

ওয়েস্টার্ন
ঘেরাও

নীল নকশা

শওকত হোসেন



ANIK



চষ্টম্বর নিবেদন ওয়েস্টার্ন

ঘেরাও

শওকত হোসেন

ফাঁসির দড়ি থেকে জ্যাক ও'নীলকে রক্ষা করল মাইক
শেভলিন নামে এক দুঃসাহসী যুবক। স্বেচ্ছায় নিজ কাঁধে
তুলে নিল তার র‍্যাপ্ত রক্ষার দায়িত্ব। শক্তিশালী শত্রুর
বিরুদ্ধে একা। শেষমুহূর্তে চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলল
ওকে বিপক্ষশক্তি। এবার?

নীল নকশা

দুঃসংবাদ পেয়ে দেশে ফিরে এল কলিন ফোর্বস দীর্ঘ আট
বছর পর। প্রথম দিনই গানফাইটে হত্যা করল ও ওর বাবার
পরম শত্রু রবার্ট ওয়ারেনের এক রাইডারকে-আত্মরক্ষার
খাতিরে।

এরপরেই আকাশ ভেঙে পড়ল ওর মাথার উপর।
ধাওয়া করছে দাগাবাজ রাইডাররা-সেই সাথে আইন।



সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



সেবা প্রকাশনীর আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজী মাহবুব হোসেন: আলেক্সার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বান্দন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনা পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায়ে এরফান, নিষ্ঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রক্ত সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অব্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাটাটারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্ত্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্রোহ, ক্রোধ, স্বপ্নগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দৃষ্টচক্র, দমন, রক্তরোধ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তক্ষণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** ভূগভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিবশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যাভার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যোনদৃষ্টি। **কাজী শাহনুর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনুর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কুটাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিষ্ঠুর আলাহু, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুপ্তন, উত্তপ্ত কারাগার। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাগল, জালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসুরি, খুনে শহর, তলাশ, মুখোশ। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিপাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জালা, জেলঘূষু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ। **আবু মাহদী:** পাঞ্চর, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বসু। **সুন্ময় আচার্য:** অপবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্তূর্ধাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some
Credit When You Share
Our Books!

Don't Remove
This Page!

COLLECTION

वरे

२६

६६६



धर

Visit Us at
boighar.com

If You Don't Give Us
Any Credits, Soon There ll
Nothing Left To Be Shared!

এক

অন্ধকারে চোখ মেলে তাকাল সে। কান পাতল। কীসের শব্দে যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে।

নরম ঘাসে বিছানো চাদরে শুয়ে আছে ও। চারদিকে হাওয়ায় ভাসছে মাতাল করা মিষ্টি একটা সুবাস। আবার আঘাত করল শব্দটা ওর কানে—এই শব্দটাই আকস্মিক নিদ্রাভঙ্গের কারণ। ধূলিধূসরিত ট্রেইলে ঘোড়ার খুরের হালকা শব্দ। বড় জোর গজ ত্রিশেক দূরে। একটা নয়, অনেক—ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

কনুইতে ভর দিয়ে সাবধানে মাথা উঁচু করল আগন্তুক। অচেনা জায়গা—সঙ্গে ধরতে গেলে কোন অস্ত্রই নেই। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে খামোকা একদল অশ্বারোহী অন্ধকার রাতে এভাবে চুপচাপ এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছে না; একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে।

কাজ শেষে র‍্যাঞ্চ ফেরত কাউন্সিলের দল হলে হৈ-চৈ করে গান গাইতে গাইতে যেত; অথচ অস্বাভাবিকভাবে নীরব ওরা সবাই। এই অস্বাভাবিক নীরবতা অশুভ ঘটনা—বিপদেরই ইঙ্গিতবহ। যদিও বিপদের মাঝেই বসবাস তার, পাথরের মত অনড়ভাবে উৎকর্ণ হয়ে রইল আগন্তুক। উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠল শরীরের প্রতিটি পেশী।

থেকে গেল ঘোড়াগুলো। ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠল একটা ঘোড়া। তারপরই ভেসে এল একটা কণ্ঠস্বর। ‘ঠিক তোমার মাথার ওপরে।’ একটু বিরতি। ‘হ্যাঁ, ঠিক আছে।’

এবার চাপা কণ্ঠে কথা বলে উঠল আরেকজন। ‘ঘোড়াটা নিয়ে এসো এখানে।’ নড়াচড়ার আওয়াজ, পাথরে ঘষা খেলো একটা খুর। ‘খামো।’

নীরব আধারে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে জিনের খসখস শব্দ। দ্বিতীয় ব্যক্তি কথা বলে উঠল আবার। ‘হয়েছে!’

কণ্ঠে সন্তোষের ছাপ সুস্পষ্ট। যেন ঘৃণার জঠরে জন্ম নেয়া এক বিজয়োল্লাস। বহুদিন ধরে এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষা করে আসছে যেন ওই স্বরের অধিকারী।

‘ঘোড়া সামলে রাখো!’ বিরক্তির ছোঁয়া লাগল কণ্ঠে। ‘তাড়াহুড়ো নয়, আস্তে আস্তে সরিয়ে আনবে!’

‘জলদি করো!’ অধৈর্য গলায় বলল আরেকজন। ‘যা করার জলদি করে ফিরে চলো!’

‘চপ্পা!’ ধমকে উঠল চাপা কণ্ঠে। ‘তাইতো করছি। অনেক দিন ধরে এই

সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। এখন কেমন লাগছে, মিস্টার ও'নীল?

কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে হতভাগ্য লোকটার গলায়, শীতল কণ্ঠে জবাব দিল সে, 'এত বড় বেঈমানি করবে তুমি, লুড, ভাবতেও পারিনি।'

চটশ করে চড় কষানোর আওয়াজ ভেসে এল। আবার শোনা গেল ও'নীলের কণ্ঠ। 'তোমার কপাল ভাল, আমার হাত দুটো বাঁধা, নইলে দেখে নিতাম। বুড়ো হয়েছি, পচে যাইনি।'

এবার পর পর কয়েকটা ঘুসির শব্দ ভেসে এল। চাদরে আধশোয়া অবস্থায় ঘামছিল আগন্তুক। পুরোপুরি উঠে হাত বাড়াল জুতোর দিকে। দ্রুত জুতো পরে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'জলদি, লুড। শিগগিরই ভোর হয়ে যাবে, ফিরতে হবে না আমাদের!'

নড়ল না আগন্তুক। এখন এদের হাতে ধরা পড়লে প্রাণ খোয়াতে হবে নির্ধাত-আত্মরক্ষার কোন পথই খেলা নেই সামনে। পিস্তল থাকলে না হয় একজন কিংবা দুজনের সঙ্গে লড়াই করা যেত; কিন্তু ওর কাছে একটা বউয়ি নাইফ ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই। এবং সংখ্যায় এরা অনেক বেশি।

কথাবার্তাতেই বোঝা যাচ্ছে কোন জাতের লোক, রাতের অন্ধকারে গোপনে অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল করতে বেরিয়েছে একদল খুনে। এ অবস্থায় কেউ ওদের চিনে রাখুক বা দেখে ফেলুক সে ঝুঁকি কোনমতেই নিতে চাইবে না। সুতরাং, ধরা পড়লেই খতম।

'ঠিক আছে,' লুডের কণ্ঠে খেদ, যেন বিরাট একটা ঘটনা উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। 'নাও, আস্তে করে সরিয়ে ফেলো ঘোড়াটা। ব্যাটা কষ্ট পেয়ে মরুক।'

নড়ে উঠল একটা ঘোড়া। রশিতে টান পড়বার মৃদু শব্দ ভেসে এল। তারপরই ঝুলন্ত লোকটার হাত-পা ছোঁড়ার আওয়াজ। না দেখেও কি ঘটছে, বুঝতে পারছে ও-বহুবীর চোখের সামনেই ঘটতে দেখেছে এমন ঘটনা।

'এই মুহূর্তটার অপেক্ষাই করছিলাম এতদিন,' বলল প্রথম কণ্ঠ। 'ও'নীলের পর আর কোন অসুবিধে হবে না-একে নিয়েই যা একটু দুশ্চিন্তা ছিল।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল লুড। 'এই ব্যাটাকে নিজ হাতে ঝোলানোর শখ ছিল আমার। চিন্তা নেই, আমার ওপর ছেড়ে দাও সব। বাকিগুলোকেও ঠিক সামলে নেব। নাও, চলো, এবার ভাগি!'

অকস্মাৎ ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দে মাটি কাঁপিয়ে চলে গেল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেল আগন্তুক। ভূতের মত ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ল নিঃশব্দে। সামান্যতম ঘর্ষণের শব্দও হলো না ওর কাপড়ের।

আশা খুবই কম। শেষ কয়েক ফুট দূরত্ব চিতার মত নিঃশব্দ দ্রুততায় দৌড়ে গেল ও। ইতিমধ্যে ছুরিটা বেরিয়ে এসেছে হাতে। গাছটার কাছে পৌঁছেই তরতর করে উঠে পড়ল, পরমুহূর্তে চট করে ছুরি চালিয়ে কেটে দিল দড়ি। ঝপাৎ করে মাটিতে পড়ল ঝুলন্ত লোকটার দেহ। দড়িটা কেটে দিয়েই একটা ডাল ধরে ঝুলে

বইঘর, কম
ঘেরাও

পড়ল আগন্তুক, আস্তে করে নেমে এল লোকটার পাশে। তাড়াতাড়ি সামনে ঝুঁকে গলার ফাঁস আলাদা করে দিল। ডাঙায় তোলা মাছের মত হাঁসফাঁস শুরু করে দিল লোকটা।

যদূর দেখা যাচ্ছে, ফাঁকা ট্রেইল। তবু জায়গাটা সুবিধেজনক মনে হলো না আগন্তুকের কাছে। বাচ্চা ছেলের মত করে লোকটাকে কোলে তুলে ঝোপের ভিতর দিয়ে দ্রুত আগের অবস্থানে ফিরে এল, মাটিতে শুইয়ে দিল তাকে। তারপর শার্টের বোতাম খুলে দিয়ে পানির ক্যান্টিনটা মুখের কাছে ধরল। মাথা তুলে কোনমতে কয়েক ঢোক পানি খেয়েই আবার মাথা এলিয়ে দিল বেচারী। চামড়া ছড়ে গিয়ে নীল হয়ে ফুলে উঠেছে গলার চারপাশ। রক্ত বেরুচ্ছে চুইয়ে চুইয়ে।

অস্থির পায়ে পায়চারি শুরু করল আগন্তুক। ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে ট্রেইলের দিকে তাকাচ্ছে বারবার। যে কোন মুহূর্তে খুনেদের কেউ আবার হাজির হতে পারে। এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে পড়া দরকার। অচেনা জায়গায় অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর পরিণতি ভাল করে জানা আছে তার।

চাদরের উপর শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। গলায় হাত ছোঁয়াল। রক্তে ভিজে গেল আঙুলগুলো। উদ্ধারকারীর দিকে ধূসর চোখ ফিরিয়ে তাকাল এবার। ‘প্রাণের...আশা...প্রায়...ছেড়েই...দিয়েছিলাম...’ ভারি ফ্যাসফেসে কণ্ঠে কথা বলতে চাইল সে।

‘কথা বোলো না। আসলে লুডের জন্যেই বেঁচে গেছ। আচমকা ঘাড় মটকে না মেরে আস্তে আস্তে কষ্ট দিয়ে মারতে চেয়েছিল সে তোমাকে।’

কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে আস্তে করে উঠে বসল মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসা লোকটা। চোখ ফিরিয়ে চাদর আর ক্যান্টিনটা দেখল। কাঁপা কাঁপা হাতে ক্যান্টিন তুলে নিয়ে দুটোক পানি খেলো। তারপর জিজ্ঞাস করল, ‘ঘোড়া নেই তোমার?’

‘না।’ আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে।

বিস্ফারিত চোখে আগন্তুককে আগাগোড়া জরিপ করল লোকটা। চাদর আর ক্যান্টিন ছাড়া এর আর কিছুই নেই দেখা যাচ্ছে। রঙ-জুলা ফ্লানেল শার্ট গায়ে, জিন্সটাও কেমন যেন ঢিলেঢালা। টুপি পরেনি মাথায়। শার্টের আড়ালে বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের আভাস, রোদে পুড়ে তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে রুম্ম চেহারা, দুটোখে ফুটে রয়েছে দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের ছাপ। হাবভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রবল ব্যক্তিত্ব। লোকটাকে অগ্রহী করে তুলছে এই যুবক।

‘আমার নাম জ্যাক ও’নীল,’ যেচে আত্মপরিচয় দিল সে। ‘তোমার?’

ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল আগন্তুকের। হাত বাড়িয়ে একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়ে নিল।

‘ব্যাপারটা কী?’ মাথা ঝাঁকিয়ে ট্রেইলের দিকে ইঙ্গিত করল, ‘ওরা কারা?’

‘শান্তিবাহিনী,’ ফ্যাসফেসে কণ্ঠে জানাল ও’নীল। ‘দুঃখের কথা কি জানো, আমিই এই বাহিনীটাকে নিজ হাতে গড়ে তুলেছিলাম।’

সাবধানে ঘাড় নাড়াল সে। এই আলোতেও চেহারাঃ বলিরেখা স্পষ্ট চোখে পড়ছে। ‘এখানকার, “জে-ডট-ও” র‍্যাঞ্চার মালিক আমি। রাসলারদের উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় আমরা সবাই মিলে শান্তিবাহিনী গঠন করেছিলাম। সংগঠিত বিরাট একটা দল পুরো এলাকায় গরু চুরি করে যাচ্ছে; কিছুতেই বোঝা যাচ্ছিল না কে এদের নেতা। শেষে হঠাৎ একদিন লুড জানাল গিড ব্ল্যাকই নাকি নাটের গুরু—কথাটা এক বিন্দুও বিশ্বাস করি না আমি।’

‘তাকেও ফাঁসি দেয়া হয়েছে নিশ্চয়ই?’

‘হ্যাঁ, লুড ফেলারই করেছে কাজটা, আমার অনুপস্থিতিতে।’

‘এই ব্ল্যাক লোকটা কে—জুয়াড়ী?’

‘হায় খোদা, না। র‍্যাঞ্চার ছিল। “বিগ-বি” নামে একটা র‍্যাঞ্চার মালিক। প্রায় আমার আউটফিটটার মতই বিরাট।’

সিধে হয়ে দাঁড়াল আগন্তুক। ‘তোমাকেও একইভাবে ফাঁসাতে চাচ্ছে এরা। চলো পালাই। আশপাশে কারও কাছ থেকে ঘোড়া জোগাড় করা যাবে না?’

‘হ্যাঁ, ওদিকে ডাচ অ্যাকিনদের র‍্যাঞ্চে গেলেই ঘোড়া পাওয়া যাবে।’

‘ডাচ অ্যাকিন—মেক্সিকান?’

‘হ্যাঁ। অনেক দিন ধরে বসবাস করছে এখানে।’

আর কথা না বাড়িয়ে রওনা হলো ওরা। এক সময় একটা পাথুরে চাতালে উঠে এল দুজন। ‘এটার ওপর দিয়ে এগোও,’ ও’নীলের উদ্দেশে বলল আগন্তুক। ‘আমাদের পিছু নিতে পারে ওরা। সহজে ছাড়বে না তোমাকে।’

এখনও একটু একটু কাঁপছে ও’নীল, ফাঁসির ধাক্কা সামলে উঠতে পারছে না। নোনা ঘামে ভিজে অসম্ভব জ্বলুনি শুরু হয়েছে গলার ক্ষতে।

হাঁটতে হাঁটতে ভুরু কঁচকে ভাবছে ও’নীল। ওকে মারতে চাইল কেন ওরা? লুডকে খুব একটা পছন্দ করত না ও; কিন্তু লোকটা ওকে এত ঘৃণা করতে পারে—কল্পনাতেও আসেনি। মাঝ রাতের দিকে শান্তিবাহিনীর কাছ থেকে ডাক পেয়েই ওদের সঙ্গে দেখা করতে আসে ও। মনস্তির করে ফেলেছিল আগেই, শান্তি-বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে। গিড ব্ল্যাকের হত্যার ব্যাপারটা আর সবার মত সে নিজেও মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু ও এসে পৌঁছনো মাত্র মাথার পেছনে আঘাত করে ওকে অচেতন করে ফেলে ওরা। জ্ঞান ফিরে পেতেই দেখতে পেল, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ওকে ফাঁসিতে লটকানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ঘাড় ফিরিয়ে পাশের দীর্ঘদেহী আগন্তুকের দিকে তাকাল ও’নীল। দৃঢ় পদক্ষেপে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে হাঁটছে লোকটা—তাল মেলানোই দায় হয়ে পড়ছে।

কে এই যুবক? ইন্ডিয়ানদের মত নগণ্য একটা অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে কেন ঘুরে ফিরছে শাদা মানুষটা?

অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে হাঁটল ওরা। তারপর একসময় থমকে দাঁড়াল ও’নীল। ‘উফ, একটু দাঁড়াও! খানিকটা বিশ্রাম না নিলে আর পারছি না!’

‘কিছু করার কথা ভেবেছ?’

‘নাহ!।’ স্বীকার করল ও’নীল। পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে অবিশ্বাস্য

বইঘর.কম
খেরাও

ঠেকছে। কেন যে ওরা এমন করল বুঝতে পারছি না। এদের একজন আরার আমার র‍্যাঞ্ছেরই ফোরম্যান। এরপর আর কাকে বিশ্বাস করব বলো?’

‘কাউকে বিশ্বাস করার দরকার কি?’

‘মুখে বলা সহজ। কিন্তু কাউকে না কাউকে তো বিশ্বাস করতেই হবে—নইলে সাহায্য চাইব কী করে!’

‘কেন, সাহায্য করার লোক এই যে তোমার সামনেই হাজির,’ বলে মাটিতেই বসে পড়ল আগন্তুক। ‘বলো, কী সাহায্য চাই?’

সাবধানে ঘাড়ে হাত বোলাল ও’নীল। ‘বুড়ো হয়ে গেছি, ফিরে গিয়ে আবার ফাঁসিতে ঝোলার সাধ আমার নেই।’

‘তার মানে পালানোর কথা ভাবছ।’

থুতু ফেলল ও’নীল। ‘কক্ষনো না! আমার সর্বস্ব ফেলে, তিরিশ হাজার গরু হাতছাড়া করে চলে যাব ভেবেছ?’

‘নিরেট বোকা না হলে কেউই তা করবে না। শোনো, এক কাজ করো, আমাকে পাঠিয়ে দাও তোমার র‍্যাঞ্ছ।’

‘তোমাকে?’

‘হ্যাঁ। তোমার র‍্যাঞ্ছের ম্যানেজারের দায়িত্ব দিয়ে; ব্যাংক স্বীকৃতি দেবে এমন কিছু কাগজপত্রের ব্যবস্থা করে দাও। তারপর সবকিছু আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকো—আমি সব সামলে নেব।’

‘ঠিক বুঝলাম না!’

‘দেখো,’ বলল আগন্তুক, ‘রাসলারদের উপদ্রব থেকে বাঁচতে শান্তিবাহিনী গঠন করেছিল তোমরা। তারপর তোমার অজান্তে হঠাৎ একদিন রাসলার আখ্যা দিয়ে ওরা গিড ব্যাককে মেরে ফেলল। অথচ, তুমি নিজেই বলেছ, বিরাট একটা র‍্যাঞ্ছের মালিক ছিল সে। আচ্ছা তার মৃত্যুর পর র‍্যাঞ্ছটার এখন কী হয়েছে?’

‘কী আবার হবে? ওর মেয়েই দেখাশোনা করছে।’

‘পারবে তো শেষ পর্যন্ত?’

‘কী জানি?’ সন্দেহমাখা কণ্ঠে বলল ও’নীল। ‘একেবারে বাচ্চা মেয়ে।’

‘এই র‍্যাঞ্ছের ফোরম্যানও নিশ্চয়ই শান্তিবাহিনীর সদস্য? আমার কিন্তু তাই মনে হচ্ছে। আমার বিশ্বাস ধূর্ত কোন লোক তোমাদের দুজনের র‍্যাঞ্ছ দখল করে নেয়ার জন্যে সুকৌশলে ব্যবহার করছে শান্তিবাহিনীকে। কথাবার্তায় মনে হলো আরও অনেকের জমির দিকেই নজর রয়েছে ওদের। তুমি, তোমরা কেউ আগে থেকে নিশ্চয়ই ক্রেইম ফাইল করোনি—তাই না? সুতরাং, তোমাদের সরাতে পারলেই তার মতলব হাসিল হবে, বুঝতে পারছ?’

‘হবেও-বা।’ এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল ও’নীল। ‘না, ঠিকই বলেছ! এ ছাড়া আর কিছু না!’ আবার মাথা নাড়ল সে। ‘কিন্তু কে হতে পারে...’

‘নির্দিষ্ট কেউ নাও হতে পারে—হয়তো কয়েকজন জোট বেঁধেছে, শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে নিজেদের মধ্যে সংঘাত বেধে গেছে ওদের। কে ঠেকাবে? মানে, ঠেকানোর মত আছে কেউ?’

‘টেল স্টিভেন্স পারলেও পারতে পারে। বেশ কবছর আগে মার্শাল ছিল, এখনও যথেষ্ট প্রভাব রাখে। ম্যাককার্থি আছে—বুদ্ধিমান লোক। ব্ল্যাক, ম্যাককার্থি, জ্যাকসন আর আমি—আমরা চারজনই এ অঞ্চলের বড় র‍্যাঞ্চগুলোর মালিক। আরেকজন আছে, লী উইলকক্স, শক্তিশালী হলেও তার র‍্যাঞ্চটা তত বড় নয়। শান্তিবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত আমরা সম্মিলিতভাবে নিয়েছিলাম। অবশ্য বেশির ভাগ কাজ আমিই করেছি—বলতে পারো নেতা ছিলাম; অন্তত তাই ভাবতাম।’

বিশ্রাম সেরে আবার এগোল ওরা। আগের চেয়ে ধীর পায়ে হাঁটছে এবার।

‘আমার প্রস্তাবটা পছন্দ হয়?’ জিজ্ঞেস করল আগন্তুক। ‘এখন র‍্যাঞ্চ ফিরলে কোন সন্দেহ নেই মরতেই হবে তোমাকে। বরঞ্চ আমাকে পাঠাও, তা হলে ভড়কে যাবে সবাই—তোমার কী হয়েছে, বেঁচে আছ, নাকি মরে গেছ, বুঝতে না পেরে দিশেহারা হয়ে পড়বে ওরা।’

‘কিন্তু তোমাকে পাঠানো মানেই তো, আমি বেঁচে আছি জানিয়ে দেয়া।’

‘কেন, পুরানো তারিখ, ধরো, দুতিনমাস আগের একটা তারিখ দিয়ে কাজে লাগালে আমাকে—তা হলেই তো হয়ে গেল। আচমকা আমি গিয়ে হাজির হব, মাথা খারাপ হয়ে যাবে ওদের।’

‘ওরা তোমাকে মেরে ফেলতে চাইলে? ঠেকাবে কী করে?’ জিজ্ঞেস করল ও’নীল। ‘সোজা ওদের পাতা ফাঁদে গিয়ে হয়তো পা দিলে তুমি।’

‘আমার জন্যে ভেবো না। এসব আমার কাছে নতুন কিছু নয়, ঠিকই বেরিয়ে আসতে পারব।’

এগিয়ে চলল ওরা। টকটকে লাল সূর্য উঠে এল আকাশের গা বেয়ে। তেতে উঠল আন্তে আন্তে। মনে মনে আগন্তুকের কথাগুলো ভাবছে ও’নীল। অনেক বয়স হয়েছে এখন ওর, ষাট পেরিয়ে এসেছে সেই কবে, দেখে শুনে চললে আরও কয়েক বছর হয়তো টিকে যাবে। কিন্তু একা লড়াই করে র‍্যাঞ্চ রক্ষা করা সম্ভব হবে না। কেউ পারলে, কেন যেন মনে হচ্ছে, কেবল এই ন্যুবকের পক্ষেই তা সম্ভব। ছেলেটাকে বেশ ভাল লেগে গেছে তার।

‘তোমাকে তো আমি চিনিই না। বিশ্বাস করব কীভাবে? দেখে তো ভবঘুরে ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না।’

‘ঠিক তাই। মাত্র কদিন আগে জেল থেকে পালিয়েছি।’

হেসে উঠল ও’নীল। ‘আর তোমার হাতেই কি না আমার র‍্যাঞ্চের ভার ছেড়ে দিতে বলছ—বুকের পাটা আছে বলতে হবে!’

‘জেলটা ছিল ওল্ড মেক্সিকোতে। বিপ্লবী সেনাদলে একজন কর্নেল ছিলাম আমি। বিপ্লব ব্যর্থ হলো, গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম। ফায়ারিং স্কোয়াডে মেরে ফেলার পায়তারা করছিল ওরা, ব্যাপারটা আমার পছন্দ হলো না। তাই একদিন রাতের অন্ধকারে দেয়াল উপকে পালালাম। হারামেসিলো গিয়েছিলাম প্রথমে, সেখান থেকে এখানে এসেছি।’

‘তোমার নাম?’

হেসে হাতের পিঠে মুখ মুছল যুবক। ‘তা একটা আছে বটে। মাইক

বইঘর, কম
ঘেরাও

শেভলিন-সাডেন নামেও চেনে অনেকে।’

আড়ষ্ট হয়ে গেল ও’নীল। হতচকিত দৃষ্টিতে তাকাল সে। ‘তুমি... তুমিই সাডেন শেভলিন-গানফাইটার?’

‘ঠিক ধরেছ।’

চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবল ও’নীল। সাডেনের কাহিনী কত হাজার বার শুনেছে ও? বন্দুক চালনায় ওয়েস হারডিন, ক্লে অ্যালিসন আর ওয়াইট ইয়ার্পের সমকক্ষ হিসাবে ধরা হয় একে। শোনা যায়, মুখোমুখি গানফাইটে প্রায় বিশজন লোককে নাকি হত্যা করেছে শেভলিন। অথচ যে কোন র‍্যাঙ্কের জন্যও সে গর্বের বিষয় হতে পারে।

‘তুমিই স্টারদের গরুর পাল নিয়ে গিয়েছিলে?’

‘হ্যাঁ, পীয়ার্সদেরগুলোও নিয়েছিলাম।’

‘ঠিক আছে, শেভলিন। আমি রাজি। বিনিময়ে কী চাও তুমি?’

‘মাসে একশো ডলার। র‍্যাঙ্গে যাব, সেজন্যে একহাজার ডলার হাত খরচা-এ টাকার অবশ্য হিসেব দাখিল করব আমি। আর কাজ শেষ হলে পরে একশোটা গরু দিতে হবে আমাকে।’

থুতু ফেলল ও’নীল। ‘আগে সব ঝামেলা মিটিয়ে দাও। তারপর একশো কেন-দরকার হলে হাজারটা গরু নিয়ো-কোন আপত্তি করব না। চাইকি, স্থায়ী একটা কাজের ব্যবস্থাও করে দেয়া যাবে। ভাল লোককে কীভাবে কাজে লাগাতে হয়, আমি জানি, শেভলিন। তুমি সাংহাই পীয়ার্সদের কাজ করে থাকলে আমার জন্যে তা হবে সোনায় সোহাগা। ঠিক আছে, র‍্যাঙ্গ ম্যানেজার করে ব্যাংক থেকে টাকা তোলায় ক্ষমতা দিয়ে দেব তোমাকে।’

সূর্যাস্তের সময় ডাচ অ্যাকিনের র‍্যাঙ্গ সীমানায় পৌঁছুল ওরা। প্রায় আধঘণ্টা ধরে নজর রাখল র‍্যাঙ্গের উপর। মোট তিনজন লোক চোখে পড়ল ওদের, দীর্ঘদেহী ডাচ অ্যাকিন আর তার দুছেলে। সচরাচর কেউ আসে না এদিকে। আর কেউ নেই, নিশ্চিত হয়ে অবশেষে র‍্যাঙ্গের দিকে পা বাড়াল ওরা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওদের দেখতে পেল অ্যাকিন। অপেক্ষা করতে লাগল সে। ওরা কাছাকাছি হতেই প্রথমে শেভলিন, তারপর ও’নীলের দিকে তাকাল। ‘কী ব্যাপার?’ জিজ্ঞেস করল। ‘পায়ে হেঁটে যে? আরে, তুমি আহত হয়েছ দেখছি!’

ভিতরে এসে বসল ওরা। সংক্ষেপে সব কিছু ডাচ অ্যাকিনকে খুলে বলে শেভলিনের দিকে ইঙ্গিত করল ও’নীল। ‘আমার হয়ে ওখানে আবার ফিরে যাবে ও। এখন একটা কাভার্ড ওয়াগনে করে আমাদের রেলরোড পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবে?’

‘কেন নয়! আর কোন সাহায্য যদি লাগে, বলো, যথাসাধ্য করব আমি।’

চারদিন পর। এল পাসোতে চুক্তিপত্রে সই করল ও’নীল আর শেভলিন। পরস্পর হাত মেলাল ওরা। ‘আমার ছেলে থাকলে-হয়তো এভাবেই এগিয়ে যেত সে, সাডেন।’

‘নিশ্চয়ই,’ জবাবে বলল শেভলিন, ‘চিন্তা কোরো না, এখন এতে আমারও

স্বার্থ আছে, ও'নীল। তুমি চাও তোমার আউটফিট শত্রুর হাত থেকে বাঁচুক—আমার দরকার নিজের জন্যে এক টুকরো জমি।’

অনেক দূর এগিয়ে গেছে, যত বাধাই আসুক সামনে এগিয়ে যেতেই হবে ওকে, ভাবল শেভলিন। কিন্তু এখনই কোনরকম কথা দিতে যাওয়া বোকামি হয়ে যাবে। আসলে তড়িৎ অ্যাকশনের উপরই নির্ভর করবে সব কিছু—এবং তার জন্য ও তৈরি। কোমরে'ঝোলানো পিস্তল আর হাতের কাছে উইনচেস্টারের উপস্থিতিতে বরাবরই স্বস্তি বোধ করে ও।

শহরের নাম রেডক্রিক। ওখানে প্রথম চেহারা দেখিয়ে তারপর রঙনা দিতে হবে 'জে-ডট-ও'-র উদ্দেশ্যে। ট্রেনের আসনে গা এলিয়ে বসল সাডেন। টেনে চোখের উপর নিয়ে এল নতুন টুপিটা। সময় মিলে গেছে যখন, একটু বিশ্রাম নিয়ে নেয়া যাক।

আগামী কিছুদিনের জন্য এটাই হবে ওর শেষ বিশ্রাম।

দুই

ঠিক দুপুরবেলা রেডক্রিকে পৌঁছুল সাডেন শেভলিন। রেলকর্মীদের সহায়তায় ব্যাগেজ কার থেকে নামিয়ে আনল ওর স্ট্যালিয়নটা। ঘোড়া আনতে গিয়ে অতিরিক্ত দশটি ডলার ভাড়া বইতে হয়েছে ওকে।

জেব্রা ডান ঘোড়াটার মাথা, কেশর আর লেজ মিশকালো। বিশাল শক্তিশালী গড়ন বলে দেয় এর পূর্বপুরুষ ছিল মরগান; আর অন্যদিকে রঙ বা আরও কিছু বৈশিষ্ট্য দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না অ্যাপালুজা জাতীয় ইন্ডিয়ান কোন ঘোড়ার রক্তও বইছে শরীরে। দেখামাত্র ঘোড়াটা পছন্দ হয়ে গিয়েছিল শেভলিনের।

ট্রেন থেকে ঘোড়া নামানোর পর আনকোরা নতুন জিনটা চাপিয়ে লাগাম লাগিয়ে ঘোড়াটাকে তৈরি করে নিল শেভলিন। উইনচেস্টারটা ভরে দিল স্ক্যাবার্ডে। তারপর উঠে বসল ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে রাস্তায় উঠে এগোল আস্তাবলের দিকে। অনুভব করছে, কেউ যেন লক্ষ্য রাখছে ওর উপর।

সারা শহরে একটা মোটে রাস্তা, চলে গেছে শহরের এমাথা থেকে ওমাথায়। দুপাশে দালান-কোঠা, প্রায় সবগুলোর সামনেই হিচিং রেইল রয়েছে। আস্তাবলের ঠিক উল্টোদিকেই ব্যাংক। আস্তাবলের পাশে বিপরীত দিকের মুদি দোকানের মুখোমুখি একটা কামারশালা চোখে পড়ছে। তা ছাড়া হোটেল, রেস্টরাঁ, পত্রিকা অফিস এসব তো রয়েছেই। এরপর আছে বসতবাড়ি, এক-আধটা বাড়ির উঠোন বেড়ায় ঘেরা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রয়েছে অযত্ন আর অবহেলার ছাপ।

আস্তাবলে ঘোড়া রেখে দরজায় এসে দাঁড়াল শেভলিন। সিগারেট ধরাল।

বইঘর, কম
ঘেরাও

ওআর্টারং ট্রাফের সামনে বেঞ্চে বসে আড্ডা মারছে দুজন বেকার কাউন্সিল। যেন অফুরন্ত সময় ওদের হাতে। শেভলিনের দিকে ফিরেও তাকাল না ওরা। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওর উপস্থিতিতে ভিতরে ভিতরে সচেতন হয়ে উঠেছে লোক দুটো।

‘...কারও জানতে আর বাকি নেই,’ বলছিল একজন, ‘লুড ফেলারকে সরানোর মত কেউ নেই এ তল্লাটে—চেষ্টা করার মতও তো দেখছি না কাউকে।’

‘তাই বা বলি কী করে,’ আপত্তি জানাল অপরজন। ‘“জে-ডট-ও” হচ্ছে এখানকার সবচেয়ে বড় রেঞ্জ। “বিগ-বি” কিংবা অন্য যে কোন রেঞ্জের চেয়ে ভালও। খাবলা বসানোর সুযোগ পেলে আমি নিজেই তো ছেড়ে কথা কইব না।’

দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাডেন শেভলিন। রক্ষ কঠিন চেহারায় চিন্তার ছাপ। পরনে ধূসর উলের শার্ট, তার উপরে কালো কোট। কোমরে গুঁজে রেখেছে পিস্তলটা।

সামনে পা বাড়াল সাডেন। এক নজর তাকাল দুই রকবাজের দিকে। ‘“জে-ডট-ও”-র জমি মুফতে লুফে নেয়া থাকবে, এ ধরনের কথায় আমল দিয়া না,’ আস্তে করে বলল ও, ‘ওখানকার এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বে না জ্যাক ও’নীল।’

কথাটা বলে ওদের প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্য অপেক্ষা করল না সাডেন। রাস্তার উল্টোদিকের ব্যাংকের উদ্দেশে পা বাড়াল। সূর্যের প্রখর তাপে পায়ের নীচে রাস্তার ধুলো পর্যন্ত তেতে রয়েছে। রাস্তার উপর চিৎকার করে ডিম পাড়বার খবর রাষ্ট্র করছে একটা মুরগি। একটা দালানের আড়াল থেকে মোড় নিয়ে রাস্তায় উঠে দুলকি চালে এগিয়ে আসছে বাকবোর্ড, চালকের আসনে একটা মেয়েকে দেখা যাচ্ছে, দক্ষ হাতে ঘোড়া সামলাচ্ছে।

টোকা-মেরে সিগারেট ফেলে দিল শেভলিন। পা রাখল ব্যাংকের ভিতরে। শীতল পরিবেশ। একধারে কাউন্টারে বসে রয়েছে কটাচুলো বিশালদেহী এক লোক। তার দিকে এগিয়ে গেল ও। ডেস্কের উপর রাখা নামফলকে শোভা পাচ্ছে লোকটার নাম: ম্যাককার্থি।

‘ম্যাককার্থি? আমি শেভলিন, “জে-ডট-ও”-র ম্যানেজার। এই আমার কাগজপত্র।’

চমকে তাকাল ম্যাককার্থি, যেন চড় কষেছে কেউ তার গালে। ‘তুমি কী?’

তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে ব্যাংক কর্মী এবং আরও দুজন খন্দের বাধ্য হলো চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে।

কাগজপত্র ম্যাককার্থির সামনে রাখল সাডেন শেভলিন। ‘এখানে সব কিছু লেখা আছে। ছুটি কাটাতে গেছে ও’নীল। র‍্যাঞ্চার ভার এখন থেকে আমার হাতে থাকবে।’

শেভলিনের শীতল সবুজ চোখে চোখ রাখল ম্যাককার্থি। হতভম্ব চেহারা। জ্যাক ও’নীলের রহস্যময় অন্তর্ধান এবং এর পরিণতি নিয়ে গুজব-গুঞ্জন আর জল্পনা-কল্পনা চলছে রেডক্রিকে। ম্যাককার্থিসহ এখানকার প্রায় প্রতিটি লোকই ও’নীলের সবুজ শ্যামল রেঞ্জের দিকে লোভাতুর নয়নে চেয়ে থাকত। জ্যাক

ও'নীল আর বেঁচে নেই বলেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে শহরবাসী।

কীভাবে যেন বুঝে গেছে সবাই, গিড ব্ল্যাকের হত্যাকাণ্ডের মত এই রহস্যময় অন্তর্ধানের পিছনেও শান্তিবাহিনীর হাত রয়েছে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে প্রকাশ্যে আলাপ আলোচনার সাহস করছে না কেউ, কারণ কে যে শান্তিবাহিনীর সদস্য জানবার উপায় নেই। ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রাণ খোয়ানোর ঝুঁকি নেবে কেন লোকে?

শান্তিবাহিনী গঠনের পরপরই দুজন জুয়াড়ীকে ধরে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। তারপর বাকি অপরাধীদের শহর ত্যাগ করবার সুযোগ দেওয়া হয়। তখন একবাক্যে সবাই স্বীকার করেছে, এতদিনে একটা কাজের মত কাজ হয়েছে—এটাই চাইছিল সবাই। কিন্তু গিড ব্ল্যাক ওদের হাতে মারা যাওয়ায় প্রচণ্ড একটা নাড়া খেল এখানকার সমাজ, সহজে মেনে নিতে পারল না কেউ এই মৃত্যু। এবং তারপরই হঠাৎ উধাও হয়ে গেল জ্যাক ও'নীল। ও'নীলের অন্তর্ধানের ব্যাপারে একমাত্র যে লোকটা প্রশ্ন তুলেছিল তাকেও রহস্যজনকভাবে কে বা কারা যেন হত্যা করল।

ও'নীলের একজন বিশ্বস্ত কাউন্সিলকেও খুন করা হলো একইভাবে। শেষের এই হত্যাকাণ্ডগুলোর কারণ মুখে উচ্চারণ না করলেও, আসল কথাটা বুঝে নিতে অসুবিধে হলো না কারও—শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে কিছু বলা বুদ্ধিমানের পরিচায়ক নয়।

'জে-ডট-ও'-র বিশাল এলাকা নিয়ে চিন্তাভাবনায় প্রচুর সময় ব্যয় করেছে ম্যাককার্থি। তিরিশ হাজার গরুর বিশাল পাল—খেলা কথা নয়। তা ছাড়া, শেষ পর্যন্ত কেউ না কেউ তো দখল করে নেবেই রেঞ্জটা।

ম্যাককার্থি জানে, নিজেকে পয়লা নম্বর দাবিদার বলে ভাবছে লুড ফেলার। ওদিকে জ্যাকসন, মুখে কিছু না বললেও সে যে খাবলা বসাতে চাইছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। চুপি চুপি কাউকে না বলে 'জে-ডট-ও'-তে কয়েকশো গরু পাঠিয়ে দিয়েছে সে, জ্যাকসনের সব লাইন কেবিনে কয়েকজন লোক এসে অবস্থান নিয়েছে। সশস্ত্র সংঘর্ষের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে এখানকার পরিস্থিতি। এ অবস্থায় হঠাৎ কোথেকে এসে হাজির হয়েছে এই যুবক।

খাম থেকে কাগজপত্র বের করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ম্যাককার্থি। ব্যাংকারকে সম্বোধন করে একটা চিঠি দিয়েছে ও'নীল। 'জে-ডট-ও'-র ম্যানেজার করে মাইক শেভলিনকে ব্যাংক থেকে টাকা তোলা হতে শুরু করে ব্যাংকের স্বার্থে যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করবার কথা উল্লেখ করেছে সে চিঠিতে।

একটা 'পাওয়ার অভ-অ্যাটর্নি' এবং আরও কয়েকটা দলিল শেভলিনের ব্যাপারে সব সন্দেহের নিরসন করল। ও'নীলের স্বাক্ষর ম্যাককার্থির পরিচিত, চিনতে কষ্ট হলো না। তা ছাড়া, ভুরু কঁচকালো ম্যাক, আজ থেকে বেশ কয়েক সপ্তাহ আগেই সই করা হয়েছে কাগজপত্রে।

'হুম,' মাথা তুলে তাকাল ম্যাককার্থি। 'সব কিছু ঠিকই আছে মনে হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হলো না আমার কাছে, জ্যাক হঠাৎ গেল কোথায়?'

‘এল প্যাসোতে শেষবার দেখা হয়েছিল আমাদের। কিন্তু এখন আর ওখানে নেই সে। নিরিবিবি কোথাও নিশ্চিতে ছুটি কাটানোর কথা বলছিল আমাকে। আগামী কিছুদিনের ভেতর না ফেরারই সম্ভাবনা বেশি।’

হেলান দিয়ে বসল ম্যাককার্থি, সিগারের গোড়া চিবুল কয়েক মুহূর্ত। ‘কীসের ভেতর পড়তে যাচ্ছ ধারণা আছে তো?’

‘কিছুটা।’

‘তা হলে শোনো, বলছি, কারও কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য সহযোগিতা পাবে না তুমি। ও’নীলকে সবাই পছন্দ করত ঠিক, কিন্তু তাকে হিংসা করার মানুষেরও অভাব নেই। সে নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রেঞ্জটা দখল করে নেয়ার ফান্দি আঁটতে শুরু করেছে এখানকার প্রতিটি লোক—এদের ভেতর একগুঁয়ে লোকের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। সুতরাং, বুঝতেই পারছ প্রচুর ঝামেলা পোহাতে হবে তোমাকে।’

‘আমার কাছে ওসব নতুন কিছু নয়,’ শান্ত কণ্ঠে বলল শেভলিন, ‘তবে খুব একটা ঝামেলা হবে বলে মনে হয় না।’

কাগজপত্র থেকে একটা চিঠি তুলে নিল ও। চিঠিটায় শেভলিনকে ‘জে-ডট-ও’-র স্বার্থে সবরকম লেনদেন করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। দুজন সাক্ষীর স্বাক্ষর রয়েছে এতে, দুজনেই এল প্যাসোর ব্যবসায়ী মহলে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব।

‘কথাটা সবাইকে জানাতে পারলে ভাল হয়,’ বলল সাডেন। ‘কাল সকালে র‍্যাঞ্জে যাচ্ছি আমি এবং কোনরকম ঝামেলা চাইছি না।’

‘কিন্তু তার সম্ভাবনাই বেশি।’

দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল শেভলিন, এগোতে গিয়েও থমকে গেল। বাকবোর্ডের সেই মেয়েটা এগিয়ে আসছে দ্রুত পায়ের। হাঁটতে হাঁটতেই হাত থেকে দস্তানা খুলে নিচ্ছে। লম্বায় মোটামুটি পাঁচফুট চার ইঞ্চি হবে আন্দাজ, অপূর্ব সুন্দরী—গাঢ় নীল চোখ, লাল চুলে সোনালী আভা। চেহারাই বলে দিচ্ছে মেজাজ তেতে আছে মেয়েটার।

‘রাজধানী থেকে কোন খবর পেলে, ম্যাক? বাবার হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্যে ওরা নাকি লোক পাঠাচ্ছে—কোথায়?’

‘শোনো, মেরি, দেশের সব জায়গায় লোক পাঠানো তো সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। গিডের মৃত্যু আমাদের সবাইকে দুঃখ দিয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে অযথা হৈ চৈ করে কী লাভ?’

‘আচ্ছা, আরেকটা কথা, একজন নতুন ফোরম্যান চাই আমার। সহ্যের শেষ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে মিলার। রেঞ্জের মালিকানা দাবি করার মত দুঃসাহস পর্যন্ত দেখিয়েছে। বলছে, আমি মেয়ে মানুষ, রেঞ্জ সামলানো নাকি আমার কাজ নয়।’

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল ম্যাককার্থি। চৌকো বাদামী চেহারায় ব্যাংকারের চেয়ে একজন সফল র‍্যাঞ্চারের পরিচয়ই ফুটে উঠেছে বেশি করে। এই মুহূর্তে একটু যেন উদ্ভিগ্ন সে। করণীয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছে না লোকটা। ‘মেয়েরা রেঞ্জ চালাতে পারবে না একথা কোন আইনে লেখা নেই। কিন্তু কাজটা তোমার

জানো বোধহয় বেশ কঠিনই হবে। এই শেভলিনের মত লড়াই করে টিকে থাকতে হবে হয়তো তোমাকেও।’

ঝট করে শেভলিনের দিকে ফিরল মেয়েটা, এই প্রথম যেন দেখতে পেয়েছে ওকে। ‘শেভলিন? এ নাম তো আগে শুনিনি। তুমি আবার কিসের জন্যে লড়াই?’

‘ও জ্যাক ও’নীলের ম্যানেজার, মেরি। এল প্যাসো থেকে এসেছে।’

‘জ্যাক ও’নীলের ম্যানেজার?’ মেরির কণ্ঠে স্পষ্ট অবিশ্বাস। ‘বিশ্বাস করি না। জ্যাক ও’নীলের ম্যানেজার, সে তো মরেই গেছে, ম্যানেজার দিয়ে করবেটা কি! এ লোক নিজেকে ও’নীলের ম্যানেজার বলে দাবী করলে পরিষ্কার মিথ্যে কথা বলছে সে!’

নেচে উঠল শেভলিনের দুচোখ। ‘তোমার কথাবার্তা একটু রুঢ় হয়ে যাচ্ছে, মিস। জ্যাক ও’নীল বেঁচে আছে—এবং সুস্থই আছে।’

‘কিন্তু তা কী করে সম্ভব?’

‘দুঃখিত ম্যা’ম, কিন্তু সত্যি কথাই বলছি আমি।’

‘আমি যে শুনলাম—!’ হঠাৎ থেমে গেল মেয়েটা। তারপর আবার বলে উঠল। ‘শান্তি বাহিনীর লোকজন ওকে ধরেছিল বলে শুনেছি আমরা।’

‘না, বেঁচে আছে সে এবং আমাকে তার র‍্যাঞ্ছের ম্যানেজার করে পাঠিয়েছে।’

নিদারুণ তাক্ষিল্যের সঙ্গে শেভলিনের দিকে তাকাল মেয়েটা। ‘হতে পারে। যাও লুড ফেলারকে গিয়ে কথাটা বলো গে। প্রাণ নিয়ে শহরে ফিরে এসো, তারপর দেখব তোমার কথা বিশ্বাস করা যায় কি না।’

‘ধন্যবাদ, ম্যা’ম,’ মৃদু হাসল সাডেন। ‘তোমার মত সুন্দরী একটা মেয়ে আমার সম্পর্কে ভুল ধারণা করে বসে থাকবে—তা হতে পারে না; শিগ্গিরই তোমার ধারণা পাল্টে দেয়ার ব্যবস্থা করছি।’

দৃঢ় পদক্ষেপে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এল সাডেন শেভলিন। ওর গমন পথের দিকে চেয়ে রইল ম্যাককার্থি, দৃষ্টি বিভ্রান্ত। কী যেন আছে যুবকের আচরণে...কিছু যেন টোকা মারছে স্মৃতির পর্দায়...কথা বলবার ভঙ্গি, ঘুরে দাঁড়ানো...লহমার জন্য যেন অন্য এক শহরের কথা মনে পড়ে যেতে চাইছে, স্পষ্ট কানে আসছে পরিচিত পায়ের আওয়াজ...হারিয়ে গেল ক্ষণিকের স্মৃতিটুকু। সম্বিৎ ফিরে পেয়েই দেখল ওর দিকে ফিরে তাকাচ্ছে মেরি ব্ল্যাক। বড় মোকাবিলা করবার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিল ব্যাংকার।

কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মেরি, ‘লোকটা কে, ম্যাক?’

চিঠি আর কাগজপত্র গুছিয়ে নিল ম্যাককার্থি। ‘ওর পরিচয়ে কোন খাদ নেই। ও’নীল বেঁচে আছে—অন্তত,’ ভুল শোধরালো ম্যাককার্থি—‘কাগজপত্রে সই করা পর্যন্ত...ছিল। জ্যাক ও’নীলের সই জাল করার সাধ্য নেই কারও। তা ছাড়া সাক্ষীও রয়েছে।’

‘কে এই লোকটা?’ আবার জানতে চাইল মেরি।

‘মাইক শেভলিন। আসল পরিচয় জানার জন্যে হয়তো আরও কটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। আসলে,’ একটু থেমে আবার বলল ম্যাক, ‘নাম দিয়ে কিছু বোঝা যায় না—অন্তত এদেশে নয়। এখানে কাজেই প্রমাণ হয় একটা লোকের পরিচয়। দেখা যাক, কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়।’

‘লুড ফেলারের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর পানি আর গড়াবে না, দেখে নিয়ো।’

কাগজপত্র খামে ভরে রাখল ম্যাককার্থি। সেই অস্পষ্ট স্মৃতি আবার টোকা মারছে যেন মনের পর্দায়। স্মৃতিতাড়িত হয়েই যেন বলে ফেলল সে কথাটা। ‘এতটা জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না, মেরি। এত অল্পতে বিচার করে বোসো না। আমার ধারণা ভুল না হলে, অনেক ঘাটের পানি খাওয়া লোক এই শেভলিন—বন্দুকবাজিতে অভ্যস্ত।’

বন্দুকবাজি? হ্যাঁ, তাইতো! সেই যে অ্যাবিলিনে ফিল কো কে মারল ওয়াইল্ড বিল হিকক। সেদিনই তো হয়েছিল ভয়ঙ্কর গান্ফাইটটা! কিন্তু সে কথা এখন মনে পড়ছে কেন? এ লোক হিকক নয়, আর ফিল তো বেঁচেই নেই।

উত্তপ্ত অপরাহ্ন—আগুন জ্বলছে যেন। চোখ ছোট ছোট করে সূর্যের দিকে তাকাল সাডেন শেভলিন। তারপর হাঁটতে হাঁটতে এগোল সামনের দিকে। এরই ভিতর আস্তাবলের সামনে বসা লোক দুটো সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে ওর খবর। সবার কৌতূহলী দৃষ্টি একবার করে স্পর্শ করছে ওকে।

রেডট্রিককে কেউ ওকে না চিনবার সম্ভাবনাই বেশি। বহুদিন ধরে এখানে বসবাস করছে এ শহরের অধিবাসীরা। ট্রেইল টাউন বা মাইনিং ক্যাম্প নয়—শান্ত শহর। এখানকার লোকরা সাডেনের গল্প শুনে থাকলেও—ও—ই যে সে—ই সেটা হয়তো বুঝে উঠতে পারবে না—এ মুহূর্তে তো নয়ই।

নতুন স্যাডল ব্যাগটা বাঁ হাতে ঝুলিয়ে হোটেলের দিকে পা বাড়াল শেভলিন। দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল বিশাল লবিতে। ঘাড় ফিরিয়ে চশমার ভিতর দিয়ে ওর দিকে তাকাল হোটেল ক্লার্ক। তারপর ডেস্কে এসে রেজিস্টার খাতা ওর দিকে ঠেলে দিল। ‘দোতালায়,’ বলল সে, ‘করিডরের শেষ মাথায় বার নম্বর ঘর।’

রেজিস্টার খাতাটা টেনে আরেকটু কাছে নিয়ে এল শেভলিন। দ্রুত সাবলীল ভঙ্গিতে লিখল: মাইক শেভলিন, এল প্যাসো, টেক্সাস।

লেখাটার দিকে এক নজর তাকিয়েই মাথা তুলে ওর দিকে চাইল ক্লার্ক। ‘কিছুদিন থাকছো তো, মিস্টার শেভলিন?’

ঠোটে হাসি ফুটিয়ে তুলল সাডেন। ‘এ ব্যাপারে এখানে অনেকেরই সংশয় আছে দেখতে পাচ্ছি। তবে এটুকু নিশ্চিত থাকতে পারো, খুব শিগগির এখান থেকে নড়ছি না আমি।’

স্যাডল ব্যাগ নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে নিজের ঘরে ঢুকল সাডেন। গায়ের কোটটা খুলে রাখল। সিঙ্ক-গুটারটা বের করে টেবিলের উপর রেখে স্নান সারতে ঢুকল বাথরুমে। স্নান সেরে আবার কাপড়-চোপড় পরে তৈরি হওয়ার পরই কেবল মনে পড়ল মেয়েটার কথা। সত্যিই অপূর্ব সুন্দরী। কী যেন নাম? ও, হ্যাঁ, মেরি ব্ল্যাক। মেয়েটার অভিযোগ আর সন্দেহের কথা ভেবে মুচকি হাসল

সাডেন।

জানালাৰ কাছে গিয়ে বাইৰে চোখ রাখল। এই সময় স্যালুন থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। এদিকে মাথা তুলে তাকাল একবার। তারপর রাস্তা পেরুৱানোৱ জন্ম পা বাডাল। ছিপছিপে লম্বা, একটু যেন সামনে ঝুঁকে হাঁটছে। ধুলো উড়ছে পায়ে পায়ে। রাস্তাৰ মাঝামাঝি এসে দাড়িয়ে পড়ল সে, আবার তাকাল এদিকে। দৃষ্টিতে বিদ্বেশ।

জানালাৰ কাছ থেকে সরে এল শেভলিন। স্যাডল ব্যাগ খুলে একজোড়া হোলস্টাৰ ঝোলালো একটা গানবেল্ট বের করল। কোমরে এঁটে নিল ওটা। তারপর ব্যাগ থেকে দুটো ফরটি ফোৱ রাশান পিস্তল বের করে গুলি ভরা আছে কি না দেখল। বার দুয়েক মহড়া দিয়ে হোলস্টাৰে ভরে রাখল ওগুলো। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর হাতে। নিমেষে উঠে এল পিস্তলজোড়া।

আবার ওগুলো হোলস্টাৰে রেখে, হোলস্টাৰ দুটো বেধে নিল উরুর সঙ্গে। প্রচণ্ড গরম সন্ধ্যাও গায়ে চাপাল কোটটা। ঠিক এই সময় টোকা পড়ল দরজাৰ গায়ে।

‘ভেতরে এসো,’ বলল সাডেন। ‘দরজা খোলাই আছে।’

দড়াম করে খুলে গেল দরজাটা। রাস্তাৰ সেই লোকটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল দোৱগোড়ায়। লম্বায় শেভলিনকেও ছাড়িয়ে গেছে আগম্ভক, তবে একটু যেন কুঁজো; লম্বাটে চেহাৰা, উঁচু হয়ে আছে চোয়ালৰ হাড়। একদৃষ্টে শেভলিনেৰ দিকে তাকিয়ে আছে। ‘এত সহজে পাৰ পাবে না তুমি!’ প্রায় ধমকে উঠল সে, ‘শুনে রাখো, “জে-ডট-ও”-ৰ ত্ৰিসীমানাতেও যেন না দেখি তোমাকে!’

‘ওটা কি তোমাৰ নাকি?’ আশ্চৰ্য্য করে শাস্ত কণ্ঠে জানতে চাইল শেভলিন।

‘সে কথা তোমাৰ না জানলেও চলবে! আমাদেৰ ব্যাপাৰে বাইৰেৰ লোক এসে নাক গলাক, চাই না আমরা!’

‘নাক গলানোৰ স্বভাব আমাৰ নেই,’ বলল সাডেন। “জে-ডট-ও”-ৰ ম্যানেজাৰ আমি-সে দায়িত্ব পালন কৰতেই এখানে এসেছি। বাধা দিতে পাৰবে না কেউ।’

‘হুঁহু!’ ভিতৰে ঢুকে পড়ল লোকটা। ‘এসব কথা আৰ যাকে হোক আমাকে শোনাতে এসো না। লী উইলকক্স অত বোকা নয়। ধানাইপানাই ছেড়ে দাও, খুব ভাল কৰেই জানো তুমি ও’নীল আৰ বেঁচে নেই! লোকটা মাৰা যাওয়ায় এতটুকু দুঃখ পাইনি আমি! আগেভাগে এখানে এসে পুরো জায়গাটা দখল করে নিয়েছিল সে-তারপর আৰ এক কণা জমিও ছাড়েনি। এবাৰ বিদায় হয়েছে যখন, সুযোগ পাওয়া গেছে-কসম, আমি অন্তত ছাড়ছি না এই সুযোগ!’

‘উইলকক্স,’ শাস্ত কণ্ঠে জবাব দিল শেভলিন, ‘তুমি মানো চাই না মানো, আমিই “জে-ডট-ও”-ৰ ম্যানেজাৰ। একটা কথা এখুনি বলে রাখছি, আমাদেৰ রেঞ্জ তোমাৰ কোন গৰু যেন না ঢোকে-এ কথা দ্বিতীয়বাৰ আৰ বলব না আমি। আমাদেৰ সীমানায় কোনরকম ব্যাভিৎচল্য চালাতে পাৰবে না। প্রতি ইঞ্চি জায়গা পৰিষ্কাৰ রাখতে চাই আমি-বাস, এটাই শেষ কথা।’

‘তুমি বললেই হলো!, তোমার কথার খোড়াই পরোয়া করি আমি-’
শেভলিনের হোলস্টারগুলোর শেষ মাথা উরুর সঙ্গে আটকানো, এতক্ষণে খেয়াল
করল উইলকক্স। দেখেই একটু ইতস্তত করল সে। হঠাৎ করে পাণ্টে গিয়ে
কৌতূহলী হয়ে উঠল তার কণ্ঠ। ‘গানম্যান মনে হচ্ছে? নাকি লোক দেখানো?
দেখো, খামোকা ধোঁকাবাজির চেষ্ঠা কোরো না-আচমকা কেউ চ্যালেঞ্জ করে
বসলে শেষে পস্তাবে।’

‘উইলকক্স,’ মুখ টিপে হেসে নিরুত্তাপ গলায় বলল শেভলিন। ‘মাঝে মাঝে
হয়তো ধোঁকাবাজি করি, ঠিক-কিন্তু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে ভয় পাই না।
কথাটা খেয়াল রেখো। যে কোন মুহূর্তে আসতে পারো তোমরা যে কেউ-তৈরি
থাকব।’

তিন

পরদিন সকাল। আস্তাবলে ঢুকল সাডেন শেভলিন। স্ট্যালিয়নটার পিঠে জিন
চাপিয়ে বের করে আনল ওটাকে। ঘোড়া নিয়ে এগোল রেস্তুরার দিকে। খুব একটা
বেলা হয়নি, রেস্তুরার সামনে আগে থেকেই দুটো ঘোড়া বাঁধা রয়েছে দেখতে পেল
সে।

ও ঢুকতেই মুখ তুলে তাকাল দুজন লোক। এদের একজন একহারা গড়নের
যুবক; বুদ্ধিদীপ্ত আকর্ষণীয় চেহারা, ধূসর চোখ। শেভলিনের উদ্দেশ্যে নড করল
সে। ‘খবর কি, শেভলিন? দেখেই কিন্তু চিনতে পেরেছি তোমাকে।’ হাত বাড়িয়ে
দিল যুবক। ‘আমি জিম ন্যারোজ। এখানকার খবরকাগজের মালিক।’

গম্ভীর চেহারায় হাত মেলাল শেভলিন। ‘খবরকাগজের কথা এই প্রথম
শুনলাম,’ বলল ও, ‘ভাল কথা, তোমরা বিজ্ঞাপন নাও তো, না কি?’

হেসে উঠল ন্যারোজ। ‘আসল কথা জানলে আর প্রশ্ন করতে না। বিজ্ঞাপনের
ওপর নির্ভর করেই তো চলে কাগজ।’

‘তা হলে আমার নামে একটা বিজ্ঞাপন ছাপতে হবে তোমাকে। “মাইক
শেভলিন “জে-ডট-ও” রেঞ্জের ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়েছে। জ্যাক ও’নীলের
অনুপস্থিতিতে সবরকম লেনদেন, কাজকর্ম তার সঙ্গেই হবে”-ব্যস, এটুকু
লিখলেই চলবে।’

আবার হাসল ন্যারোজ। ‘টাকা দেয়ার কী দরকার। এটাকে তো খবর
হিসেবেই ছেপে দেয়া যায়। এখানকার র্যাঞ্চারদের জন্যে এরচেয়ে দুঃসংবাদ আর
কিছুই হতে পারে না। ও’নীলকে সবাই পছন্দ করত-কিন্তু তারচেয়ে বেশি পছন্দ
করে তার রেঞ্জটাই। কথাটার মানে নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দিতে হবে না তোমাকে!’

‘না।’ বুঝতে পারছে শেভলিন, আভাসে সতর্ক করে দিতে চাইছে ওকে
পত্রিকা সম্পাদক। ঘরের অন্য লোকটা এতক্ষণ পর্যন্ত একটা শব্দও উচ্চারণ

করেনি। জিম ন্যারোজ যেন চাইছে, একটা কিছু বলুক সে। যা হোক, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওদের।

অন্য লোকটা কিছুটা খর্বাকৃতি; টকটকে মাংসল চেহারা, জ্বলজ্বল করছে নীল একজোড়া চোখ। এক টুকরো মাংস কেটে পেটে তুলে নিল সে। ‘যতক্ষণ পারো ফুটি করে নাও,’ সাডেনকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘যে কোন মুহূর্তে আয়ু ফুরিয়ে যেতে পারে তোমার।’

কাঁধ ঝাঁকাল শেভলিন। ‘উল্টোটিও তো হতে পারে।’

‘হাহ্, এখানে নয়। বাইরের লোক এসে খামোকা মাতবরি করবে—কিছুতেই মেনে নেবে না ওরা। জ্যাক ও নীলকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে—দুহস্তারও আগে মরে ভূত হয়ে গেছে সে, বুঝলে!’

‘ফাঁসি দেয়ার সময় তুমি ছিলে?’ হালকা কণ্ঠে জানতে চাইল সাডেন।

আস্তে করে ফিরে তাকাল লোকটা। ক্রোধে জ্বলছে নীল দুচোখ। ‘না। কিন্তু ঠিক লোকের কাছেই খবর পেয়েছি। তাকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। না জেনে কথা বলার লোক নয় সে।’

‘লুড ফেলার নয় তো?’

এবার আর তাকাল না লোকটা। ‘লুড তো ও নীলের র‍্যাঞ্চার ফোরম্যান, হঠাৎ তার নাম বললে কেন?’

‘জানি সে কি। ও নীলকে ফাঁসি দেয়ার সময় লোকটা উপস্থিত ছিল, তা-ও জানি। সেজন্যেই একটু জিজ্ঞেস করে দেখলাম আর কি।’

দুজন নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। নিজের চোখে দেখলেই কেবল এভাবে, এতখানি আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলতে পারে কেউ। তার মানে ঘটনাস্থলে ছিল লোকটা! কাঁধ ঝাঁকিয়ে রুটি কাটায় মনোযোগ দিল বেঁটে লোকটা, এক টুকরো রুটি কেটে মুখে পুরল। এক নাগাড়ে চিবুল কিছুক্ষণ। মুখের রুটিটুকু শেষ হলে পরে আবার মুখ খুলল। ‘র‍্যাঞ্চে যাও, গিয়ে লুডের সামনে উচ্চারণ করো কথাটা, দেখো, সে সময় হাতে একটা পিস্তল থাকে যেন। আরেকটা কথা, পিস্তলে কিন্তু অসম্ভব ক্ষিপ্ত লুড ফেলার।’

‘আচ্ছা?’ হাসল শেভলিন। ‘অমন অনেক ক্ষিপ্ত লোকই দেখা আছে আমার।’

হঠাৎ তীক্ষ্ণ চোখে শেভলিনের দিকে তাকাল জিম ন্যারোজ। মুঠি পাকিয়ে আচমকা প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল টেবিলের উপর। ‘ধেং, আমার হয়েছে কী!’ কণ্ঠে উত্তেজনা, ‘আরে, তুমি তো সাডেন শেভলিন!’

হাত থেকে কাঁটাচামচ পড়ে গেল বেঁটে লোকটার। হাঁ হয়ে গেল মুখ, বিস্ফারিত হলো চোখ। লম্বা করে দম নিয়ে ঢোক গিলল সে। আস্তে আস্তে জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভেজাল। পেটের ভিতর ডানা ঝাপটাচ্ছে যেন হাজারটা প্রজাপতি। দুর্ধর্ষ লোক হলেও নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল লোকটা। সাডেন শেভলিনের সমকক্ষ দূরে থাক, ধারে কাছে ঘেঁষবারও সামর্থ্য তার কিংবা লুড ফেলারের নেই। এর সামনে দাঁড়ানোর যোগ্য লোক সারা দেশে খুব বেশি নেই।

‘ঠিক ধরেছ,’ জবাবে বলল সাডেন, ‘আমিই সেই শেভলিন।’

উঠে দাঁড়াল ও। জিম ন্যারোজ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল ওকে। ‘একটা কথা, শেভলিন,’ একটু ইতস্তত করল সে, তারপর বলল, ‘সত্যি যদি এখানে থাকো, আমার একটা উপকার করতে হবে।’

‘যেমন?’

‘তোমার রেঞ্জের পাহাড়গুলোর কাছে অনেকদিন ধরে একটা মেয়ে বসবাস করে আসছে। বেটি কনসিডাইন। জ্যাক নিজেই থাকতে দিয়েছিল ওকে, তুমিও আপত্তি করবে না আশা করি।’

‘এটা তো ও’নীলেরই র‍্যাঞ্চ!’

সতর্ক চোখে ওকে জরিপ করল ন্যারোজ। ‘ও, হ্যাঁ, তা-তো বটেই। বেটি মেয়েটা ভাল, খুব কষ্টে দিন কাটাচ্ছে, কিন্তু মানুষ হিসেবে ওর কোন তুলনা হয় না। ও থাকলে তোমার একটুও অসুবিধে হবে না, দেখো।’

‘বেশ তো, থাকবে।’

‘আর হ্যাঁ, একটু দেখে শুনে পা ফেলো। এখানকার পরিস্থিতি সামাল দেয়া হয়তো তোমার পক্ষেও কঠিনই হবে। এ তল্লাটের প্রায় প্রতিটি লোক “জে-ডট-ও”-র ওপর হামলে পড়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে; রেঞ্জটা ওরা দখল করবেই। জ্যাক থাকলেও এখন আর ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারত বলে মনে হয় না। কারণ, অনেক দিন অপেক্ষা করার পর এই প্রথম একটা সুযোগ পেয়েছে ওরা—এ সুযোগ ছাড়বে না কেউ। একদল তুখোড় গানম্যানও এখন রেঞ্জটা আগলে রাখতে পারবে কি না কে জানে! একজনের পক্ষে পারার প্রশ্নই ওঠে না।’

‘সঙ্গে নেয়ার মত নেই কেউ?’

‘উঁহঁ, “জে-ডট-ও” রেঞ্জে একলাই চলতে হবে তোমাকে।’

ট্রেইল ধরে টুলি মেসার চুড়োয় উঠতে উঠতে সিগারেট রোল করছে আর তীক্ষ্ণ চোখে চারদিক জরিপ করছে সাডেন শেভলিন। জায়গাটা ভাল করে চিনে রাখবার উপর হয়তো নির্ভর করবে ওর বাঁচামরা। যুদ্ধক্ষেত্র চিনে নিয়েই লড়াই করতে অভ্যস্ত সে।

মেসার চুড়ো থেকে নেমে একটা ছায়াশীতল পাইন বনের ভিতর দিয়ে এগোল সে। কিছুক্ষণ এগোনোর পর শেষ হয়ে গেল পাইনের বন। সিঁড়ার গাছের ভিতর দিয়ে একটা উপত্যকায় এসে পড়ল ট্রেইল। এখানে নদীর পাশ ঘেঁষে রয়েছে সবুজ সুন্দর মাঠ, নদীর ধারে জন্মেছে কটনউড, উইলো, আর সিকামোর। গাছপালার ভিতরেই নিজের জায়গা করে নিয়েছে র‍্যাঞ্চটা।

আশপাশের এলাকার তুলনায় সামান্য উঁচু একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে আছে বিশালকায় পুরোনো ধাঁচের র‍্যাঞ্চ হাউসটা। বার্ন, আন্তাবল, কোরাল—এসব রয়েছে টিলাটার ঠিক গোড়ায়। র‍্যাঞ্চের উঠানে ঢুকেই সাডেন দেখল, বাংক হাউস থেকে বেরিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এক লোক, বগলতলায় বিছানাপত্রের

একটা বাঙিল। ঘোড়ার খুরের শব্দে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল ওর দিকে।

বাংক হাউজের দিকে এক নজর তাকাল সাডেন। আরেকজন লোককে দেখা যাচ্ছে দরজায়। চৌকাঠে ঠেস দিয়ে আয়েসী ভঙ্গিতে দাঁড়াল লোকটা। ঠোঁটে ঝুলছে সিগারেট। প্রথম জনের দিকেই ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে গেল সাডেন। এ লোকটাই লুড ফেলার, ধরে নিয়েছে ও।

বিশালদেহী লোক লুড ফেলার, মেদহীন পেশীবহুল দীর্ঘ শরীর। খোঁচাখোঁচা দাড়িতে গাল ভরে আছে। শীতল চোখে নির্মম দৃষ্টি।

জিন থেকে লাফিয়ে নামল শেভলিন। ‘তুমিই ফেলার?’

কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল ফেলার, ‘কী চাই?’

হাসল শেভলিন। ‘আমার নাম শেভলিন। এই আউটফিটের নতুন ম্যানেজার। তুমিই যদি ফোরম্যান হয়ে থাকো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।’

বিরক্তির ছায়া পড়ল লুড ফেলারের চেহারায়। আর যাই হোক—এমন কিছু নিশ্চয়ই আশা করেনি সে। কথাটার মানে বুঝে উঠতেই অনেক কটা মুহূর্ত পেরিয়ে গেল তার। তারপরই জ্বলে উঠল ক্রোধে। ‘কী? তুমি কী?’ হাত থেকে বাঙিল পড়ে গেল। ‘কোথেকে এসেছ ইয়ার্কি মারতে?’

‘ইয়ার্কি নয়, ফেলার, জ্যাক ও’নীল নিজেই আমাকে ম্যানেজার করে পাঠিয়েছে। গতকাল ব্যাংকে গিয়েছিলাম, ম্যাককার্থি আমার কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখেছে—কোন খুঁত পায়নি।’ বিছানার দিকে ইঙ্গিত করল সাডেন—‘ওগুলো নিয়ে তুমি বরং বাংক হাউসেই ফিরে যাও—অবশ্য যদি একেবারে বিদেয় হওয়ার ইচ্ছে না থাকে।’

‘বিদেয় হব!’ বাঙিলটা সামনে রেখে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়াল ফেলার। ‘মরে ভূত হয়ে গেছে ও’নীল, আর সে পাঠাবে তোমাকে ম্যানেজার করে! ধাপ্পাবাজির আর জায়গা পাও’নি!’

শেভলিনের চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি। ‘ধাপ্পাবাজিও নয়, লুড! জ্যাক ও’নীল মারা যায়নি। বেঁচে আছে এবং সুস্থ শরীরেই আছে। এই দেখো না, ওর সই দেখে কি মনে হয়, সে মরে গেছে?’

ও’নীলের চিঠিটা ফেলারের হাতে দিল শেভলিন। দেখল লুড। রাগে, হতাশায় মুখে কথা সরল না তার। ঝাপসা হয়ে এল যেন দৃষ্টিশক্তি। জ্বলজ্বল করছে জ্যাক ও’নীলের স্বাক্ষর, তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কোন সন্দেহ নেই—এটা ও’নীলেরই হাতের লেখা।

‘এসব দেখিয়ে লাভ নেই!’ কর্কশ শোনালা ফেলারের কণ্ঠ।

‘আমি লাভের কথা বলছি না, ফেলার।’ কণ্ঠ শান্ত রেখে বলল শেভলিন। ‘একটা দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাদের, সেটা পালন করতে এখানে এসেছি। এখন থেকে আমার নির্দেশ মেনে চলতে হবে তোমাকে।’

‘কিছুতেই না!’ খেকিয়ে উঠল লুড ফেলার। ‘আমি এখানকার বস্—তা—ই থাকব! নিশ্চয়ই কিছু একটা গড়বড় আছে এর মধ্যে!’

‘ঠিক বলেছ। র‍্যাঞ্চ দখল করার জন্যে যখন নিজের লোকরাই বিশ্বাসঘাতকতা করে বন্ধুকে ফাঁসিতে ঝোলায়, গড়বড় হয়ে যায় সব। আসল কথাটা এবার মাথায় ঢুকিয়ে নাও, ফেলার-আমার কথা মত চলবে তুমি, নইলে ভাগবে-চাও তো এখনি। বোঝা গেছে!’

চিন্তাভাবনা গুলিয়ে গেল ফেলারের। বুঝতেই পারছে না সে ব্যাপারটা কী। ইচ্ছে হচ্ছে এখনই বাঁপিয়ে পড়ে শেষ করে দেয় এ লোকটাকে। নিজ হাতে ও নীলের গলায় ফাঁস পরিয়েছে সে, অথচ তারই সই করা চিঠি নিয়ে হাজির হয়েছে ব্যাটা। রাগে সারা শরীর কেঁপে উঠল তার।

বাংক হাউস থেকে একে একে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে কাউহ্যান্ডরা। একটু আগে বিছানা পত্র গোছগাছ করবার সময় কিছুই বলেনি ওরা। স্টুট পরিস্থিতি থেকে ওরাও ফেলারের মত ফায়দা লুটবার কথা ভাবছিল। অবশ্য ওদের প্রায় সবারই মতলব র‍্যাঞ্চের গরু বিক্রি করে দিয়ে টাকা-পয়সা নিয়ে কেটে পড়বার। লুড ফেলার নিজের হাতে কাজে নিয়েছিল ওদের, র‍্যাঞ্চের কর্মী সংগ্রহের দায়িত্ব ফোরম্যান-হিসাবে তার উপরই ন্যস্ত ছিল। বাদ সেধেছিল কেবল বিল কোফিন। লম্বাটে চেহারার, দুর্ধর্ষ এক কাউহ্যান্ড, শক্ত-সমর্থ এবং বুদ্ধিমান। ‘আমি হলে কিন্তু আরও ধীরে সুস্থে এগোতাম,’ বলেছিল সে, ‘বুড়ো মিয়া আবার ফিরেও আসতে পারে।’

‘আসরে না।’

‘একেবারে নিশ্চিত মনে হচ্ছে? তুমিই ব্যবস্থা করেছ নাকি?’

জবাব না দিয়ে চোখ রাঙিয়ে কোফিনের দিকে তাকিয়েছিল ফেলার। কিন্তু ভিতর থেকে কেউ যেন সতর্ক করে দিয়েছে ওকে, গানফাইটে কোফিনকে কায়দা করা সহজ হবে না। তবে খালি হাতে-কিন্তু হাতাহাতি কখনও করেনি ফেলার-তা ছাড়া তালপাতার সেপাই কোফিনকে মেরে হাত ময়লা করবার কী দরকার। এ কথা ভেবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ফেলার, বাউলিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাংক হাউস থেকে-এগোচ্ছিল র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে। কোফিনসহ সব কাউহ্যান্ডরা বেরিয়ে আসছে এখন মজা দেখতে।

‘জ্যাক ও নীল,’ গৌয়ারের মত বলল ফেলার, ‘মারা গেছে। তার জায়গায় আমি দায়িত্ব নিতে যাচ্ছি।’

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল শেভলিন। ‘দুঃখিত, তোমার সাধ মেটাতে দিতে পারছি না,’ বলল ও। ‘আসলে একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলেছ তুমি। এখন যাও, বিছানা পত্র নিয়ে বাংক হাউসে ফিরে যাও-নয়তো সব নিয়ে বিদেয় হও।’

বাংক হাউস থেকে বেরিয়ে আসা সাতজন কাউহ্যান্ডের দিকে ফিরল এবার শেভলিন। ‘আমি মাইক শেভলিন। এই আউটফিটের নতুন ম্যানেজার। এরই মধ্যে ফেলারকে কাগজপত্র দেখিয়েছি; এখানে আসার আগে ম্যাককার্থিকেও দেখিয়ে এসেছি। কোন খঁত পাওয়া যায়নি ওগুলোয়। এখন তোমরা যারা থাকতে চাইবে থাকতে পারো; আর যদি বিদায় নিতে চাও, তা হলেও আপত্তি নেই। ভেবে দেখো কী করবে। খাওয়ার টেবিলে আবার দেখা হবে, বাকি কথা তখন বলব।’

দুট ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল সাডেন, এগিয়ে গেল র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে।
বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল ফেলার। ‘আরে! শোনো!’ প্রায় চোঁচিয়ে
উঠল সে।

থামল না শেভলিন। সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। হঠাৎ
সশব্দে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল বিল কোফিন। ‘এক কাজ করো, লুড, পিস্তলটা
বের করে নিয়ে এগিয়ে যাও।’

‘এত সহজে ছাড়ছি না আমি!’ হিংস্র ভঙ্গিতে বলে উঠল ফেলার।

‘করার কিছু তো দেখছি না,’ জবাবে বলল বিল কোফিন, ‘ওর সঙ্গে
বাড়াবাড়ি করতে যেয়ো না, ফেলার, মারা পড়বে।’

রাগে ক্রোধে কথা শুনবার আত্মহ হারিয়ে ফেলল লুড ফেলার। আস্তে আস্তে
ঘুরে দাঁড়াল কাউহ্যান্ডরা, নিজেদের ভিতর ফিসফিস করে আলোচনা করছে। গরু
বিক্রি করে টাকা পাওয়া যাবে, এই আশায় এরই মধ্যে অনেক টাকা বাজে খরচ
করে ফেলেছে ওরা। অথচ এখন হঠাৎ করে সে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল।

কৌতুক ভরা চোখে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে তাকাল বিল কোফিন। হেসে
ফেলল সে। খেলাটা বেশ জমে উঠছে মনে হচ্ছে। ফেলারকে যেভাবে জপ করল
শেভলিন-জবাব নেই। কিন্তু এরপর?

ফেলারের তুলনায় অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে কোফিন। রেডক্রিকের পরিস্থিতি
সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে ওর। জানে, ফেলার সাময়িকভাবে র‍্যাঞ্চটা দখল
করে নিতে পারলেও আয়ত্তে রাখতে পারবে না কিছুতেই। অসংখ্য ক্ষুধার্ত
নেকড়ের মাঝে সেও একজন মাত্র। কিন্তু তীক্ষ্ণ দাঁত আর কুটুবুদ্ধির যথেষ্ট অভাব
রয়েছে তার-সবার সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকবার সাধ্য নেই।

সিগারেট রোল করতে করতে চোখ ছোট ছোট করে পাহাড়ের দিকে তাকাল
কোফিন। ঝামেলা একটা এবার বাধবেই। এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে এ লোকটা
একা। বেশ বেশ, আবার আপন মনে হেসে উঠল বিল কোফিন।

বাংক হাউসে ফিরে এল লুড ফেলার। প্রচণ্ড আক্রোশে বাউলটা ছুঁড়ে ফেলল
বাংকের উপর। ডানে বাঁয়ে তাকাল। রাগ ঝাড়বার জন্য যেন খুঁজছে কিছু; না
পেয়ে বাংক হাউস থেকে বেরিয়ে এল সে, হাঁটা দিল কোরালের দিকে।
জ্যাকসনের সঙ্গে এখুনি দেখা করতে হবে; ‘বিগ-বি’-র ক্লে মিলারের সঙ্গেও দেখা
করা দরকার। ওদের সঙ্গে আলাপ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা কিছু বুদ্ধি
বের করতে হবে, ব্যবস্থা নিতে হবে শেভলিন ব্যাটার বিরুদ্ধে।

ঘোড়ার পিঠে চেপে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে ফেলার, দেখল কোফিন। ফেলার
বেরিয়ে যাবার সাথে সাথে এগিয়ে গেল র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে
এল উপরে। নিজের বক্তব্য জানিয়ে দিতে যাচ্ছে ও। দরজার হাতলে হাত
রাখতেই ভিতর থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে এল শেভলিন। গায়ের কোটটা খুলে
রেখেছে ও; নিচু করে ঝুলিয়ে রেখেছে পিস্তলজোড়া। তৈরি হয়েই আছে দেখছি
লোকটা, ভাবল কোফিন। বাজিয়ে দেখব নাকি-মুহূর্তের জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠল
সে।

‘আমার নাম বিল কোফিন,’ হঠাৎ করে বলে উঠল ও, ‘এ র‍্যাঞ্চার সবচেয়ে নতুন লোক, মাস চারেক হলো এসেছি।’

‘তা কোফিন,’ বলল শেভলিন, ‘কিছু বলবে?’

‘এসেছ, ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়বে।’

‘এরকম কিছু হবে-জানি।’

‘কিন্তু তুমি তো একদম একা।’

‘তা-ও জানি।’ মৃদু হাসল সাডেন শেভলিন। ‘নতুন কিছু বলার থাকলে বলো, ফ্রেড।’

সিগারেট রোল করা শেষ হলো কোফিনের। ‘বুদ্ধিগুদ্দি,’ শেভলিনের দিকে না তাকিয়ে বলে চলল সে, ‘আমার বরাবরই একটু কম। আমিও থাকতে চাই এর মধ্যে-তোমার দলে।’

‘কারণ?’

শুধু হাসি হাসল কোফিন। ‘হয়তো কঠিন লড়াই লড়তে পছন্দ করি বলে; অনেক লোকের মধ্যে থেকে লড়তে আমার ভাল লাগে না, সেজন্যেও হতে পারে; আবার কোণঠাসা হলে তোমার পাশে থাকতে চাই-স্রেফ এটাই হয়তো কারণ।’

‘বেশ বেশ, সবকটা কারণই পছন্দ হয়েছে আমার।’ হাত বাড়িয়ে দিল শেভলিন। ‘তোমাকে সঙ্গে পেয়ে খুশি হলাম, কোফিন। নতুন করে তোমাকে সাবধান করার প্রয়োজন দেখি না। এখানকার অবস্থা আমার চেয়ে তুমি অনেক ভাল জানো।’

‘অনেকটা তাই।’ মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দিকে ইঙ্গিত করল কোফিন। ‘অন্তত জনাতিরিশেক র‍্যাঞ্চার রয়েছে ওদিকটায়, প্রত্যেকেই ভয়ঙ্কর; একসময় রাসলিং করে হাত পাকিয়েছিল। এই-রেঞ্জের জমির ওপর প্রচণ্ড লোভ রয়েছে তাদের। তারপর রয়েছে, “বিগ-বি” র‍্যাঞ্চার ফোরম্যান, ক্লে মিলার। ওল্ড জেমস গ্যাং-এর এক আউট-ল’র চাচাতো ভাই-ওদের মতই বিপজ্জনক। সিন্ধু গানে দারুণ চালু হাত-যে কারও মোকাবিলার ক্ষমতা রাখে। লড়াই শেষে “বিগ-বি” দখল করে নেয়ার ফন্দি আঁটছে সে। সেই সঙ্গে স্কেলিটন রিজ আর নদীটার মাঝখানের “জে-ডট-ও”-র জায়গাটুকুও কেড়ে নিতে চাইছে।’

‘আচ্ছা!’

‘আরও আছে। ম্যাককার্থি, ওপরে ওপরে বন্ধুভাবাপন্ন লোক হলেও সবার মত এখানকার জমির ওপর লোভ আছে তারও। সুযোগ পেলে খাবলা বসাতে দ্বিধা করবে না।’

‘আর অন্যরা?’

‘ফেলার, মিলার আর জ্যাকসন-এই তিনজনই হলো সবচেয়ে খারাপ।’

‘লী উইলকক্স?’

ইতস্তত করল কোফিন। ‘এ লোকটাও বোধহয় একই রকম। বছরখানেক আগে নিজের হাতে র‍্যাঞ্চার দুজন কাউহ্যান্ডকে হত্যা করেছিল। লোকটা যে বন্দুকবাজ-ভাবতেই পারেনি কেউ। কিন্তু ধরতে যেতেই নাকি বুন্দো বেড়ালের মত

খেপে উঠে দিশেহারা করে দিয়েছিল সবাইকে।’

‘আর কেউ?’

‘হুম। স্ট্যাগ হারভে আছে। জ্যাকসনের ডানহাত।’

‘নাম শুনেছি।’

‘শোনারই কথা। ভয়ঙ্কর বললেও কম বলা হয় তাকে।’

‘উত্তরের র‍্যাঙ্গারদের কথা বলো। ওদের ভেতর সবচেয়ে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে কোনজন?’

‘নোবল হুইলার। কঠিন লোক।’

হঠাৎ হেসে উঠল শেভলিন। ‘এ যে দেখছি হাজার শত্রু! তারপরও থাকতে চাও এরমধ্যে?’

‘ভুলে যাচ্ছ—এসব অনেক আগে থেকেই জানি আমি। অবশ্যই থাকছি আমি—লাখ টাকা দিলেও সরছি না!’

চার

নিজের মেয়ারের পিঠ থেকে নামল মেরি ব্ল্যাক। জিন, লাগাম খুলে ওটাকে কোরালে রেখে র‍্যাঙ্গ হাউসের দিকে এগোল, আশপাশে দেখা যাচ্ছে না কাউকে। তিক্ত মনে ভাবছে, বাবা নিজ হাতে শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও একজন র‍্যাঙ্গারের মত চলতে পারছে না ও। ক্লে মিলারের মত ফোরম্যান থাকবার কারণেই এমনটি ঘটছে। কিন্তু এ লোকটাকে বিদায়ই বা কীভাবে করবে? মেরি জানে, কিছুতেই কাজ ছাড়তে রাজি হবে না লোকটা। তাছাড়া অপ্রস্তুত অবস্থায় তার সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়বারও ইচ্ছে নেই। তুরুপের সবকটা তাসই রয়েছে মিলারের হাতে। ভাগিয়ে দিতে গেলে সে যদি অস্বীকার করে বসে, তাকে গুলি করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না; কিন্তু ওর ইচ্ছে নয় সেটা।

খাঁচায় বন্দী অসহায় নিঃসঙ্গ প্রাণীর মত লাগছে নিজেকে। জানে, ‘পুরোনো দিনের দু’একজন কাউহান্ড প্রয়োজনে পাশে এসে দাঁড়াবে—ট্রিপ বা উইলিয়ামস অন্তত বেঙ্গমনি করবে না, দুজনেই ভাল লোক। কিন্তু অসংখ্য শত্রুর বিরুদ্ধে জেনেশুনে ওদের দুজনকে বিপদের মুখে ঠেলেও দেওয়া যাবে না। উপযুক্ত সময় আসুক—ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

সিঁড়িতে পা রাখতেই ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে এল ক্লে মিলার। লম্বা, শক্ত-সমর্থ গড়ন; গালের উপর তিন-চারটে গভীর ক্ষতে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে সুন্দর চেহারাটা। এই ক্ষতচিহ্নগুলোর জন্য দায়ী লোকটাকে খুন করবার কাহিনী প্রায়ই গর্বের সঙ্গে বর্ণনা করে সে। আর কৌতূহলবশত কেউ জিজ্ঞেস করে বসলে তো কথাই নেই।

‘এত তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে গেল?’ অস্বাভাবিক অমায়িক ভঙ্গিতে বলল ক্রে মিলার। ‘লোক পাঠিয়ে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে ম্যাকার্থি, নাকি?’

‘কারও কোন সাহায্যের দরকার নেই আমার।’

উদ্ধত ভঙ্গিতে মেরির দিকে তাকাল মিলার। ‘দরকার নেই? কী জানি, হবেও-বা। আমি তো ভাবলাম লোক যোগাড় করতেই গেছ বুঝি।’

কথাবার্তা বিপজ্জনক বাক নিতে পারে ভেবে নিজে থেকেই প্রসঙ্গ পাল্টাল মেরি। ‘শুনলাম, জ্যাক ও’নীল এখনও বেঁচে আছে।’

ঘাড় ফিরিয়ে কী যেন দেখতে উদ্যত হয়েছিল মিলার, ঝট করে ওর দিকে তাকাল, এত জোরে যে ঘাড়ের হাড় ফুটবার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল মেরি। ‘কী! কী বললে?’

‘ও’নীল এখনও বেঁচে আছে।’

‘শহরে ফিরে এসেছে?’ মিলারের কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর। কিন্তু মেরি সত্যি কথা বলছে বলেই তার মনে হচ্ছে। বুকের ভিতর মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে ক্রোধ। লুড গর্দভটা কি কোন কাজই করতে পারবে না ঠিকমত! সবতাতেই গোলমাল বাধিয়ে বসবে!

‘না তা আসেনি। এল প্যাসোতে আছে শুনেছি। ওর এক ম্যানেজারকে পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে। লোকটার নাম শেভলিন।’

‘শেভলিন!’ টানটান হয়ে গেল মিলারের দেহ, ফাঁদে পড়া বুনো জানোয়ারের দৃষ্টি দুচোখে। ‘লোকটার পুরো নাম জানো? কী নামে ডাকছে ওকে সবাই?’

মিলার উত্তেজিত হয়ে উঠছে দেখে বিস্মিত হলো মেরি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ‘মাইক শেভলিন বোধ হয়। চেনো নাকি?’

‘লোকটা কি লম্বা? চওড়া কাঁধ? চোখ দুটো সবুজ?’ উত্তেজনায় যেন ফুটছে মিলার।

‘হ্যাঁ, মিলে যাচ্ছে। কে লোকটা?’

কয়েকটা মুহূর্ত মেরির দিকে চেয়ে রইল মিলার। এই স্বীকারোক্তিতেই যেন মেরির প্রতি সব বিদ্বেষ দূর হয়ে গেল তার। ‘কে?’ হেসে উঠল সে। ‘ও হচ্ছে সাডেন, বুঝেছ! নসেসের সেই দুর্ধর্ষ গানম্যান-অল্টাকে জঞ্জাল মুক্ত করেছিল। বিশ ত্রিশজন লোক ওর হাতে মারা গিয়েছিল। ও’নীল ওকে পেল কোথেকে?’

সাডেন! বাবার মুখে গল্প শুনতে শুনতে নামটা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে ওর কাছে। বাবা এতবার বলেছে গল্পটা যে, প্রতিটি শব্দ মনে গেঁথে আছে ওর। সাংহাই পীয়ার্সের বিশাল গরুর পালের ঠিক আগে আগে নিজের পাল নিয়ে উত্তরে যাচ্ছিল বাবা। হঠাৎ হামলা চালাল একদল রাসলার। বাবাকে সাহায্য করতে সেদিন এগিয়ে এসেছিল সাডেন, একাই রুখে দিয়েছিল রাসলারদের। ও ছিল পীয়ার্সের ট্রাইল বস্। যা হোক, সেবার রাসলারদের ভিতর সবচেয়ে ক্ষিপ্ত বন্দুকবাজকে হত্যা করে অন্যদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল সে। এ ঘটনার পর নিরাপদেই গন্তব্যে পৌঁছেছিল বাবা, আর কোন সমস্যা হয়নি। সাডেন লোকটা বয়স্ক কেউ হবে বলেই কেন যেন ধারণা হয়েছিল ওর। ভাবতেই অবাক

লাগছে, শৈশবের সেই কল্পনার বীর এখন 'জে-ডট-ও'-র দায়িত্ব নিতে এখানে এসে হাজির!

উত্তেজনায় কিছুক্ষণের জন্য নিজের সমস্যার কথা ভুলে গেল মিলার। দক্ষ এবং বিখ্যাত বন্দুকবাজদের সামনে দাঁড়ানোর মত পরিস্থিতিতে কখনও পড়তে হয়নি তাকে। অবশ্য লোকে বলে, বন্দুক চালনায় বিখ্যাত বন্দুকবাজদের সঙ্গে এক কাতারে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখে সে। অনেকের মতে, হারডিনের চেয়েও ক্লে মিলার সেরা বন্দুকবাজ; তবে মিলার খুব ভাল করেই জানে, ক্ষিপ্ৰতায় হারডিনকে হার মানানোর মত লোক থাকতেই পারে না। কিন্তু সাডেনকে যদি মারতে পারে ও, একটা কাজের কাজ হয়! কথাটা ভাবতেই বুকের খাঁচায় ছলকে উঠল রক্ত! সাডেন শেভলিনকে হত্যা করবে ক্লে মিলার!

সাডেনের হত্যাকারী! আর কোন কথা না বলে চলে গেল মিলার।

সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে ঘরে ঢুকল মেরি। সাবধানে দরজা বন্ধ করে দিল। নাভাহো চাদরে সাজানো বিশাল কামরা। ভিতরে ঢুকেই দেখতে পেল বব ট্রিপ বসে আছে। চট করে উঠে সামনে এগিয়ে এল সে। বলিষ্ঠ গড়নের ট্রিপকে নিয়ে গর্ব করতে পারে যে কোন র‍্যাঞ্চ। মেরি জানে, মনে মনে ওকে ভালোবাসে লোকটা—একতরফা ভালোবাসা।

'ম্যা'ম,' দ্রুত বলল ট্রিপ, 'মিলার বোধ হয় বেশ কিছু গরু সরানোর ফন্দি আঁটছে—ক্যানিয়ন ক্রিকে প্রায় শখানেক গরু এরই মধ্যে জমা করে ফেলেছে সে।'

'ওঅট উইলিয়ামস কোথায়?'

'নজর রাখছে ওদিকে। কথাটা তোমাকে জানানো দরকার ভেবে চলে এসেছি আমি।'

'ধন্যবাদ, বব, কিন্তু জেনেই-বা এ মুহূর্তে কী করব আমি। আপাতত চলুক যেভাবে চলছে। এখন তো কোনরকম ঝুঁকি নিতে যাওয়া ঠিক হবে না।'

আঙুলে টুপি ঘোরাতে লাগল ট্রিপ। সমস্যাটা বোঝে সে, তবুও একটা কিছু করতে চায়। কিন্তু করবেই-বা কী, মিলারের মোকাবিলা করা তো সম্ভব নয় ওর পক্ষে! অথচ বিনা বাধায় যা খুশি তাই করে যাবে মিলার, এটাও তো মেনে নিতে বিবেকে সায় দেয় না।

'তবে এবার বোধ হয় একটা সুযোগ আমরা পাব, বব। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। তুমি ফিরে গিয়ে উইলিয়ামসকে এখানে পাঠিয়ে দাও। এখন থেকে তোমরা যে কোন একজন সব-সময় আমার সঙ্গে থাকবে। মিলার বা ওদের আর কারুও ওপর বিশ্বাস নেই আমার। যা বলছিলাম, উইলিয়ামসকে পাঠিয়ে দিয়ে 'জে-ডট-ও' র‍্যাঞ্চে যাবে তুমি। সাডেন শেভলিন আছে ওখানে।'

'ঠিক জানো? ওখানে কী করছে সে?'

জানালা দিয়ে বাংক হাউসের উপর চোখ রেখে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল মেরি। 'সাডেনকে বলবে, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। দেখো, আর কেউ যেন জানতে না পারে ব্যাপারটা।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল বব ট্রিপ। শোবার ঘরে এসে চুল আঁচড়া বসল

মেরি। একহারা গড়নের মেরিকে কেবল সুন্দরী বললে যেন সবটা বলা হয় না-ওর সৌন্দর্যে আলাদা মাধুর্য আছে। আয়নার বুকে ফুটে ওঠা নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল ও। এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে।

বাবার মৃত্যুর পর এই প্রথম অন্ধকারে যেন আলোর দিশা দেখতে পাচ্ছে ও। উইলিয়ামস আর ট্রিপ রয়েছে ওর সঙ্গে, এরা শেভলিনের সঙ্গে যোগ দিতে পারলে একটা সত্যিকার লড়ুয়ে দল দাঁড় করানো যাবে, পরে হয়তো আরও কেউ যোগ দেবে ওদের সঙ্গে...

মেরি যখন শত্রুর হিংস্র থাবা থেকে দুটো বিশাল রেঞ্জ বাঁচানোর জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার কথা ভাবছে; ঠিক সেই মুহূর্তে ঘোড়ায় চেপে 'বক্সড-আর' র‍্যাঙ্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লুড ফেলার। রাশ জ্যাকসনের র‍্যাঙ্ক ওটা।

ভিতরে ভিতরে রাগে সাপের মত ফুঁসছে সে, যুক্তিজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। সারা জীবন মনে প্রাণে ঘৃণা করে এল যাকে, সেই জ্যাক ও'নীল কি না বেঁচে আছে। কীভাবে ও বেঁচে গেল, কী ঘটেছিল-এসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না লুড। ও'নীল বেঁচে আছে...বেঁচে আছে...এই একটা কথাই কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার ভিতর।

ও'নীলের কোন দুর্ব্যবহারের কারণে তার প্রতি ঘৃণা জন্মেনি ফেলারের। কাজের লোকদের প্রতি বরাবরই সদ্যবহার করে এসেছে জ্যাক ও'নীল। ফেলারের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে লালিত ঈর্ষা বোধ থেকেই জন্ম নিয়েছে এই ঘৃণা, ধীরে ধীরে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছে। ও'নীলকে হত্যা করে তার সহায়-সম্পত্তি কেড়ে নেয়ার অদম্য স্পৃহা পেয়ে বসেছিল ওকে।

'বক্সড-আর' র‍্যাঙ্কের উঠানে ঢুকতেই মাথা তুলে ফেলারের দিকে তাকাল রাশ জ্যাকসন। 'ও'নীল বেঁচে আছে!' চোখ বড় বড় করে চোঁচিয়ে বলল ফেলার। 'এখনও বেঁচে আছে! একটা লোককে পাঠিয়েছে-'

'চুপ করো! গর্দভ কোথাকার!' কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠে সামনে এগিয়ে এল জ্যাকসন। 'চুপ থাকো! আর বলতে হবে না! এখানে এসেছ কেন? দলবল নিয়ে গিয়ে লটকে দিতে পারছ না!'

'ও'নীলকে?' বোকার মত জিজ্ঞেস করে বসল ফেলার।

'আরে না, গর্দভ! শেভলিনকে!' ক্রুদ্ধ চোখে বিশালদেহী ফোরম্যানের দিকে তাকাল জ্যাকসন। সঙের মত দাঁড়িয়ে থেকো না! যাও, জলদি করো। সময় পেলেই গ্যাঁট হয়ে বসে যাবে লোকটা, এখুনি ঝুলিয়ে দাও ফাঁসিতে। এমনিতেই যথেষ্ট বদনাম আছে তার-অজুহাতের অভাব হবে না। কই, যাও!'

ফিরতি পথ ধরল লুড ফেলার। মাঝ রাস্তায় এসে হঠাৎ এবার জ্যাকসনের উপরেই রেগে উঠল সে।

পাঁচ

খাবার ঘরে ঢুকল সাডেন। ইতিমধ্যে টেবিল ঘিরে বসে পড়েছে সবাই। এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল সে-ও। অসম্ভব ক্লান্ত বোধ করছে সে, আড়াল করবার চেষ্টা করছে না সেটা। হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করবার মত নীরস বিরক্তিকর কাজটাই এতক্ষণ করতে হয়েছে ওকে, পার করে দিয়েছে অর্ধেক রাত। ওর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল যার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছে সেটাকে ভাল করে বুঝে নেয়া—যতটুকু জেনেছে যথেষ্ট।

ও'নীল বলেছিল, প্রায় তিরিশ হাজার গরু আছে এখানে, তবে বলা যায় না আরও বেশিও থাকতে পারে। এগুলোর মধ্যে বেশ কিছু বিক্রিযোগ্য গরুও আছে। এ মুহূর্তে র‍্যাঞ্চার কাজকর্ম মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও—একে ঠিক ভাল বলা যায় না। অথচ এখানে মিঠে পানি বা সবুজ ঘাস কোনটারই অভাব নেই। ঠাণ্ডা মাথায ভেবেচিন্তে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। ওদিকে ইতিমধ্যে দুটো ঘটনা ঘটেছে।

শেভলিনের দলে সে থাকবে বলে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে বিল কোফিন, লোকটাকে ভাল লেগে গেছে শেভলিনের। এবং বব ট্রিপের সঙ্গে কথা হয়েছে। মেরি ব্ল্যাক আলাপ করবার আগ্রহ দেখিয়েছে তার মারফত। অবশ্য ওদিক থেকে সহযোগিতা পাওয়া যাবে সামান্যই; ট্রিপ জানিয়েছে, ওরা মাত্র দুজন কাউন্সিল রয়েছে মেরির পক্ষে। তবু একসঙ্গে কাজ করতে পারলে দলে চারজন হবে ওরা, সেটাও একেবারে ফেলনা নয়। কোফিনের মত বুদ্ধিমান না হলেও সৎ এবং শক্তিমান লোক বব ট্রিপ।

মেরি ব্ল্যাকের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছে সাডেন।

খাবার ঘরে লুড ফেলার আছে, আগেই লক্ষ্য করছে ও। এক নাগাড়ে খেয়ে চলেছে সে। চিবুনার তালে তালে সমানে ওঠানামা করছে ওর বিশাল চোয়াল। ‘লুড,’ বলল শেভলিন, ‘আমাদের আউটফিটে প্রচুর কাজ জমে গেছে—এগুলো শেষ করা দরকার। এক কাজ করো, চারজন কাউন্সিল সঙ্গে নিয়ে স্কঅ পিকের ওদিকে চলে যাও। ওখানে আমাদের অনেক গরু চরছে। আমি চাই আমাদের ব্র্যান্ডের ছাপঅলা প্রত্যেকটা গরু যেন নদীর এই তীরে নিয়ে আসা হয়।’

রাগে প্রতিবাদ করে উঠতে চাইল ফেলার। স্কঅ পিক? সে তো উত্তরে, বেশ দূরে! ওদিকে গেলে শান্তিবাহিনীর লোকজন একজোট করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে! কিন্তু প্রতিবাদ করতে গিয়েও শেভলিনের নির্দেশের পেছনে যুক্তি আছে বুঝতে পেরে নিজেকে বিরত রাখল ফেলার। ওদিকের ছোট ছোট র‍্যাঞ্চাররা অবিরাম ‘জে-ডট-ও’ র‍্যাঞ্চার গরু চুরি করে জবাই করে চলেছে। এর ফলে বন্ধ

হবে সেটা।

‘জায়গাটা ছেড়ে দিচ্ছ?’ মুখ তুলে শেভলিনকে জিজ্ঞেস করল সে।

‘কিছুই ছেড়ে দিচ্ছি না আমি। যদূর শুনেছি, দলবলসহ আমাদের স্টক নিয়ে ইচ্ছেমত ছিনিমিনি খেলছে হুইলার। ওখান থেকে ওদের উৎখাত না করা পর্যন্ত আমাদের গরু-বাছুর নদীর এপারে এনে রাখলে অসুবিধে কী?’

ঘরের প্রতিটি লোক তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে। ‘ওদের আমরা উৎখাত করব,’ বলল শেভলিন। ‘নয়তো বাধ্য করব আমাদের কথামত চলতে।’

‘কঠিন হবে কাজটা,’ বলে উঠল লম্বা ছিপছিপে গড়নের লালচুলো এক কাউহ্যান্ড, ‘ওরা লড়বে।’

‘কঠিন কাজ আগেও করেছি,’ সংক্ষেপে বলল সাডেন, ‘লড়াই সেখানেও হয়েছে।’

এ কথার আর কেউ জবাব দিল না। মাইনিং টাউন অল্টার কাহিনী কে না জানে! পর পর তিনদিনে তিন তিনজন দুর্ধর্ষ মার্শাল খুন হওয়ার পরই হাজির হয়েছিল মাইক শেভলিন। এসেই নিজের কাঁধে মার্শালের দায়িত্ব তুলে নিল সে। প্রথম রাতে মারা পড়ল আউট-ল-ট্রীফ, এবং সে রাতেই বাইশজন গুণাবদমাশকে ধরে হাজতে ভরল। ফাটা মাথা নিয়ে শহরের এক রুমঅলা একমাত্র হাসপাতালে শয্যা গ্রহণ করতে হলো দুজনকে।

শেভলিন দায়িত্ব গ্রহণের এক সপ্তার মধ্যেই একের পর এক মুখোমুখি গানফাইটে মারা পড়ল চারজন দুর্ধর্ষ আউট-ল।

অল্টা। শহরটা ছিল নরকের চেয়েও জঘন্য। প্রতিরাতে খুনোখুনি লেগেই থাকত। বাষাট্রিট লাশ কবর দেওয়া হয়েছিল বুট হিলে—এদের ভিতর একজনেরও মৃত্যু স্বাভাবিক নয়! সাতহাজার শহরবাসীর প্রত্যেকে কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াত; দুহাজার মাইনার, অর্থাৎ, শিকার এবং পাঁচ হাজার শিকারী। মোট কথা, জলজ্যান্ত এক জাহান্নাম। সেই শহরটাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিল মাইক শেভলিন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং ক্ষিপ্ততা দিয়ে। হঠাৎ এসে হাজির হয়েছিল, ওর ক্ষিপ্ততা হতভম্ব করে দিয়েছিল সবাইকে—সেই থেকে ওর নাম হয়ে গেছে সাডেন।

‘যা বলছিলাম,’ খেই ধরল শেভলিন, ‘লোকজন নিয়ে চলে যাও তুমি। খানা-খন্দ কোথাও টু মারা বাদ রাখবে না। কেবল আমাদের গরু খুঁজে বের করে পাঠিয়ে দেবে নদীর এপারে। দু’তিনজন মিলে কাজ করবে, একা থাকবে না কেউ। স্যাজম ক্রিকের দুটো মাথাই দেখে আসবে; গ্যাপের ওদিকটাও দেখবে ভাল করে। কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, গরু চুরি করার সময়, গ্যাপ থেকে চক ট্যাঙ্ক দিয়েই ওগুলো নিয়ে যায় ওরা। ওদিককার কাজ শেষ করে তারপর দক্ষিণে যাবে। কাজটা শেষ হতে অনেক সময় লাগবে, কিন্তু দেখো একটা গরুও যেন নদীর ওপারে থাকতে না পারে।’

‘হুইলারের সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবছ?’ জিজ্ঞেস করল সেই লালচুলো কাউহ্যান্ড।

‘সময় হোক।’

নির্দেশের আশায় অপেক্ষা করছে অন্যান্য কাউহ্যান্ড। ‘কোফিন, আস্তাবলের একটা স্টল দেখলাম নষ্ট হয়ে গেছে, তাছাড়া কোরালটাও মেরামত করা প্রয়োজন। তোমার ওপর থাকল এ দুটোর ভার।’ কোফিনকে ছাড়িয়ে চলে গেল ওর দৃষ্টি। ‘আর তোমরা বাকি সবাই স্কেলিটন রিজের ওদিককার মেসার ধারে চলে যাও। একই কাজ তোমাদেরও, নদী পার করে দেবে সব গরু।’

খাওয়া শেষে কফিতে চুমুক দিল শেভলিন। তারপর হঠাৎ করে উঠে দাঁড়াল, টুপি হাতে তুলে নিতে নিতে একবার চোখ বুলাল সবার উপর। ‘এখানে আমি নতুন। তোমাদের কাছে আমি যেমন নতুন, তোমরাও আমার কাছে নতুন। তোমাদের কোন সমস্যা থাকলে, কিছু বলার থাকলে বিনা দ্বিধায় জানাবে। কিন্তু একটা কথা ভাল করে বুঝে নাও। “জে-ডট-ও”-র দায়িত্ব এখন আমার হাতে, এখানে কোনরকম ঝামেলা হতে দেব না, সে রকম কোন লক্ষণ দেখলেই শক্ত হাতে দমন করব। তবে যতক্ষণ শান্তভাবে কাজ করছ, কথা দিচ্ছি, তোমাদের কোন বিপদ হবে না।’

খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পেছনে হাত বাড়িয়ে দরজাটা ভিজিয়ে দিল সাডেন। এক টুকরো মাংস মুখে পুরে হাসি চাপল কোফিন। হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে লুড ফেলার, বুঝে উঠতে পারছে না এখন তার কী করা উচিত। ফোরম্যান হিসাবে যুক্তিসঙ্গত নির্দেশ বুঝতে বেগ পেতে হয়নি তার। নদীর এপারে নিয়ে এলে, সন্দেহ নেই, প্রচুর গরু চুরির হাত থেকে রেহাই পাবে। র‍্যাঞ্চ হাউসে বসে একটা দূরবীন হলেই একজন লোক সব গরু পাহারা দিয়ে রাখতে পারবে। এপার থেকে গরু তাড়িয়ে নেয়ার সাধ্য হবে না কারও।

ফেলারের চিন্তাভাবনা স্পষ্ট বুঝতে পারছে কোফিন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেভলিনের নির্দেশ মেনে নিতে হচ্ছে তাকে। অন্যদিকে হুইলারের মুখোমুখি দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাডেন অন্যান্য কাউহ্যান্ডের সম্মান আদায় করে নিয়েছে, সেটাও নজর এঁড়ায়নি তার।

সুকৌশলে ঘটনার নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নিয়েছে শেভলিন। এখন ওর কথামতই চলতে হবে ফেলারকে, নয়তো বরখাস্ত হয়ে যাবে সে। একবার র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চলে গেলে, দলছুট হয়ে পড়বে-এসব না বুঝবার মত নির্বোধ সে নয়।

র‍্যাঞ্চের আশপাশে কাজ করা পছন্দ নয় কোফিনের। কিন্তু বিশ্বস্ত একজন লোককে হাতের কাছে রাখবার ব্যাপারে শেভলিনের এ কৌশলটা পছন্দ হয়েছে ওর।

ফেলার বিদায় নেবার পর পরই ঘোড়ায় চেপে ‘বিগ-বি’-র উদ্দেশে রওনা হলো জ্যাকসন। কিন্তু মাঝপথেই ক্রে মিলারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ঘর্মাক্ত ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এল মিলার।

‘সব বরবাদ করে দিয়েছে লুড!’ রাগে গর্জে উঠল জ্যাকসন। ‘ও’নীল এখনও বেঁচে আছে। আর শেভলিন লোকটা এসে হাজির হতেই, কাজের কাজ কিছু না করে সোজা আমার কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে গর্দভটা!’

পা দিয়ে স্যাডল হর্ন পেঁচিয়ে ধরে বসল মিলার। ‘এখন কী করবে?’

‘বাইরের কাউকে ওই র‍্যাপ্স দখল করে নিতে দেব না আমি।’

‘ও’নীল সত্যি মারা গেছে—কী মনে হয়?’

‘আমি কী করে জানব? আর না মরলেও, বিশ্বাস করো, মরবে!’

চিন্তিত চেহারায় জ্যাকসনের দিকে চাইল মিলার। ‘ভাল কথা বলেছ।’

‘শোনো।’ আরও কাছে এগিয়ে এল জ্যাকসন। ‘ও’নীল বেঁচে থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। মারা গিয়ে থাকলে যত শীঘ্র সম্ভব খোঁজ নেয়া দরকার। বেঁচে থাকলে যে করে হোক মেরে ফেলতে হবে। এতদূর আসার পর আর বোকা বনতে চাই না আমি।’

‘শেভলিনকে সামলানো বোধ হয় খুব সহজ হবে না।’

‘ভয় পাচ্ছ?’

‘সে আমার চেয়ে তুমিই ভাল জানো।’

উপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল জ্যাকসন। ‘হ্যাঁ, তা জানি। আচ্ছা, বাদ দাও, একটু উত্তেজিত হয়ে গেছি আমি।’

‘ও’নীলের কী করবে বলো।’

‘ও নিয়ে ভেবো না। শেভলিনকে নিয়ে মাথা ঘামাও তুমি।’

জ্যাকসনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মিলার। তা হলে এই ব্যাপার! এক সঙ্গে কাজে না নামলে, একটা লোকের আসল চেহারা বোঝা যায় না কখনও। অন্যের সম্পত্তি ছিনিয়ে নিতে যাচ্ছে ওরা, এ নিয়ে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই মিলারের; জানে, বাধা হয়ে দাঁড়ালে কাউকে হত্যা করতে দ্বিধা করবে না ও। তা ছাড়া ও কী চরিত্রের মানুষ তাও অজানা নেই কারও। কিন্তু সবার চোখে ভাল মানুষ জ্যাকসন, অথচ...

‘স্ট্যাগ কোথায়?’

‘স্ট্যাগের কথাও ভাবতে হবে না তোমাকে। নিজের কাজে ব্যস্ত আছে সে।’

‘আচ্ছা! স্ট্যাগ হারভে জ্যাক ও’নীলের প্রাণ সংহার করতে গেছে! বেশ, এ কাজে ওর চেয়ে যোগ্য লোক মেলা ভার। ছোট চেহারার শীতল দৃষ্টির এই লোকটা নিপুণ এবং ক্ষিপ্ত হাতে মানুষ শিকারে ওস্তাদ। ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।’

‘জে-ডট-ও’ র‍্যাপ্সটা সত্যিই তা হলে তাদের হাতে আসতে যাচ্ছে!

‘আর শেভলিনের কী হবে?’ আবার জিজ্ঞেস করল মিলার।

‘ওকে আমরাই সামলাব। কোণঠাসা করে ফেলব। কিন্তু, ক্রে, মনে রেখো, কোনরকম গানফাইটের ঝুঁকি নেয়া যাবে না। ধরে ঝুলিয়ে দিতে হবে। এবার আমরা একসঙ্গে নামব—তুমি, আমি, লুড-সবাই!’

‘আর ম্যাককার্থি?’

‘সে বাদ। মানে আমরা সব কাজ শেষ করে ফেলার পর বাদ হয়ে যাবে। নিজেকে জড়াতে চাইলে স্রেফ ফতুর করে ছেড়ে দেব তাকে। দরকার হলে তার র‍্যাপ্সটাও নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেব।’

সিগারেটের গোড়ার দিকে চাইল মিলার, কঁচকে আছে ভুরুজোড়া, ভাবছে জ্যাকসন হচ্ছে খ্যাপা ষাঁড়ের মত, একবার কিছু শুরু করলে কারও সাধ্য নেই ঠেকায়। মনে মনে পুরো ব্যাপারটা উল্টেপাল্টে দেখল মিলার, এখন যদি শেভলিন না থাকত, ও'নীরের র‍্যাঞ্চটা দখল করে নেয়া কোন সমস্যাই হত না। 'আচ্ছা, শেভলিনকে হুইলারের সঙ্গে লাগিয়ে দিলে হত না?' পরামর্শ দিল সে। 'নিজেরা নিজেরা মারপিট করে শেষ হয়ে যেত ওরা।'

'সেজন্যে, অনেক সময় দরকার।' বুঝতে পারছে মিলার, বুকটি মনঃপূত হয়েছে জ্যাকসনের। 'তবে চেষ্টা করে দেখা যায়, একটার হাত থেকে অন্তত রেহাই পাওয়া যাবে হুইলার পিস্তল ব্যবহার করতে গেলে শেভলিনের হাতে খুন হয়ে যাবে। আর সে যদি শেভলিনকে একবার হাতের মুঠোয় পায়—শেষ হয়ে যাবে সাডেন।' তুড়ি বাজিয়ে শেষ হয়ে যাঁবার ভঙ্গি করল জ্যাকসন।

'কিন্তু হুইলারের হাতে ধরা দেয়ার মত বোকা নয় শেভলিন।'

'তোমার লোকদের তৈরি রেখো,' পরামর্শ দিল জ্যাকসন। 'এদিকে হুইলারকে খেপিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করছি আমি, দুটোকে হয়তো লাগিয়ে দেয়া যেতেও পারে। আর তা যদি নাও যায়, রাস্তা তো খোলাই আছে। আমাদের দুজনের আউটফিটের সব গরু-বাছুর নিয়ে ছেড়ে দেব "জে-ডট-ও" র‍্যাঞ্চ। চতুর্দিক থেকে হামলা করে শেভলিনকে দিশেহারা করে সবার কাছ থেকে আলাদা করে ফেলব। তারপর নিশ্চিন্তে শেষ করে দেব।'

'আর মেরি ব্ল্যাক?'

'সে পরে দেখা যাবে ওকে নিয়ে অত চিন্তার কিছু নেই

'কিন্তু ট্রিপ আর উইলিয়ামস—এরা ওর পক্ষে রয়েছে যে!'

'মেরে ফেলো—আজ রাতেই ব্যবস্থা করো। বোঝা গেছে, মিলার?'

র‍্যাঞ্চ ফিরবার পথে কথাটা নিয়ে ভাবল মিলার। ঠিকই বলেছে জ্যাকসন। ট্রিপদের মেরির পক্ষে দাঁড়ানোর সুযোগ দেওয়ার কোন মানে হয় না। এখুনি ওদের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু ট্রিপ লোকটা খুব ভাল ছিল—উপায় কী—এটাই যে তার নিয়তি!

লুড বেরিয়ে যাবার পর কোফিনের হাতে র‍্যাঞ্চের দায়িত্ব দিয়ে মেরি ব্ল্যাকের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে পড়ল শেভলিন। নদীর ওপারে গোট ক্যাম্প নামে একটা জায়গায় সাক্ষাতের স্থান নির্ধারিত হয়েছে। উঁচু চাতালটার কথা ট্রিপই বলেছে কাছাকাছি আসবার পর হঠাৎ ক্লিফের ছায়ায় এক চিলতে সবুজ জায়গা দেখতে পেল ও। বিরাট বিরাট কটনউড আর সিকামোরের ফাঁকে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোটখাট কেবিন। এটা সেই বেটি কনসিডাইনেরই কেবিন বুঝতে পেরে কৌতূহলী হয়ে উঠল শেভলিন।

সূর্যের দিকে চোখ ফেরাল ও সময় আছে। অন্যায়সে মেয়েটার সঙ্গে পরিচয়পর্ব সেরে নেয়া যায়। ট্রেইল থেকে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল সাডেন। কেবিনে পৌঁছানোর আগেই চোখে পড়ল ফুলের বাগান, অসংখ্য ফুল ফুটে আছে—আক্ষরিক

বইঘর, কম
ঘেরাও

অর্থেই যেন ফুলের বিছানা। ফুলের সাগর দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। আকাশছোয়া ক্রিফ আর বিশালাকার সব গাছের ছায়ায় দাঁড়ানো কেবিনটার কাছ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে নদী। কেবিনের পাশে বেড়ায় ঘেরা কয়েকটা সজি ক্ষেতও রয়েছে। সব কিছুতেই যত্ন আর সুরুচির ছাপ। গাছপালার ভিতর দিয়ে কেবিনের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল শেভলিন।

পেছনে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে ঘুরে দাঁড়াল। সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, কালো চুল, কাকের চোখের মত গভীর কালো দুটি চোখ। চকিত পদক্ষেপে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এল সে। টুপি খুলে তাকে শুভেচ্ছা জানাল শেভলিন ‘আমার নাম মাইক শেভলিন,’ বলল, “‘জে-ডট-ও’ র‍্যাঙ্কের ম্যানেজার। তুমি বোধকরি বেটি কনসিডাইন।’

তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকাল মেয়েটা, যেন এক নজরেই বুঝে নিতে চাইল ওকে। ‘ওখানে ম্যানেজার আছে জানতাম না তো!’

সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে যদূর সম্ভব ব্যাখ্যা করল শেভলিন। অনেকটা পথ ঘোড়া হাঁকিয়ে আসবার পর এখানকার ছায়াময় শীতলতা ভাল লাগছে। বেটি কনসিডাইন বেশ লম্বা, সুগঠিত স্বাস্থ্যের অধিকারী; কণ্ঠস্বর একটু যেন গম্ভীর কথা বলতে বলতে মেয়েটা এখানে একা থাকছে কীভাবে, ভাবল সাডেন

‘জায়গাটা বেশ সুন্দর,’ শেভলিনের কণ্ঠে আন্তরিকতার ছোঁয়া। ‘অনেক দিন ধরেই এখানে আছি বোধ হয়।’

‘তিন বছর, খুব বেশি আর কোথায়।’

শেভলিনকে জরিপ করছে মেয়েটা। গম্ভীর অথচ মৃদু হাসিমাখা চেহারার দীর্ঘ যুবককে ঘিরে জমে উঠেছে ওর সব মেয়েলী কৌতূহল। কোমরে ঝোলানো পিগুলা দুটো ওর নজর কেড়ে নিয়েছে, এর অর্থ দুর্বোধ্য নয়। আঁচ করে নিয়েছে ওর নামের সঙ্গে ওগুলোর সম্পর্ক। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, শেভলিনের উপস্থিতি উপত্যকার র‍্যাঙ্কারদের ভিতর কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। জ্যাক ও’নীর কোনরকম বিপদাশঙ্কা করবার বহু আগেই তাকে সতর্ক করেছিল বেটি কনসিডাইন। তরতাজা ঘাস আর সুমিষ্ট পানির সুবাসে ‘জে-ডট-ও’-র গুরুত্বপূর্ণ তাগড়া হয়ে উঠেছে ওর চোখের সামনেই; নিজের চোখে দেখেছে, অন্য র‍্যাঙ্কারের চোখে রাজ্যের তক্ষা নিয়ে চেয়ে আছে এদিকে। এদের নিজস্ব রেঞ্জ যে খুঁ খারাপ, তা নয়—কিন্তু সেরাটাই যখন হাতের কাছে; অপেক্ষাকৃত খারাপটা নিয়ে সমুদ্র তাকতে চাইবে কে?

এসব কথা শেভলিনকে বলল ও। জ্যাক ও’নীর কী রকম একগুঁয়ে ছিল তাও জানাল, অ্যাপাচিদের সঙ্গে লড়াই করে নিজের জায়গা আদায় করে নিয়েছিল সে।

‘জ্যাক আমাকে বলছিল, ষাটের দিকে নাকি এখানে এসেছে ও,’ কৌতূহলের সঙ্গে জানতে চাইল শেভলিন, ‘ইন্ডিয়ানদের সামলেছিল কীভাবে? তখন নিশ্চয়ই অসংখ্য ইন্ডিয়ান থাকত এখানে!’

‘যখন প্রয়োজন হয়েছে, ওদের সঙ্গে লড়াই করেছে—প্রয়োজনে আপোষ করেছে একবার তো লড়াইয়ের সময় একজন ছাড়া আর সবাই ওকে ভেঙে

পালিয়ে গেল! কিন্তু তবু হঠানো যায়নি ওকে। লড়াই করে টিকে গেছে।’

‘একজন ছিল? কে সে?’

‘হ্যাঁ,’ ঘুরে দাঁড়িয়ে গজ ত্রিশেক দূরে একটা সিকামোর গাছের তলায় উঁচু একটা ঢিবির উপরের পাথরের টুকরোর দিকে ইঙ্গিত করল বেটি কনসিডাইন, ফুল ফুটে আছে কবরের উপর। ‘ওখানে ঘুমিয়ে আছে সে। আমার বাবা।’

‘আচ্ছা!’ আত্মহের সঙ্গে বেটির দিকে তাকাল সাডেন শেভলিন। ‘তখন এখানে ছিলে তুমি? এত বিপদের মধ্যে?’

গাছের পাতার ফাঁক গলে সূর্যের আলো এসে নকশা আঁকছে মেয়েটার গালে।

‘জ্যাকের সঙ্গে পশ্চিমে আসার আগেই আমার মা মারা গিয়েছিল। তারপর এখানেই বেড়ে উঠেছি আমি। এখানে আসার পর প্রথম একটি বছর ইন্ডিয়ানরা হামলা চালায়নি এরকম একটা দিনও ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় বছরে হামলা হয়েছিল মাত্র তিনবার। এরপর অনেক দিন আর কোনরকম বিপদ-আপদ হয়নি-শান্তিতেই কেটেছে। কিন্তু তারপর সৈন্যদের ভয়ে ওরা যখন শ্বেতাঙ্গদের খুন করতে শুরু করল, আরও একবার লড়াই করতে হয়েছিল।’

‘এখান থেকে কখনও যাওনি তোমরা?’

চট করে একবার ওর মুখের দিকে তাকাল মেয়েটা। ‘তা হলে আমার কথা ওরা বলেনি তোমাকে?’

‘কই, না! কিছু বলেনি তো! ন্যারোজ বলছিল তুমি এখানে থাকো-বাস।’

‘ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে?’ মেয়েটার ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠছে দেখে একটু যেন ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল শেভলিন, বিস্মিত হলো ও। তা হলে কি ন্যারোজকে ভালবাসে মেয়েটা? ‘খুব ভালমানুষ, ওর মত লোক খুব কম দেখেছি আমি।’

মাথা ঝাঁকিয়ে সাই দিল সাডেন।

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে রইল মেয়েটা। গোট ক্যাম্প মেরির সঙ্গে দেখা করবার কথা মনে পড়ল শেভলিনের। ‘এবার তা হলে আমি যাই, কেমন?’

ওকে অনুসরণ করল বেটি কনসিডাইন। ‘সাবধানে থেকো,’ হঠাৎ শেভলিনের বাহুতে হাত রেখে বলে উঠল ও, ‘খুব সাবধান, সাডেন, তোমাকে ওরা খুন করার চেষ্টা করবে-সবাই! এমন একটা লোকও পাবে না, যাকে বিশ্বাস করতে পারো।’

‘একটা উপায় হয়তো ঠিকই বেরিয়ে যাবে। মেরি ব্ল্যাকের ভাল ভাল দুজন কাউন্সিল সঙ্গে পাচ্ছি সম্ভবত। আর ওদিকে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছে বিল কোফিন।’

‘মেরি...তা হলে ওর সঙ্গেও পরিচয় হয়ে গেছে।’ শেভলিনের চোখে কিছু যেন খুঁজল মেয়েটার চোখ। ‘এখন নিশ্চয়ই ওর সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছ?’

‘হ্যাঁ। লড়াইয়ের একটা পরিকল্পনা দাঁড় করানোর চেষ্টা করব।’

‘মেয়েটা কিন্তু স্বার্থপর।’ তাড়াতাড়ি বলে উঠল বেটি। কিছুটা অবাক হলো সাডেন, এই মেয়েটা আরেকজনের কুৎসা গাইবে-এমনটি আশা করেনি ও।

‘তা আমি কী করে জানব,’ অনিচ্ছাসত্ত্বেও শীতল শোনাৎল শেভলিনের কণ্ঠ। ‘নিজের ব্যাঞ্চ বাঁচানোর চেষ্টা করছে মেয়েটা-এর বেশি আর কিছু মনে হয়নি

বইঘর, কম

ঘেরাও

আমার কাছে।’

গভীরভাবে হ্যাঁ-সূচক মাথা ঝাঁকাল বেটি। ‘আমার কথাগুলো নিশ্চয়ই ভাল লাগেনি তোমার, তাই না? ভাল ভাল কথা বলাই বোধ হয় উচিত ছিল, সেটাই হয়তো শোভন দেখাত, কিন্তু তোমার কোন উপকারে আসত না।’ শেভলিন কিছু বলছে না দেখে খেই ধরল ও, ‘এমনিতে খুবই সুন্দরী মেরি, কিন্তু ওর স্বভাব বাবার মতই—“বিগ-বি” ছাড়া দুনিয়ার আর কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না গিড ব্ল্যাকের কাছে, মেরির বেলায়ও তাই। ব্যাঙ্ক রক্ষা করতে প্রয়োজন হলে মিথ্যের আশ্রয় নেয়া, চুরি কিংবা হত্যা—কোনকিছুতেই সংকোচ বোধ করবে না সে।’

‘তাই বুঝি ধারণা তোমার?’ রেকাবে পা গলিয়ে দিল শেভলিন, তারপর এক ঝটকায় উঠে বসল ঘোড়ার পিঠে, ‘কিন্তু জানো তো, সময় সময় খুন করা ছাড়া উপায় থাকে না।’

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল বেটি। ‘খুনেরও রকমফের আছে। কিন্তু আমার একটা কথা মনে রেখো, ও যদি ভাবে তোমাকে ব্যবহার করে “বিগ-বি” বাঁচানো যাবে, বিনাধ্বিধায় তাই করবে।’

ডান স্ট্যালিয়নটা ঘুরিয়ে নিল শেভলিন। ‘বেশ ধন্যবাদ,’ বলল ও। ‘তবে অত খারাপ বোধ হয় নয় মেয়েটা।’

‘হয়তো।’ গভীর কালো চোখে শেভলিনের দিকে তাকাল বেটি। বাকস্কিন শার্ট আর ক্যালিকো ব্লাউজে নিঃসঙ্গ, দুঃখী অথচ অপূর্ব লাগছে মেয়েটাকে। ‘এসব কথা আর কেউ হলে বলতাম না আমি, সাডেন। কিন্তু তুমি কে আমি জানি, জানি জ্যাক ও’নীলের হয়ে কাজ করছ, সেজন্যেই বললাম, তবে এসব ছাড়া আরও গুঢ় কোন কারণও থাকতে পারে এর পেছনে!’

কথাটা শেষ করেই ঝট করে ঘুরে কেবিনের দিকে হাঁটা দিল মেয়েটা। বিস্মিত চোখে সেদিকে চেয়ে রইল শেভলিন। হঠাৎ আবার ঘুরে দাঁড়াল বেটি। ‘ওই নেকডের দল যখন ঘিরে ধরবে তোমাকে...সাহায্যের দরকার হলে চলে এসো। বাবা যেমন জ্যাক ও’নীলের পাশে দাঁড়িয়েছিল—তেমনি আমাকে পাশে পাবে তুমি!’

ছয়

গোট ক্যাম্পের একটা ঝাঁরার ধারে অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করছে মেরি ব্ল্যাক। নিচু ছাদের ছোট একটা কুঁড়ে ছাড়া আর কিছুই নেই এখানে। একটা পাথুরে কোরাল আর ডালপালার ছাউনি দেওয়া একটা ছাপড়া দাঁড়িয়ে আছে কুঁড়েটার পেছনে।

শেভলিনকে এগিয়ে আসতে দেখে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল মেরি। ‘দেরি করে ফেলেছ। নিশ্চয়ই ওই মেয়েটার সঙ্গে কথা বলছিলে।’

‘কে, বেটির কথা বলছ? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ।’

‘মেয়েটা খুব সুন্দরী।’ সংক্ষেপে বলল মেরি। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে নামতে হাসি চাপল শেভলিন।

‘হ্যাঁ,’ সপ্রতিভ কণ্ঠে সায় দিল ও, ‘সত্যি সুন্দরী। এবার বলো দেখা করতে চেয়েছ কেন?’

‘অনুমান করতে পারছ হয়তো। কথাটা হচ্ছে, আমার সঙ্গে দুজন লোক আছে, ট্রিপ আর উইলিয়ামস; গানম্যান না হলেও শক্ত ধাতুতে গড়া-লড়তে জানে, দুজনেই দুর্ধর্ষ লোক। ওদিকে তুমি আছ। তো আমরা যদি একজোট হই, বুঝতেই পারছ, লড়াইয়ের সময় শক্তি বেড়ে যাবে আমাদের। তা ছাড়া, তুমি...মানে, তোমার নামটাও যথেষ্ট কাজ দেবে।’

‘আমার সঙ্গেও একজন আছে,’ বলল শেভলিন, ‘বিল কোফিন।’

শুনেই খুশি হয়ে উঠল মেরি। ‘বাহ, দারুণ! ও হচ্ছে “জে-ডট-ও”-র সেরা লোক, লড়াইয়ের বেলায় একাই আমার দুজন লোকের সমান। ভালই হবে। তা ছাড়া আরও লোক জোগাড় করাও সমস্যা হবে না। জাংশনে প্রচুর লোক এসে হাজির হচ্ছে ইদানীং—সব ভবঘুরে।’

‘উই, ওসব ভাড়াটে বন্দুকবাজে কাজ হবে না।’

‘ভাড়াটে নয় কে? তুমি নিজেই কি ভাড়াটে নও?’ একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলল মেরি। মাথা থেকে টুপি খুলতেই ছড়িয়ে পড়ল একরাশ চুল। ‘ওহ-হো, কিছু মনে কোরো না, সাডেন, এই ব্যাপারটা নিয়ে বড্ড চিন্তায় আছি। যার তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বসছি নিজের অজান্তে।’

‘বুঝতে পারছি। মাঝে মাঝে আমার এমন হয়।’

তীক্ষ্ণ চোখে শেভলিনের দিকে তাকাল মেরি। ‘তাই কি? আদৌ কি কখনও চিন্তা হয় তোমার? তোমাকে কোন কিছু স্পর্শ করে বলে তো মনে হয় না।’

‘তা হলে,’ মেরির কথায় পা করল না শেভলিন, ‘দলে মোট চারজন দাঁড়াচ্ছি আমরা। তোমার মতে একসঙ্গে লড়াই করাটাই আমাদের জন্যে সুবিধেজনক হবে। ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু যখন “জে-ডট-ও,” ওখানেই ঘাঁটি গাড়তে পারি আমরা, কী বলো?’

দ্রুত পরিবর্তন ঘটল মেরির চেহারায়। “বিগ-বি” ছেড়ে যাব? মুহূর্তের জন্যও নয়। আমি আরও ভেবে রেখেছি, তুমিই চলে আসবে আমাদের র‍্যাঞ্জে। খাওয়াদাওয়ার কোন অসুবিধে হবে না, রান্নার কাজটা আমি ভালই জানি। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে মারিয়া আছে—ওকে একা রেখে কিছুতেই যাওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে।’

তার চেয়ে বললেই হয় র‍্যাঞ্জ ছেড়ে নড়বে না তুমি, মনে মনে বলল শেভলিন। পরমুহূর্তে অপরাধী মনে হলো নিজেকে। বেটির উপর কিছুক্ষণ আগে বিরক্ত হয়ে এখন আবার ওর কথারই প্রতিধ্বনি তুলছে ও। ‘আসলে সব চেয়ে ভাল হয়,’ বলল শেভলিন, ‘ম্যাককার্থির সঙ্গে ফয়সালা করে এলে। আমাদের পক্ষে নিয়ে আসতে হবে ওকে।’

‘পারবে না। তাতে ওর কী লাভ? যতক্ষণ সম্ভব নিরপেক্ষ থাকবে সে, তারপর সুযোগ বুঝে যোগ দেবে ওদের সঙ্গে।’ একটু কাছাকাছি ‘এগিয়ে এল মেরি। ‘তোমার সাহায্য আমার প্রয়োজন, সাডেন। “জে-ডট-ও” ব্যাপ্তি থাকলে, ভেবে দেখো, তোমার একদিকে থাকছে হুইলার, আর দক্ষিণে থাকবে বাকি সব শত্রুরা—দ্বিমুখী আক্রমণে চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। তার চেয়ে “বিগ-বি”—তে চলে এসো, একসঙ্গে রাখো দাঁড়াতে পারব আমরা। শত্রুর ভয় থাকবে কেবল একদিক থেকে।’

ওর কথায় কিছুটা যুক্তি আছে—কিন্তু অঁকাট্য নয়। সাডেনের নিজের ইচ্ছে অবশ্য সোজা গিয়ে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়ানো। অবশেষে ও বলল, ‘আগামী কাল হুইলারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি আমি। কথাবার্তা বলে দেখি, ওকে সরিয়ে দেয়া যায় কি না, তারপর অন্যদের মোকাবিলা করব।’

‘তোমার কথায় সে কানই দেবে না।’

‘সুযোগ দিয়ে দেখা যাক।’

কাঁধ ঝাঁকিয়ে মৃদু হাসল মেরি। ‘ওহ—তোমার সঙ্গে তর্কে গিয়ে লাভ নেই হয়তো তোমার কথাই ঠিক। তবে...তবে...তুমি আমাদের সঙ্গে থাকলে অনেকটা ভরসা পেতাম। মারিয়া মেয়েটা খুব ভাল। জানি, প্রয়োজনে আমার জন্যে প্রাণ দিতেও দ্বিধা করবে না; ট্রিপ আর উইলিয়ামসও তাই। কিন্তু ওরা কেউই ক্রে’কে ঠেকাতে পারবে না। লোকটাকে অসম্ভব ভয় করে আমার। ওর কথা ভাবলেই শিউরে ওঠে গা।’

চট করে মেরির উপর থেকে ঘুরে এল শেভলিনের দৃষ্টি। ‘মিলারের কাছ থেকে বিপদের আশঙ্কা করছ?’

‘অস্বীকার করব না।’ খুব-ভাল করে জানে মেরি, মিথ্যে কথা বলছে ও। ক্রে’র কাছ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। ওর সঙ্গে বাঁকা সুরে, উদ্ধত ভঙ্গিতে কথা বলতে পছন্দ করে মিলার। কারণ, অনেক দিন ধরে মাতার উপর বস হয়ে বসে আছে ও। কিন্তু যতই খুন-খারাবি করুক; যতই সে ভয়ঙ্কর হোক, বরাবর মেয়েদের সম্মান দেখিয়ে এসেছে। পতিতাদের সঙ্গেও নাকি তাকে কখনও কাজে ব্যবহার করতে দেখা যায়নি বলে শুনেছে মেরি।’

কিন্তু ওর ইঙ্গিতে সাডেনকে উদ্ভিগ্ন হয়ে উঠতে দেখেই সুযোগটা কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। দারুণ সুদর্শন এই লোকটা, মনে মনে ভাবল মেরি। ভাল লাগবার মত কাউকে জীবনে এই প্রথম পেয়েছে ও। একে ব্যাপ্তি নিয়ে যেতে পারলে সত্যি ভাল হত।

‘ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকছে,’ বলল মেরি, ‘আমাদের সঙ্গে আরামে খাবার সুযোগ থাকবার পরও তোমরা কি না ওখানে কষ্ট করে মরছ। আমি, মারিয়া—আমরা দুজনেই রাঁধতে জানি। আর তা ছাড়া এটা নিশ্চয়ই বোঝো, আমাদের শক্তি-দ্বিধা-বিভক্ত করে রাখাটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়।’

‘আগে হুইলারের সঙ্গে দেখা করি,’ বলল শেভলিন। ‘তারপর কোফিনকে নিয়ে তোমার ওখানে আসব।’

এখানেই আলোচনার সমাপ্তি ঘটল ওদের।

নির্জন র্যাঞ্জে ফিরে এল শেভলিন, চারদিক নিস্তব্ধ। কাজ থেকে ফেরেনি কেউ। হাতের ভাঁজে উইনচেস্টার নিয়ে র্যাঞ্জে হাউস থেকে বেরিয়ে এল বিল কোফিন। সংক্ষেপে কোফিনের কাছে নিজের পরিকল্পনাটা খুলে বলল সাডেন। কোফিন কাঁধ ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ, কাজ হবে' বলে মনে হয়। ট্রিপদের আমি চিনি। ওরা আর যাই করুক, বেঙ্গম্যানি করবে না।'

'ঠিক আছে,' বলল সাডেন, 'কাল সকালে সবার আগে হুইলারের কাছে যাচ্ছি আমি। আমাদের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করব তাকে।'

'পারবে না।'

'দেখাই যাক। যাবে নাকি?'

হেসে ফেলল কোফিন। 'এ জিনিস ছাড়া যায় না। লোকটাকে দেখার পর তোমার মুখের চেহারাটা একবার দেখতে চাই আমি। বাজি ধরে বলতে পারি, এমন চিজ জীবনেও দেখিনি।'

পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়ল ওরা। টুলি মেসার কাছে পৌঁছে মেসার উপর দিয়েই এগিয়ে গেছে ট্রেইলটা। এগোতে এগোতে পুরো এলাকাটার উপর আরও একবার চোখ বোলানোর সুযোগটা কাজে লাগাল শেভলিন। ঘাড় ফিরিয়ে দক্ষিণপূবে প্রায় মাইল পঁচিশেক দূরের ম্যাজাটজালের দিকেও তাকাল বারকয়েক। দেখে মনে হচ্ছে বহুদূরের জায়গাটা এবড়োখেবড়ো পাহাড়-পর্বতে ভরা।

চুপচাপ শেভলিনের সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে বিল কোফিন। সতর্ক দৃষ্টি দুচোখে ইয়েলোজ্যাকেট ট্রেইলে পৌঁছানোর পর নীরবতা ভেঙে কথা পাড়ল সে।

'ও'নীলের জন্যে চিন্তা লাগছে। ওর যদি কিছু হয়ে যায়...মানে, তোমার তখন কী হবে?'

ভাল প্রশ্ন। প্রশ্নটা ভাবতে বাধ্য করল শেভলিনকে। ও'নীলের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়েই এখানে এসেছে ও। কিন্তু তাকে খুন করা হলে বা কোন কারণে সে মারা গেলে সেই ভিতটা ধসে যাবে। কথাটা ভাবতেই শক্ত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসল সাডেনের ঠোঁটজোড়া। 'এ নিয়ে এখন চিন্তা করে ফায়দা নেই। নদী তো আগে আসুক, তারপর পার হওয়ার কথা ভাবা যাবে।'

'আগে চিন্তা করে রাখা ভাল,' স্যাডলে নড়েচড়ে বসল কোফিন। 'বাজি রেখে বলছি আগেই সব কিছু ছক কেটে রেখেছে জ্যাকসন।'

'জ্যাকসন লোকটা কেমন, চেনো তাকে?'

'হুম। কিছু কিছু লোক আছে না-ওপরে ওপরে ভাল মানুষের ভান করবে, আর তলে তলে দুনিয়ার অপকর্ম করে বেড়াবে? জ্যাকসনও এই জাতের-পাজির পা ঝাড়া। ক্ষুধার্ত নেকড়ে মত ভয়ঙ্কর। শক্তিশালী, ধূর্ত আর অসম্ভব শক্ত লোক। উইলকক্সের মত অস্থির নয়। গানম্যান না হয়েও প্রচুর লড়াই করেছে ওকে সামলানো সত্যিই কঠিন হবে।'

বইঘর,কম

কাঁধ ঝাঁকাল সাডেন শেভলিন। ‘সবার বেলায়ই এই কথা খাটে।’

ঘোড়া ঘুরিয়ে ইয়েলোজ্যাকেট ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ল ওরা। এই সময় ঘরগুলো চোখে পড়ল। সব মিলিয়ে গোটাবিশেক হবে। বড় জোর দশ-বারোটায় লোকজন থাকবার আভাস মিলছে—বাকিগুলোকে পেয়েছে মরণদশায়। বারান্দাসহ দীর্ঘ একটা দালান দেখা যাচ্ছে। বুলানো সাইনবোর্ড থেকে বোঝা যায় এককালে স্যালুন-কাম-জেনারেল স্টোর ছিল। বেশ কয়েকজন লোক বারান্দায় বসে আড্ডা মারছে। আয়েসী ভঙ্গিতে পা নাচাচ্ছে কেউ কেউ। কাছাকাছি পৌঁছে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল সাডেন। ‘এই যে, ফ্রেন্ডস্, হুইলার কোথায়?’

‘ভেতরে,’ মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল একজন।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল সাডেন। চোখে হালকা কৌতুক নিয়ে কোফিন তাকাল ওর দিকে। ‘আমি অপেক্ষা করছি,’ বলল সে, ‘তোমার কাছ থেকে সরিয়ে রাখব ওদের।’

হাসল শেভলিন। ‘নিজের কাছ থেকে তো আগে সরিয়ে রাখো,’ পাল্টা জবাব দিল। তারপর উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। বারান্দায় বসে থাকা সবকটা লোকই গুণ্ডা প্রকৃতির, চেহারাই বলে দিচ্ছে ওদের পরিচয়। তাচ্ছিল্যভরা চোখে ওকে মাপছে ওরা। ওঅটারিং-ট্রাফের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে কোফিন, কৌতূহলের সঙ্গে দেখছে তাকেও।

স্যালুনে ঢুকেই মোট তিনজন লোককে দেখতে পেল সাডেন, এদের একজন লুড ফেলার।

ফেলারকে দেখেই আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল ও। ‘এখানে কী করছ, লুড।’

এক পা থেকে অন্য পায়ে দেহের ভর বদল করল ফেলার। এখানে শেভলিনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ভাবতে পারেনি। বিমূঢ় হয়ে গেল সে। ‘গরু খুঁজছি,’ বলে ফেলল আগুপিছু না ভেবেই।

‘চক ট্যাংকের ওদিকে পেয়ে যাবে অনেকগুলো,’ বলল শেভলিন, ‘আসার পথেও বেশ কিছু গরু চোখে পড়েছে আমাদের।’

ঘাড় ফিরিয়ে এবার কাউন্টারের উপর বসে থাকা বিশাল দেহী লোকটার দিকে তাকাল সাডেন শেভলিন। বিশাল শরীরের মাপে চেয়ার পাওয়া যায় না বলেই নাকি, কে জানে, কাউন্টারের উপর বসে আছে লোকটা। এমন বিশালদেহী মানুষ জীবনে দেখেনি সাডেন, চওড়া কাঁধ, বিরাট বুকের ছাতি, পেশীবহুল হাত! লম্বায় কমপক্ষে ছফুট আট ইঞ্চি হবেই, সোজা কথা দশাসই শরীর।

‘তুমিই তা হলে শেভলিন।’ নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল হুইলার।

‘আর তুমি হুইলার।’

করমদনের কোন রকম উৎসাহ দেখা গেল না কারও মধ্যে। ঠাণ্ডা চোখে একে অপরকে জরিপ করে নিচ্ছে। লোকটার সামনে শেভলিনকে মনে হচ্ছে যেন বামন।

‘আমি একটা লড়াইতে জড়িয়ে পড়েছি, হুইলার,’ সরাসরি কাজের কথায় এল সাডেন। ‘ও’নীল বাইরে রয়েছে এই মুহূর্তে। “জে-ডট-ও” রেঞ্জের দায়িত্বে

রয়েছি আমি দেখে শুনে মনে হচ্ছে এদিককার প্রায় সবাই রেঞ্জের জমিতে খাবলা বসানোর পায়তারা করছে।

‘আমিও আছি।’ স্বীকার করল হুইলার। শরীরের মত তার মাথাটাও বিশাল। চোয়ালের হাড়গুলো চওড়া আর চ্যাপ্টা। গালের উপর হালকা দাড়ি। ঘরে সেলাই করা শার্টের গলার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে দড়ির মত প্যাচানো পেশী। সারা বুকে ঘন লোমের আভাস।

‘হ্যাঁ, তুমিও,’ সায় দিল শেভলিন। ‘কিন্তু এ লড়াইতে আমিই জিততে যাচ্ছি—হুইলার! সুতরাং, এতে যত কম লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয় ততই মঙ্গল তোমাকে,’ বলল ও, ‘দেখলে শক্ত লোক বলেই মনে হয়, লোকজনও আছে দেখছি।’

‘আমাদের সাহায্য চাইতে যাচ্ছ নাকি?’ জানতে চাইল হুইলার।

‘সাহায্য চাইছি না। তোমাকে’ এসব থেকে দূরে সরে থাকতে বলছি বড় দলগুলোকে ঠেকাতে দাও আমাকে। আমি চাই না ওদের সঙ্গে লড়াই করার সময় পেছন থেকে তুমি খোঁচাও আমাকে।’

‘বেড়ে বলেছি।’ হাঁতের তালুতে গ্লাস ঘোরাতে ঘোরাতে বলল হুইলার বিশাল হাতে প্রমাণ সাইজের গ্লাসটাকেও খেলনা মনে হচ্ছে। ‘কিন্তু তাতে তোমার সুবিধে হলেও, আমার কোন লাভ হবে না। হাতের কাছে খোলা পড়ে আছে রেঞ্জটা, যে আগে দখল নেবে সেই ভোগ করবে। আমরা সবাই গরু চরানোর মত জায়গা আর জমি চাই শ্রেফ দখল করে নেয়ার জন্যেই তো পড়ে আছে “জে-ডট-ও”।’

‘না,’ ঠাণ্ডা কণ্ঠে জবাব দিল শেভলিন। ‘আমার বা জ্যাক ও’নীলের অনুমতি ছাড়া ওখানকার এক ইঞ্চি জমিও পাবে না তোমরা। এক ইঞ্চিও নয়। এটাই শেষ কথা। সবাইকে জানিয়ে দিয়ো। জমি দখলের স্বপ্নে যারা বুঁদ হয়ে আছে, ওদের বলো বাস্তবে ফিরে আসতে। এক কণা জমিও ছেড়ে দেবে না “জে-ডট-ও”।’

‘বড় বড় কথা বলতে তো দেখছি ওস্তাদ। কিন্তু সঙ্গে লোকজন কই তোমার?’

এবার হাসল না সাডেন শেভলিন, নড়লও না। শান্ত কণ্ঠে বলল, ‘আমি একাই যথেষ্ট।’ অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথাটা শুনে খুশি হলো হুইলার। ‘এমন কী তোমার সাহায্যেরও দরকার নেই।’

“আমার জবাবটাও শোনো,” উঠে দাঁড়াল হুইলার। ‘আমি সরছি না। সময় হলেই ওখানে হামলা চালাব। তুমি, তোমার “জে-ডট-ও”—সব শেষ। কোন আশা নেই তোমার। গিড ব্ল্যাকের মত তোমাকেও ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হবে।’

চোখ ছোট হয়ে এল সাডেন শেভলিনের, ঠাণ্ডা দৃষ্টি। ‘যেমন তোমার মর্জি হুইলার,’ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল ও, ‘তবে লড়াইতেই যদি চাও, এসো না এখনই শুরু হয়ে যাক?’

মুহূর্তের জন্য পিটপিট করে উঠল হুইলারের চোখ। একটু যেন চমকিত, অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছুটা শ্রদ্ধা এসে যাচ্ছে এই যুবকের উপর ওর শক্তি আর

‘মারপিটের ভয়ঙ্করত্বের জন্য আজ পর্যন্ত কেউ সরাসরি চ্যালেঞ্জ করবার সাহস করেনি। তা ছাড়া ডাক দিলেই মুহূর্তের মধ্যে এসে হাজির হবে অন্তত জনাবিশেক লোক—জানা সত্ত্বেও কি না ওকে চ্যালেঞ্জ করে বসেছে শেভলিন।

‘ওই পিস্তল দিয়ে আমাকে খুন করার কথা’ ভাবছ তো?’ কোমরে হাত রেখে বলল হুইলার। ‘তা হয়তো পারবে। কিন্তু মরার আগে তোমাকে হাতের মুঠোয় পাবই আমি, সঙ্গে সঙ্গে খুন করে ফেলব!’

কর্কশ কণ্ঠে হেসে উঠল সাডেন। ‘তাই?’ একটু করে ঘাড় ফেরাল ও। ‘বিল, গলা চড়িয়ে ডাকল, ‘এসো, তো, আমার পিস্তলটা ধরো। একে একটু শিক্ষা দেয়া দরকার।’

‘আরে বোকা নাকি!’ চিৎকার করে উঠল ফেলার। ‘স্রেফ খুন করে ফেলবে তো!’

‘প্রার্থনা করো, তাই যেন হয়,’ সংক্ষেপে জবাব দিল শেভলিন, ‘নইলে এরপর তোমার সঙ্গে ফয়সালা হবে আমার।’

কোফিন ঢুকতে ঢুকতেই কোমর থেকে গান বেট খুলে ফেলল শেভলিন। কোফিনের হাতে দিল ওটা। ‘হুইলার,’ বলল ও, ‘পিস্তল দিয়েই তোমাকে শেষ করে দিতে পারি: কারণ আমার একটা গুলিও মিস হবে না। সোজা হৃৎপিণ্ডে গিয়ে ঢুকবে প্রত্যেকটা। একশো গজ দূর থেকেও যতবার বলবে ততবারই একটা ডল্লার ফুটো করতে পারব, আর তোমার গায়ে গুলি লাগানো তো পানির মত সহজ। কিন্তু তোমাকে মারতে চাই না আমি। তাই খালি হাতে পিটিয়ে একটু টাইট দিয়ে দিচ্ছি।’

‘টাইট দেবে? আমাকে?’ হুইলারের কণ্ঠে অবিশ্বাস।

‘হ্যাঁ,’ হঠাৎ হেসে উঠল সাডেন শেভলিন। বিরাট কিছু মনে হচ্ছে নিজেকে। কী যেন জেগে উঠছে ওর ভিতর। লড়াইয়ের সেই পুরোনো উন্মাদনা। ‘লড়াই হয়তো করেছ তুমি। কিন্তু বাজি রেখে বলছি সারা জীবনে দশবারের বেশি লড়াইতে নামতে হয়নি তোমাকে। এই শরীরে লড়বে কী! আমি অন্তত একশোবার লড়েছি। নাও, আগ বাড়ো দেখি। এখুনি মাটিতে শুইয়ে দিচ্ছি তোমাকে!’

বিস্ময়কর ক্ষিপ্ৰতায় লাফ দিল হুইলার, এগিয়ে এল সামনে। কিন্তু আগেই তৈরি হয়ে আছে সাডেন। বাম হাতের বেমক্লা একটা ঘুসিতে তার ঠোঁট খেঁতলে দিল ও। আর কেউ হলে এই একটা ঘুসিতেই জমে যেত, কিন্তু একটুও কমল না দানবটার গতি।

বাউলি কেটে একটা ঘুসি এড়ানোর চেষ্টা করল সাডেন। বাঁচাতে পারল না নিজেকে। ঘুসিটা হজম করে সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের একটা ঘুসি বসিয়ে দিল হুইলারের বুকে। পরমুহূর্তে পা ফাঁক করে দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ বাকিয়ে হুইলারের পেটে ঝেড়ে দিল একটা লেফট হুক কেঁপে উঠল হুইলার। এবার আধ বসা ভঙ্গিতে উবু হয়ে গেল সাডেন, ডান হাতট’ লম্বা করে আঘাত হানল হুইলারের কপালের পাশে।

বেতলা মার খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল হুইলার। ‘তুমি-তুমিতো দেখছি ভালই মারতে পারো!’ বলেই আবার ঝাঁপ দিল সে।

সাত

বিদ্যুৎগতিতে পটাপট দুহাতে দুটো ঘুসি হাঁকাল হুইলার। বাঁ হাতের ঘুসিটা এড়াতে পারলেও ডান হাতেরটা থেকে বাঁচতে পারল না শেভলিন। ঠিক বুকের উপর লাগল আধমণী ঘুসিটা। দড়াম করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল ও। ছুটে এল হুইলার। চট করে গড়ান খেয়ে সরে গেল সাডেন, কাউন্টারে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল দ্রুত। হুইলার এগিয়ে আসতেই ডানহাতটা ছুটে গেল তার পেট বরাবর, তারপরই চালাল বাঁ হাতটা। এবার হুইলারের বুকে মাথা ঠেকিয়ে পেটের উপর দমাদম একের পর এক ঘুসি বসিয়ে চলল শেভলিন।

একহাত বাড়িয়ে শেভলিনকে জড়িয়ে ধরল হুইলার। আটকে ফেলল বাঁ হাতটা। তারপরই বিরামি শিক্কার একটা রদ্দা হানল সাডেনের মুখে। চোখে সর্ষে ফুল দেখল ও, খুলির ভিতর যেন কেঁপে উঠল মগজ। জুতোর ডগা দিয়ে হুইলারের হাঁটুর ঠিক নীচে কষে একটা লাথি চালাল সাডেন, সর্ব শক্তিতে পাটা নামিয়ে আনল লোকটার পায়ের পাতার উপর। তীব্র আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল দানবের গলা চিরে। টলতে টলতে পিছিয়ে গেল সে। এবার পূর্ণশক্তিতে আঘাত হানল সাডেন।

তিন কদম পিছিয়ে গেল হুইলার। সেই সঙ্গে সামনে এগোল সাডেন। কাউন্টারের কাছে পৌঁছেই চট করে এক পাশে সরে গেল নোবল হুইলার, বাঁ হাতের প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল শেভলিনের মুখে। রক্তের নোনাশ্বাদ অনুভব করল সাডেন জিভে। বুনো হিংস্রতায় হুইলারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও, সমানে চলছে দুহাত। পাল্টা আঘাত হানল হুইলার। দুজন পিছিয়ে এল দুদিকে। তারপরই আচমকা সামনে হাত বাড়িয়ে শেভলিনের কজি জাপ্টে ধরল হুইলার। হ্যাঁচকা টানে ছুঁড়ে দিল দরজার দিকে।

সশব্দে দরজার উপর এসে পড়তেই হাঁ করে খুলে গেল কবাট দুটো। গতি রুদ্ধ হলো না সাডেনের। দরজা গলে বারান্দার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে ধূলি-ধূসরিত রাস্তার উপর পড়ল। পিছু পিছু ছুটে এল হুইলার। বারান্দার কিনার থেকে এক লাফে শূন্যে উঠে গেল। জোড়া পায়ে সাডেনের মাথার উপর এসে পড়বে। তাড়াতাড়ি গড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সাডেন, টলছে। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছে ও। চোখ পিটপিট করে সামনে তাকাল। একটু আগে যেখানে সাডেনের মাথাটা ছিল, সেখানেই এসে পড়ল হুইলার, মুহূর্তের জন্য বেসামাল হয়ে গেল সে। এই সুযোগে আঘাত হানল শেভলিন। নাকের উপর বেমক্কা ঘুসি খেয়ে বারান্দার উপর

হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা। উবু হয়ে ঘাম আর রক্তের পর্দা ভেদ করে তাকাল সাডেন। ‘কেমন বুঝছ?’ বলে সামনে এগিয়ে গেল ও।

ও এগিয়ে যেতেই পাঁজরের উপর দ্রুত দুটো ঘুসি বসিয়ে দিল হুইলার। স্নায়ু বেয়ে মস্তিষ্কে আলোড়ন তুলল অসহ্য যন্ত্রণা। টালমাতাল অবস্থায় এক কদম পিছিয়ে এল ও, হাঁটু ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে—মুখ হাঁ করে ফুসফুসে বাতাস টেনে নেয়ার চেষ্টা করছে। এবার এগিয়ে এল হুইলার, সাডেনের মাথা নিশানা করে সর্ব শক্তিতে লাথি হাঁকাল। ঝাপটা মেরে পা-টা সরিয়ে দিয়েই তুরিং উঠে দাঁড়াল শেভলিন। এক হাতে হুইলারের প্যান্টের বেল্ট, অন্য হাতে শার্টের কলার জাপ্টে ধরল।

এমনিতেই গতির উপর ছিল বিশালদেহী লোকটা, দু’জায়গায় ধরে একটু চাড় দিতেই শূন্যে উঠে গেল সে। মাথার উপর দিয়ে তাকে ছুড়ে দিল শেভলিন। কাটা কলা গাছের মত হড়মুড় করে পপাত ধরণীতল হলো হুইলার। টলমল পায়ে পিছিয়ে এল সাডেন। দম ফেলবার সুযোগ পেয়ে শোকর করছে। আস্তে আস্তে আবার উঠে দাঁড়াল হুইলার।

বাঁ হাতে একটা স্কিন টাইট গ্লাভ পরেছিল শেভলিন। এবার ডান হাতেরটাও পরে নিল। এরই মধ্যে শার্টটা ছিড়ে ফালি ফালি হয়ে গেছে, টান মেরে টুকরোগুলো ফেলে দিল। তামাটে দেহে একটু নড়াচড়াতেই সাপের মত কিলবিলিয়ে উঠছে পেশী। সামনে পা বাড়াল সাডেন। দাঁত বের করে হাসল হুইলার। ‘এসো, বাছা, দেখি কেমন মারপিট জানো তুমি!’

একেকারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আঘাতে আঘাতে একে অপরকে জর্জরিত করে ফেলল ওরা। ঠোট ফুলে ঢোল হয়ে গেল হুইলারের, চোখের নীচে সৃষ্টি হলো বড়সড় একটা পুঁটুলি—চোখটা প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়। ওদিকে গালের চামড়া কেটে ফাঁক হয়ে গেল শেভলিনের, দরদর করে রক্ত বেরিয়ে আসছে অবিরাম। কেটে গেছে মুখের ভিতরেও।

আচমকা পিছিয়ে এল শেভলিন। হুইলারের কাঁধ জাপ্টে ধরে দিল এক হ্যাঁচকা টান। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে কিছু বুঝে উঠবার আগেই তার কিডনি বরাবর একটা ঘুসি চালিয়ে দিল ও।

পাহাড় টলে উঠল। এবার তুরিং বাঁ হাতের একটা ঘুসি হাঁকাল সাডেন পাহাড়ের মুখে। তারপর আরেকটা। পরমুহূর্তে শরীরের উপর বাঁ হাতের একটা ঘুসি বসিয়ে দিয়েই পেছন পেছন এগিয়ে দিল ডান হাতটা।

পিছিয়ে এসে এবার সতর্কভাবে হুইলারের চারদিকে ঘুরতে শুরু করল শেভলিন। বিশাল হাতজোড়ার নাগালের বাইরে থাকতে চাইছে। সীসের মত ভারি ঠেকছে পা দুটো, হাপরের মত ওঠানামা করছে বিশাল বুক। ক্লান্ত। তবু ঘুরছে। ঘুরবার উপরেই আচমকা সামনে বাড়ল ও, বাঁ হাতে চট করে আঘাত হানল হুইলারের মাথায়, তারপরই ডান হাত স্পর্শ করল তার শরীর। পুরো এক কদম পিছিয়ে গেল হুইলার। মাতাল ভালুকের মত এপাশ-ওপাশ দুলছে প্রকাণ্ড মাথাটা। আবার এগিয়ে গেল শেভলিন। দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ডান হাতের প্রচণ্ড এক ঘুসি

হানল ও, তারপর বাঁ হাতে, আবার ডান হাতে। দুর্বল হাতে পাল্টা আঘাত হানবার ব্যর্থ চেষ্টা করল হুইলার। খপ করে ক্লজিটা ধরে ফেলল শেভলিন। হিপ থ্রো করে ছুড়ে দিল লোকটাকে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল হুইলার। বাপসা হয়ে গেছে দৃষ্টি, সারা মুখে রক্তের প্রলেপ। হাত মুঠি পাকিয়ে আবার খুলল সে। তারপর ছুটে এল শেভলিনের উদ্দেশে। সামনে ঝুঁকে এগিয়ে গেল শেভলিনও। দু'হাঁটুতে পর পর দুটো লাথি ঝেড়ে দিল। পাল্টা লাথি মারবার চেষ্টা করল হুইলার। কিন্তু অসম্ভব মন্তর সে। সাডেনের কাঁধে লাগল লাথিটা, মাটিতে আছড়ে পড়ল ও। দ্রুত গড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে।

লাথি মেরে পড়ে গিয়েছিল হুইলার নিজেই, উঠে দাঁড়াল সে—বিধ্বস্ত বিশাল শরীর। পিছিয়ে এল সাডেন শেভলিন। 'খতম তুমি, হুইলার,' ফ্যাসফেসে গলায় বলল ও, 'গায়ে হাত তুলতে আমাকে আর বাধ্য করো না।'

'তুমিই মারপিট করতে চেয়েছ,' বলল হুইলার, 'এসো!'

'হেরে গেছ তো তুমি,' আবার বলল শেভলিন। 'এখন ইচ্ছে করলে তুলো ধুনো করে ছেড়ে দিতে পারি তোমাকে। কিন্তু কী লাভ হবে তাতে? শক্ত লোক তুমি, চতুরও বটে; কিন্তু মুখে একবার হাত দিয়ে দেখো, রক্তে লাল হয়ে গেছে।'

হাত দিয়ে মুখ ছুলো হুইলার, তারপর হাতটা মেলে ধরল চোখের সামনে। বিরক্তির ছাপ পড়ল চেহারায়ে। 'আরে,' বলল সে, 'ঠিক বলেছ তো!' মুখ মুছে সামনে দাঁড়ানো শেভলিনের দিকে তাকাল আবার। রক্তাক্ত চেহারায়ে টলছে—অতচ বিপদ মোকাবিলার জন্য তৈরি। 'তোমার চেহারাটাও কিন্তু দেখার মত নেই। চলো একটু ড্রিঙ্ক করা যাক।'

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে টলতে টলতে একসঙ্গে সেলুনে এসে ঢুকল দুজন। বড়সড় একটা বোতল থেকে দুটো গ্লাসে মদ ঢালল হুইলার, ঢালতে গিয়ে গ্লাস থেকে ছলকে পড়ে গেল বেশ খানিকটা। একটা গ্লাস তুলে নিল সাডেন। 'দুর্দান্ত এক লড়ুয়ের উদ্দেশে,' বলল ও।

গ্লাস তুলে নিয়ে ঠোঁটের অক্ষত অংশে এক পেশে হাসি হাসল হুইলার। একসঙ্গে সবটুকু মদ গলায় ঢেলে দিল ওরা। ইঠাৎ ঘুরে লুড ফেলারের মুখোমুখি হলো শেভলিন। 'তোমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো, লুড। কষ্ট দিয়ে জ্যাক ও'নীলকে ফাঁসিতে লটকে মারার চেষ্টা করছ, বেঈমানির চেষ্টা চালিয়েছ আমার সঙ্গে। আজ সন্ধ্যার পর যদি তোমার চেহারা আর দেখি, খুন করে ফেলব!'

কদর্যরূপ ধারণ করল লুড ফেলারের চেহারা। 'ওহ! খালি বড় বড় কথা!' নাক সিটকাল সে। 'সঙ্গে তোমার পিস্তলই নেই! ইচ্ছে হচ্ছে—' পিস্তলের বাঁটে হাত রাখল লুড

'মতলবটা খুব খারাপ, লুড,' বলল বিল কোফিন। 'মরার সাধ থাকলে অবশ্য ওটা বের করে দেখতে পারো। শেভলিনের কাছে পিস্তল না থাকলে কি, আমার আছে!'

কোফিনের দিকে চাইল লুড ফেলার। দরজা গলে ঘরে ঢোকা ম্লান আলোয় হিংস্র দেখাচ্ছে কোফিনের চেহারা। অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, হাত দুটো ঝুলছে, অথচ ঘাপটি মেরে বসে থাকা কৃগারের মতই তৈরি সে। দেখেই যা বুঝবার বুঝে নিল ফেলার। মুখ খিস্তি করে এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়াল, তারপর ঝটিতি বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

ধীরে-সুস্থে 'জে-ডট-ও'-র পথে রওনা হলো ওরা পথে দুবার থামতে হলো—কাহিল অবস্থা শেভলিনের। মারাত্মক কয়েকটা আঘাত হজম করতে হয়েছে ওকে। নিঃশ্বাস নিতে গেলেই সুচের মত বারবার কী যেন খচ করে বিধছে বুকে। বিল কোফিনের চোখে সতর্ক দৃষ্টি। 'ফেলার পিস্তল বের করলেই বোধ হয় ভাল হত, এক সময় তিক্ত কণ্ঠে বলল ও। 'যতক্ষণ বেঁচে থাকবে, বিপদ আসতে পারে তার কাছ থেকে। লোকটা আমাদের চিন্তায় ফেলে দিচ্ছে। ভীতু টাইপের লোক—কখনও মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস পায় না।'

বেশ কয়েক মাইল দূরে 'বিগ-বি' র‍্যাক্স। ট্রিপের অপেক্ষায় ঘরময় অস্থিরভাবে পায়চারি করছে ওঅট উইলিয়ামস। অনেকক্ষণ আগেই ফিরে আসা উচিত ছিল ওর। বাংক হাউসে মাতলামো করছে কাউহ্যান্ডরা—যখন তখন ঝামেলা বাধাতে পারে ওরা, এত মদ যে কোথেকে পায়! ট্রিপ থাকলে খুব একটা উদ্ভিগ্ন হত না ও। কিন্তু ওর একার পক্ষে এই বিশাল র‍্যাক্স আগলে রাখা অসম্ভব। কফি দিয়ে গেল মারিয়া। সময় যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। অবশেষে ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে আসতেই দরজার দিকে ছুটে গেল ওয়াট উইলিয়ামস। মেরি ফিরে এসেছে।

'ওহ, ম্যাম!' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল ওঅট। 'এতক্ষণে ফিরলে! বাঁচালে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। এদিকে ট্রিপ তো এখনও ফিরল না।'

'ব্যাংক হাউসে ক্রে মিলারও আছে নাকি?'

'না, বোধ হয়। কোথায় যেন বেরিয়ে গেল, ফিরতে দেখিনি।' অস্থির পায়ে এ জানালা থেকে ও জানালায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ওঅট উইলিয়ামস। 'খাবে নাকি এখন কিছু?' মেরিকে জিজ্ঞেস করল সে। 'শেভলিনের সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে আসতে রাজি হয়েছে ও। বিল কোফিনও থাকবে ওর সঙ্গে।'

ওঅটের জন্য এটা সুখবর। সাডেন শেভলিনকে সবাই জানে। আর বিল কোফিন সম্পর্কে তেমন কিছু না জানলেও, এটুকু জানে ওঅট, লড়াকু লোক সে কিন্তু এত বড় সুখবরও ট্রিপের জন্যে ওর উদ্বেগ কমাতে পারল না।

'এখানে কখন আসছে শেভলিন?' জানতে চাইল উইলিয়ামস।

'আগে লুইসারের সঙ্গে দেখা করবে ও। কথাবার্তা বলে লড়াই শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে নিরপেক্ষ থাকতে রাজি করাতে পারবে বলে ভাবছে সাডেন।'

'কিন্তু, ম্যাম, ট্রিপ গেল কোথায়? গতকাল মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না আমাদের এখানে ফেরত পাঠানোর কথা ছিল ওর, পাঠিয়েছে। তারপর শেভলিনের সঙ্গে দেখা করার কথা শেভলিনের সঙ্গে তোমার যখন কথা হয়েছে, তার মানে

ও কাজটাও করেছে। কিন্তু তারপর গেল কোথায়?’

ওঅটের কথা এখন আর ভাবছে না বব ট্রিপ-‘বিগ বি’-তে ফিরে যাবার কথাও নয়। মকিং বার্ড পাশে ট্রেইলের উপর মুখ খুবড়ে পড়ে আছে সে। তিনটে বুলেট ঢুকেছে ওর দেহে। মেলে দেওয়া হাতের কাছেই পড়ে আছে ওর পিস্তলটা।

পথের উপর পড়ে রয়েছে ট্রিপ, রক্তে ভিজে ক্রমশ গাঢ় বর্ণ ধারণ করছে শুকনো ধূসর বালি। গাছের পাতায় কাঁপন তুলে বয়ে যাচ্ছে মৃদু হাওয়া। কাছেই ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘোড়াটা, একটু পর পর ভীৰু চোখে পেছনে তাকাচ্ছে। রক্তের অচেতনা গন্ধে অস্বস্তি বোধ করছে। আস্তে আস্তে ঘন ঘাসের অরণ্যে ঢুকে একসময় ঘাস খাওয়ায় মনোযোগ দিল ঘোড়াটা। একটুও নড়ছে না বব ট্রিপ। হালকা হাওয়ায় নেচে উঠছে কেবল ওর জামা, গলায় প্যাচানো রুমাল।

ঠিক সূর্যাস্তের সময় সাডেন শেভলিন আর বিল কোফিন ওই অবস্থায় পেল ওকে। ইয়েলোজ্যাকেট থেকে ‘বিগ-বি’তে পৌঁছানোর সবচেয়ে সুবিধেজনক রাস্তাটা টোয়েন্টি টু মেসা হয়ে সোজা মকিং বার্ডের উপর দিয়ে চলে গেছে। সিকামোরের রাইস নামে একজন ক্ষুদ্র ব্যাধগর থাকে, সজির ক্ষেত, শিকার, আর বুনো ঘোড়া পোষ মানিয়ে কোনোমতে দিন কাটায়; বরাবরই নিরপেক্ষ লোক। তার ওখানেই ঘোড়া বদল করেছে ওরা। শেভলিনের বিধ্বস্ত চেহারার দিকে একবার তাকিয়ে ঘোড়া বদলে দিয়েছে রাইস-কোন প্রশ্ন করেনি। ‘স্ট্যালিয়নটাকে দেখে শুনে রেখো,’ বলে দিয়েছে সাডেন, ‘আবার ফিরে আসব আমি।’

তরতাজা ঘোড়ায় চেপে বেশ দ্রুত গতিতেই এগোচ্ছিল ওরা। দুজনেই জানে, এখন থেকে ঘটনার গতিধারা হবে দ্রুত। নষ্ট করবার মত এক মুহূর্ত সময়ও হাতে নেই। মকিং বার্ড পাশে পৌঁছানোর আগেই আঁধার হয়ে এল চারদিক। সামনে ছিল শেভলিন। আচমকা রাশ টেনে ধরল ও, হাতে উঠে এসেছে পিস্তল, তৈরি। ‘একটা ঘোড়া দেখতে পাচ্ছি সামনে,’ ফিসফিস করে বলল ও, ‘সওয়ারি ছাড়া।’

নিমেষে স্ক্যাবার্ড থেকে উইনচেস্টার বের করে নিল বিল কোফিন। ঘোড়ার পেটে স্পারের গুঁতো মেরে এগিয়ে এল সামনে। অ্যামবুশের আশঙ্কায় সতর্ক। ঠিক এই সময় একসঙ্গে ট্রিপকে দেখতে পেল ওরা। ‘ওই যে, একটা লোক পড়ে আছে।’ বলল বিল। লাফ দিয়ে নেমে পড়ল স্যাডল থেকে। এগিয়ে গেল মাটিতে শায়িত লোকটার কাছে, সঙ্গে সঙ্গে বিড়বিড় করে বলে উঠল কী যেন।

‘কে?’ ঘোড়া থেকে নামল শেভলিন।

‘ট্রিপ। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। এখনও বেঁচে আছে কীভাবে সেটাই আশ্চর্য!’

একটা ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল সাডেন শেভলিন। শুকনো ডালপালা ভেঙে একসঙ্গে জড়ো করে দ্রুত হাতে আগুন জ্বালল। বার্চ গাছের এক টুকরো বাকলে পানি নিয়ে বসিয়ে দিল আগুনে। তারপর কোফিনের সাহায্যে আহত ট্রিপকে ধরাধরি করে আগুনের কাছে নিয়ে এল। পানিটুকু ফুটতে শুরু করেছে

বইঘর, কম
ঘেরাও

ইতিমধ্যে। বিস্ময় ভরা চোখে বাকলটার দিকে চেয়ে রইল বিল কোফিন

‘আরে!’ বলল সে, ‘ওটা পুড়ছে না কেন? এমন অবাধ কাণ্ড তো দেখিনি কোনদিন!’

‘তাপটুকু পানিতেই শুষে নিচ্ছে,’ বুঝিয়ে বলল শেভলিন, ‘অগ্নিশিখাকে পানির স্তরের ওপরে উঠতে না দিলেই আর বাকল পুড়তে পারে না। এটা ইন্ডিয়ান কৌশল।’

দ্রুত হাতে কাপড় সরিয়ে ট্রিপের ক্ষতস্থান খুঁজে বের করল ওরা। সবকটা জখমই মারাত্মক। দুটো গুলি সোজা পেট ফুটো করে চলে গেছে, অন্যটা গেছে হৃৎপিণ্ডের একটু নীচ দিয়ে। দেখেই বুঝে ফেলল ওরা বব ট্রিপের বাচবার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

গরম পানি দিয়ে ক্ষতস্থান ধুয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল শেভলিন। একটু পরেই নড়ে উঠল ট্রিপ, আস্তে আস্তে চোখ মেলে চাইল। ‘সাডেন...’, বিড়বিড় করে উঠল সে, ‘...শেভলিন কোথায়...ওর সঙ্গে...দেখা...করতে...হবে...’

‘এই যে আমি, ট্রিপ,’ বলল সাডেন। ‘কে গুলি করল তোমায়?’

‘শেভলিন!’ গোঙানি বেরল ট্রিপের গলা দিয়ে। ‘শেভলিন! পালিয়ে যাও তুমি, শেভলিন...তোমরা সবাই...পালাও!...মিল-মিলার...আমাকে বলেছে...ও’নীল আর বেঁচে নেই...খুন...এবার...তোমাকে...মারতে আসছে...ওরা ...’

বিড়বিড় করে খিস্তি ঝাড়ল কোফিন। উবু হয়ে ট্রিপের মুখের কাছে কান এনে তাড়াতাড়ি অধৈর্য কণ্ঠে জানতে চাইল, ‘ঠিক জানো তুমি, ট্রিপ?’

‘স্ট্যাগ-স্ট্যাগ নিজ হাতে খুন করেছে তাকে।’

‘স্ট্যাগ,’ সোজা হয়ে দাঁড়ল বিল কোফিন। ‘তা হলেই হয়েছে। স্ট্যাগ ও’নীলকে মারতে গিয়ে থাকলে, সন্দেহ নেই মারা গেছে সে। তার মানে তুমি শেষ, সাডেন।’

‘আহা,’ আহত ট্রিপের পরিচর্যা করছে সাডেন। ‘অস্তির হয়ো না, ট্রিপ। সব ঠিক হয়ে যাবে।’

‘আমার কথা বুঝতে পারেনি তুমি,’ প্রতিবাদ বরল কোফিনের কণ্ঠে। ‘ও’নীল মারা যাবার পর তোমার আর কোন ক্ষমতা নেই। এবার পঙ্গপালের মত ধেয়ে আসবে ওরা। তোমাকে...আমাদের সবাইকে কুকুরের মত গুলি করে মেরে সাফ করে ফেলবে।’

‘হয়তো!’ দৃঢ় হয়ে চেপে বসেছে সাডেনের চোয়াল, চেহারা গম্ভীর। হঠাৎ ক্লান্তি অনুভব করছে। সাধ্যমত চেষ্টা করেছে ও, তবু শেষ পর্যন্ত বাঁচানো গেল না ও’নীলকে। এত ভাল একটা মানুষকে খুন করে ফেলল স্ট্যাগ হারভে।

স্ট্যাগ-কিন্তু এখনও অন্তত একটা কাজ করতে পারে ও। ‘নিজ হাতে স্ট্যাগকে খুন করব আমি,’ শাস্ত কণ্ঠে বলল সাডেন শেভলিন।

‘ততক্ষণ বেঁচে থাকলে।’ পায়চারি করছে কোফিন। ‘খোদা, সবাই ছুটে আসবে ওরা-আসল ফাইট শুরু হবে এবার!’

‘ক্রে মিলারই গুলি করেছে তোমাকে?’ ট্রিপকে জিজ্ঞেস করল সাডেন

ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে ট্রিপ। 'হ্যাঁ-অ্যাঁ' অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল সে। 'আমার জন্যে ভেবো না। আমি-আমি তো মারাই যাচ্ছি...তোমরা পালিয়ে যাও...সবাই!'

লম্বা একটা দম নেওয়ার চেষ্টা করল ট্রিপ, শেষ করতে পারল না।

শব্দহীন ঠোট নড়ে উঠল সাডেনের। 'চলে গেল একজন ভাল মানুষ, অবচেতনায় যেন ট্রিপের এপিটাফই উচ্চারণ করল ও। 'চলো, কোফিন। ওই র‍্যাঞ্চটায় আবার একা রয়েছে ওঅট উইলিয়ামস।'

'ওর পিস্তলগুলো নিয়ে নাও। লাগবে। রাইফেলটা আমি নিচ্ছি। বাড়ির দিকে রওনা করিয়ে দিচ্ছি ঘোড়াটাকে।'

আবার ঘোড়ায় চেপে বসল ওরা। ট্রিপের লাশ পেছনে ফেলে এগিয়ে চলল শীরবে।

ব্লাডি বেসিনের কাছে রিজটা পেরুনোর সময় কয়েক মাইল দূরে 'বক্সড-আর' র‍্যাঞ্চে আলো জ্বলতে দেখল ওরা।

'ওই যে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল কোফিন, 'তৈরি হচ্ছে ওরা।'

'কি হে, নিজেই না তখন লড়াই করতে চাইলে?' শুষ্ক কণ্ঠে বলল সাডেন

'তা হলে থাকছ তুমি?'

'নিশ্চয়ই।'

হাসল কোফিন। ওর মনের কথা বলেছে সাডেন। 'ধরে নাও, একজন পার্টনার পেয়ে গেছ,' শান্ত কণ্ঠে বলল ও। তারপর আবার যোগ করল, 'তুমি স্ট্যাগকে নাও, কিন্তু মিলারকে আমার চাই!'

আট

কংগ্রেস জাংশনেই জ্যাক ও'নীলের দেখা পেল স্ট্যাগ হারভে। রাশ জ্যাকসনের নির্দেশে ও'নীলকে খুঁজে বের করে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে এল পাসোর দিকে রওনা দিয়েছিল সে। জাংশনে পৌঁছেই দেখল একটা ক্যাটল ট্রেন থেকে নামছে তার শিকার। সাথে সাথে ঘোড়া থেকে নেমে প্ল্যাটফর্ম ধরে এগিয়ে গেল। ও'নীল টের পাওয়ার আগেই পৌঁছে গেল তার বিশ ফুটের মধ্যে।

'হাওডি, জ্যাক?' বলল সে।

চমকে ফিরে তাকাল ও'নীল।

এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করল না স্ট্যাগ হারভে। ও'নীলের পেট লক্ষ্য করে পর পর তিনবার ট্রিগার টিপল। প্রতি আঘাতে কেঁপে উঠল ও'নীলের শরীর দড়াম করে প্ল্যাটফর্মের উপর আছড়ে পড়ল, হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে। চোখের পলকে এগিয়ে এল স্ট্যাগ, লাথি মেরে সরিয়ে দিল হাতটা। তারপর ও'নীলের কপাল লক্ষ্য করে আবার টিপ দিল ট্রিগারে। বন্ধ হয়ে গেল ও'নীলের নড়চড়া

বইঘর কম
ঘেরাও

এবার ধীরে, সুস্থে স্বাভাবিক পদক্ষেপে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল স্ট্যাগ হারভে ফিরতি পথ ধরল বক্সড-আরের উদ্দেশে।

দাবানলের মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। ও'নীল মারা গেছে। সুতরাং এখন আর শেভলিনের কোন বৈধ ক্ষমতা নেই। ফলে এতক্ষণ যারা অপেক্ষা করছিল, এরপর আর খামোকা সময় নষ্ট করবার কোন কারণ দেখল না। একসঙ্গে হামলে পড়ল সবাই। খবর পেয়েই লোকজন জড়ো করতে শুরু করল রাশ জ্যাকসন। সবার আগেই পূর্ণ শক্তি নিয়ে 'জে-ডট-ও' রেঞ্জের পৌছুতে চায় সে। একবার ওখানে পৌছুতে পারলে বাকি সবাইকে নিজের ইচ্ছে মত শর্তে রাজি করানোয় কোন সমস্যা হবে না।

এলাকায় ম্যাককার্থির রাজনৈতিক প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তাকে নিয়ে বিন্দুমাত্র উদ্ভিগ্ন নয় জ্যাকসন। সরাসরি লড়াইতে নামবার চেয়ে কয়েক বর্গমাইল জমি পেলেই বরং সন্তুষ্ট থাকবে সে। ছইলারকে নিয়ে কিছুটা সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে ক্রে মিলার আর লুড ফেলার যখন আছে, লোকজন নিয়ে ওরাই সামলাতে পারবে তাকে। আসলে সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলছে ওকে উইলকক্স।

জ্যাকসনের 'বক্সড-আর' এবং 'জে-ডট-ও' রেঞ্জের মাঝামাঝি বেল মাউন্টেনেই লী উইলকক্সের নিবাস। এক দুর্বোধ্য চরিত্র এই লী উইলকক্স-চেহারা দেখে কারও পক্ষে তার বুদ্ধি বা ক্ষমতার পরিমাপ করা অসম্ভব। ঝোঁকের বশেই কাজ করে অভ্যস্ত-যুক্তির ধার ধারে না সে। এই লোক যদি একবার খুনের নেশায় মেতে ওঠে, মাত্র সাত দিনে রক্তসাগরে ডুবে যাবে পুরো এলাকা।

তবে বর্তমান পরিস্থিতি আপাতত সুবিধেজনক বলেই মনে হচ্ছে জ্যাকসনের কাছে। 'জে-ডট-ও' র‍্যাঞ্জে আস্তানা গাড়তে পারলে অনেক শক্তিশালী হবে ওর অবস্থান, ইচ্ছেমত নাচানো যাবে সবাইকে। বড় বড় দুটি র‍্যাঞ্জের লোকজন হাতে থাকায় অন্যদের নাস্তানাবুদ করা কঠিন হবে না।

'জে-ডট-ও' র‍্যাঞ্জে পৌছুল ক্রে মিলার। চারদিক ফাঁকা মনে হচ্ছে। ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে এক আধজন কাউহ্যান্ড। ওরা জানাল, সাডেন কিংবা লুড ফেলার কেউই র‍্যাঞ্জে নেই। কয়েকজন লোকসহ উত্তরে কাজে পাঠানো হয়েছে ফেলারকে, ফেরেনি এখনও। শেভলিনের সঙ্গেই বেরিয়ে গেছে বিল কোফিন।

সিগারেট রোল করতে করতে কিছুক্ষণ ভাবল মিলার। দুর্ধর্ষ লোক বিল কোফিন। সে শেভলিনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে থাকলে, ওদের টলানো কঠিন হবে। একা ওদের দুজনকে সামলাতে পারবে না ও। ঘোড়া ঘুরিয়ে দক্ষিণে নদীর দিকে রওনা হলো ক্রে মিলার, বক্সড-আরে যাওয়ার এটাই সবচেয়ে সহজ পথ।

বরাবরই কিছুটা স্ববিরোধী স্বভাবের মানুষ মিলার, একই সঙ্গে ভালমন্দের বাস। খুন করবার পর অনুশোচনা করা ওর ধাতে নেই। কিন্তু এই প্রথম বারের মত একটা খুন ভাবিয়ে তুলেছে তাকে। বব ট্রিপের হত্যাকাণ্ড। খুব ভাল ছিল মানুষটা। ট্রিপকে গুলি করবার পর থেকেই কিসে যেন তাড়া করে ফিরছে

মিলারকে-এক ধরনের অস্থিরতা। কিছুতেই মন থেকে উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। অথচ এর আগে কখনও এমন হয়নি। অনেক দিন আগে এরকম কিছু হবার কথাই বলেছিল এক বুড়ো। ‘বন্দুকে চালু হাত তোমার, ঠিক, কিন্তু একদিন দেখবে ভুল লোককে মেরে বসেছ এবং তারপর সারা জীবনেও আর স্বস্তি খুঁজে পাবে না।’

কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার আক্রমণে কুঁজো হয়ে গেছে মিলার। তেতো মনে নিকষ অন্ধকারের দিকে তাকাল সে। শীত যেন হঠাৎ করে বেড়ে গেছে আজ রাতে। হঠাৎ বক্সড-আরে ফিরে যাবার সব ইচ্ছে উবে গেল ওর। জ্যাকসনের লোভে চকচকে চোখ, স্ট্যাগ হারভের ভয়ঙ্কর চেহারা দেখতে মন চাইছে না আর।

‘বিগ-বি’তে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল সাডেন শেভলিন। বিল কোফিনের উদ্দেশ্যে বলল, ‘এখুনি এসপার-ওসপার হয়ে যাবে এখানকার লোকজনের সঙ্গে।’

দ্রুত পদক্ষেপে বাংক হাউসের দিকে এগিয়ে গেল ও। র‍্যাঞ্চ হাউসের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ওট উইলিয়ামস, বুঝতে পারল বিল কোফিন। ‘তুল্লি কিছু করতে যেয়ো না,’ বলল ও, ‘আমরা সামলাচ্ছি ওদের।’

এক ধাক্কা দরজা খুলে বাংক হাউসের ভিতরে পা রাখল সাডেন। তাকে অনুসরণ করল কোফিন।

মোট পাঁচজন কাউহ্যান্ড রয়েছে ভিতরে-অন্যরা কোথাও গেছে হয়তো। এদের একজন আবার বাঞ্চে শুয়ে নাক ডাকছে অবিরাম, মদে চুর হয়ে আছে। সাডেন ঢুকতেই মাথা তুলে তাকাল বাকি চারজন। চট করে ভিতরে ঢুকে ডান দিকে অবস্থান নিল বিল কোফিন।

‘এবার তোমাদের পালা,’ পরিষ্কার কণ্ঠে বলল সাডেন শেভলিন। ‘ও’নীলকে খুন করেছে স্ট্যাগ হারভে। মকিং বার্ডে বব ট্রিপকে গুলি করে মেরেছে ক্লে মিলার। এবার তোমরা কী করবে বলো। যদি আমাদের সঙ্গে থাকো-ভাল কথা! নইলে র‍্যাঞ্চ ছেড়ে ভাগো। আর সাধ থাকলে পিস্তল বের করতে পারো, দেখা যাক কজনের কাঁধে আজরাইল ভর করেছে!’

এক চুলও নড়ল না কেউ। এরা সবাই লড়াই করে অভ্যস্ত, সুতরাং বিপদ চিনতে ভুল হলো না। এ দুজনের সামনে সংখ্যায় বেশি হলেও কোন ফায়দা নেই। গানফাইট করতে গেলে অন্ততপক্ষে দু’চারজনকে মারা পড়তে হবে। এবং বেঘোরে প্রাণ খোয়ানোর ইচ্ছে নেই ওদের একজনেরও। সবার কাছেই মনে হচ্ছে, বুঝি তার দিকেই তাকিয়ে আছে শেভলিন।

‘তোমাদের কোন একজনের’ সঙ্গে লড়াইয়ের খুব শখ ছিল আমার,’ সহজ কণ্ঠে বলল কোফিন। ‘লাগবে নাকি কেউ-এখনই ফয়সালা হয়ে যেত!’

খোঁচা খোঁচা দাড়িঅলা টেকোমাথা খর্বাকৃতি এক কাউহ্যান্ড জবাব দিল, ‘আমরা চলেই যাব। ভয় পাইনি, কিন্তু খামোঁকা লড়াইও চাই না। আমাদের বন্দুকগুলো নিতে পারব?’

হেসে উঠল শেভলিন। ‘হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! নিরস্ত্র লোককে কখনও গুলি করি

বইঘর কম
ঘেরাও

না আমি; বলা যায় না, তোমাদের কাউকে খুনও করতে হতে পারে! তবে একটা কথা মনে রেখো, এরপর যদি তোমাদের কাউকে কপার ক্রিকের পুবে কিংবা ডেডম্যানের উত্তরে কখনও দেখি, দেখো, বন্দুকটা যেন হাতে থাকে।’

‘আমারও একই কথা,’ সায় জানাল কোফিন। ‘তবে এখনই কেউ পিস্তল বের করতে চাও নাকি? সাডেন বলছিল, তোমাদের সংখ্যা একটু কমিয়ে দেয়া দরকার। এই মুহূর্তে শুরু করতে রাজি আছি।’

কোফিনের দিকে তাকাল টেকো। ‘দাঁড়াও, শিগগিরই সাধ মিটবে তোমার, কত সাহস খুব জানা আছে!’

‘পরখ করে দেখতে চাও?’ উসকে দিতে চাইল কোফিন। ‘কিছু আগাছা উপড়ে ফেলা যেত তা হলে।’

কোন জবাব দিল না এবার টেকো। ছিপছিপে গড়ন, হালকা পাতলা এক কাউহ্যান্ড তাকাল শেভলিনের দিকে, পরনে অন্তর্বাস ছাড়া আর কিছুই নেই তার। ‘কাপড়চোপড় পরতে পারব?’ আপোষের সুরে জানতে চাইল সে।

‘এভাবেই তো বেশ লাগছে তোমাকে! বলেছি, যে যেভাবে আছ সেভাবেই বেরিয়ে যেতে হবে। জিনিস হারানোর জন্যে দুঃখ হলে সেজন্যে তোমরাই দায়ী।’

পাঁড় মাতালটাকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে বেরিয়ে এল ওরা। একে একে ঘোড়া তৈরি করে চেপে বসে যার যার ঘোড়া নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সবাই।

দরজায় দাঁড়িয়েছিল মেরি ব্ল্যাক। জানালার পাশে উইনচেস্টার হাতে ঘাপটি মেরে বসেছিল ওঅট উইলিয়ামস, উঠে বের হয়ে এল।

‘সাডেন, তুমি এসেছ! বড্ড চিন্তায় পড়ে গেছিলাম!’ প্রায় চোঁচিয়ে উঠল মেরি।

‘ববকে দেখলে পথে?’ তাড়াতাড়ি জ্ঞানতে চাইল উইলিয়ামস।

একটু ইতস্তত করল শেভলিন। এরা দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধ ছিল সে কথা ভারল একবার। তারপর বলল, ‘ট্রিপ আর ফিরবে না। মকিং বার্ড পাসে ওকে খুন করেছে ক্রে মিলার।’

বিড়বিড় করে উঠল ওঅট। ‘এই ভয়ই করছিলাম। খুব ভালমানুষ ছিল ট্রিপ।’ কাঁপা কাঁপা হাতে মুখ মুছল সে। ‘আটটি বছর একসঙ্গে কেটেছে আমাদের। ইশ, আমি যদি গানস্লিংগার হতাম!’

‘ভেবো না,’ আশ্বাস দিল কোফিন, ‘নিজ হাতে ও ব্যাটার চামড়া তুলে নেব আমি।’

ঘরে ঢুকে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল সাডেন শেভলিন। লড়াইয়ের সময় এভাবে বন্দী হয়ে থাকাটা ধাতে সয় না, আগে হাসলা চালানোই ওর স্বভাব। এসবের ভিতর মেয়েদের উপস্থিতিও ভাল ঠেকছে না ওর কাছে। সরাসরি পরিস্থিতির আসল রূপ মেরির কাছে ব্যাখ্যা করল ও। ‘এখন আর কোনরকম দ্বিধার অবকাশ নেই,’ কণ্ঠকে শান্ত রেখে উপসংহারে বলল, ‘সব শত্রুতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তুমি বরং কোথাও চলে যাও।’

‘তোমাদের একা ফেলে?’ প্রতিবাদ ঝরল মেরির কণ্ঠে, ‘কক্ষনো না!’

‘জেদ কোরো না, মেরি,’ বলল শেভলিন। ‘লড়াইয়ের সুবিধের জন্যে আমাদেরও হয়তো অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে হতে পারে। তখন অসুবিধেয় পড়ে যাব।’

রাইফেল হাতে বাইরে এল কোফিন। অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে র‍্যাক্স হাউস থেকে কিছুটা দূরে সরে গেল। বারান্দায় এসে দাঁড়াল ও’ট উইলিয়ামস, আগুন জ্বালান পাইপে। ট্রিপের কথা ভেবে বুকের ভিতরটা কেমন খালি খালি লাগছে। বব মারা গেছে, বিশ্বাসই হতে চাইছে না।

‘মেরি,’ শান্ত কণ্ঠে বলল সাডেন, ‘তুমি চলে গেলে আমাদের দুজনেরই সুবিধে হয়। রেডক্রিক কিংবা পুবে মরমনদের ওদিকে, যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো। ওখানে অনেকটা নিরাপদে থাকবে তুমি। এখানে তো নরক ভেঙে পড়ার অবস্থা হয়েছে।’

জিজ্ঞাসু চোখে শেভলিনের দিকে তাকাল মেরি। ‘ওদের সবার বিরুদ্ধে তুমি একাই-বা কী করবে? কী করার আছে তোমার? জ্যাক ও’নীলের, দেয়া ক্ষমতাও তো আর এখন নেই তোমার!’

কথাটা নিয়ে শেভলিন ভেবেছে। ও’নীলের মৃত্যুর ফলে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে ওর। কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় ও’নীলের রেঞ্জের এখন কোন বৈধ দাবিদার নেই। ও নিজেই অবশ্য দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কিন্তু সেজন্যে প্রয়োজন যথেষ্ট লোকজন। লোক যোগাড় করবার টাকা কোথায়?

আর লোক যোগাড় হলেও বিশাল শান্তিবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের মুখে বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব হবে না ওদের পক্ষে। ‘আমাদেরও যেতে হবে এখান থেকে,’ অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করল সাডেন। ‘বেরিয়ে পড়তে হবে। বেশিক্ষণ ওদের ঠেকিয়ে রাখার আশা করাই বোকামি; তবু আমি চেষ্টা করব। যদি ব্যর্থ হই, কেটে পড়ব।’

দরজায় এসে দাঁড়াল কোফিন। ‘এদিকে আসছে একদল রাইডার। আমরা এবার কী করব?’

দরজার দিকে এগিয়ে গেল সাডেন। ‘আবার বলছি, তুমি চলে যাও, মেরি। মারাত্মক বিপদ হতে পারে।’

‘তুমি পালিয়ে যাচ্ছ?’

শুষ্ক হাসি হেসে ঘাড় ফেরাল সাডেন। ‘গত কয়েক ঘণ্টার ভেতর এই নিয়ে দুবার শুনতে হলো প্রশ্নটা। না, পালাচ্ছি না। জ্যাক ও’নীলকে খুন করেছে এক লোক বিনা কারণে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আমার কাঁধে একটা দায়িত্ব এসে পড়েছে।’

ঘরের কোণে অবস্থান নিয়েছে বিল কোফিন, দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শেভলিন এগিয়ে যেতেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। ‘ওই পাথুরে কুয়ার পাশে ওত পেতে বসেছে ও’ট উইলিয়ামস। বেশ বড়সড় একটা দলই আসছে কিন্তু।’

‘ঠিক আছে। ওরা গুলি না করলে তোমরা গুলি ছুঁড়তে যেয়ো না। কিন্তু ওরা

একবার শুরু করার পর দেখো, তোমাদের একটা গুলিও যেন না ফস্কায়

‘ফস্কাতে যাবে কেন?’

ট্রেইল ধরে ধীর পায়ে সামনে এগোল সাডেন শেভলিন। থালার মত চাঁদ ভাসছে আকাশে, আলোয় ভেসে যাচ্ছে পাহাড় প্রান্তর। কাছাকাছি আসতেই গতি কমিয়ে আনল অশ্বারোহীরা। আরও সামনে বাড়ল শেভলিন। ‘ব্যস, থামো!’

থেকে গেল ওরা, প্রায় বিশজনের এক বিরাট দল। সবার সামনে রাশ জ্যাকসন। ‘তুমি সেই শেভলিন?’

‘নিশ্চয়ই। আর কাউকে আশা করেছিলে নাকি? জ্যাক ও’নীলকে হত্যা করেছে তুমি।’

একটু নীরবতা। তারপর জবাব দিল জ্যাকসন, কণ্ঠে চাপা আক্রোশ। ‘তো ও’নীল যখন মারা গেছে, বুঝতেই পারছ এখানে কর্ম কাবার হয়ে গেছে তোমার।’

‘সেভাবে দেখছি না আমি ব্যাপারটা,’ বলল শেভলিন। ‘ও’নীল বেঁচে থাকলে হয়তো আমাকে বরখাস্ত করতে পারত। কিন্তু সে মারা যাওয়ায় এখন আর সেটা সম্ভব নয়। একটা চাকরি নিয়ে এসেছিলাম এখানে, চাকরিটা যতক্ষণ আছে আমি থাকছি।’

‘গর্দভের মত কথা বোলা না!’ ফেটে পড়ল জ্যাকসন। ‘বিশজন লোক রয়েছে আমার সঙ্গে। এখনি জায়গাটা দখল করে নিতে পারি, জানো!’

‘পারবে না,’ শান্ত কণ্ঠে বলল শেভলিন। ‘আর যদি পারোও, বেশ কিছু লোক হারাতে হবে তোমাকে। তা ছাড়া,’ মুহূর্তের জন্য থামল ও, ‘আমি আবার ফিরে আসব।’

‘এখনই মারা যাও যদি?’

একটু চড়ল শেভলিনের কণ্ঠ; জ্যাকসনের সঙ্গে লোকদের উদ্দেশ্য করে বলল, ‘তোমরা সরে যাও। এসো, দেখা যাক কী রকম সাহসী তোমাদের নেতা জ্যাকসন, এই চ্যালেঞ্জ করছি তোমাকে। সঙ্গে যাকে ইচ্ছে বেছে নাও। চাঁদের আলোতেই তোমাদের দুজনের মোকাবিলা করব আমি। এসো, দেখি কত সাহস তোমার!’

আর যা হোক, দূর কল্পনাতেও এটা আশা করেনি জ্যাকসন। একেবারে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার! অনেক কিছু করবার ক্ষমতা থাকলেও শেভলিনের মত বিখ্যাত গানফাইটারের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস তার নেই। আরেকজনের সাহায্য নিয়েও নয়। খুব ভাল করে জানে সে, ওকে লক্ষ্য করেই ছুটে আসবে শেভলিনের প্রথম গুলি—এবং সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

আবার পশ্চিমের মানুষের কাছে সাহসী নেতৃত্বের গুরুত্ব কতখানি তা-ও জানা আছে ওর। কাপুরুষকে কখনোই নেতা হিসাবে মেনে নেয় না এরা।

সংকটজনক অবস্থাই বটে! কী করে এ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়? মনে মনে ফন্দি খুঁজতে শুরু করল জ্যাকসন।

‘ব্যাপার কী জ্যাকসন? ভয় লাগছে?’ টানটান কণ্ঠ সাডেনের। ‘অত চিন্তার কিছু নেই। এই মুহূর্তে হাত দুটোর অবস্থা খুব ভাল নেই, বলা যায় না, জিতেও

যেতে পারো। কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাইছে সাডেন, যাতে হামলাকারীদের উৎসাহে ভাটা পড়ে। 'কাল হুইলারকে টাইট দিতে গিয়ে বারটা বেজে গেছে ও দুটোর।'।

'কখন...কী দিয়েছে?'

পেছন থেকে জানতে চাইল একজন অশ্বারোহী। এতক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করছিল সে।

বাঁয়ে একটু পেছন থেকে কোফিনের কণ্ঠ ভেসে এল। 'হ্যাঁ, ফ্রেডস্, ভুল শোনোনি।' ঘটনাস্থলে নিজের উপস্থিতির কথা সবাইকে জানিয়ে দিল সে। 'সোজা আস্তানায় গিয়ে চ্যালেঞ্জ দিয়ে খালিহাতে তুলে ধুনো করে ছেড়ে দিয়েছে ও হুইলারকে। অবশ্য স্বীকার করতেই হয়, আবার বলল কোফিন, 'হুইলারও ছেড়ে কথা কয়নি।'

'শুনলে?' একজনকে বলল অন্য একজন অশ্বারোহী। 'শুনলে, খালিহাতে নাকি হুইলারকে পিটিয়েছে সাডেন শেভলিন!'

'ভারিছ, তোমাদের মরার সাধ জাগবে কখন,' স্বাভাবিক কণ্ঠে মন্তব্য করল কোফিন, 'এদিকে শটগানটা আর ধরে রাখতে পারছি না আমি।'

আসলে বিল কোফিনের কাছে রয়েছে একটা উইনচেস্টার। যথেষ্ট আড়াল নিয়ে থাকায় নলের গায়ে চাঁদের আলোর মৃদু প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রাইডাররা। সুতরাং ওদের বুঝবার কথা নয়, ওটা রাইফেল না শটগান। কিন্তু ওরা সবাই জানে, একটা কোল্ট রিভলবিং শটগানে চারটে গোলা থাকে, কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক এটার সামনে দাঁড়াতে চাইতে পারে না। অশ্বারোহীদের লড়াইয়ের উৎসাহ স্তিমিত করে দিতেই নির্জলা মিছে কথাটা ঝেড়ে দিয়েছে বিল কোফিন।

'হ্যাঁ,' কুয়ের কাছ থেকে ভেসে এল ওঅট উইলিয়ামসের গলা, 'তোমাদের গুলি করার জন্যে আমার হাতও নিশাপিশ করছে। এত কাছ থেকে স্পেনসারের একটা গুলিও ফস্কাবে না!'

চুপ করে রইল সবাই। কেটে গেল কয়েকটা দীর্ঘ মুহূর্ত। নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে জ্যাকসন। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও সবার মনোযোগ তার উপর থেকে সরে গেছে বলে মনে মনে স্বস্তি বোধ করছে। এখন কেন, কোনসময়ই শেভলিনের সঙ্গে মুখোমুখি গানফাইটে নামবার ইচ্ছে নেই তার। চ্যালেঞ্জটা কীভাবে এড়ানো যায় ভেবে পাচ্ছে না। পরিস্কার বোকা বনে যাবার ফলে মাথায় রক্ত চড়ে যেতে চাইছে। বুঝতে পারছে, হামলা চালানোর সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে ওর সঙ্গের লোকজন। শেভলিন একাই মহা বিপদ...তার উপর আছে আবার শটগান...শটগানের একটা গোলা কারও গায়ে লাগলেই হয়েছে...স্রেফ দুটুকরো করে দেবে। এটায় রয়েছে চার চারটে গোলা; কোফিনের নাগাল পাওয়ার আগেই আবার ওটা লোড করে নিতে পারবে সে অনায়াসে।

আর স্পেনসার পয়েন্ট ফাইভ সিক্সও যেমন তেমন কথা নয়!

'ঠিক আছে,' আচমকা সামনে পা বাড়াল শেভলিন ওদের ইতস্তত ভাবটা

ঠিকই আঁচ করে নিয়েছে। ‘আজ রাতের মত খেল খতম! র‍্যাক্স যদি দখল করতে চাও-কষ্ট করেই তা করতে হবে। নাও, এবার, ভাগো সবাই!’

কথা ফুটল জ্যাকসনের ঠোঁটে। ‘ঠিক আছে,’ সহজ কণ্ঠে বলল সে। ‘যাচ্ছি আমরা। কিন্তু সকালেই আবার আসব।’

‘কেন নয়, নিশ্চয়ই!’ মহাআনন্দে! হাসছে সাডেন! ‘তোমাদের সবকয়টাকে কবর দেয়ার জন্যে জায়গার অভাব হবে না এখানে!’

পেছনের অশ্বারোহীরা পিছুতে শুরু করল আস্তে আস্তে। সামনে এগোনের আত্মহ দেখা গেল না কারও মধ্যে। হতাশা আর ক্রোধ চেপে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওদের অনুসরণ করল জ্যাকসন।

ধীর পদক্ষেপে সাডেনের কাছে এগিয়ে এল বিল কোফিন। ‘এমন সুযোগ আর কখনও মিলবে না,’ বলল সে, ‘হাত দুটো একেবারে নিশপিশ করছিল!’

‘শটগানের কথা বলে একটা কাজের কাজ করেছ, বিল,’ বলল সাডেন।

প্রশংসা শুনে খুশি হয়ে উঠল কোফিন। ‘হঠাৎ মাথায় এল বুদ্ধিটা। অন্ধকারে শটগানের গুলি খাওয়ার সাধ হবে না আমারও।’

‘এবার?’ উইলিয়ামস এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। ‘ক্রে’র গলা শোনার অপেক্ষা করছিলাম আমি। কিন্তু এদের সঙ্গে বোধ হয় আসেনি সে।’

‘ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করব,’ বলল শেভলিন, ‘সূর্য ওঠার ঠিক আগ মুহূর্তে এখান থেকে সরে যাব আমরা।’

‘বলো কী!’ বলল কোফিন। ‘ওদের তো ঠেকিয়েই দিলাম তা হলে আর পালানো কেন?’

‘যে কোন যুদ্ধের,’ বলল শেভলিন, ‘মূল উদ্দেশ্য, প্রতিপক্ষের লড়াইয়ের শক্তি নষ্ট করে দেয়া। সংখ্যায় আর অস্ত্রশস্ত্রে বেশি হয়েও ওয়াশিংটনকে হারাতে পারেনি ব্রিটিশরা, কারণ বরাবরই ওদের খালি থলে ধরিয়ে দিয়ে কেটে পড়েছে সে। ঠিক এই জিনিসটা করতে যাচ্ছি আমরাও।’

‘যতক্ষণ আমরা বেঁচে আছি, এই দেশে আছি,’ বলল ও। ‘“জে-ডট-ও” কিংবা এই র‍্যাক্সের কোনটাই গিলতে পারবে না ওরা। আজ ছেড়ে দিচ্ছি ওদের হাতে, যখন ইচ্ছে কেড়ে নেব!’

নয়

রাত ফুরোতেই বেরিয়ে পড়ল ওরা। মারিয়াকে নিয়ে মরমন বসতিতে যাচ্ছে মেরি র‍্যাক। পরে, সম্ভব হলে, রেডক্রিকে যাবে ও, ওখানে গিয়ে র‍্যাক্স রক্ষার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করবে।

বিল কোফিন আর ওট উইলিয়ামসকে নিয়ে এবড়োখেবড়ো পাথুরে

ভেঙে দক্ষিণে এগিয়ে চলল সাডেন শেভলিন।

প্রখর তাপ ছড়াতে শুরু করেছে এখন সূর্য। বিরামহীন এগিয়ে চলেছে তিন আরোহী, পাহাড়ের গভীরতম প্রদেশে। খাবার এবং আর কিছু অতি প্রয়োজনীয় জিনিস বয়ে ওদের পেছন পেছন আসছে তিনটে প্যাক হর্স।

‘মেভেরিক স্প্রিংস,’ ওদের বলল উইলিয়ামস, ‘আমাদের জন্যে ও জায়গাটাই সবচেয়ে ভাল হবে। পাহাড়ের অনেক ভেতরে বন্ধুর এলাকা।’

ঘামে ভেজা মুখ মুছল শেভলিন। চোখ ছোট ছোট করে সূর্যের আলোর ভিতর দিয়ে পশ্চিমে তাকাল। এখানে মেসার উপর থেকে উপত্যকা আর নদীসহ বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একটু উত্তর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ‘টেবল মাউন্টেন’ কয়েকজন ঘোড়সওয়ার নদী পেরুচ্ছে দেখতে পেল ওরা।

‘লী উইলকক্স,’ জানাল কোফিন, ‘বোঝা যাচ্ছে সহজে কিছু হাত করতে পারবে না জ্যাকসন।’

‘জ্যাকসনের ব্যাগটা তো টেবল মাউন্টেনের ওপাশে ব্লাডি বেসিনে, না?’ চিন্তিত কণ্ঠে বলল শেভলিন। ‘রসদপত্রের একটা ব্যবস্থা করে তার সঙ্গে দেখা করতে যাব আমরা। কী বলো, রাজি?’

‘এই তো কথা ফুটেছে মুখে!’ উল্লসিত হয়ে উঠল কোফিন।

‘আমাদের রসদপত্র তিনভাগ করে আলাদা আলাদা জায়গায় রাখব। সবকটা ডিম এক ঝুড়িতে রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।’

‘রেযর ব্যাকের পেছনের ক্যানিয়নে নেমে এল ওরা। রসদের একটা অংশ লুকিয়ে রাখল সাইপ্রেস বাটের পাদদেশে এক গহ্বরে। তারপর দীর্ঘ পাইনের ছায়ায় ছায়ায় এগোল আবার, বেশ শীতল হাওয়া বইছে এখানে। নাকে লাগছে ঘাম আর ধুলোর গন্ধ। ধীরে-সুস্থে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে ওরা। কারণ কারও অনুসরণের আশংকা নেই আপাতত, তা ছাড়া তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ঘোড়াগুলোকে ক্লান্ত করে ফেলবার ইচ্ছেও ওদের নেই। বারবার জেব্রা ডান স্ট্যালিয়নটার কথা মনে পড়ছে সাডেনের। ঘোড়াটা ফিরিয়ে আনতে আরও কটা দিন অপেক্ষা করতে হবে।

অবশেষে অ্যাসপেন আর পাইনে ছাওয়া সংকীর্ণ একটা গ্লেনে এসে ঢুকল তিন অশ্বারোহী। হঠাৎ হঠাৎ এক-আধটা বিশালাকার ওয়ালনাট গাছও চোখে পড়ছে। এ মুহূর্তে ম্যাজটজালের কাছাকাছি কোথাও রয়েছে ওরা, টুলি মেসার উপর থেকে এদিকটা জরিপ করেছিল শেভলিন।

পরদিন সকাল। ট্যাভল ট্রিক ধরে ব্লাডি বেসিনে বক্সড-আরের সীমান্তে এসে পৌঁছুল ওরা। নজর রাখল কিছু সময়। বাবুর্চি ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেল না। র‍্যাক্সের উঠানে এসে ঢুকল তিনজন একসঙ্গে। রাইফেল হাতে দরজায় এসে দাঁড়াল বাবুর্চি। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল সাডেন।

‘জ্যাকসন কই?’

ঠিক পেছনেই ছিল বিল কোফিন, বাবুর্চিকে দেখেই ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে র‍্যাক্সে উঠে পিছন দিকে চলে গেল।

‘তা দিয়ে তোমার কাজ কী?’ ঝাঁঝিয়ে উঠল বাবুর্চি, ‘কে তুমি?’

‘শেভলিন।’ ঘোড়া থেকে নেমে ঘরের পেছন দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কোফিন। দেখল সাডেন। ‘জ্যাকসন এলে বোলো, আমি বলেছি “জে-ডট-ও” আর “বিগ-বি” থেকে যেন দূরে থাকে সে। নইলে কপালে খারাবি আছে।’

‘নিজে বলো গিয়ে!’ আরও কিছু বোধ হয় বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পেছন থেকে বন্দুকের তীক্ষ্ণ খোঁচা খেয়ে চুপ মেরে গেল বেচারী।

‘ধীরে সুস্থে বন্দুকটা নামাও দেখি,’ শান্ত কণ্ঠে বলল বিল কোফিন। ‘তোমার হাতে গুলি ফস্কাতে পারে, কিন্তু আমার ফস্কাবে না।’

একেবারে পরিষ্কার কথা, না বুঝবার কিছু নেই। গম্ভীর চেহারায় রাইফেল নামিয়ে নিল বাবুর্চি। এক হাত বাড়িয়ে ওটা কেড়ে নিল কোফিন।

‘আমাকে নিয়ে কী করবে?’ করুণ কণ্ঠে জানতে চাইল বাবুর্চি।

‘তোমাকে?’ হেসে ফেলল শেভলিন। ‘তোমাকে কি করব! তোমার সঙ্গে তো আমাদের কোন বিরোধ নেই। যাও, তুমি বরং কিছু খাবারের ব্যবস্থা করো আমাদের জন্যে। অনেক দূর থেকে এসেছি, তার ওপর অল্প একটু নাশতা করেছি সেই কোন ভোরে! জ্যাকসন ফিরে এলে আমরা যে এসেছিলাম জানিয়ে দিয়ো তাকে; আর এ-ও বলে দিয়ো, “জে-ডট-ও”-র দিকে হাত বাড়ালে এখানে এসে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সব ছারখার করে দিয়ে যাব-বাস্, তা হলেই হবে!’

‘মোট তিনজনে,’ অবহেলাভরে বলল বাবুর্চি লোকটা। ‘কোন সুযোগই পাবে না!’

‘বেশ তো,’ সপ্রতিভ কণ্ঠে বলল বিল কোফিন। ‘এসো, বাজি ধরে ফেলি। প্রাণ গেলেও তার আগে জ্যাকসনের কবরের ব্যবস্থা করব আমরা-ঠিক আছে!’

মহাখাপ্পা হয়ে আছে জ্যাকসন। লোকজনসহ ‘বিগ-বি’তে এসে র‍্যাক্সটা খাঁ খাঁ করছে দেখতে পেয়েছে সে। কোথায় যেন চলে গেছে সবাই। অথচ শেভলিন যতক্ষণ বেঁচে আছে, ‘বিগ-বি’ কিংবা ‘জে-ডট-ও’ দুটো র‍্যাক্সই ওদের সবার জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে-এই সহজ সরল কথাটা না বুঝবার মত নির্বোধ নয় সে।

ক্রে মিলার এসে পৌঁছুল। দাড়ি না কামানো রুক্ষ কঠিন চেহারা! দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেল জ্যাকসন। ‘শেভলিন কোথায় জানো?’

‘না।’ ক্লান্ত দেহে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল মিলার। ‘জানি না। জানার ইচ্ছেও নেই।’

‘ভয় পাচ্ছ?’ বাঁকা স্বরে বলল জ্যাকসন।

ঝট করে তাকাল মিলার, হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল জ্যাকসন।

‘না,’ আস্তে করে বলল মিলার, ‘তবে ব্যাপারটা মোটেই ভাল ঠেকছে না। আপাত দৃষ্টিতে ভাল মনে হলেও-আসলে তা নয়।’

স্নায়ু ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে মিলারের. বুঝতে পারছে জ্যাকসন একে উসকে দেওয়া ঠিক হবে না। ‘হয়েছে কি?’

‘মকিং বার্ড পাসে বব ট্রিপকে পেয়ে, বলল মিলার, ‘খুন করে ফেলেছি তাকে।’

‘ও।’ ট্রিপ লোকটা ভালই ছিল। কিন্তু এ কথাও ঠিক ‘বিগ-বি’ দখল করবার পথে কাঁটা হয়ে ছিল সে-ও।

‘এখান থেকে কেটে পড়েছে শেভলিন, বলল জ্যাকসন, ‘কোফিন আর উইলিয়ামসও আছে তার সঙ্গে।’

‘তা হলে দুর্গতি আছে আমাদের কপালে।’ মিলারের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ‘তারচেয়ে এসো সব ছেড়ে দিই, জ্যাকসন। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।’

‘ছেড়ে দেব!’ আবার তেতে উঠল জ্যাকসন। ‘মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? এমন একটা সুযোগ ছেড়ে দেব! যাকগে,’ জোর দিয়ে বলল সে, ‘এখন আর কেউ আমাদের ঠেকাতে পারবে না কেউ না!’

‘ঠিক। আমি ভাবছি,’ জ্যাকসনের দিকে চাইল মিলার, ‘ও’নীলের হত্যার জন্যে তোমার কপালে কী আছে!’

চট করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল জ্যাকসন। ‘আমি খুন করেছি নাকি?’

‘তোমার নির্দেশে হারভে করেছে। কিন্তু এবার? ও’নীলের বন্ধুর অভাব নেই, জ্যাকসন। ফিনিক্স কি টুসান, সব জায়গায় বন্ধু আছে ওর। খোজ-খবর নেবে ওরা প্রত্যেকে! ও’নীল একবার বলছিল, কী এক বিপদ থেকে নাকি ভার্জিল ইয়ার্পকে রক্ষা করেছিল সে। বিপদে আপদে সব সময় বন্ধুদের সাহায্যে পাশে এসে দাঁড়ায় ইয়ার্পরা; ডক হ্যালিডেকে কীভাবে সাহায্য করেছিল ওয়াইট ইয়ার্প-জানো তো!’

তুড়ি মেরে এসব উড়িয়ে দিতে চাইলেও ভিতরে ভিতরে ঠিকই শংকিত হয়ে উঠল জ্যাকসন। বাড়াবাড়ি হয়ে গেল কি? কিন্তু না বিচলিত হওয়ার সময় এটা নয়। ফিরে আসবার পথও বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই।

ভুরু কুঁচকে কথাটা একবার ভেবেই মন থেকে তাড়িয়ে দিল অস্বস্তিকর চিন্তাভাবনা। ‘শেভলিনের পিছু নেব আমরা। জলদি ধরতে হবে ব্যাটাকে।’

‘পিছু নেয়ার জন্যে ওরা বসে আছে ভেবেছ?’

মিলারের দিকে বিশাল মাথাটা ফেরাল জ্যাকসন। ‘কি বলতে চাও?’

‘আমার ধারণা, ও-ই আমাদের আগে হামলা করবে-ভয়ঙ্কর হামলা। অল্টার কথা ভুলে গেছ? আমি ভুলিনি। আমাদের চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর লোকদের ওখানে শায়েস্তা করেছিল সে।’

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ওরা। পেরিয়ে গেল কিছুটা সময়। দু’জনেই জানে, পিছিয়ে আসবার এখন আর কোন উপায় নেই।

হঠাৎ পেছনে আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জ্যাকসন। রাইফেল হাতে কাছে এসে দাঁড়িয়ে ওরই একজন কাউহ্যান্ড।

‘কারা যেন আসছে, বস্। অনেক কজন। বোধ হয় লী উইলকক্স

‘উইলকক্স,’ বিড়বিড় করে উঠল জ্যাকসন, ‘আরেক আপদ

হলদে বাকস্কিনে চেপে হাজির হলো দীর্ঘদেহী লোকটা। আচমকা ঘোড়া থামিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওর দিকে। ‘সময়মতই হাজির হয়েছ দেখছি, জ্যাকসন। ঠিক আছে, থাকো তুমি এখানে। “জে-ডট-ও”তে চললাম আমি।’

‘এখনও কিছু ঠিক হয়নি,’ কথা চালিয়ে গেল জ্যাকসন, “জে-ডট-ও” পুরোটা আর “বিগ-বি”-র একটা অংশ চাই আমার। এরপর বাকিটুকু নিতে পারো তুমি।’

মুচকি হাসল উইলকক্স। ভয়ঙ্কর হাসি। পিলে চমকে উঠল জ্যাকসনের। ‘সব ঠিক করে ফেলেছ, না? তা ম্যাককার্থির কী করবে?’

‘এসবে নেই সে।’

‘কথাটা তাকে গিয়ে বলে দেখো। ওকে ভাগ না দিয়ে পারবে না, জ্যাকসন, না হলে ও’নীলের বন্ধুদের কাছে মুখ খুলবে সে!’

কথাটা মানতেই হলো জ্যাকসনকে। সবকিছু কত সহজ ভেবেছিল সে। অথচ একশো একটা গেরো বেধে গেছে এখন। মিলারও তলে তলে কোন ফন্দি আঁটছে কি না কে জানে।

‘আপাতত “জে-ডট-ও”তে চলে যাও তুমি,’ লীকে বলল জ্যাকসন, ‘কে কোনটার কতটা পাবে পরে ঠিক করা যাবে।’

নড়ল না উইলকক্স। ‘ইচ্ছে করলে এখনই তো ফয়সালা করে ফেলা যায়!’

শিকারী কুকুর জ্যাকসন। আস্তে আস্তে চোখ রাখল সে উইলকক্সের চোখে। ‘এসব কথার কোন মানে নেই, উইলকক্স। নিজেরা নিজেরা ঝামেলা করে কী লাভ! তারচেয়ে এসো একটু আনন্দ করা যাক। লুড, হুইস্কির বাস্কেট একটু খোলো দেখি!’

বিশাল শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াল ফেলার। দ্রুত এবং মারাত্মকভাবে শেভলিন হুইলারকে আহত করবার ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বড়সড় একটা ধাক্কা খেয়েছে সে। কেউ কল্পনাও করতে পারেনি এমন কিছু ঘটতে পারে; অথচ তা-ই সম্ভব করেছে সাডেন। দুজনের ভিতর সাডেনই যে ক্ষিপ্ততর তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এবং আঘাত করতেও সে ওস্তাদ। বিশালদেহী হুইলার ঘুসিতে শেভলিনকে কাঁপিয়ে দিলেও পরাস্ত করতে পারেনি। জিতে গিয়ে নিজেকে অপরাধে প্রমাণ করেছে সাডেন শেভলিন। এরপর আবার চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেশ ছাড়বার নোটিস দিয়েছে ফেলারকে।

মারপিটের কথাটা লুড কাউকে না বললেও জানতে আর বাকি নেই কারও। হুইস্কি আধাআধি শেষ হতেই সেদিকেই মোড় নিল আলোচনা।

‘নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না আমি,’ বলে উঠল লুড ফেলার।

সবার চোখ স্থির হলো তার উপর। সামনে এগিয়ে এল মিলার। কৌতূহলী ‘নিজের চোখে দেখেছ?’

‘হ্যাঁ,’ বোতলে ছিপি আঁটতে আঁটতে বলল ফেলার। ‘হুইলারকে একদম শেষ করে দিয়েছে শেভলিন। বলতে পারো মাখন কাটার মত কেটেছে তাকে। কোন

সুযোগই পায়নি হুইলার।

ক্ষণিক নীরবতা। তারপরই ঠাণ্ডা একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ওরা।
'তোমাদের সঙ্গে যোগ দিলে আপত্তি আছে!'

চমকে তাকাল সবাই। পা ফাঁক করে ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সাডেন শেভলিন। মাথায় চওড়া কারনিশঅলা টুপির নীচ থেকে উঁকি দিচ্ছে সতর্ক সবুজ দুটি চোখ। ওর ঠিক পেছনেই ঘোড়ার পিঠে বসে আছে বিল কোফিন আর ওঁট উইলিয়ামস। 'বক্সড-আর' থেকে ছিনিয়ে আনা দুটো শটগান শোভা পাচ্ছে ওঁদের দুজনের হাতে।

রক্ত জমে লাল হয়ে গেল জ্যাকসনের চেহারা। 'তুমি? তুমি এখানে?' প্রায় চিৎকারের মত শোনাগল তার কণ্ঠ।

'দেখতেই পাচ্ছ।' একে একে সবার উপর চোখ বুলিয়ে লুড ফেলারের উপর স্থির হলো শেভলিনের দৃষ্টি। ফ্যাকাসে হয়ে গেল সাবেক ফোরম্যানের চেহারা। 'ভয় পেয়ো না, লুড। আমি এমনি এসেছি এখানে। তা ছাড়া দেশ ছেড়ে পালানোর সময় এখনও ফুরিয়ে যায়নি তোমার। তবে মনে রেখো, এরপর যেন তোমার চেহারা আমাকে আর না দেখতে হয়।'

'কী চাও তুমি?' কৈফিয়ত দাবী করল জ্যাকসন।

'কী চাই? কিছু না। দেখলাম মদের বোতল খুলছ তোমরা, তাই ভাবলাম একটু চেখে যাই।' আন্তে আন্তে জ্যাকসনের উপর স্থির হলো শেভলিনের দৃষ্টি। 'যাই বলো, উইনচেস্টারের নলের মাথায় তোমাকে কিন্তু দারুণ লাগছিল, জ্যাকসন।'

শেভলিনের দিকে চেয়ে রইল জ্যাকসন, প্রচণ্ড ঘৃণায় মাথায় রক্ত উঠে যেতে চাইছে। কিন্তু ভিতর থেকে কেউ যেন সতর্ক করে দিচ্ছে ওকে, তাড়াহুড়ো করতে যেয়ো না, গুলি খেয়ে বেঘোরে প্রাণ খোয়াতে হবে!

'মিলারকেও তাক করেছিলাম,' বলল শেভলিন, 'দু'চোখের মাঝখানে তাক করতে বেশ লাগছিল! গুলিই করে বসতাম হয়তো, কিন্তু আগে থেকে কথা দিয়ে রেখেছি যে!'

বুকের মধ্যে বাদ্য বাজছে ক্রে মিলারের। 'অ্যা-কাকে?'

'আমাকে, ক্রে,' ভয়ঙ্কর হাসি বিল কোফিনের ঠোঁটে। 'তোমাকে চাই আমি। আমার ধারণা, যতটা ভাবো, সিক্স-গানে ততটা চালু তুমি নও। মনে রেখো, আমি বব ট্রিপ নই। ওটা ছিল ঠাণ্ডা মাথায় খুন।'

কটমট করে কোফিনের দিকে তাকাল মিলার, কিন্তু পরমুহূর্তে দৃষ্টি সরিয়ে নিল সে। ওঁটের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই শিউরে উঠল তার শরীর। নম্র, ভদ্র, ধীর-স্থির ওঁটের চোখে তীব্র ঘৃণা জ্বলজ্বল করছে, আর কোনদিন যা দেখেনি সে।

'ট্রিপের সঙ্গে অনেকক'টা বছর একসঙ্গে কেটেছে আমার, ক্রে,' বলল উইলিয়ামস।

এগিয়ে এসে জ্যাকসনের হাত থেকে গ্লাসটা ছিনিয়ে নিল সাডেন। মদ ঢেলে

বইঘর কম
ঘেরাও

নিল আধগ্লাস পিছিয়ে এসে আবার তাকাল জ্যাকসনের দিকে। চুমুক দিল গ্লাসে। ‘তোমাকে আমি খুন করব, জ্যাক,’ শীতল কণ্ঠে বলল ও, ‘কিন্তু আজ নয়। আজ এমনি বেড়াতে এসেছি আমরা। কোফিনকে বলেছি, ও মিলারকে টাইট দিতে না! পারলে তোমাকে আজ মারব না আমি।’

একটু পিছিয়ে গেল শেভলিন। উইলিয়ামসের হাতে দিল গ্লাসটা, এক চুমুক খেয়ে কোফিনের হাতে পাচার করল সে ওটা। হাসল কোফিন, এক চুমুকে শেষ করে ফেলল বাকি মদটুকু। আবার সামনে এগোল শেভলিন। ঝুনঝুন বাজছে পায়ের স্পার। অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করতে হচ্ছে ক্রেকে, বুকের পাটা আছে ব্যাটার!

এদের চরিত্র ঠিকই আঁচ করতে পেরেছে শেভলিন, পশ্চিমে সুস্থ মস্তিষ্কের কোন লোক সশস্ত্র তিনতিনজন লোকের সামনে বন্দুকের দিকে হাত বাড়ানোর সাহস করবে না কিছুতেই। তবে একটা লোককে নিয়েই উদ্ভিন্ন শেভলিন-লী উইলকক্স। ঝুঁকি নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। ভাবতে ভাবতেই আড়চোখে কোফিনের দিকে তাকাল ও।

সতর্ক চোখে উইলকক্সের দিকে নজর রাখছে কোফিন। কোথেকে বিপদ আসতে পারে, জানে সে।

‘শোনো,’ বলল শেভলিন, ‘দুটো খুন নিয়ে হত্যালীলা শুরু করেছে তোমরা-ও’নীল আর বব ট্রিপ। দু’জনেই ভাল লোক ছিল। তবে তোমরা “বিগ-বি” আর “জে-ডট-ও” থেকে সরে থাকলে এখানেই সব খুনোখুনির সমাপ্তি ঘটতে পারে।’

‘ত এমন কিছু ভেবে থাকলে বলতে হবে,’ জবাব দিল জ্যাকসন, ‘আপাদমস্তক পাগল তুমি।’

‘এখান থেকে সরছি না আমরা,’ বলল উইলকক্স।

‘ঠিক আছে, তা হলে তোমরাও শুনে রাখো, কাল সন্ধ্যার আগেই র‍্যাক্স না ছাড়লে-তোমাদের বিপদ হবে। দেখামাত্র এক এক করে খুন করব সবাইকে!’

‘মাত্র দু’জন লোক নিয়ে খুব বড় বড় বুলি কপচাচ্ছ!’

‘পরখ করে দেখতে চাও, জ্যাকসন?’ টুপির নীচ থেকে জ্যাকসনের দিকে তাকাল সাডেন।

‘সময় আসুক।’

ঘোড়ায় চেপে বসল সাডেন। ‘বেশ, আমার যা বলার ছিল, বলে দিলাম, বাকি তোমাদের ইচ্ছে।’

আচমকা বন্দুক উঠে এল ওর হাতে। ‘গানবেল্ট খুলে ফ্যালো!’ চাবুকের বাড়ি পড়ল যেন সবার পিঠে। ‘ফেলে দাও-কোনরকম চালাকি নয়!’

একসঙ্গে বাকলসে হাত রাখল সবাই। খুলে পড়ল সবগুলো গানবেল্ট।

‘এবার,’ বলল শেভলিন, ‘ঘুরে দাঁড়াও!’ ঘুরে দাঁড়াল ওরা। শেভলিন আবার বলল, ‘নাও, দৌড়াও! সবচেয়ে পেছনে যে থাকবে তাকে শট গানের গোলা হজম করতে হবে!’

একসঙ্গে উর্ধ্বশ্বাসে সামনে ছুটল ওরা। ঘোড়া ঘুরিয়ে তিন আরোহী ফিরতি পথ ধরল।

ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে যেতেই দাঁড়িয়ে পড়ল জ্যাকসন। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল সে, ‘জলদি! ঘোড়া নিয়ে গিয়ে ধরো ওদের! জ্যান্ত বা মরা শেভলিনের জন্যে পাঁচশো ডলার!’

দশ

ব্লাডি বেসিন থেকে বেরুবার পর সবার সামনে চলে এল ওঅট উইলিয়ামস। মকিং বার্ড পাসের ট্রেইল না ধরে পশ্চিমে সোড়া স্প্রিংস ত্রিকো নেমে ছুট লাগাল সে। এদিককার খানা খন্দ সব তার নখদর্পণে; নির্দিধায় ওর উপর নির্ভর করে পিছু পিছু চলল শেভলিন আর বিল কোফিন। দ্রুত এগোচ্ছে ওরা। ঘোড়াগুলোকে ক্লান্ত না করে যতটা সম্ভব সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

হঠাৎ বাঁক নিয়ে একটা প্রাথুরে চাতালে উঠে এল উইলিয়ামস। খানিকক্ষণ এগিয়ে চলল ওটার উপর দিয়ে। তারপর একটা টিবি ডিঙিয়ে নেমে পড়ল আরেকটা ত্রিকো। ত্রিকটা শুকিয়ে গেছে এখন। ওদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ক্ষতবিক্ষত টারেট পিক-বহুদিন আগে কোণঠাসা অবস্থায় এখানে ফাঁদে ফেলা হয়েছিল অ্যাপাচি ইন্ডিয়ানদের।

‘উইলকক্সকে নিয়ে ভাবছি। নাছোড়বান্দা লোক, হাল ছাড়বে বলে মনে হয় না,’ শেভলিনের চিন্তার ধারা অনুসরণ করেই যেন বলে উঠল কোফিন, ‘বরং আরও খেপে ওঠার সম্ভাবনাই বেশি!’

‘হ্যাঁ, আমিও সেটাই ভাবছি।’

বলবার মত কিছু নেই ওঅট উইলিয়ামসের। তীক্ষ্ণ চোখে পাহাড়-পর্বত পরখ করে যদূর সম্ভব ট্রেইলের চিহ্ন গোপন করে পথ বেছে নেওয়ার চেষ্টা করছে সে অসীম সতর্কতায়। বেশ খানিকক্ষণ নীরবে এগোল ওরা। এক সময় বালুকাময় পাথরের তাক বেছে নিয়ে উল্টোপথ ধরল। গভীর বালুতে ট্রাকের ছাপ অন্যান্য বুনো ঘোড়া কিংবা গবাদি পশুর পায়ের ছাপের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

‘ম্যাককার্থির র‍্যাঞ্চ এখন থেকে কদূর?’ জিজ্ঞেস করল শেভলিন।

‘এই তো কাছেই।’ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওঅট। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কয়েক বছর বয়স কমে গেছে ওর। চোখের কোণে সূক্ষ্ম কৌতুক খেলা করছে, লক্ষ্য করল শেভলিন। এতদিনে যেন মনের মত একটা কাজ পেয়েছে লোকটা। যুদ্ধের স্মৃতি রোমন্থন করছে হয়তো। ‘যেতে চাও?’

‘নিশ্চয়ই। চলো একবার টু মেরে আসি।’

‘ওরা কিন্তু ধাওয়া করছে আমাদের,’ সতর্ক করল কোফিন।

‘জানি। তার মানে ম্যাককার্থির সঙ্গে দেখা করার এটাই শেষ সুযোগ।’

সৌভাগ্যক্রমে ব্যাঞ্চেই ছিল ব্যাংকার। কারা আসছে দেখতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল সে, অশ্বারোহীদের চিনতে পেরেই তার মুখের ভাব বদলে গেল ‘এখানে কেন এসেছ তুমি? এখুনি দেশ ছেড়ে পালাও!’

‘তা হলে তোমার খুব সুবিধে হয়, তাই না?’ ঘোড়া নিয়ে ওওটারিং ড্রাফের দিকে যাচ্ছে ওঅট উইলিয়ামস, দেখল শেভলিন। ‘কিন্তু কোথাও যাচ্ছি না আমরা, ম্যাক। থাকছি। লড়াই করেই টিকে থাকব আমরা।’

‘বোকামি কোরো না!’ রাগের চেয়ে বেশি উদ্ভিগ্ন ম্যাককার্থি। ‘বুঝ না কেন? তোমাদের কোন আশাই নেই। সারা দেশ খেপে আছে তোমাদের বিরুদ্ধে। এই খুনোখুনি দেখতে আর ভাল লাগছে না আমার। দয়া করে পালিয়ে যাও! টাকা লাগলে বলো, আমি দিচ্ছি।’

‘না,’ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল শেভলিন। কঠিন শীতল চোখে তাকাল ব্যাংকার ম্যাককার্থির দিকে। ‘আমাকে খোঁচাবে, আর আমি এমনি এমনি ছেড়ে দেব! দেশ ছেড়ে পালানোর প্রশ্নই ওঠে না। মরতে হয়, এখানেই মরব। কিন্তু বিশ্বাস করো, ম্যাক, অন্তত কয়েকটাকে নিয়ে যাব সঙ্গে।’

‘এসব কোন কথা হলো!’ উদ্ভিগ্ন ম্যাককার্থি। সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এল সে। ‘ভাল কথা, মেরি কোথায়? ওর কিছু হয়নি তো?’

‘মরমনদের ওখানে আছে। যতক্ষণ ওখানে থাকবে, বিপদের ভয় নেই।’

‘আর বব ট্রিপ?’

‘শোনোনি? ফ্রে মিলার মকিং বার্ড পাসে খুন করছে ওকে। মারা গেছে জ্যাক ও’নীলও।’

মাথা ঝাঁকাল ম্যাককার্থি। ‘তা জানি। ট্রিপের জন্যে খারাপ লাগছে। আসলে সময় থাকতে ও’নীলের উচিত ছিল সরে পড়া।’

ঘোড়ার উপর থেকে ব্যাংকারের দিকে তাকাল শেভলিন, চোখেই ওর মনোভাব ফুটে উঠেছে। ‘ম্যাক,’ সোজাসাপ্টা বলল ও, ‘চেহারা দেখলে তো ভালমানুষ বলেই মনে হয় তোমাকে; খামোকা একপাল কয়োটার সঙ্গে ঘুরছ কেন? একটা লোক মারা পড়তে যা দেরি, অমনি তার সর্বস্ব ছিড়েখুঁড়ে খেতে হামলে পড়েছ-আশ্চর্য!’

‘রয়ে সয়ে কথা বলো!’ জ্বতোর গোড়ালি দিয়ে একটা বাঁকরে আঘাত করল ম্যাককার্থি। ‘কোথেকে আসছ তোমরা?’

“বিগ-বি”। জ্যাকসন আর উইলকিন্সের সঙ্গে দেখা করে এলাম। কার পেছনে লাগতে চাচ্ছে একটু বুঝিয়ে দিয়ে আসতে গিয়েছিলাম। তোমার এখানেও সে কারণেই আসা, ম্যাক। কী বলছি, বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই?’

গ্র্যান্টি পাথরের মত কঠিন চোখে তাকাল ম্যাককার্থি ‘কীসের কী বুঝব? অত সহজে আমাকে ধাপ্পা দিতে পারবে না, সাডেন!’

‘আমি কখনও ধাপ্পা দেই না,’ শান্ত কণ্ঠে বলল শেভলিন শিউরে উঠল

ব্যংকার। 'যা সত্যি, তা-ই বলছি, ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছ-শেষ হয়ে যাবে তোমাকে দেশ ছাড়া করে ছাড়ব আমি!'

রাগে অন্ধ হয়ে গেল ম্যাক এগিয়ে এল সামনে কথা সরতে চাইছে না মুখে। 'তুমি!' চিৎকার করে উঠল সে, 'আমাকে দেশ ছাড়া করবে তুমি! তোমার মত ছিচকে গান শ্রিংগার! ফেরারী একজন আউট-ল ছাড়া আর কী তুমি! উল্টো তোমাকেই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ছাড়ব! আমাকে কথা শোনাতে এসো না, বুঝলে!'

'যা বলার বলে দিয়েছি।' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল সাডেন শেভলিন

'চলো যাই, সাডেন,' ওঅটের কণ্ঠে উদ্বেগ। 'খুব বেশি দূরে নেই ওরা।'

স্যাডলে নড়েচড়ে বসে ম্যাককার্থির দিকে চোখ ফেরাল শেভলিন। 'কী করবে, ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নাও। কিন্তু ভুল কোরো না আমার বিরুদ্ধে এখনও কিছু করোনি যখন, না করলেই ভাল করবে।'

তিনজন একসঙ্গে র‍্যাঞ্ছের উঠোন ছেড়ে বেরিয়ে গেল। পিস্তলের বাঁটে হাত রেখে বিস্মিত চোখে চেয়ে রইল ম্যাককার্থি। পাগল নাকি লোকটা! নিজে পালাচ্ছে, অথচ ভাব দেখাচ্ছে যেন সবাইকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে সে-ই! ব্যাটা...ক্রোধ স্তিমিত হয়ে এল ব্যাংকারের। পুরোনো দিনের কথা ভীড় করে এল মনে। একা, কারও কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য না নিয়েই অল্টায় পা রেখেছিল এই যুবক-ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল শহরটাকে।

অন্যান্য ঘটনার কথাও জানে ম্যাককার্থি। বছবার গিড ব্র্যাকের মুখে রাসলারদের গল্পটা শুনেছে। মাথা ঝাঁকিয়ে এসব চিন্তা দূর করে দিতে চাইল ও; তারপর আপনমনেই বলল, 'আরে, এ গর্দভটা তো মারা পড়বে!' কিন্তু নিজের কানেই ফাঁপা শোনালা কথাটা। গস্তীর চেহারায় ওদের গমনপথের দিকে তাকাল সে। আচ্ছা, সত্যি যদি জিতে যায় লোকটা? তা হলে? জবাবটা শেভলিনের কথাতেই রয়েছে: শেভলিন কখনও ধাপ্লা দেয় না। যা বলেছে করবেই সে।

কিন্তু তা কিছুতেই সম্ভব নয়। পুরো সপ্তাহটা সাডেন টিকে থাকবে কি না সন্দেহ! কয়েক মিনিট পর সদলবলে এসে হাজির হলো জ্যাকসন। ফলে বিশ্বাসটা আরও দৃঢ় হলো তার। কিন্তু রাতে ঘুমুতে গিয়েই আবার শেভলিনের চেহারা ভেসে উঠল মনের পর্দায়। শীতল সবুজ চোখজোড়া যেন চেয়ে আছে ওর দিকে-আতঙ্কে শিউরে উঠল ম্যাককার্থি।

পিছু ধাওয়া শুরু হয়েছে এবার। মরিয়া হয়ে উঠল তিন রাইডার। রাত নেমে আসতেই রাইসের কেবিনে পৌঁছুল ওরা। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে একবার ভিতরে তাকিয়েই আশ্তে আশ্তে দরজায় টোকা দিল সাডেন।

'কে?' ভিতর থেকে জানতে চাইল রাইস।

'শেভলিন। আমারটা সহ আরও দুটো ঘোড়া নিতে এলাম।'

দরজা খুলে বাইরে পা রাখল রাইস। কোফিন আর ওঅটের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকাল। 'ঠিক আছে। ঘোড়া নিয়ে ক্যানিয়ন ধরে পেছনে চলে যাও। একটা পুরোনো কোরাল আছে ওখানে-ঘোড়াগুলো কেউ দেখতে পাবে না

বইঘর.কম
স্বৈরাণী

আমি আসছি।’

কোরালে এসে ক্লান্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন, লাগাম খুলে তাজা ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে নিল ওরা। নিজের স্ট্যালিয়নের পিঠে জিন বসাতেই নাক দিয়ে গুঁতো মেরে আনন্দ প্রকাশ করল ঘোড়াটা। ‘আমাদের চেহারাও দেখোনি তুমি, বুঝলে।’ ব্যাপারটা রাইসকে বুঝিয়ে দিল শেভার্লিন।

শুকনো হাসি দিল রাইস। ‘বলতে হবে না, অবুঝ শিশু নই আমি। তোমরা সাবধানে থেকো।’

পিছিয়ে এসে কোরাল গেইট খুলে ধরল সে। এক এক করে বেরিয়ে এল ওরা। মাথা তুলে ওঅটের দিকে তাকাল রাইস। ‘দুটো জলজ্যান্ত নেকড়ে’র সঙ্গে যে পথ চলছে—সেটা জানো?’

হাসল উইলিয়ামস। ‘নিশ্চয়ই, সপ্রতিভ কণ্ঠে বলল সে, ‘কী বলব, রাইস, মনে হচ্ছে, পাকা পনেরো বছর বয়স কমে গেছে আমার। তা ছাড়া,’ আবার বলল ও, ‘কয়োটের সঙ্গে থাকার চেয়ে নেকড়ে’র সঙ্গে থাকা ঢের ভাল।’

চারদিন পর ক্লান্ত, বিধ্বস্ত চেহারা হয়েছে ওদের—কোটরের গর্তে আশ্রয় নিয়েছে একেক জনের চোখ। কাফপেন ক্যানিয়নে আশ্রয় নিল ওরা আগুন জ্বেলে ঘিরে বসল। পানি ফুটিয়ে কফি বানাল উইলিয়ামস। কোফিনের মাথায় রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ। ওরা প্রত্যেকেই অবসাদগ্রস্ত; ক্ষুধা আর পথচলবার পরিশ্রমে কাহিল। ঘোড়াগুলোর চেহারাও ওদের চেয়ে খুব একটা ভাল নয়।

‘নেকড়ে’র সঙ্গে পথ চলাটা কিন্তু সত্যি কঠিন, উইলিয়ামস,’ বলল সাডেন।

মুখ তুলে তাকাল ওঅট উইলিয়ামস। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বয়স্ক দেখাচ্ছে তাকে। ‘তবু ভাল লাগছে, সাডেন,’ নিচু কণ্ঠে বলল ও। ‘একটা জিনিসই চাই আমি এখন—প্রতিশোধ।’

‘সেজন্যে,’ শান্ত কণ্ঠে বলল সাডেন, ‘পরশু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। পুণ্য দিক হয়ে ধীরে সুস্থে ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিয়ে এবার আমরা ঘুর পথে “বক্সড-আরে” যাব।’

মাথা তুলে তাকাল বিল কোফিন। ওর লম্বাটে চেহারা আরও লম্বা দেখাচ্ছে; মুখটাকে মনে হচ্ছে গভীর একটা ক্ষতচিহ্ন।

‘পাল্টা আঘাত করতে যাচ্ছি আমরা,’ বলল সাডেন, ‘কঠিন আঘাত। লড়াই কাকে বলে ওদের শিখিয়ে দেব আমরা।’

‘এই তো কথার মত কথা!’ কর্কশ শোনাৎ বিল কোফিনের কণ্ঠস্বর ‘পালাতে পালাতে শেষ হয়ে’ গেলাম।’

ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে রাশ জ্যাকসন কাপড় পাল্টে আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে হামাগুড়ি দিয়ে চাদরের নীচে ঢুকে পড়ল সে পাশের ঘর থেকে লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে—তবে চড়া গলায় কথা বলছে না কেউ। নিজের জুতোজোড়ার দিকে বিষণ্ণ চেহারা তাকিয়ে আছে সে।

উৎসাহ আর উত্তেজনার ভিতর দিয়ে শেভলিনদের ধাওয়া করা শুরু হলেও বেশিক্ষণ তা টেকেনি। আস্তে আস্তে একঘেয়ে হয়ে গেছে কাজটা। কখনও বা বিপজ্জনক।

পিছু ধাওয়ার দ্বিতীয় দিনে দুই সঙ্গীসহ শেভলিনদের বাগে পায় ওরা। প্রচণ্ড লড়াই বেধে যায় ওদের মধ্যে। ফলে আহত হয় 'বক্সড-আরে'র দুজন রাইডার-এদের একজনের অবস্থা আবার সংকটজনক। শেভলিনদেরও একজন আহত হয়েছে-ক্লেফিন বলে ধারণা প্রকাশ করছে কেউ কেউ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আহত লোকটাকে সঙ্গে নিয়েই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় ওরা।

এর পরের দিন অন্তত দুবার ওদের ট্রেইল হারিয়ে ফেলে ওরা; কিন্তু তারপর দিন সকালে একেবারে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সব চিহ্ন। একনাগাড়ে বেশ কয়েক ঘণ্টার ব্যর্থ অনুসন্ধানের পর হাল ছেড়ে দিয়ে ক্লান্তদেহে 'বক্সড-আরে' ফিরে আসতে হয়েছে ওদের।

দুপা লম্বা করে দিয়ে ভাল করে চাদর মুড়ি দিয়ে শুলো জ্যাকসন। এদিকে আবার উইলকিন্সের ব্যাপারটাও সামলাতে হবে। 'জে-ডট-ও' র‍্যাঞ্জে গিয়ে শেকড় গেড়েছে টেবল মাউন্টেন র‍্যাঞ্জার। 'বিগ-বি'তেও একজন লোক পাঠিয়ে দিয়েছে সে। 'বক্সড-আরে'র লোকও অবশ্য আছে ওখানে। ওদিকে ম্যাককার্থিও নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লোক পাঠাবে, অনুমান করছে সবাই।

হঠাৎ চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠল জ্যাকসন। জানে না কতক্ষণ ঘুমিয়েছে। বুঝতে পারছে ঘরের বাইরে থেকে কোন শব্দ শুনেই ঘুম ভেঙেছে তার। কনুইতে ভর দিয়ে আধবসা ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে কান খাড়া করে শুনবার চেষ্টা করল সে। নাক ঝাড়ল বোধ হয় একটা ঘোড়া; দড়িতে টান পড়বার মৃদু শব্দ ভেসে এল; ছুটন্ত ঘোড়ার খুরে প্রচণ্ড শব্দ। ঘোড়া তাড়ানো হচ্ছে! -কে তাড়চ্ছে?

এক লাফে দাঁড়িয়ে পড়ল জ্যাকসন, হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি টেনে নিল জুতোজোড়া। পাশের ঘরে ফস করে জ্বলে উঠল একটা দেশলাইর কাঠি, আলো জ্বালল কেউ। পরমুহূর্তে একটা গুলি এসে ভেঙে চুরচুর করে দিল এ ঘরের লণ্ঠনের চিমনিটা। ঝন্ঝন্ শব্দে ভেঙে পড়ল জানালার কাচ।

প্রচণ্ড ক্রোধে লাফ দিয়ে রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল জ্যাকসন। কিন্তু ঠিক ওই মুহূর্তে জানালা গলে একটা বুলেট ছুটে এসে রাইফেলটার বাঁটের মাত্র ইঞ্চি খানেক তফাতে দেয়ালের গায়ে আঘাত করল। ঝট করে হাত সরিয়ে নিল সে। অন্যান্য জানালা দিয়েও ছুটে আসছে একের পর এক বুলেট। পাশের ঘরে, পেট মোটা চুলোয় এসে লাগল একটা বুলেট, বাড়ি খেয়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল ওটা ঘরময়। আচমকা ব্যথায় আতর্জনাদ করে উঠল একজন। তারপরই আবার ছুটে এল এক ঝাঁক বুলেট। রাইফেলটা খামচে তুলে নিল জ্যাকসন, জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। সাথে সাথে চৌকাঠে এসে লাগল একটা বুলেট। ছিটকে উঠল কাঠের গুঁড়ো, চোখে মুখে ছুঁচ ফুটল যেন। রাইফেল ফেলে দুহাতে মুখ ঢাকল সে। গালিগালাজের ঝড় বইছে দুটোটে।

আরও কিছুক্ষণ চলল গোলাগুলির ঝড় তারপরই হঠাৎ আলোর ঝলকানি

বইঘর, কম
ঘেরাও

দেখা গেল বাইরে জলে ঝাপসা হয়ে আসা চোখে তাকাল জ্যাকসন। অনেক কষ্টে জমানো খড়ের গাদায় আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে!

চিৎকার করে আবার রাইফেল তুলে নিল সে, ছুটে গেল বাইরে। অন্ধকার থেকে চিৎকার করে বলে উঠল একটা কণ্ঠ, 'লড়তে চেয়েছিলে না, জ্যাকসন? কেমন বুঝছ এখন?' কথাটা শেষ হতেই জ্যাকসনের পায়ের কাছে বিস্ফোরিত হলো একটা বুলেট, ফোয়ারার মত ছিটকে উঠল মাটি। কাচ ভাঙবার শব্দ ভেসে এল পেছন থেকে।

রাগে থরথর করে কাঁপছে জ্যাকসন। আঁধারের দিকে আন্দাজে গুলি ছুঁড়ে বার্নের দিকে দৌড়ে গেল সে। বাকিরাও এসে যোগ দিল তার সঙ্গে। এক ঘণ্টারও বেশি সময় যুঝল ওরা আগুনের সঙ্গে; বার্ন রক্ষার আশ্রয় চেষ্টা চালাল। পুড়ে ছাই হয়ে গেল পুরো দশ টন খড়।

ক্লান্তি আর অবসাদে ভেঙে পড়া শরীর কোনমতে বয়ে ঘরে ফিরে এল সবাই। কফি তৈরি হচ্ছে। 'হারামজাদাকে খুন করব আমি!' গর্জে উঠল জ্যাকসন, 'ফাঁসি যদি না দিয়েছি!'

জবাব দিল না কেউ। বসে পড়ল সবাই, হাঁপাচ্ছে। গত কদিনের কষ্টকর পরিশ্রমের পর এতক্ষণ ধরে আগুনের সঙ্গে লড়তে গিয়ে একেবারে পেরেশান হয়ে গেছে—অথচ এখনও ঘোড়াগুলোকে ফিরিয়ে আনবার কাজটা বাকিই রয়ে গেছে।

তেমন কেউ অবশ্য আহত হয়নি। ছিটকে ওঠা কাচের ঘায়ে সামান্য একটু কেটে গেছে একজনের গাল—ব্যস।

গানফাইটে আহত লোকটা উঠে বসল বিছানায়। 'শেভলিন ছাড়া,' বলল সে, 'আর কেউ না!'

'চুপ!' ফিরে তাকাল জ্যাকসন। 'একদম চুপ!'

সারা বাড়ির সবাই চুপ মেরে রইল। অবশেষে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল ফ্র্যাংক চেয। 'আমি,' বলল ও, 'বাইরে যাচ্ছি ঘুমুতে।' আন্তে আন্তে বেরিয়ে গেল সে। আরও দুজন অনুসরণ করল তাকে।

তাকিয়ে রইল জ্যাকসন, কঠিন চেহারা। অশ্রাব্য ভাষায় গাল পাড়ল সে। হতচ্ছাড়া শেভলিন!

আন্তে আন্তে একে একে ঘুমুতে চলে গেল সবাই। নিভে গেল বাতি। ইতিমধ্যে ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে পুবের আকাশ। ঝাপাৎ করে বিছানায় পড়ল জ্যাকসন—জানালা দিয়ে চেয়ে রইল ধূসর আকাশের দিকে। অন্তরের তিক্ততা রূপ নিচ্ছে ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসায়। এতক্ষণ পর্যন্ত নামমাত্র বাধা মনে হয়েছিল গানফাইটার লোকটাকে কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আরও বেশি কিছু।

এই বাধা ডিঙানোর একটা পথই খোলা আছে। স্ট্যাগ হারভেকে বলে পেশাদার কিছু খুনে যোগাড় করে লেলিয়ে দিতে হবে সাভেনের পেছনে—পেশাদার মানুষ শিকারী। উইলকক্স আছে, হয়তো ম্যাককার্থিও—চারপাঁচজন লোককে অনায়াসে লেলিয়ে দেওয়া যাবে শেভলিনের পিছে। শেভলিনের মাথার জন্য দরকার হলে মোটাসোটা একটা পুরস্কারও ঘোষণা করে দেওয়া যাবে

ক্লান্তদেহে বিছানা থেকে নোমে বেরিয়ে এল জ্যাকসন। ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপিয়ে চেপে বসল ওটার পিঠে। বার্ন থেকে গলা বের করে উঁকি দিল একজন কাউন্সিলর।

‘রেডট্রিকে যাচ্ছি! কাল ফিরব!’ চিৎকার করে তাকে বলল সে।

‘বক্সড-আরে’ সাডেনের হামলার কিছুক্ষণ আগে রেডট্রিকে পৌঁছেছে মেরি ব্যাক ঘটনা কোন দিকে গড়াচ্ছে জানতে না পেরে অধৈর্য হয়ে পড়ছিল ও-তাই আর দেরি না করে মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে স্টেজে চেপে এখানে চলে এসেছে। সকালে সবার আগে জিম ন্যারোজের সঙ্গে দেখা হলো ওর।

‘আরে, কী খবর!’ মেরিকে দেখে অবাক হলো ন্যারোজ, ‘আমি আরও শুনলাম, তুমি নাকি চলে গেছ।’

‘না, যাইনি, যাবার ইচ্ছেও নেই। আচ্ছা, সাডেনের সঙ্গে এর মধ্যে দেখা হয়েছে তোমার?’

‘না, তবে প্রচুর কথা কানে এসেছে। খাপার মত ওর পিছু ধাওয়া করেছিল জ্যাকসন। এইতো সেদিন রাতে ওদের মধ্যে একদফা ফাইটও হয়ে গেছে-সেয়ানে সেয়ানে লড়াই যাকে বলে! তা এখন কী করার কথা ভাবছ তুমি?’

ন্যারোজের দিকে তাকিয়ে হাসল মেরি। ‘নাশতা।’

‘চলো তা হলে। একসঙ্গেই সেরে ফেলি।’

রাস্তা পেরিয়ে কাফের দিকে এগোল ওরা দুজন। দরজার মুখেই দেখা হয়ে গেল ম্যাককার্থির সঙ্গে গভীর চেহারা মেরিকে একনজর দেখেই ন্যারোজের দিকে দৃষ্টি ফেরাল সে।

‘নতুন কোন খবর?’ জানতে চাইল

‘নাহ।’

দরজা ঠেলে কাফের ভিতর পা রেখেই থমকে দাঁড়াল ওরা। সাডেন শেভলিন, ওট উইলিয়ামস আর বিল কোফিন একটা টেবিলে বসে নাশতা করছে। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভরা ক্লান্ত চেহারা তিনজনেরই। মাথা তুলে একে একে তিনজনকে দেখল শেভলিন। মেরির উপর মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করে ম্যাককার্থির উপর এসে স্থির হলো ওর দৃষ্টি। কিছু বলল না।

‘মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছ তুমি,’ বলল ন্যারোজ।

‘ঝুঁকি নিয়েই আমরা অভ্যস্ত,’ জবাব দিল শেভলিন। ‘হুইলার এসেছিল নাকি শহরে?’

‘উঁহু তোমার হাতে মার খাওয়ার পর আর তার চেহারা দেখা যায়নি তা ওকে দিয়ে কী দরকার?’

‘শত্রুর সামনে তোমাকে সেকথা বলব ভেবেছ?’ বল শেভলিন।

লাল হয়ে গেল ম্যাককার্থির চেহারা। কিছু একটা বলবার চেষ্টা করল তার আগেই বাদ সাধল বিল কোফিন। ‘সাপ নিয়ে খেলতে গেলে ছোবল খাওয়ার ঝুঁকি সব সময়ই থাকে, ম্যাক।’

রাগী চেহারা এক এক করে ওদের তিনজনের দিকে তাকাল ব্যাংকার
‘শান্তিতে কি একটু খেতেও পারব না?’ অভিযোগ তার কণ্ঠে

মেরির দিকে চোখ ফেরাল সাডেন। ‘তুমি ফিরে এলে কেন?’

‘তোমাকে সাহায্য করতে

কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কেটে গেল ক্লান্তদেহে খেয়ে চলল সাডেন। ওয়েস্ট্রেস
এসে কফি ঢেলে দিয়ে গেল কাপে। কড়া গরম কফি, অমৃতের মত লাগল।

নতুন ব্যান্ডেজ লাগানো হয়েছে বিল কোফিনের মাথায়। ব্যান্ডেজ বাঁধবার
জান্যে রাতেই ঘুম থেকে জাগাতে হয়েছে জঁজ্বারকে ওদের সঙ্গে হালকা কণ্ঠে
রসিকতা করতে করতে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে সে।

‘কাগজে দেয়ার মত কোন খবর আছে নাকি, সাডেন?’ অবশেষে জানতে
চাইল জিম ন্যারোজ।

তাকাল শেভলিন লাল হয়ে আছে ওর চোখজোড়া। ‘নিশ্চয়ই।’ হঠাৎ হাসল
ও ‘লিখে দাও,’ ‘‘জে-ডট-ও’’ র‍্যাঞ্চার ম্যানেজার সাডেন শেভলিন কটা দিন ছুটি
কাটাতে গেছে পাহাড়ের কোলে। তবে শিগুগিরই হেডকোয়ার্টারে ফিরে আসছে
সে। উপত্যকার বেশ কজন নামীদামী লোকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতেই
আসবে সাডেন, অবশ্য তাদের মধ্যে ম্যাককার্থির নাম নেই।’

মুখ তুলে চাইল ম্যাককার্থি, রক্ত জমে উঠেছে চেহারা। কিন্তু সে মুখ
খুলবার আগেই ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এল বাইরে থেকে। তারপরই
কাঠের বারান্দায় বুটের শব্দ। দড়াম করে খুলে গেল কাফের দরজা।

খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে বেটি কনসিডাইন। ঘোড়া হাঁকিয়ে আসায় লাল হয়ে
গেছে চেহারা। দুচোখে উত্তেজনা।

‘সাডেন! পালাও!’ হাঁপাচ্ছে সে। ‘একদল লোক নিয়ে আসছে লী উইলকক্স
শহরের বাইরে জ্যাকসনও যোগ দিয়েছে তার সঙ্গে। জলদি পালাও, জলদি!’

গানবেল্ট ঠিক করতে করতে উঠে দাঁড়াল শেভলিন। সরাসরি তাকাল বেটির
দিকে, নরম হলো দৃষ্টি। ‘ধন্যবাদ,’ বলল ও, ‘অসংখ্য ধন্যবাদ।’

হতচকিত হয়ে গেছে মেরি ব্ল্যাক। একবার এর দিকে আরেকবার ওর দিকে
তাকাচ্ছে ওকে লক্ষ্য করছে জিম ন্যারোজ—ঠোটে মৃদু হাসি

এগার

ওরা বেরিয়ে যেতেই বেটির দিকে তাকাল মেরি ব্ল্যাক। ‘তোমাকে দেখে সত্যি
অবাক হয়েছি, বেটি, স্বাভাবিক সুরে বলতে চাইলেও কণ্ঠের তীক্ষ্ণতা গোপন
থাকল না। ‘‘তুমি তো এমনিতে শহরে আসো না; অন্তত এরকম সময় তো নয়ই।’’

মুচকি হাসল বেটি কনসিডাইন ওর মন আর এখন এখানে পড়ে নেই, ছুটন্ত

ঘাড়ার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে—বুঝতে পারছে ন্যারোজ মেরি দুজনেই। ‘না, বলল বেটি। ‘এমনি শহরে আসা আমার হয়ে ওঠে না। কিন্তু বন্ধু বিপদে পড়েছে দেখলে সব কিছু পাল্টে যায়—তখন আর নিয়ম মেনে চলার উপায় থাকে না।’

‘সাদেন শেভলিনকে চেনো, জানতাম না তো!’ বলল মেরি।

‘মাত্র একবারই কথা হয়েছে আমাদের।’

‘মোটো একবার?’ বিদ্রূপ মেরির কণ্ঠে। একটু উঁচু হয়ে আছে ওর চিবুক মনে মনে হেসে ফেলল জিম ন্যারোজ। প্রথমবারের মত মেরি ব্ল্যাককে ঈর্ষান্বিত হতে দেখছে ও—বেশ উপভোগ্য লাগছে ব্যাপারটা।

হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল বেটি। হাসল অপরূপ ভঙ্গিতে। ‘একবারই কি যথেষ্ট নয়?’

‘বোধহয়,’ কিছুটা আড়ষ্ট গলায় জবাব দিল মেরি। ‘আমি হলে কিন্তু আরও সাবধানে এগোতাম, বেটি। এসব ভবঘুরে পাঞ্চররা কেমন হয়, জানো তো?’

‘না-আ,’ মিষ্টি শোনালা বেটি কনসিডাইনের কণ্ঠ। ‘বলো শুনি, কেমন ওরা?’

রক্ত সরে গিয়ে শাদা হয়ে গেল মেরির চেহারা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গেল সে। ‘কী বলতে চাও?’ ধমকে উঠে জানতে চাইল, ‘কী বোঝাতে চাইছ?’

নির্ভেজাল বিস্ময় ফুটে উঠল বেটির চেহারা। ‘কই, কিছু না! সত্যি কিছু না, মেরি। তুমি আমাকে নিয়ে খুব উদ্ভিগ্ন মনে হলো, কথা শুনে ভাললাম, এসব ব্যাপারে তোমার বেশ অভিজ্ঞতা আছে!’

ঝট করে ন্যারোজের দিকে ফিরল মেরি। কিন্তু কিছু বলতে পারল না, তার আগেই ঘাড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল ওরা। দরজার বাইরে থেমে দাঁড়াল অন্তত দশ বারজন রাইডার। এক ধাক্কায় দরজা খুলে ভিতরে পা রাখল লী উইলকক্স। ‘কই, ওরা কোথায়? কোথায় শেভলিন?’

আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে লী উইলকক্সের দিকে তাকাল বেটি কনসিডাইন। শীতল দৃষ্টি। জবাব দিল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মেরি ব্ল্যাক। ক্রোধে জ্বলে উঠল লী উইলকক্সের চেহারা। বেটির দিকে এগিয়ে গেল সে। ‘তুমি!’ বলে উঠল চিৎকার করে, ‘এই মাত্র এসেছ তুমি। তোমার ঘোড়াটাই দেখলাম বাইরে, এখনও জিন চাপানো। তুমিই সাবধান করে দিয়েছ তাকে!’

‘যদি করেই থাকি, তো কী হয়েছে?’ দুচোখে আগুন ঝরিয়ে প্রশ্ন করল বেটি। ‘ভাল একটা লোককে তোমাদের মত একদল চোর-ছ্যাচোড়ের হাতে খুন হওয়ার জন্যে ছেড়ে দেব?’

ঢোক গিলল উইলকক্স। রাগে ক্রোধে কথা ফুটল না ঠোটে। ‘চোর?’ তীক্ষ্ণ আতর্নাদের মত শোনালা তার কণ্ঠ। ‘আমরা চোর? ওই-ওই-!’

‘হ্যাঁ, চোর।’ শান্ত কণ্ঠে বলল বেটি। ‘লী উইলকক্স, তোমাদের কারোরই “জে-ডট-ও” কিংবা “বিগ-বি”-র ওপর কোন বৈধ অধিকার নেই। অনেক আগে থেকে বসবাসকারী তোমাদের চেয়ে ভাল লোকেরা এতদিন চালাচ্ছিল ওগুলো! বছরের পর বছর এক পাল কয়োটির মত ঘুরঘুর করছিলে তোমরা ওদের চারদিকে যেই ওরা মারা গেল, অমনি ওদের এতদিনের পরিশ্রমে গড়ে তোলা

বইঘর, কম
ঘেরাও

র‍্যাঞ্জে খাবলা বসাতে হামলে পড়লে! একমাত্র লোভ ছাড়া আর কী কারণ আছে তোমাদের ওই র‍্যাঞ্জেগুলোতে হাত দেওয়ার? “জে-ডট-ও”-তে যদি কারও বৈধ অধিকার থেকে থাকে, সে হচ্ছে সাডেন শেভলিন।’

‘সাডেন!’ হিংস্র লী উইলকক্স, কণ্ঠে অবিশ্বাস ‘তার আবার কীসের অধিকার?’

‘ওর কাঁধে ছিল র‍্যাঞ্জেটার দায়িত্ব। ওটাই যথেষ্ট। অন্তত,’ বলল বেটি, ‘তোমাদের চেয়ে অনেক পোক্ত অধিকার এটা।’ হঠাৎ করে সুর পাল্টাল ওর কণ্ঠে। ‘কেন বোঝার চেষ্টা করছ না, লী? সময় থাকতে নিজের র‍্যাঞ্জে ফিরে যাও-যা আছে তাই নিয়ে সম্ভ্রষ্ট থাকার চেষ্টা করো? কী করছ এখনও বুঝতে পারছ না তোমরা!’

আরও সামনে এগিয়ে গেল উইলকক্স, আগুনের মত জ্বলছে দুচোখ। ‘তুমি-তুমি-!’ হাত তুলল সে।

‘উইলকক্স!’ গর্জে উঠল ন্যারোজ। জমে গেল উইলকক্স, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। একটা সিন্ধু-শটার বেরিয়ে এসেছে জিম ন্যারোজের হাতে। ‘আর এক পা বাড়িয়েছ কী খুন হয়ে যাবে!’

আগুন্তে আগুন্তে হাত নামিয়ে আনল উইলকক্স, নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছে। ‘তুমি এর মধ্যে নাক গলাতে এসো না,’ কর্কশ কণ্ঠে বলল সে।

‘তুমি বোধ হয় ভুলে গেছ, উইলকক্স, বেটি কনসিডাইনকে এখানে কী চোখে দেখে সবাই। ওর গায়ে হাত তুললে তোমার লোকেরাই খুন করে ফেলবে তোমাকে-স্রেফ লটকে দেবে! একটা ঘণ্টাও বাঁচতে পারবে না।’

‘আমি ওর গায়ে হাত তুলতে যাচ্ছিলাম, কে বলল!’ ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নিজেকে সামলে রাখল লী উইলকক্স। ‘কিন্তু ওভাবে কথা বলার অধিকার কে দিয়েছে তাকে?’

‘লোভের জায়গায় সাধারণ বোধশক্তি ফিরে এলেই বুঝবে, উইলকক্স, কত সত্যি ওর কথাগুলো। তা ছাড়া,’ আগুন্তে করে বলল ন্যারোজ, ‘কালকের কাগজেই এ খবরটা ছাপানোর কথা ভাবছি আমি।’

কুৎসিত হয়ে উঠল লী উইলকক্সের চোখজোড়া। ‘ছাপাও-তারপর দেখো, তোমার আর তোমার প্রিন্টিং প্রেসের কী দশা করি। ভেঙেচুরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেব! অনেক বাড়াবাড়ি করছ তুমি, বাছাধন! নতুন যুগ আসছে দেশে। যদি আমাদের মনমত চলতে না, পারো, হয় তোমাকে বদলে নেব, নইলে সোজা খুন করে ভাসিয়ে দেব, বুঝলে!’

এমনিতেই যথেষ্ট লম্বা ন্যারোজ, এখন আরও লম্বা দেখাচ্ছে তাকে। ‘চেষ্টা করে দেখতে পারো, লী, কিন্তু আমি হলে এমন কিছু করতে যেতাম না। কতগুলো জিনিস এদেশের মাটি সহ্য করবে না, মেয়েদের সঙ্গে অসদাচরণ আর কাগজের ওপর হামলা সেগুলোর দুটো।’

মেরি ব্ল্যাকের দিকে তাকাল উইলকক্স। কী যেন বলতে চাইল, তারপরই আচমকা ঘুরে দাঁড়াল, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে। একটু পরেই ছুটন্ত

ঘোড়ার খুরের আওয়াজ উঠল প্রধান সড়কে। চলে গেল ওরা।
'ধন্যবাদ, জিম,' বলল বেটি কর্নিসডাইন, 'আমাকে হয়তো মেরেই বসত
লী।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল ন্যারোজ 'এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে খুন করতাম
আমি। যদিও এর আগে কখনও খুন করিনি।'

'আর কিছু না হোক,' বলল বেটি, 'অনেকটা এগিয়ে গেছে শেভলিনরা। ওরা
আর নাগাল পাবে না।'

'হুম।'

জানালার কাছ থেকে সরে এল মেরি ব্ল্যাক। 'তুমি এবার কী করার কথা
ভাবছ, জিম। দেখো, ওদের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পোড়ো না। এখানে তো তুমি
একেবারেই একা!'

'একা?' মাথা নাড়ল ন্যারোজ। 'না, আমি একা নই। প্রয়োজনে শহরের
অন্তত এক ডজন লোক আমার পাশে দাঁড়াবে, ব্ল্যাকস্মিথ, রায়ান; শু মেকার,
জর্ডান-সবাই!'

মাত্র এক ঘণ্টা পর 'বক্সড-আরে' হামলার খবর এসে পৌঁছল রেডক্রিকে।
ক্রাফেতে বসে ন্যারোজের সঙ্গে আলাপ করছিল ম্যাককার্থি। 'বক্সড-আরে'র
কাউন্টাউ ফ্র্যাংক চেয এসে ঢুকল। ফ্র্যাংকের ধারাবিবরণী শুনল ওরা। দশটন খড়
পুড়ে নিশ্চিহ্ন! এখন প্রতিটন খড়ের দাম মাত্র পঁচিশ ডলার হলেও, শীত আসছে,
আকাশে গিয়ে ঠেকবে দাম।

রায়ান হাউসও গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে সাডেনরা! সংঘর্ষ শুরু হওয়ার
পর এখন যাচ্ছেতাই কাণ্ড ঘটে যেতে পারে যেকোন মুহূর্তে!

কফিতে চুমুক দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ফ্র্যাংক চেয।

কয়েকটা মিনিট কোন কথা বলল না। তারপর মন্তব্য করল, 'বুড়োটাকে রোধ
হয় এখন বেঁধে রাখার সময় হয়েছে। গোলাগুলির সময় তিড়িং বিড়িং করে
লাফাচ্ছিল! ভাবছি, শেভলিনের সামনাসামনি দাঁড়ালে কী অবস্থা হবে তার
কপাল ভাল যে লোকটা ঠাণ্ডামাথার খুনী নয়। তা না হলে এতক্ষণে খুন করে
ফেলত জ্যাকসনকে।'

'জ্যাকসন কী করতে যাচ্ছে এবার?' জিজ্ঞেস করল ম্যাককার্থি।

'গানমান আমদানি করছে। শেভলিনকে খুঁজে বের করে খুন করবে। লোক
জোগাড় করতে লাগিয়ে দিয়েছে স্ট্যাগ হারভেকে। শেভলিনের মাথার জন্যে এক
হাজার আর অন্য দুজনের জন্যে পাঁচশো ডলার করে পুরস্কার ঘোষণা করবে-হ্যাঁ,
পাঁচশো ডলার করে!'

'তা হলে আর রাখঢাক থাকছে না। এখানে একজন ইউএস মার্শাল নিয়োগ
করতে হবে দেখছি।'

উঠে দাঁড়াল ফ্র্যাংক চেয। 'সেটা করাই বোধকরি ভাল হবে,' বলল সে। 'তা
হলে যাই এবার।' আশপাশে চোখ বুলাল, তারপর আবার বলল, 'আমি ভাগছি।'

এসবের মধ্যে আমি নেই।

ফ্যাংক চেয়ের বিদায় অন্যান্য কাউন্সিলদের ভিতরেও অস্থিরতার বীজ বুনে দিল। ম্যাককাথির বহুদিনের পুরোনো দুজন কাউন্সিল বলা কওয়া ছাড়া, মজুরি না নিয়েই চাকরি ছেড়ে পালাল। একই ভাবে কেটে পড়ল লী উইলকক্সেরও দুজন কর্মী। এদিকে ওদের স্থান পূরণ করতে যাদের নেয়া হলো, পাঁচ পাঁচজনই গ্যানহ্যান্ড।

ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠছে শেভলিনের পিছু ধাওয়া। একে একে প্রায় সব ওয়াটার হোল খুঁজে বের করে পাহারা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাইসের কেবিনও আর নিরাপদ নয়, বুঝতে পারছে শেভলিন। নজর রাখা হচ্ছে ওটার উপর। এমনকী ক্যানিয়নের ভিতর দিকের কোরালের অবস্থানও প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বিরামহীন পাহারা দেওয়া হচ্ছে ওখানে। 'বক্সড-আরে' হামলার তৃতীয় দিনে লী উইলকক্সের টেবুল মাউন্টেন ব্যাঞ্চে চড়াও হলো শেভলিন। মাত্র দুজন লোক ছিল ব্যাঞ্চে। ওদের কষে বেঁধে ফেলল ওরা। উইলকক্সের ঘোড়াগুলো তাড়িয়ে দিল এদিক ওদিক, ভেঙে চুরমার করে দিল ওয়াটারিং ট্রাফ; পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিল কোরাল।

ক্রে মিলার আর ওয়াটারের মধ্যে গুলি বিনিময় হলো একবার। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো দুজনের গুলিই।

পিট স্ক্যাটলিন নামে এক ইন্ডিয়ান ট্র্যাকারের মুখোমুখি হলো বিল কোফিন। জ্যাকসনের মানুষ শিকারীদের সঙ্গে কাজ করছিল লোকটা। ট্র্যাকিং ব্যস্ত ছিল সে, হঠাৎ মাথা তুলে দেখল ঠিক সামনেই ঘোড়ার পিঠে বসে আছে বিল কোফিন! সাথে সাথে রাইফেল তুলে ধরল সে। কিন্তু ট্রিগার টিপবার আগেই ছুটে এল কোফিনের পয়েন্ট ফোর ফোরের বুলেট, ছিন্নভিন্ন করে দিল তার কণ্ঠনালী। এক ঘণ্টা পর লাশটা খুঁজে পেল তার সঙ্গীরা। লাশের পাশেই মাটির উপর বড় বড় হরফে লেখা:

মানুষ শিকারীদের ক্ষমা নেই।

যেমন কর্ম তেমন ফল।

এর পর পরই জ্যাকসনের দুজন গানহ্যান্ড মাতাল অবস্থায় রেডক্রিকের রেস্তোরাঁয় উল্টাপাল্টা গুলি ছুঁড়ে একজন লোককে আহত করল।

যথাসময়ে বের হলো ন্যারোজের পত্রিকা। বোল্ড টাইপে হেড লাইন:

উপত্যকায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক

অবনতি।। জ্যাকসন, উইলকক্স, ম্যাককাথির

অবৈধ জমি দখলের অপচেষ্টায় হত্যাকাণ্ডের

সূচনা।।

রাত নামতেই লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালাল গুজারা ন্যারোজের প্রেসে ভেঙে চুরমার করল একটা প্রিন্টিং মেশিন, জ্বালিয়ে দিল কাগজপত্র ঠিক সময়ে

ন্যারোজের সশস্ত্র উপস্থিতি পালাতে বাধ্য করল হামলাকারীদের। এবার পুরোপুরি খেপে উঠল সাংবাদিক। পরদিন সকালে আগুনের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া কাগজের কর্প ডাকযোগে গভর্নর, ইউএস মার্শাল, আর এল প্যাসো, সান্তা ফে এবং অন্যান্য পশ্চিমা শহরে পাঠিয়ে দিল।

যা হোক, উইলকক্সের হামলার পর শেভলিনের কাছ থেকে আর কোন খবর মিলছে না। সবাই বলাবলি করছে, ও নাকি আহত হয়েছে। স্ক্যাটলিনকে হত্যার বাহাদুরিটা শেভলিনকেই দিচ্ছিল সবাই: কিন্তু বিল কোফিন শহরে এসে সবার ধারণা পাল্টে দিচ্ছিল।

‘ভরদে’ স্যালুন বন্ধ হবে হবে, এমন সময় এসে হাজির হলো বিল কোফিন। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে সোজা বারে গিয়ে দাঁড়াল ও। ক্লান্ত চেহারায চোখজোড়া জ্বলছে। এক গ্লাস মদ গলায় ঢেলে ঘরের প্রায় আধডজন লোকের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ‘সবাই বলছে, স্ক্যাটলিনকে সাডেন মেরেছে। কথাটা ঠিক নয়। স্ক্যাটলিনকে মেরেছি এই আমি। ব্যাটা শেয়াল কুকুরের মত খুঁজছিল আমাকে: তো সোজা সামনে গিয়ে সুযোগ করে দিলাম হতচ্ছাড়াকে—কিন্তু ব্যাটা হেরে গেল!’

‘বিল, তুমি জলদি পালাও! ক্রে খুঁজে ফিরছে তোমাকে!’

‘আমাকে খুঁজছে? কই, সে কই?’

‘হোটেল’, বলল আরেকজন, ‘কিন্তু...তুমি...’ চুপ মেরে গেল লোকটা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ক্রে মিলার

তীক্ষ্ণ, রক্ষ দেখাচ্ছে মিলারের চেহারা। কুৎসিত চোখের দৃষ্টি। বোঝা যাচ্ছে, এতক্ষণ ধরে মদ গিলছিল, কিন্তু মাতাল হয়নি।

‘আমাকে খুঁজছ, বিল?’ ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ক্রে মিলার। ‘তুমি আসছ দেখে ভাবলাম দেখা করে যাই।’

‘নিশ্চয়ই। তোমাকেই খুঁজছি।’ বার থেকে সরে এল বিল কোফিন। ওর লম্বাটে চেহারা স্বপ্নাহার আর ঘুরে বেড়ানোর ক্লান্তিতে আরও শীর্ণ দেখাচ্ছে। কিন্তু বেপরোয়া হাসি খেলছে ঠোঁটে। ‘এখনই ঝামেলা মিটিয়ে ফেলা যাক, কী বলো?’

‘আপত্তি কীসের?’ বলতে বলতেই পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ক্রে। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় হাতে উঠে এল ওটা—বিল কোফিনের চেয়েও দ্রুত। প্রথম গুলিটা কোফিনের বেল্টের ঠিক উপর দিয়ে শরীরে ঢুকল, নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে এল বিল। আবার গুলি করল মিলার, কিন্তু ফস্কে গেল ওটা। ততক্ষণে পিস্তল উঠে এসেছে কোফিনের হাতে, হাত স্থির করে এবার পাল্টা গুলি করল ও। গুলির ধাক্কায় পাই করে একপাক ঘুরল মিলার। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল মেঝের উপর। এই অবস্থাতেই আবার ট্রিগারে টিপ দিল সে। কেঁপে উঠল বিল। এবার পিস্তলটা নিচু করে ধরল ও—পর পর দুবার টিপ দিল ট্রিগারে। দুটো গুলিই সোজা মাথায় গিয়ে ঢুকল মিলারের ধাক্কার চোটে ডিগবাজি খেয়ে মেঝেয় আছড়ে পড়ল সে। স্থির হয়ে গেল।

টলছে বিল কোফিন, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। টলতে টলতে দরজার

দিকে এগিয়ে গেল ও। বাইরে পা রাখতেই রাস্তার উল্টো দিক থেকে চিৎকার করে উঠল কে যেন, 'বিলের পাঁচশো ডলার পেয়ে গেছি!' পরমুহূর্তে একসঙ্গে গর্জে উঠল ছটা পিস্তল। দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ল বিল। আবার পিস্তল উঠে এল হাতে। হাঁটু কাঁপছে, প্রাণান্তকর চেষ্টায় লক্ষ্য স্থির করল সে। মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে—তারপরও পা স্থির করে দাঁড়িয়ে ট্রিগারে চাপ দিল। লাফিয়ে শূন্যে উঠে গেল এক খুনে, তারপর দড়াম করে মুখ খুবড়ে পড়ল রাস্তার উপর। আবারও ট্রিগার টিপল বিল কোফিন। পাল্টা জবাব এল শত্রুর তরফ থেকে। গুলির বৃষ্টি যেন! কিন্তু বেপরোয়া বিল, গুলি ভরে চলল নিজের পিস্তলে।

ফাঁকা জায়গায় এতগুলো খেয়েও লুটিয়ে পড়ল না ও। হাত স্থির করে ট্রিগার টিপল। একবার...দুবার। আতঁচিৎকার করে উঠল কেউ একজন। এবং তারপরই আরেকটা গুলি এসে কাঁপিয়ে দিল সোনালী চুলের যোদ্ধাকে। পড়ে যাচ্ছে ও, পড়ন্ত অবস্থাতেই আবার গুলি করল। দুপা শূন্যে তুলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল আরেক শত্রু।

হোটেল থেকে ছুটে বেরিয়ে এল ন্যারোজ। পেছন পেছন মেরি ব্ল্যাক আর বেটি। ম্যাককার্থি সহ শহরের লোকজন চারদিকে ভিড় করে দাঁড়াতে শুরু করল। ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এল স্ট্যাগ হারভে। 'পিছিয়ে যাও, সবাই!' গর্জে উঠল সে, 'ব্যাটা না মরে থাকলে শিগুগিরই মরবে!'

হারভের দিকে তাকাল ন্যারোজ। 'ভারদে' সেলুনের জানালা গলে বেরিয়ে আসা আলোয় কঠিন দেখাচ্ছে তাকে। 'ওকে ছেড়ে দাও।' বলল ও, 'যথেষ্ট হয়েছে!'

জুলজুল করে উঠল স্ট্যাগ হারভের চোখ, পরমুহূর্তে দৃষ্টি সরিয়ে নিল সে। ইতিমধ্যে ডাক্তার এসে গেছে, হাঁটু গেড়ে কোফিনের পাশে বসল সে। কেঁপে উঠল কোফিনের চোখ, তাকাল হারভের দিকে। হঠাৎ হাসি ফুটে উঠল মৃত্যুপথযাত্রী লোকটার ঠোঁটে। 'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' চাপা কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে উঠল সে। 'মরণ ঘনিয়চ্ছে তোমার, স্ট্যাগ! শেভলিনের কানে যাক না খবরটা—খুলি উড়িয়ে দেবে!'

'চোওপ!' গর্জে উঠল স্ট্যাগ হারভে।

দুর্বল হাসি হাসল বিল কোফিন। 'খারাপ না!' ফিসফিস করে আবার বলল ও, 'ক্লেকে শেষ করেছি। ওর সঙ্গে পেরে উঠব, ভাবতেই পারিনি।'

কোফিনের উপর ঝুঁকে পড়ল বারটেন্ডার। সাহসী লোকদের শ্রদ্ধা করে সে। 'শান্তিতে মরতে পারো, বয়,' বলল লোকটা, 'আরও দুটোকে খুন করেছ তুমি।'

কাঁপা কাঁপা হাতে ডাক্তারের বাহু আঁকড়ে ধরল বিল, 'শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ, ডাক্তার!' আস্তে আস্তে চোখের পাতা পড়ল। 'ক্লে এবং সঙ্গে আরও দুটো! সাডেনও এমন পারত কিনা সন্দেহ!'

উঠে দাঁড়িয়ে ন্যারোজের দিকে তাকাল ডাক্তার, 'বুঝছি না,' ফিসফিস করে বলল সে। 'গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে! এখনও বেঁচে আছে কীভাবে!'

বেটি কনসিডাইন এগিয়ে এল। 'ওকে আমার ঘরে নিয়ে চলো, ডাক্তার দুজন লোকের শক্তি ধরে ও শরীরে, এ যাত্রা হয়তো বেঁচেও যেতে পারে।'

দুপুরের আগেই সারা উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। মুখোমুখি গানফাইটে ক্রে মিলারকে শেষ করেছে বিল কোফিন। আহত অবস্থায় টালমাতাল পায়ে স্যালুন থেকে বেরুতেই ছয়জন গানম্যানের অ্যাম্বুশে পড়ে যায় ও। বুলেট বৃষ্টির ভিতর লুটিয়ে পড়বার আগে দুদুজন গানম্যানকে ঘায়েল করেছে। এগারটা গুলি হজম করে দিব্যি বেঁচে আছে এখনও।

‘ধাক্কাটা হয়তো শেষ পর্যন্ত সামলে উঠতে পারবে ও, বেটিকে বলল ন্যারোজ। ‘নর্থ ফিল্ড রেইডের সময় এগার বার গুলি খেয়েছিল কোলে ইয়ংগার, তারপরও বেঁচেছিল সে।’

‘হ্যাঁ,’ কথা শুনছিল বারটেভার; বলল সে, ‘ডালটনদের হামলার সময় কফিভিলে ছিলাম আমি। সেবার ঘোলটা গুলি খেয়েও এখনও নাকি বেঁচে আছে ইমেট।’

‘জে-ডট-ও’ রেঞ্জ জরিপ করতে গিয়েছিল সাডেন শেভলিন।

হোয়াইট রক মেসার কাছে একটা গিরিসঙ্কটে ওদের সাময়িক হাইডআউটে ফিরে আসতেই উদ্ভিগ্ন চেহারায ওর মুখোমুখি হলো ওঅট উইলিয়ামস। ‘বিলকে দেখলে কোথাও?’ জিজ্ঞেস করল সে। ‘গতরাতে আমাকে ঘুমের মধ্যে ফেলে রেখে চলে গেছে। কোথায় যাচ্ছে কিছু বলে যায়নি।’

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দাঁড়াল শেভলিন। চারদিনের গজানো দাড়িতে জঙ্গলে পরিণত হয়েছে ওর চেহারা। অনিদ্রার ফলে কোটরের গর্তে-বাসা বেঁধেছে চোখজোড়া। ‘নির্বোধটা,’ উদ্ভিগ্ন কণ্ঠে বলল ও, ‘লড়াই করতে গেছে! জলদি ঘোড়ায় জিন চাপাও! এখনি-রওনা দিতে হবে!’

‘না,’ বলল উইলিয়ামস। আগে বিশ্রাম নিয়ে নাও। এখনও যদি না মরে থাকে, তা হলে ঠিকই বেঁচে থাকবে বিল। কিন্তু এই অবস্থায় শহরে গেলে প্রথম যে দেখবে তার হাতেই মারা পড়তে হবে তোমাকে। ঘুমিয়ে শরীরটাকে তৈরি করে নাও।’

উত্তম পরামর্শ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমে তলিয়ে গেল সাডেন শেভলিন। ওর দিকে তাকিয়ে একবার মাথা ঝাঁকাল ওঅট উইলিয়ামস। তারপর রোদের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গিয়ে বড় বড় পাথরখণ্ডের আড়ালে বসে পড়ল ও। এখান থেকে গিরিসঙ্কটে ঢুকবার পথে নজর রাখতে পারবে। এখানে ওদের খুঁজে পাবার সম্ভাবনা খুবই কম; কিন্তু সম্ভাবনা-সম্ভাবনাই! ও নিজেও বড্ড ক্লান্তি বোধ করছে-অসম্ভব ক্লান্তি!

দূরে, নদীর কিনারে স্ট্যাগকে ইস্তিত করল একজন অ্যাপাচি। একটা ঘোড়া, বলল ইন্ডিয়ানটা, ‘একদম ক্লান্ত-এদিকে গেছে।’

‘ঘোড়াটা বিরাট?’ আত্মহের সঙ্গে জানতে চাইল হারভে

‘হ্যাঁ-অনেক বড়।’

শেভলিনের জেব্রা ডান স্ট্যালিয়নটা এদিককার যে কোন ঘোড়ার তুলনায় বিরাট। চিন্তিতভাবে হাত দিয়ে গাল ঘষল হারভে চকচকে কুঁতকুঁতে চোখ

দুটোকে আরও ছোট ছোট করে সামনের বিস্তৃত এলাকার উপর নজর বোলাল। প্রায় তিনমাইল দূরে মেসার ত্রিকোণ অবয়ব আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচু হবে জায়গাটা ডানে বাঁয়ে দুদিকে পুরো এলাকাই এবড়োখেবড়ো। ক্লান্ত একটা ঘোড়া নিয়ে এদিকে বেশি দূরে যেতে পারবে না কেউ। এবং সাডেন শেভলিনের মত ক্লান্ত একজন লোককে কোথাও না কোথাও বিশ্রাম নিতে থামতেই হবে। নিজের ট্রাইলও গোপন করবার চেষ্টা করবে না সে এ অবস্থায়।

‘মেসারটার বাঁ দিকের ক্যানিয়নগুলোতে টু মারিগে,’ বলল স্ট্যাগ হারভে, ‘একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়।’

ছ’মাইলের চেয়ে সামান্য কম দূরে, সূর্যের নীচে বসে আছে ওঅট উইলিয়ামস। ক্লান্ত। মিঠে রোদে ধীরে ধীরে ঢিল পড়ছে ওর ক্লান্ত পেশীগুলোয়। বুকে হেঁটে পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিল একটা র‍্যাটল স্নেক। পুকুরের ধারে পানি খাচ্ছে একটা হরিণ। সব স্বাভাবিক। একটু নড়েচড়ে বসল উইলিয়ামস। চোখ খুলল না।

বিশ্রাম পেয়ে বেশ ভাল লাগছে। রাতের হিমেল হাওয়ার পর মিঠে রোদে প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে এখন। ওঅটের চোখজোড়া একবার খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল...আবার খুলল...বুজল। বিল বা সাডেনের মত তরুণ নয় উইলিয়ামস। ছোটোছোটো শরীরের শেষ শক্তিকুকুও নিঃশেষ হয়ে গেছে ওর। আস্তে আস্তে চোখের পাতা চেপে বসল তার-তলিয়ে গেল ঘুমের অতলে।

বার

গাছপালায় ভরা এবড়োখেবড়ো পাহাড়ের গোলকর্ধাধায় চার অনুচর নিয়ে ঢুকে পড়ল স্ট্যাগ হারভে। একটা মেসার কিনারা ঘুরে কোকোনির্নো চূনাপাথরের উপর দিয়ে চলল কিছুক্ষণ, তারপর আবার নদীর দিকে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল।

বিরতিহীনভাবে ক্লান্ত অবসন্ন দুজন ঘোড়সওয়ারের সম্ভাব্য আত্মগোপনের জায়গাগুলো তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে চলল ওরা। মেসার আকাশ ছোঁয়া দেয়ালের উত্তরে অন্তত আধডজন গভীর ক্যানিয়ন আছে; পাহাড়ী বর্না থেকে বেরুনো চোয়ানো পানির বর্না বা সিপ রয়েছে এগুলোর প্রায় সবকটাতে। এসব সিপ থেকে অনায়াসে পানীয় জল সংগ্রহ করা সম্ভব।

সঙ্গে খাবার না থাকলেও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, বুনোজানোয়ারের অভাব নেই এখানে—হরিণ, এলক, ভালুক আর অসংখ্য পাখি। এর চেয়ে ভাল হাইডআউট আর হতে পারে না। কোনরকম তাড়াহুড়ো করছে না স্ট্যাগ হারভে। ঘোড়ার পিঠে উবু হয়ে বসে চারদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করছে। কোন সন্দেহ

নেই, পালানোর পথ খোলা রেখেই লুকোনোর জায়গা বেছে নেবে শেভলিন। কিন্তু লোকটা এখন ক্লান্ত, বেশি দূরে যেতে পারবে না; বিশ্রাম তাকে নিতেই হবে। এবং বিশ্রাম নিতে গেলে সতর্কতায় চিল পড়বে তার, চলে পড়বে ঘুমের কোলে। সুতরাং ধরতে চাইলে তাকে বিশ্রামের সুযোগ করে দিতে হবে—এগোতে হবে ধীরে-সুস্থে।

স্ট্যাগের একজন বিশ্বস্ত অনুচর কিলবার্ন সতর্ক চোখে নজর রাখছিল চারদিকে। ‘ফাঁদ, পাতার সেরা জায়গা,’ মন্তব্য করল সে। ‘শেভলিন ব্যাটা বড় চালু মাল।’

উত্তরের দুটো ক্যানিয়ন তল্লাশি করতে করতেই সূর্যাস্তের সময় ঘনিয়ে এল। এবার গোর্জ বলে পরিচিত মূল ক্যানিয়ন তল্লাশি করতে এগোল ওরা। সোজা প্রায় পূর্ব দিকে চলে গেছে ক্যানিয়নটা। বড়জোর আধমাইলটাক দূরত্ব পেরিয়েছে, হঠাৎ হাতের ইশারায় সবাইকে থামতে বলল এক ট্র্যাকার। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঘোড়ার পিঠে এখানে বর্না পেরিয়েছে কেউ।

রাশ টেনে ধরল সবাই। দেশলাইর কাঠি জ্বলে আগুনের ভিতর দিয়ে হারভের দিকে তাকাল কিলবার্ন। ‘কী মনে হয়, বেশি দূরে?’

সোজা সামনের দিকে তাকাল স্ট্যাগ হারভে। ‘ক্যানিয়নটা,’ বলল সে, ‘দু’মাইল পুবে গিয়ে হঠাৎ বাঁক নিয়েছে। আমার ধারণা ওদিকে, হোয়াইট রক মেসার ঠিক নীচেই পাওয়া যাবে ব্যাটারদের। খাঁজালা দেয়াল আছে সেখানে। জ্বালানি কাঠ কিংবা পানিরও অভাব নেই।’

‘আমরা,’ বলে চলল হারভে, ‘একসঙ্গে চুপচাপ এগিয়ে গিয়ে খপ করে ধরে ফেলব ওদের।’

হঠাৎ চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠল ওঅট উইলিয়ামস। কী করেছে ভেবে মাথা চাপড়াতে ইচ্ছে করছে। সূর্য ডুবে গেছে, তার মানে অনেকগুলো ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে ঘুমের ভিতর। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াতে গিয়েই স্নেফ বরফের মত জমে গেল ও। মাত্র ষাট গজ দূরে সদলে দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যাগ হারভে!

একই সময়ে ওকেও দেখে ফেলল ওরা। নিমেষে উঠে এল কিলবার্নের বন্দুক। আগুন ঝারাল। পাথরের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। ঝটকা মেরে রাইফেল তুলে নিল উইলিয়ামস। টিপে দিল ট্রিগার। এক গুলিতেই দফা রফা হয়ে যেত হারভের। কিন্তু দুর্ভাগ্য, গুলি করবার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরিয়ে লাফিয়ে উঠল হারভের গেল্ডিং। সোজা ঘোড়াটার দুচোখের মাঝখানে গিয়ে ঢুকল ওঅটের বুলেট। দড়াম করে আছড়ে পড়ল ঘোড়াটা। মুহূর্তের জন্য কী ঘটেছে বুঝতে না পেরে দ্বিধায় পড়ে গেল সবাই। কিন্তু সবার আগে সামলে নিল কিলবার্ন, গুলি করল আবার। পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ল ওঅট। গড়িয়ে উপুড় হলো ও, গিরগিটির মত বুকে হেঁটে আশ্রয় নিল একটা বোল্ডারের আড়ালে।

গুলির শব্দে গভীর ঘুম থেকে আচমকা জেগে উঠল শেভলিন। লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই বাঁপ দিল পাথরের আড়ালে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে। তারপরই

বইঘর, কম
ঘেরাও

বুঝতে পারল অন্তত শ'খানেক গজ দূরে চলছে গুলি বিনিময়। দ্রুত হাতে ঘোড়া দুটোতে জিন চাপিয়ে লাগাম পরিয়ে ফেলল। তারপর রসদপত্র চাপিয়ে বেঁধে নিল ওগুলোর পিঠে। মুহূর্তের নোটিসে পালাবার জন্য আগে থেকে সব কিছু তৈরি ছিল বলে এত কিছু করতে মিনিট খানেকের বেশি সময় লাগল না।

পেছন থেকে আবার গুলির শব্দ ভেসে এল। বুঝতে পারল সাডেন, ঠিকমতই মোকাবিলা করেছে ওঅট উইলিয়ামস। কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যাবে না শত্রুদের। রাত নেমে আসছে বলেই রক্ষা। ঘোড়াগুলোকে দাঁড় করিয়ে রেখে শাখা ক্যানিয়ন ধরে মূল ক্যানিয়নের উদ্দেশ্যে রাইফেল বাগিয়ে ধরে ছুটল ও। বেরিয়ে এসেই দেখতে পেল ওঅটকে। উদ্যত রাইফেল হাতে কতগুলো বোল্ডারের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে আছে বয়স্ক লোকটা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর পিঠ—ক্রমে লাল হয়ে উঠছে গায়ের পোশাক।

এক নজরেই বুঝে ফেলল সাডেন, মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে।

হামাগুড়ি দিয়ে ওর পাশে চলে এল শেভলিন। ‘নোড়ো না এখান থেকে, পার্টনার,’ ফিসফিস করে বলল ও।

যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেছে ওঅটের চেহারা। ‘ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!’ লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চাইছে যেন লোকটা।

হাসল শেভলিন। ‘জেগে থাকলেও ওদের দেখতে পেতে না।’ মাথা জাগিয়ে তুলল সেই অ্যাপাচিটা। চোখের পলকে গুলি করল সাডেন। কাঁধে আগুন জ্বালিয়ে দিল লোকটার। ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল এবার শত্রুপক্ষ।

ওঅটের দিকে তাকাল সাডেন। মারাত্মকভাবে আহত হলেও এখনও চলৎশক্তি হারায়নি সে। ‘ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে রেখে এসেছি আমি,’ বলল সাডেন, ‘হামাগুড়ি দিয়ে চলে যাও, পারলে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে থাকো!’

শেভলিনের কথামত ত্রল করে এগিয়ে গেল ওঅট।

হঠাৎ একটু বাঁয়ে সরে এল সাডেন, ট্রিগারে টিপ দিয়েই আবার চলে এল আগের অবস্থানে। এবং আবারও গুলি করল ও। ধূর্ত এবং ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে অসংখ্য লড়াইয়ের অভিজ্ঞতায় পোড়খাওয়া সাডেন জানে, ওদের বাঁচবার সম্ভবনা কত ক্ষীণ। শত্রুপক্ষ ব্লাডহাউন্ডের মত হিংস্র। পাল্লা দিয়ে পিছু নেবে ওরা। সুতরাং, ওদের কোন সুযোগ দেওয়া ঠিক হবে না।

হঠাৎ ওর কাছেই একটা পাথরে আঘাত করল ছুটে আসা গুলি। কোথেকে গুলি করা হয়েছে দেখল সাডেন। প্রায় খাড়া পাহাড়ী ঢালের উপরকার একটা বিশাল পাথরের চাঁইয়ের নীচ থেকে। ছোট একটা পাথরে আটকে আছে চাঁইটা; ঠিক পিছনেই লক্ষ লক্ষ নুড়ি পাথর আর মাটির স্তূপ। কাঁধের সঙ্গে রাইফেল লাগিয়ে সময় নিয়ে ছোট পাথরে লক্ষ্যস্থির করল শেভলিন। টিপ দিল ট্রিগারে।

টুকরো টুকরো হয়ে গেল ক্ষুদ্রে পাথরটা, নড়ে উঠল বিশাল বোল্ডার। যত্নের সঙ্গে আবার লক্ষ্যস্থির করল শেভলিন, ট্রিগার টিপল। কোন গুলিটার জন্য ঘটল ব্যাপারটা বলতে পারবে না; কিন্তু দ্বিতীয়বার ট্রিগার টিপবার সাথে সাথেই পাহাড়ী ঢাল বেয়ে হুড়মুড় করে নামতে শুরু করল দানবাকৃতি পাথর—ওটাকে অনুসরণ

করল পেছনের স্তূপটা।

হতচকিত চিৎকার করে উঠল কেউ একজন, তারপর আরেকজন। লাফিয়ে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল দুজন লোক। ধীরেসুস্থে প্রথম জনের বুকে একটা ফুটো তৈরি করে দিল সাডেন, অন্যজন লুটিয়ে পড়ল হাঁটুতে গুলি খেয়ে। সশব্দে গাড়িয়ে নামছে হাজার হাজার পাথরের টুকরো, একটা বড় পাথরে বাধা পেয়ে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল, তারপর বার্নার মত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল চারদিকে।

মানুষ শিকারীরা নিজেদের সামলে নেয়ার আগেই দ্রুত ক্যানিয়ন ধরে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল শেভলিন। ঘোড়ার পিঠে উঠে বসেছে ওঅট, ঝুঁকে রয়েছে পমেলের উপর। মাটিতে পড়ে আছে ওর রাইফেলটা। তুলে নিয়ে স্ক্যাবার্ডে ভরে রাখল শেভলিন। তারপর এগোতে শুরু করল। ওঅটের ঘোড়াটাকে টেনে নিয়ে কতগুলো বড় পাথরের পেছনে অস্পষ্ট একটা পাহাড়ী ট্রেইলের দিকে এগোল সাডেন শেভলিন। পাথরগুলো পেরুলেই রয়েছে ঘন ঝোপ। ছায়াগুলো ক্রমশ জমাট বাঁধছে যেন। শিগগিরই আরও আঁধার ঘনিয়ে আসবে চারদিকে। আহত ওঅটের দিকে মাঝে মাঝে ফিরে তাকাচ্ছে সাডেন। দ্রুত এগিয়ে চলছে ওদের ঘোড়া।

আঁকাবাঁকা সর্পিল ট্রেইল ধরে ঘন পাইনের ভিতর দিয়ে দ্রুত উপর দিকে উঠছে ওরা। অন্ধকারে ভরে গেছে নীচের উপত্যকা; ক্যানিয়নগুলোর অন্ধকার ক্ষতগুলোকে মনে হচ্ছে গভীর কালো দাগের মত। দূরে, দক্ষিণে, সূর্যের সোনালী আভা ম্যাঙ্গাটজালের চারটি সুউচ্চ চূড়াকে সোনারঙে রাঙিয়ে দিয়েছে।

পাহাড়ী ট্রেইল ধরে আরও মাইলখানেক এগোনোর পর গভীর হয়ে এল পাইনের বন। নীচে চাদরের মত ঘন হয়ে বিছিয়ে আছে পাইনের ঝরা পাতা। এর উপর দিয়েই এগোল সাডেন। হারিয়ে গেল ট্রেইলের চিহ্ন। এবার রক ক্রিক বেসিনের দিকে চলে যাওয়া একটা ট্রেইল ধরল ও। দক্ষিণে খাবার লুকিয়ে রাখবার জায়গার দিকে না গিয়ে রক ক্রিক ক্যানিয়ন ধরে বাঁ দিকে এগোল সাডেন। কিছুক্ষণ পর উঁচু একটা ঢিবি পেরিয়ে নেমে পড়ল আরেকটা ক্রিকে।

পেছনে তাকিয়ে দেখল এখনও ঘোড়ার পিঠেই রয়েছে ওঅট। নীরবে এগিয়ে চলল ও। পেরিয়ে গেল কয়েকটা ঘণ্টা। তারপর যা খুঁজছিল, পেয়ে গেল, পাথুরে সেতুঅলা একটা ক্যানিয়ন। ক্যানিয়ন ধরে সামনে এগোল সাডেন। বহুদিন আগে ও এখানে কতগুলো গুহা থাকবার কথা শুনেছিল—অবশেষে এসে পৌঁছুল ওগুলোর কাছে।

ঘোড়া থামাল শেভলিন। ঘোড়ার পিঠে দুলছে ওঅট। নিজের ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে গেল ও। হাত বাড়িয়ে প্রায় কোলে তুলে নিল ওঅটকে। গুহামুখের কাছে অস্পষ্ট আলোতেও বোঝা যাচ্ছে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বেচারার চেহারা। ‘পেরেছি আমি, না?’ ফিসফিসিয়ে বলেই জ্ঞান হারাল সে।

কোলে করে গুহার ভিতরে এনে সাডেন শুইয়ে দিল ওকে। গুহাটার মেঝে বালুময়, আরামে শুয়ে থাকতে পারবে আহত ওঅট। এবার ঘোড়াগুলোকে ভিতরে এনে গুহামুখ থেকে বেশ ভিতরে দৃষ্টিসীমার বাইরে লুকিয়ে রাখল। তারপর

শুকনো কাঠ জড়ো করে আগুন জ্বালাল। এখানে ওদের খুঁজে পাবে না কেউ।

জ্বলন্ত আগুনে পানি ফুটিয়ে নিল সাডেন। ওঅটের ক্ষতস্থান থেকে কাপড় সরিয়ে গরম পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিল। মারাত্মকভাবে আহত হয়েও এতক্ষণ ঘোড়ার পিঠে কীভাবে বসেছিল লোকটা সেটাই আশ্চর্য! সাবধানে ওঅটের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল শেভলিন। তারপর ওর পাশে বসেই খাবার তৈরি করতে লাগল।

বাইরে, ভারি হয়ে উঠেছে বাতাস, বৃষ্টি নামবার পূর্বলক্ষণ। দূর থেকে ভেসে আসছে গুরুগুরু মেঘের গর্জন। গুহায় আশ্রয় নিতে পেরে মনে মনে খুশি ও। বৃষ্টি নামলে ওদের ট্র্যাকের সব চিহ্ন মুছে যাবে।

অবশ্য অসুবিধেও আছে; খাবার থেকে অনেক দূরে পড়ে গেছে ওরা; ওঅটের চিকিৎসা প্রয়োজন, অথচ এই মুহূর্তে এখান থেকে কিছুতেই সরানো যাবে না; তা ছাড়া বিল কোফিনের সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারবে না।

হঠাৎ নড়ে উঠল ওঅট, বিড়বিড় করে বলল কী যেন, গুঁড়িয়ে উঠল যন্ত্রণায়। খুব কাহিল দেখাচ্ছে তাকে, কিন্তু ওষুধ কোথায়...অন্ধকার স্মৃতিতে নাড়া পড়ল হঠাৎ...অনেকদিন পর মনে পড়ল কথাটা।

ঘোড়াকে খাওয়ানোর জন্য নিয়ে আসা ভুট্টার থলে থেকে কয়েক কাপ ভুট্টা বের করে নিল শেভলিন। একটা চ্যাপ্টা পাথরে পিষে নিল ওগুলো। তারপর পানি মিশিয়ে মগ্ন তৈরি করে লাগিয়ে দিল ক্ষতস্থানে। অনেক দিন আগে ইন্ডিয়ানদের এ ওষুধটা ব্যবহার করতে দেখেছিল।

কাজ শেষে গুহামুখে এসে দাঁড়াল সাডেন। ঝামঝাম বৃষ্টি পড়ছে। সৌভাগ্যক্রমে গুহার মুখটা বেশ উঁচু হওয়ায় বৃষ্টির পানি গড়িয়ে ভিতরে ঢুকতে পারছে না।

শেভলিন এগিয়ে যেতেই কানখাড়া করে ফেলল ঘোড়াগুলো। কিছুক্ষণ ওদের আদর করে আবার ওঅটের কাছে ফিরে এল। অবশেষে চোখ মেলল উইলিয়ামস। ওকে হাঁটুর উপর শুইয়ে ভুট্টা আর শুকনো মাংসের মস্ত খাওয়াল সাডেন। জ্ঞান ফিরলেও কোথায় আছে বুঝতে পারছে না ওঅট।

খাওয়ার পর পরই ঘুমিয়ে পড়ল ওঅট। আবার গুহামুখে এসে দাঁড়াল সাডেন। ফেঁপে উঠেছে জলের ধারা, তীব্রস্রোত গর্জন করতে করতে ছুটে যাচ্ছে ক্যানিয়ন ধরে। কোন সন্দেহ নেই, পানির তোড়ে মুছে যাবে ওদের ট্র্যাকের ছাপ। গুহামুখের কাছেই কাঠ ভাসতে দেখে বেশ কয়েকটা কাঠ টেনে ভিতরে নিয়ে এল ও, শুকানো যাবে এমন একটা জায়গা দেখে স্তূপ করে রাখল। তারপর ওঅটের কাছে এসে ক্ষতস্থানের পুলটিস পাল্টে দিল। কাঠ ফেলে আগুন উষ্ণে দিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে ও শুয়ে পড়ল।

রাত পেরিয়ে সকাল হলো। ঘুম থেকে উঠে নাশতা তৈরি করল শেভলিন। অবশিষ্ট ভুট্টা বাটা দিয়ে আবার পুলটিস বেঁধে দিল ওঅটের ক্ষতস্থানে। গতকালের চেয়ে অনেকটা সুস্থ দেখাচ্ছে আজ ওঅটকে, কিছুটা যেন বল ফিরে এসেছে। নিজে নিজেই খাবার খেলো সে।

‘ওকে একাই থাকতে দাও, মেরি,’ সংক্ষিপ্ত জবাব দিল বেটি, ‘একটা মেয়ের পিছু নিয়ে স্ট্যাগ হারভে ওর কাছে পৌঁছে যাবে, আর যাই হোক, এটা অন্তত আশা করবে না ও।’

‘ওকে আমি খুঁজে বের করবই। আর স্ট্যাগ হারভেও আমার পিছু নিতে পারবে না। খসিয়ে দেব তাকে।’

‘প্রথমে কোফিন, তারপর ওঅট-এবার একদম একা হয়ে গেল ও।’

‘এটা তোমার লড়াই না,’ শান্ত কণ্ঠে বলল মেরি। ‘তুমি এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন?’

জবাব না দিয়ে ঘাড় কাত করে ন্যারোজের দিকে তাকাল বেটি। তারপর চোখ রাখল রাস্তায়। কার্পেট ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে দীর্ঘদেহী একলোক স্টেশনের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। মুহূর্তের জন্য একবার থামল লোকটা; তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এল ওদের কাছে। এক মাথা ধূসর চুল; তীক্ষ্ণ চোখজোড়ায় চঞ্চল দৃষ্টি।

‘হাওডি,’ বলল সে। ‘আমার নাম মরটন শবি। অ্যাটর্নি-অ্যাট-ল। তোমরা?’

‘আমি জিম ন্যারোজ।’ চোখে হাসি খেলে গেল ন্যারোজের। ‘থ্রেস জ্বালিয়ে দেয়ার আগ পর্যন্ত স্থানীয় কাগজের সম্পাদক ছিলাম।’ হঠাৎ তীক্ষ্ণ হলো ওর কৌতূহল, ‘আচ্ছা, তুমি কি সরকারের তরফ থেকে আসছ?’

‘না,’ হাসল মরটন শবি। ‘আমাকে অবশ্য এখানকার লোকজনের সঙ্গে সাবধানে কথাবার্তা চালানোর জন্যে বলে দেয়া হয়েছে। তবে ন্যারোজ নামটা বন্ধুদের তালিকাতেই আছে।’

‘ও-হ্যাঁ, পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি-এ হচ্ছে বেটি কনসিডাইন আর ও হলো মেরি ব্ল্যাক।’

টুপি খুলে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে ওদের শুভেচ্ছা জানাল মরটন শবি। আবার তাকাল ন্যারোজের দিকে। ‘ইয়ে-সাডেন শেভলিন কোথায়? “জে-ডট-ও” র‍্যাঞ্চে গেলে পাব?’

সংক্ষেপে গত কদিনের ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করল ন্যারোজ। হুইলারের সঙ্গে সাডেনের মারপিট; র‍্যাঞ্চে শেভলিনদের উপর হামলা এবং ওদের পলায়ন; বব ট্রিপের হত্যাকাণ্ড; কোফিনের সঙ্গে ক্রে মিলার আর একদল ভাড়াটে গানহ্যান্ডের মুখোমুখি লড়াই; ওঅটের সম্ভাব্য মৃত্যু-একে একে খুলে বলল সব।

‘কোফিন এখনও বেঁচে আছে বললে, না?’

ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল ন্যারোজের ঠোঁটের কোণে। ‘না, ভুল শোনোনি, সত্যি বেঁচে আছে। তবে শেষ পর্যন্ত বাঁচবে কি না কে জানে-আশা খুবই কম। আহত হওয়ার পর থেকে প্রতিমুহূর্তে তার মৃত্যুর আশঙ্কা করছে ডাক্তার। কিন্তু কীভাবে যে টিকে আছে লোকটা, খেদা মালুম। ওদিকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে সাডেন-একা সেই-বা কদ্দূর কী করতে পারবে কে জানে!’

‘আমার খবরটা তা হলে দেখা যাচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ,’ শান্ত কণ্ঠে বলল মরটন শবি। ‘জ্যাক ও’নীল আমার কাছে গিয়েছিল, উইল করার জন্যে। উইল

অনুযায়ী, ওর কিছু হলে র‍্যাঞ্জেস উত্তরাধিকারী হবে শেভলিন।’

‘কী?’ বিস্মিত কণ্ঠে চোঁচিয়ে উঠল জিম ন্যারোজ, চমকে তাকাল রাস্তার লোকজন। ‘ভুল হচ্ছে না তো কোথাও?’

‘প্রশ্নই ওঠে না!’

মরটন শবির-বাহু খামচে ধরল ন্যারোজ। ‘এসো আমার সঙ্গে!’ প্রায় টানতে টানতে কাগজের অফিসে নিয়ে এল মরটন শবিকে। ‘খবরটা,’ বলল ও, ‘এক্ষুণি ছেপে নিজের হাতে বিলি করছি আমি!’

গায়ের কোট খুলে রেখে কাজে নেমে পড়ল ন্যারোজ। ধীরে ধীরে সব কিছু খুলে বলে গেল মরটন শবি। বেটি আর মেরির সাহায্যে দ্রুত হাতে গোটাবিশেক হ্যান্ডবিল তৈরি করে ফেলল ন্যারোজ। বড় বড় হরফের শিরোনামের নীচে সংক্ষেপে অথচ স্পষ্ট ভাষায় কী কী শর্তে জ্যাক ও’নীল সাডেন শেভলিনকে তার র‍্যাঞ্জেস দিয়েছে তা বর্ণনা করা হলো:

জ্যাক ও’নীলের উইল। ‘জে-ডট-ও’ রেঞ্জ শেভলিনের!!

এল প্যাসোতে রেজিস্ট্রিকৃত একটি উইলের মাধ্যমে জ্যাক ও’নীল তার স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তিসহ ‘জে-ডট-ও’ রেঞ্জ সাডেন শেভলিনের নামে লিখে দিয়েছে। ও’নীলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই উইল কার্যকর হয়েছে। এর মাধ্যমে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হলো যে, ‘জে-ডট-ও’ এবং ‘বিগ-বি’-র উপর হামলা পরিচালনাকারী এবং এই দুই আউটফিটের কর্মীদের হত্যার পেছনে দায়ী জোটবদ্ধ র‍্যাঞ্জেসদের সকল দাবী আসলে ভিত্তিহীন!

জ্যাক ও’নীলের উইলের শর্তানুযায়ী উপত্যকায় বর্তমানে বসবাসকারী কোন র‍্যাঞ্জেসের কাছে সাডেন শেভলিন ‘জে-ডট-ও’-র কোন অংশ বিক্রি, ইজারা কিংবা অন্য কোন উপায়ে হস্তান্তর করতে পারবে না। অর্থাৎ হামলাকারী ব্যক্তিদের শেষ ছায়াটুকুও এই শর্তের মাধ্যমে এখন অপসারিত হলো। এরপরও যদি এইসব র‍্যাঞ্জেস তাদের অন্যায়, অবৈধ হামলা অব্যাহত রাখে, আইন ভঙ্গকারী হিসাবে আখ্যায়িত করে এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া উপায় থাকবে না।

হ্যান্ডবিল দেখে দাঁত বের করে হাসল মরটন শবি, তাকাল ন্যারোজের দিকে। ‘এগুলো বিলি করার পর হয় শহর ছেড়ে পালাতে হবে, নয়তো নিজের চারদিকে লোহার দেয়াল বানিয়ে নিতে হবে তোমাকে!’

মাথা ঝাঁকাল ন্যারোজ। ‘আমিও এ কথাই ভাবছিলাম!’ বলে মাথা তুলে ওদের তিনজনের দিকে তাকাল ও। হাতে তুলে নিল কয়েকটা হ্যান্ডবিল। ‘গুরু করা যাক তা হলে!’

পিটপিট করে উঠল মরটন শবির চোখের পাতা। টেনেটুনে পিস্তলটা ঠিকমত

বসিয়ে নিল সে। তারপর অবশিষ্ট হ্যান্ডবিলগুলো থেকে তুলে নিল কয়েকটা। দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

আস্তে আস্তে বাইরে এসে দাঁড়াল বেটি কনসিডাইন। এরপর কী ঘটতে যাচ্ছে জানে ও—অন্তত ধারণা করতে পারছে। এ ছাড়া আর কিই-বা ঘটতে পারে? অনেকদূর এগিয়ে গেছে জ্যাকসন, পিছিয়ে আসবার পথ বন্ধ। উইলকস্কেসের বেলায়ও একই কথা খাটে। অন্যায়ভাবে রেঞ্জ দখল করে নেয়ার জন্য একের পর এক নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে ওরা। অথচ এখন রেঞ্জ দখল করবার শেষ সম্ভাবনাতুকুও নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। সাডেন শেভলিন ‘জে-ডট-ও’ রেঞ্জের বৈধ মালিকানা লাভ করেছে। কোন সন্দেহ নেই, এবার ক্রোধে দিশেহারা হয়ে যাবে জ্যাকসনরা, খুন করতে চাইবে সাডেনকে যে ভাবে পারে।

ওই পাহাড়গুলোর কোথাও সম্ভবত আহত ক্ষুধার্ত অবস্থায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে সাডেন শেভলিন। স্ট্যাগ হারভেকে ফাঁকি দিয়ে কি তার কাছে পৌঁছুতে পারবে মেরি ব্ল্যাক? না, সাডেন কোথায় আছে জানা থাকলেও পারবে না। শত্রুর চোখে ধুলো দেওয়ায় অতটা দক্ষ নয় সে। কিন্তু বেটির কথা আলাদা। ও জানে...হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে রাস্তা ধরে এগোতে শুরু করল বেটি কনসিডাইন। হাঁটবার গতি দ্রুত।

পাহাড়ের অনেক ভিতরে গুহাগুলোর কাছে ওঅট উইলিয়ামসকে কবর দিল সাডেন। কবরের পাশে কয়েকটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে নীরবে প্রার্থনা করল ও। তারপর একগুচ্ছ ফুল আলগোছে নামিয়ে রাখল কোনমতে বানানো ক্রসটার গোড়ায়।

পিছিয়ে এসে আরেকবার তাকাল ও কবরের দিকে। ‘আবার তোমাকে দেখতে আসব আমি ওঅট!’ বলেই ঘুরে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে উঠে বসল ঘোড়ার পিঠে। দক্ষিণ-পশ্চিমে পাইন ক্যানিয়নের দিকে রওনা হলো সাডেন শেভলিন—পেছনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওঅট উইলিয়ামসের ঘোড়াটা। জীবনে এই প্রথমবারের মত শিকারে বেরিয়েছে ও—মানুষ শিকার। তিনজন লোককে হত্যা করবার প্রতিজ্ঞা করেছে মনে মনে।

দ্রুত এগোল শেভলিন। মাইল পাঁচেক পথ পেরুনোর পর ঘোড়া পাল্টে ওঅটের গেল্ডিংটায় চেপে বসল। এই ভাবে ঘোড়া পাল্টে পাল্টে ঘন্টায় গড়ে প্রায় আট থেকে দশমাইল গতিতে সারারাত একটানা পথ চলল।

ভোরে গেল্ডিংটাকে ছেড়ে দিল সাডেন। তবে ওঅটের অস্ত্রগুলো রেখে দিল। ওর অস্ত্রের সংখ্যা দাঁড়াল ছয়ে: দুটো রাইফেল একটা শটগান আর তিনটে পিস্তল—সবগুলো লোডেড।

এখন সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন তা হলো খাবার। পেটপুরে খাওয়া হয়নি কতদিন? অথচ উত্তরে মাত্র কয়েক মাইল এগোলেই বেটির কেবিনে পৌঁছে যেতে পারে ও! ঘোড়া ঘুরিয়ে নদীর কিনারা বরাবর উত্তরে রওনা হলো শেভলিন। প্রায় ঘন্টাখানেক এগোনোর পর পৌঁছে গেল বেটির কেবিনের কাছে। প্রথমই চোখে

বইঘর.কম
ঘেরাও

পড়ল ধোঁয়ার ক্ষীণ একটা রেখা চিমনি গলে বেরিয়ে হাওয়ায় মিশে যাচ্ছে। তারপর লক্ষ্য করল পিঠে জিন চাপানো একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে কোরাল গেইটে।

ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে কেবিনের পিছন দিকে পাইন গাছগুলোর আড়ালে চলে এল শেভলিন। ঘোড়া বেঁধে রেখে শটগান হাতে গাছপালার ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোল কোফিনের দিকে। আগেরবার যে বিশাল সিকামোরটার নীচে দাঁড়িয়ে বেটির সঙ্গে কথা বলেছিল, ওটার নীচে পৌঁছেই দাঁড়িয়ে পড়ল ও। তীক্ষ্ণ চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল চারদিক। কিন্তু অপরিচিত কোন ট্রাক নজরে পড়ল না। সতর্ক চোখে নদীর দিকে তাকাল ও। সম্ভ্রষ্ট হয়ে তারপর এগোল দরজার দিকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে দরজা খুলে পা রাখল ভিতরে।

বাইরে বেরুণোর জন্য তৈরি হচ্ছে বেটি কনসিডাইন, কাজ করছে ব্যস্ত হাতে। টেবিলের উপর একটা মাত্র প্লেট দেখতে পেল সাডেন।

‘আর গোটা দুয়েক ডিম হবে না, বেটি?’

ঝট করে ফিরে তাকাল মেয়েটা, বিস্ময়-বিস্ফারিত দুচোখ। ‘সাডেন! ওহু, খোদা! এসেছ! কিছু হয়নি তো তোমার!’

‘আমার জন্যে ভাবছিলে তুমি?’ বেটিকে একনজর দেখল শেভলিন। ‘যাচ্ছিলে কোথায়?’

‘তোমাকে খুঁজতে, সাডেন। এল প্যাসোতে ও’নীলের উইল রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। র‍্যাঞ্চসহ সব কিছু তোমাকে দিয়ে গেছে ও।’

স্থির দৃষ্টিতে বেটির দিকে তাকিয়ে রইল শেভলিন। ‘আমাকে? ঠিক জানো তুমি?’

‘হ্যাঁ,’ তাড়াতাড়ি আরও ডিম ভাজতে ভাজতে সব কিছু সাডেনকে খুলে বলল বেটি কনসিডাইন। মরটন শবির কাছে শোনা উইলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করল ওকে। ন্যারোজ কী করেছে তা-ও বলল।

সবশেষে জিজ্ঞেস করল, ‘ওঅট কোথায়, সাডেন?’

‘গতকাল সন্ধ্যায় ওকে কবর দিয়েছি। হোয়াইট রক ফাইটে আহত হয়েছিল। কোফিনকে দেখেছ?’

শহরে কোফিনের দুঃসাহসিক লড়াইয়ের কাহিনী ওকে বলল বেটি। ক্রে মিলারসহ আরও দুজন বন্দুকবাজকে হত্যা করেছে কোফিন। ‘এবং অসংখ্য গুলির আঘাত হজম করে এখনও টিকে আছে ওঁ। অবশ্য গত কদিন ধরেই বেহুঁশ। ব্যাপার দেখে ডাক্তার পর্যন্ত অবাক হয়ে গেছে। ওর আশা অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছে ডাক্তার। অথচ গুলিতে ঝাঁঝরা শরীর নিয়ে এখনও দিব্যি বেঁচে আছে।’

‘কেবল ও’নীলের উইলের খবর দিতেই আমার খোঁজে যাচ্ছিলে তুমি,’ কফির কাপের উপর দিয়ে বেটির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল শেভলিন, ‘নাকি আর কিছু?’

‘না, মানে-মানে-মেরি তোমার জন্যে খুব চিন্তা করেছে সাডেন। ও-ই বেরুতে চাইছিল তোমার খোঁজে।’ একটু ইতস্তত করল বেটি, ‘তুমি ওকে

ভালবাস, সাডেন?’

‘মেরিকে?’ বিস্মিত হলো শেভলিন। পেছন ফিরে থাকায় বেটির চেহারা দেখতে পাচ্ছে না ও। ‘এমন মনে হওয়ার পেছনে কারণ?’

ডিম ভাজি, হ্যাম আর কয়েকটুকরা টোস্ট প্লেটে করে সাডেনের দিকে এগিয়ে দিল বেটি। কয়েকদিনের অনাহার অর্ধাহারের পর সুস্বাদু খাবার পেয়ে অন্য সব কিছু ভুলে গেল শেভলিন। অনেকক্ষণ চুপচাপ খেয়ে চলল। হঠাৎ মাথা তুলে তাকিয়ে লাজুক হাসি হাসল। ‘কী খিদে যে লেগেছিল! আচ্ছা তোমার কাছে ক্ষুর আছে?’

‘বাবার ক্ষুরটা আছে এখনও। বাবার অনেক জিনিসই নিজের কাছে রেখে দিয়েছি আমি। বন্দুক, ক্ষুর—’ ক্ষুরটা বের করে সাডেনকে দিল বেটি।

সাডেন দাড়ি কামাতে শুরু করলে আলাপ জড়ল বেটি।

গালের উপর দাড়ির সঙ্গে ক্ষুরের সংঘর্ষের ফলে খসখস শব্দ উঠছে। বহুদিন পর এই প্রথম কোন পুরুষকে শেভ করতে দেখছে ও। এই প্রথম লক্ষ্য করল, কী চওড়া এই লোকটার কাঁধ! তাড়াতাড়ি উঠে দরজায় এসে দাঁড়াল বেটি। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল বাইরে, নদী পেরিয়ে অনেক দূরে চলে গেল ওর দৃষ্টি।

‘ওরা এখন কী করবে, সাডেন? লেগে থাকবে তোমার পেছনে?’

ক্ষুর নামিয়ে বেটির দিকে তাকাল শেভলিন। মুহূর্তের জন্য এক হলো ওদের দৃষ্টি, চট করে চোখ সরিয়ে নিল বেটি। এক বলক রক্ত ছড়িয়ে পড়ল ওর চোখে-মুখে। ধুক ধুক করছে বুকের ভিতর।

হারিয়ে গেল প্রশ্নটা। আস্তে করে বেটির পেছনে এসে দাঁড়াল শেভলিন। ‘বেটি...’ বা হাতটা রাখল ওর কাঁধে। ‘বেটি, আমি...’ ঘুরে দাঁড়াল বেটি, ডাগর কালো চোখে ভয়াবহ দৃষ্টি। কোমরে নেমে এল শেভলিনের হাত, নিবিড় করে কাছে টানল বেটিকে।

ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল না ওদের কেউ। পায়ের শব্দ উঠল সিঁড়ির উপর। চমকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হলো ওরা। একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল দরজার দিকে।

দাঁড়িয়ে আছে মেরি ব্ল্যাক। ঘোড়া হাঁকানোর পরিশ্রমে লাল হয়ে গেছে চেহারা। একবার সাডেন আরেকবার বেটির দিকে তাকাল ও। ক্রোধে ফুলে উঠল নাকের বাঁশী। ‘বাহ! আগেই পৌছে গেছ দেখছি, বেটি!’

‘মানে-আমি তো আমার ঘরে ফিরেছি! আমি—’

‘গাল থেকে সাবান মুছে ফেললেই,’ বলল মেরি, ‘বোধ হয় আরও সুশ্রী দেখাবে তোমাকে। নাকি ইদানীং শেভ করতে শুরু করেছ?’

‘ওহ!’ ঢোক গিলল বেটি। দৌড়ে গেল আয়নার দিকে।

হঠাৎ হেসে ফেলল সাডেন। ‘কী খবর, মেরি। তোমাকে এখানে দেখে কিন্তু সত্যি অবাক হয়েছি।’

‘শিগগির এখান থেকে না পালালে আরও অবাক হতে হবে,’ শুষ্ক কণ্ঠে বলল মেরি। ‘স্ট্যাগ হারভে আসছে!’

চোদ্দ

‘স্ট্যাগ আসছে?’

‘হ্যাঁ। তবে জ্যাকসন বোধ হয় আগেই পৌঁছে যাবে। স্কাউটিং করতে ট্রেইল থেকে সরে গেছে হারভে। কিলবার্ন আর লুড ফেলার আছে ওর সঙ্গে।’

‘আর জ্যাকসনের সঙ্গে?’

‘ওর অন্তত আধডজন রাইডার।’

ঘুরে দাঁড়িয়ে টপি হাতে তুলে নিল সাডেন শেভলিন। ‘এখানেই থাকো তোমরা। দেখছি আমি।’

কেবিন থেকে বেরিয়ে এল শেভলিন। হাঁটতে হাঁটতে কেবিনের পেছনে বাঁধা স্ট্যালিয়নটার কাছে চলে এল। আপনমনে ঘাস খাচ্ছিল ঘোড়াটা। বাঁধন খুলে ওটাকে কেবিনের কাছে এনে সামান্য পানি খাওয়ায় ওঅটারিং ট্রাফ থেকে।

নদীর ওপারে দূরে ধুলোর মেঘ চোখে পড়তেই চট করে স্যাডলে চেপে বসল সাডেন। এগোল নদীর ফোর্ডের দিকে। নদীটা এখানে প্রায় বিশগজ প্রশস্ত—রেকাব ছুঁই ছুঁই গভীরতা। একটা গহ্বরে ঘোড়াটাকে লুকিয়ে রেখে গাছপালার আড়াল নিয়ে দাঁড়াল শেভলিন।

একটু পরেই দেখতে পেল নদীর বাঁক ঘুরে এদিকেই এগিয়ে আসছে একদল রাইডার। একটা বোল্ডারের উপর আরাম করে বসল সাডেন। ধীরে সুস্থে সিগারেট ধরাল। সিগারেটে টান দিতে দিতে ওদের আরও কাছে আসবার সুযোগ করে দিল। রাইডার তিনশো গজের মত দূরত্বে আসতেই আরেকটা পাথরে হাঁটু ঠেকিয়ে তুলে নিল রাইফেল, কনুইটা ঠিকমত বসাল ব্যারেলের তলায়। নলের গায়ে গাল ঠেকিয়ে নড়েচড়ে লক্ষ্য স্থির করল জ্যাকসনের উপর। জ্যাকসনকে হত্যা করতে চাইছে না ও। কিন্তু এই মুহূর্তে হঠাৎ কেন যেন মনে হলো, মারলেই বা ক্ষতি কী! ঘোড়াটা আচমকা নড়ে উঠতেই—ট্রিগার টিপে দিল সাডেন।

জ্যাকসনের কানের লতি ফুটো করে দিতে চেয়েছিল ও—তাই মুহূর্তের জন্যও তার উপর থেকে দৃষ্টি সরায়নি। ট্রিগার টিপেই দেখল, চমকে উঠে হাত বাড়িয়ে কান চেপে ধরেছে জ্যাকসন। স্পষ্ট শুনতে পেল তার ভয়ানক আত্ননাদ। এত দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা।

মুহূর্তের মধ্যে বৃষ্টির মত গুলি ছুটে এল শেভলিনের অবস্থানের দিকে। এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল লোকগুলো। আবার গুলি করল সাডেন। কাভার নিতে ডাইভ দিতে যাচ্ছিল একজন। গুলিটা তার উরুতে গিয়ে লাগল। ওর দ্বিতীয় গুলিতে লুকিয়ে পড়ল জ্যাকসনের ঘোড়া। ঘোড়ার নীচে চাপা পড়ে গেল ওটার আরোহী—ভয়ে বিকৃত হয়ে গেল তার চেহারা। আবার গুলি করল শেভলিন,

একরাশ বালি ছিটিয়ে পড়ল জ্যাকসনের চোখে-মুখে।

‘কী জ্যাকসন, দেব নাকি শেষ করে? একা না পেরে একদল লোক নিয়ে লড়তে এসেছ! তা কেমন লাগছে এখন?’

আবার ট্রিগার টিপল শেভলিন, ‘ইচ্ছে করেই’ মিস করল গুলিটা। কিন্তু এত কাছে বিক্ষোবিত হলো যে আত্মারাম খাচাছাড়া হওয়ার দশা হলো জ্যাকসনের। ‘চোখে কি বালি পড়েছে, জ্যাকসন? পরেরটা আরও কাছে পাঠাচ্ছি!’ আবারও আগুন ঝরল সাডেনের রাইফেল থেকে। জ্যাকসনের ঠিক নাকের ডগায় বিক্ষোবিত হলো বুর্লেটটা, ছিটকে আরও বালি ঢুকল ওর চোখে।

একমুহূর্ত অপেক্ষা করল শেভলিন, তারপর চোঁচিয়ে বলল, ‘শোনো, আমাদের ব্যাপারে নাক না গলালে তোমাদের কিছু বলব না। কেউ একজন এসে আহত লোকটাকে নিয়ে যাও! ব্যান্ডেজ বেঁধে দাও ওর পায়ে! কই, এসো! গুলি করব না, বললাম তো!’

দৌড়ে এল এক কাউহ্যান্ড; আহত লোকটাকে কাঁধে তুলে নিয়েই ছুটে গেল আবার নিরাপদ আশ্রয়ে। গুলি ছোঁড়ায় বিরতি দিল সাডেন। ঘোড়ার নীচে চাপা পড়া জ্যাকসন চিৎকার করে উঠল, ‘আরে, গর্দভের দল! যাও, ওকে ধরো! ধাওয়া করো ওকে!’

হেসে উঠল সাডেন। ‘তোমাকে একা আমার সামনে দাঁড়াতে দেখলাম না, জ্যাকসন। একশো একজনের সাহায্য নেয়া চাই-ই চাই।’

জ্যাকসনের নাকের কাছে মাটি সই করে ট্রিগার টিপল ও। ‘নদীর এপারে প্রথম যার মাথা দেখব, সোজা গুইয়ে দেব তাকে।’

অপেক্ষা করতে লাগল সাডেন। সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছে চারদিকে। সামান্যতম নড়াচড়াও যেন চোখ এড়াতে না পারে। জানে, গুলি খাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে নদী পেরুনের সাহস করবে না কেউ। হাজার হোক, মানুষ খুন করবার জন্যে তো জ্যাকসনের ভাড়াটে গানম্যানই রয়েছে-খুন খরাবির জন্যে টাকা পাচ্ছে ওরা। খামোকা ঝুঁকি নিতে যাওয়া কেন? আবার, বলা যায় না, মৃত ঘোড়ার নীচে চাপা পড়ে প্রাণভয়ে কাঁপছে ওদের বস্-দৃশ্যটা হয়তো দু’একজনের কাছে ভাল নাও লাগতে পারে।

প্রাণভয়ে সত্যি ত্রাহিমধুসূদন অবস্থা জ্যাকসনের। কারও সাহায্য ছাড়া মরা ঘোড়ার নীচ থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারবে না সে। ইচ্ছে করলেই যে কোন মুহূর্তে তাকে শেষ করে দিতে পারে শেভলিন।

‘ওঅটকে হত্যা করিয়েছ তুমি,’ কথোপকথনের ভঙ্গিতে বলল শেভলিন। ‘কোফিনকে গুলি করেছে তোমার লোকেরা; তারপর আমাকে হত্যা করতে লোক ভাড়া করেছে। জ্যাক ও’নীলকে ফাঁসি দেয়ার সময়ও তুমি উপস্থিত ছিলে। সুতরাং, বুঝতেই পারছ গুলি করে তোমার শরীর ঝাঁঝরা করে দেয়ার পূর্ণ অধিকার আমার আছে।’

জবাব দিল না জ্যাকসন। পড়ে রইল চুপচাপ। এতক্ষণে বুঝতে পারছে, ওকে প্রাণে মারতে চায়নি সাডেন। কিন্তু তবুও বিন্দুমাত্র কমল না তার আতঙ্ক।

হঠাৎ মনে পড়ল দলবল নিয়ে আসছে স্ট্যাগ হারভে। নিশ্চয়ই গুলির শব্দ কানে গেছে ওদের। কী করতে হবে ঠিকই বুঝে নেবে ওরা।

আবার গুলি করল শেভলিন। গুলি করেই পিছিয়ে এল দ্রুত। গাছপালার ভিতর দিয়ে দৌড়ে ফিরে এল ঘোড়ার কাছে। উঠে বসল জিনে। নরম বালির উপর দিয়ে ঘুরপথে ঘোড়া হাঁকাল নদীর দিকে। নদী পেরিয়ে তীরে উঠেই ট্রেইল ধরে এগোল পাহাড়ের দিকে। হারভেকে ধোঁকা দিতে চাইছে ও। এগোতে এগোতেই হঠাৎ একটা চিৎকার কানে আসতে চমকে তাকাল সাডেন। বড় জোর দুশো গজ দূরে! পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ছুটে আসছে অন্তত একডজন ঘোড়সওয়ার! দেখামাত্রই উইলকক্সকে চিনতে পারল সাডেন।

তড়িৎ গতিতে একটা গুলি ছুঁড়েই স্যাং করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ও। ছোট লাগাল ট্রেইল ধরে। ঠিক এই সময় পড়ে গেল হারভের সামনে। কিন্তু এটা ওর পরিকল্পনায় ছিল না। মুহূর্তে বিস্ময়ভার কাটিয়ে উঠল সাডেন। বিন্দুমাত্র কমল না ওর ছুটবার গতি, সোজা তুফানের মত এগিয়ে গেল সামনে। সরে যাবার কোন সুযোগ পেল না প্রতিপক্ষ, ওর বিশাল স্ট্যালিয়নটার সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হলো ছোটখাট অশ্বারোহী দলটার। হাতে লাগাম পেঁচিয়ে চোখের পলকে উঁচিয়ে ধরল সিক্স-গুটারটা। লাল আগুন বরল ওটার মুখ থেকে।

তীব্র আতর্জনাদ করে দুহাত শূন্যে ছুঁড়িয়ে দিল একজন, সাথে সাথে তাকে আঘাত করল শেভলিন। ঘোড়ার হেঁষা ধ্বনিতে ভরে উঠল চারদিকের পরিবেশ। বালির মেঘে ঢেকে গেল সব। ভীড় ঠেলে লাফিয়ে সামনে বাড়ল স্ট্যালিয়নটা। পলকের জন্য হারভের হিংস্র ভয়াল চেহারাটা চোখের সামনে দেখতে পেল সাডেন। খপ করে পিস্তল আঁকড়ে ধরল লোকটা। দেরি করল না সাডেন, সিক্স-গুটারটা ঘুরিয়ে ব্যারেল দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানল ওর মুখে। কিন্তু ঠিকমত লাগল না। ওর কজির পেছনটা বাড়ি খেলো স্ট্যাগের মুখে। এতেই জিন থেকে ছিটকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে। ওদের ছাড়িয়ে ছোট লাগাল জেব্রা ডান স্ট্যালিয়ন।

গুলির শব্দ হলো পেছনে। বাতাসে শিস কেটে কানের পাশ দিয়ে চলে গেল বুলেটটা। তারপরই শরীর থেকে এক খাবলা মাংস তুলে নিল যেন কিসে। দম বেরিয়ে যাবার দশা হলো ওর। চোখের সামনে টলে উঠল পৃথিবী। ঘোড়া নিয়ে নদীতে নেমে উর্ধ্বশ্বাসে উজানে ঘোড়া হাঁকাল ও। তারপর একসময় আস্তে আস্তে গতি কমিয়ে উঠে এল কিনারে। বাঁক নিয়ে একটা নালায় ঢুকে পড়ল-ফের উল্টো রাস্তা ধরল। নিঃশ্বাসের সাথে সাথে বুকে ছুরি বিধছে যেন। সমানতালে ছুটে চলেছে ঘোড়াটা। এমনভাবে ছুটেছে যেন আজই প্রথম ট্রেইলে নামানো হয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল সাডেন। দেখতে পেল না কাউকে। পর পর দুটো টিলা আর উঁচু ঢিবি পার হয়ে একটা ড্রাই ওঅশে নেমে এল ও। এগোল উত্তর-পশ্চিমে 'জে-ডট-ও' র‍্যাঞ্চ হাউসের উদ্দেশ্যে। এখান থেকে আন্দাজ দশমাইল দূরে হবে র‍্যাঞ্চটা। পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে ট্রেইল গোপন করবার যত কায়দা জানা আছে, কাজে লাগিয়ে র‍্যাঞ্চের দিকে এগিয়ে চলল শেভলিন। দ্রুত।

দুবাব থামতে হলো ওকে। একবার ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করবার জন্য, অন্যবার পানি খেতে। গুলিতে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে ওর দেহে। প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে—জিন, ঘোড়ার শরীর সব সয়লাব হয়ে গেছে রক্তে। পশ্চিমে ঘোড়া ঘোরাল ও। ঘুরে একটা মেসাকে পেছনে ফেলে এল।

এগোতে এগোতে ভাবছে শেভলিন। ও আহত হয়েছে, হয়তো জানে ওরা। হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছল ও, চোখের সামনে হাত এনে দেখল, রক্তে লাল হয়ে গেছে। উরুতে ঘষে রক্ত মুছে ফেলল সাডেন। ও আহত হয়েছে জানবে ওরা। এবং তারপর ধৈর্যে আসবে সবাই। ক্ষুধার্ত নেকড়ে যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে আহত হরিণের উপর, তেমনি ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর উপর। হারভের অজান্তে তার পেছনে হাজির হয়ে ওদের নিরস্ত্র করে হারভেকে মুখোমুখি গানফাইটে আহ্বান করতে চেয়েছিল সাডেন। কিন্তু আচমকা লী উইলকিন্সের উপস্থিতি ভঙুল করে দিল সব—উল্টে এখন নিজেই বিপদে পড়ে গেছে ও।

ঘোড়াটা যাতে ক্লান্ত হুঁয় না পড়ে সেজন্য ওটাকে এবার হাঁটিয়ে নিয়ে চলল সাডেন। ঘোড়ার পিঠেই পিস্তল আর রাইফেল রিলোড করে সবকটা বন্দুক চেক করে দেখল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। চোখের সামনে কাঁপছে দিগন্ত, নাচছে। গরম লাগছে, প্রচণ্ড গরম। র‍্যাঞ্চ হাউস আর কত দূর?

এবার ওরা সবাই পিছু নেবে ওর। ব্যক্তিগত শত্রুতার জন্ম হয়েছে স্ট্যাগ হারভের সঙ্গে—মেরে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে এসেছে ও, প্রতিশোধ নেয়ার জন্য খেপে উঠবে লোকটা। ওদিকে ভয় দেখিয়ে অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিয়েছে জ্যাকসনের। সবাই মিলে ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নিতে চাইবে। টোক গিলবার চেষ্টা করল শেভলিন, খটখটে মরুভূমি যেন ওর কণ্ঠনালী। অসহ্য ঠেকছে সূর্যের প্রখর তাপ। ঘাম আর রক্তের মিলিত গন্ধে ভূত পালানোর দশা!

সামনে তাকিয়ে অল্প দূরেই র‍্যাঞ্চটা দেখতে পেল শেভলিন। কেউ নেই মনে হচ্ছে। ট্রেইলে বালি উড়তে দেখল কী? নাকি ঝাপসা দেখছে চোখে? নাচছে তাপতরঙ্গ। জেব্রা ডানকে ঘুরিয়ে গাছপালার মধ্য দিয়ে ট্রেইলের দিকে এগোল ও। জিনের উপর প্রায় ঝুঁকে রয়েছে ওর মাথা।

এখানেই শেষবারের মত রুখে দাঁড়াবে ও? না, এখানে এসেছে খাবার সংগ্রহ করতে—পালাতে হলে খাবার লাগবে—জিতবার স্বার্থে এখন পালিয়ে যেতে হবে ওকে। বেটির কাছ থেকেই খাবার নেয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তার আগেই দ্রুত পৌঁছে গেল খুণীর দল।

বেটি...কী গভীর কালো দুটি চোখ! বেটিকে আলিঙ্গন করবার কথা মনে পড়ল ওর। হঠাৎ মাথা তুলেই দেখল র‍্যাঞ্চের উঠোনে পৌঁছে গেছে ওর স্ট্যালিয়ন। জিনের উপর থেকে পিছলে নেমে এল শেভলিন। কতক্ষণ সময় পাবে ও? দশ মিনিট...আধ ঘণ্টা?...এক ঘণ্টা?

বেশিও হতে পারে। ও এখানে আসবে, ভাবতেই পারবে না শত্রুপক্ষ।

আচমকা দড়াম করে খুলে গেল বারান্দার দরজা। সিঁড়ি ভেঙে নেমে এল কে

বইঘর, কম
ঘেরাও

যেন! থমকে দাঁড়াল সাডেন শেভলিন। সূর্যের আলো আর চোখের পাতায় জমে ওঠা ঘামের ভিতর দিয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল লোকটার দিকে। লুড ফেলার?

‘তাজ্জব ব্যাপার!’ না, সন্দেহ নেই লুডেরই কণ্ঠস্বর। ‘যা ভেবেছি! তুমি এখানে আসবে জেনেই কেটে পড়েছিলাম আমি ওদের দল থেকে। তোমার অবস্থা যে কাহিল তা-ও জানতাম! তা কেমন লাগছে এখন, মিস্টার? আমি লুড ফেলার! তোমাকে খুন করতে যাচ্ছি আমি, সাডেন।’

টলছে সাডেন, চোখের সামনের জমাট বাঁধা কুয়াশা ভেদ করে ফেলারের দিকে তাকাল ও। একে...এই ফেলারকে...খুন করতে হবে! এ ছাড়া উপায় নেই। শরীরের সব শক্তি এক করল শেভলিন। বিজয়-আনন্দে উল্লসিত সাবেক ফোরম্যান। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছে সাডেন, লক্ষ করছে ফেলারকে। একটা পিস্তল রয়েছে ফেলারের হাতে। বোকা হতে পারে লোকটা; কিন্তু ‘ড্র’ করবার ঝুঁকি নেয়ার পথে যায়নি।

দৃঢ়ভাবে মাটি আঁকড়ে ধরল সাডেন শেভলিনের দুটি পা। ঘামে ভেজা শার্টের গন্ধ লাগছে নাকে। টুপি়র চওড়া কিনারার নীচ থেকে তীক্ষ্ণ চোখে ফেলারের দিকে তাকাল। ‘তুমি একটা গর্দভ লুড! বরখাস্ত করার পর প্রথম সুযোগেই তোমার পালানো উচিত ছিল!’

ওর কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়ের ছোঁয়া চমকে দিল ফেলারকে। বিস্ফারিত চোখে শেভলিনের দিকে তাকাল সাবেক ফোরম্যান। পিস্তল উঁচিয়ে ধরল সে, তর্জনী চেপে বসল ট্রিগারে। ক্রমশ বেড়ে উঠল চাপ।

লুড ফেলার জানলই না কীভাবে পিস্তল উঠে এসেছে সাডেনের হাতে কখন ওদিকে হাত বাড়িয়েছে নিজেও জানে না সাডেন। বহুবছরের, বহুবারের অনুশীলনে অভ্যস্ত হাত। শারীরিক ভাবে ক্লান্ত হলেও অতীতের অনুশীলন বিস্মৃত হয়নি। জরুরী মুহূর্তের প্রয়োজনে মস্তিষ্ক ঠিকমতই পাঠিয়ে দিয়েছে তার নির্দেশ। যন্ত্রণা আর দুর্বলতা সত্ত্বেও ভুল হলো না। চোখের পলকে পিস্তল উঠে এল ওর হাতে, গর্জে উঠে অগ্নিবর্ষণ করল। ওর পায়ের কাছে মাটিতে বিস্ফোরিত হলো ফেলারের একটা গুলি। পর পর দুবার ট্রিগারে টিপ দিল সাডেন শেভলিন। ফুটো হয়ে গেল ফেলারের পকেটে ঝোলানো টোব্যাকো স্যাক ট্যাগ। প্রথম ফুটোটা হলো বাঁ দিকে, অন্যটা নীচে। দুলুনির ভিতরেই খালি টোটা বের করে নতুন করে পিস্তলে গুলি ভরে নিল শেভলিন।

ফেলারের দিকে ফিরে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করল না ও। মনে পড়ছে জ্যাক ও’নীলকে ফাঁসিতে ঝোলানোর সময় কী বলছিল লুড ফেলার। ধীরে ধীরে ও’নীলের কষ্টকর মৃত্যু কামনা করেছিল সে। কিন্তু নিজে খুব তাড়াতাড়ি, প্রায় বিনাকষ্টেই মারা গেল!

এগিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকল শেভলিন। প্যান্ডিতে একটা খালি স্যাক পেয়ে হাতের কাছে যা খাবার পেল ভরে নিল তাতে। প্যান্ডি থেকে বেরিয়ে ক্যাবিনেট হাতড়ে বেশ কিছু বুলেট পেয়ে স্যাকে ভরল সেগুলোও। এবার সিঁড়ি ভেঙে নেমে এল উঠানে। ফেলারের মৃতদেহের দিকে তাকাল না ও। এগিয়ে গেল কোরালের

দিকে।

বিশাল কালো একটা ঘোড়া আস্তে আস্তে এগিয়ে এল ওর কাছে। ঘোড়াটার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করল শেভলিন। মাথা নেড়ে পাঁটা জবাব দিল ঘোড়াটা। লাগাম পরিয়ে ঘোড়াটা বের করে আনল সাডেন। জিন বদলে 'ডান'টাকে রেখে দিল কোরালে। তবে তার আগে এক টুকরো ন্যাকড়া দিয়ে ভালমত দলাইমলাই করল ঘোড়াটাকে।

এবার রসদপত্রের বসন্তটা কালো স্ট্যালিয়নের পিঠে উঠিয়ে কষে বেঁধে ফেলল স্যাডলের পেছনে। তারপর গরম পানি নিয়ে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতে বসল। ট্রেইলের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে সাবধানে আগের রক্তাক্ত ব্যাভেজটা খুলে ফেলে নতুন করে ব্যাভেজ বাঁধল। অসম্ভব জ্বলুনিতে আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। আঘাতটা মারাত্মক—কিন্তু এরচেয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়েও ঘুরে বেড়াতে পারে মানুষ, বেঁচে যায়। বাঁচবার অদম্য স্পৃহা থাকলে একটা লোক যে কী পরিমাণ সীসে হজম করতে পারে বলা কঠিন।

বহুকষ্টে ব্যাভেজ বাঁধা শেষ করে জিন চাপাল ব্ল্যাক স্ট্যালিয়নে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে বসল সাডেন। রওনা হলো উত্তরে। নদীটা ওখানে সামান্য বাঁক নিয়েছে পশ্চিমে। নদী পেরিয়ে উত্তর-পূবে খটমটে ভাঙাচোরা পাহাড়ী এলাকায় হারিয়ে যেতে পারবে ও।

এগোতে এগোতে নিজেকে শক্ত করে জিনের সঙ্গে বেঁধে ফেলল শেভলিন। শেষ পর্যন্ত হয়তো জিনের উপর টিকে থাকতে পারবে না—এই আশঙ্কায়।

র্যাঞ্চ থেকে মোটামুটি তিনমাইল দূরে এসে নদী পেরুল সাডেন। হাতের বাঁয়ে দুটো পাহাড়চূড়া দেখতে পাচ্ছে ও, ডানে একটা। সামনে রয়েছে আরও অনেকগুলো। ঠিক সামনেই একটা টিলা দেখে ঘোড়া নিয়ে সেদিকে এগোল। এরপরের কয়েক মাইলের কথা আর জানে না ও। আবার যখন চোখ খুলল, দেখল, পমেলের উপর নুয়ে পড়ে আছে ও, ক্লান্তিহীন এগিয়ে চলেছে ঘোড়াটা।

'ঠিক আছে, বয়,' ফিসফিস করে ঘোড়ার উদ্দেশে বলল সাডেন, 'দারুণ দেখাচ্ছিস বটে!'

আরোহীকে কথা বলতে দেখে উৎসাহিত হয়ে উঠল স্ট্যালিয়নটা। কান খাড়া করল। সূর্য অস্ত গেলেও আলোর আভা পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি এখনও। পাহাড়ের গভীর গহ্বরগুলো গ্রাস করে নিয়েছে কালো অন্ধকার। ধূসর ছায়া পড়েছে প্রকৃতিতে। উঁচু আকাশে ভাসমান মেঘে প্রতিফলিত হয়ে আকাশছোঁয়া পাহাড় চূড়াগুলোকে সোনালী আভায় সাজিয়েছে ডুবে যাওয়া সূর্যের আলো।

চারদিকে সুমসাম নীরবতা। বাতাসের শীতল ছোঁয়া লাগছে চোখে মুখে। বাতাসের দিকে মুখ উঁচিয়ে ক্যান্টিনের পানিতে মুখ ধুয়ে নিল ও। পাথরের মত ভারি মনে হচ্ছে মাথাটাকে। আশুন জ্বলছে ব্যাভেজের নীচে ক্ষতস্থানে। মখমলের মত কালো অন্ধকারের বশ মানছে সামনের বিস্তৃত এলাকা—ধীরে ধীরে। সব রঙ রস নিয়ে পাহাড় আর মরুভূমি মিশে যাচ্ছে রাতের নীরব আঁধারের সাথে। একটা দুটো করে তারা জ্বলে উঠছে আকাশের গায়ে; বড় বড় তারাগুলোকে দেখে মনে

বইসর কুম
ঘেরাও

হচ্ছে, বুঝি বা কেউ প্রদীপ ঝুলিয়ে দিয়েছে, এত নীচে, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া লেগে যাবে। ডান দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একটা বিশাল ঢিবি। জ্যাক ও'নীরের সঙ্গে এল প্যাসোতে যাবার পথে বিশাল কালো এই ক্লিফটার কথাই বলেছিল সে। এটাই সেই ডেডম্যান মেসা।

ডেডম্যান...মৃতমানুষ...লাশ...শিগ্গিরিই ও নিজেই হয়তো একটা প্রাণহীন লাশে পরিণত হবে...একটা লাশ পেঁছনে ফেলে এসেছে ও।

ডেডম্যান...লাশ...স্ট্যাগ হারভে, রাশ জ্যাকসন, লী উইলকক্স, ও নিজে...ওরা সবাই...লাশ ছাড়া আর কিছু নয়। ভায়োলেন্স আর অস্ত্রের উপর নির্ভর করে যারা বেঁচে থাকে...সবার পরিণতিই তা-ই।

জিনের উপর মাতালের মত এপাশ-ওপাশ দুলছে আর ভাবছে শেভলিন ওর চেতনার আঁধার পথে কাঁপন তুলে যাচ্ছে নামগুলো, স্ট্যাগ আর জ্যাকসন, আর উইলকক্স...স্ট্যাগ...জ্যাকসন...উইলকক্স...মরতে হবে সবকটাকে। খুব শিগ্গিরিই দুনিয়া থেকে সরে যাবে এই লোক তিনটে...স্ট্যাগ, জ্যাকসন আর উইলকক্স।

আলোর শেষ চিহ্নটুকুও মুছে গেল ধরার বুক থেকে। আকাশের গা থেকে মুছে গেল অবশিষ্ট লালচে আভা। আকাশছোঁয়া চূড়োর ছায়া আর ক্যানিয়ন থেকে হাত বাড়িয়ে দিল শীতল আঁধার। শীতল বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে।

নিশ্চিত অচঞ্চল পদক্ষেপে কালো আঁধার চিরে এগিয়ে চলল আরেকটা কালো অবয়ব।

পনের

নিজের অফিসে একা বসে আছে ম্যাককার্থি। গম্ভীর চেহারা। বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে ব্যাংকের কাজকর্ম শেষ হয়ে গেলেও অফিস থেকে বেরোয়নি সে। তিরতির করে কাঁপছে তার চোয়ালের পেশী, ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে পাকস্থলীর ভিতরটা। মরটন শবি লোকটা এখনও শহরেই আছে। সাডেন শেভলিনের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তাকে অগ্রিম টাকা দিয়ে দিয়েছে ও'নীল।

দেয়ালে দেয়ালে বিশটি হ্যাডবিল স্টেটে দিয়েছিল জিম ন্যারোজ। ওগুলো লোক দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে জ্যাকসন। কিন্তু তাতে ধামাচাপা দেওয়া যায়নি খবরটা, সারা শহরে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। প্রস্তুত হয়ে নিজের অফিসে বসে আছে জিম ন্যারোজ, সঙ্গে মরটন শবি। খাবার বা অস্ত্রের কোন অভাব নেই ওদের। শটগান পর্যন্ত আছে। সুতরাং এবার আর ওর প্রেস ধ্বংস করে দিতে পারবে না কেউ।

ক্রসিং ফাইটের খবর নিয়ে শহরে ফিরে এসেছে মেরি ব্ল্যাক। ভাঙা নাকে ব্যাল্বেজ বেঁধে শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে স্ট্যাগ হারভে। শেভলিনের প্রচণ্ড

আঘাতে নাক ভেঙে গেছে তার। এবং এখনও বেঁচে আছে শেভলিন। শিকারীরা খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে। কিন্তু তেমন সুবিধে করতে পারছে না কেউ। ওকে ট্রেইল করে একবার 'জে-ডট-ও'তে গিয়েছিল ওরা। লুড ফেলারের রক্তাক্ত লাশ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি—ওরা পৌঁছানোর কয়েক ঘণ্টা আগেই মারা গিয়েছে লুড ফেলার।

ক্লে মিলার...লুড ফেলার...বব ট্রিপ...ওঅট উইলিয়ামস...এবার কে?...আর কয়জন?...এর শেষ কোথায়?...কোন সম্ভাবনা তো দেখা যাচ্ছে না, কোথাও নয়।

রাশ জ্যাকসন আর লী উইলকক্স ব্যাংকে এসেছিল সেদিন সকালে। হুমকি দিয়ে গেছে ওকে। ওরা সবাই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে পুরো ব্যাপারটায়; ম্যাককার্থি এখন বলতে পারবে না সে এসবের বাইরে। প্রথম থেকেই সব কিছু জানত সে এবং এতদিন ওদের প্রতিটি কাজে মৌন সমর্থনও দিয়ে এসেছে; কিন্তু প্রকাশ্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেনি। এখন সময় এসেছে, হয় ওদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে, নয়তো শত্রুর মতই ব্যবহার পেতে হবে ওদের কাছ থেকে।

দাঁড়াটা বিরাট—তিন লক্ষ একরেরও বেশি জায়গা জুড়ে বিশাল রেঞ্জ। এর কিছু অংশ রক্ষা অনুর্ব হলেও, প্রায় পুরো এলাকাই মিঠে পানি আর সবুজ ঘাসে ভরা। আর আছে বিশাল গরুর পাল। দুটো র‍্যাঞ্চ মিলিয়ে কম করে হলেও পঞ্চাশ হাজার হবে গরুর সংখ্যা। চালানের সময় হয়ে গেছে অনেক আগেই। এই মুহূর্তেই তো অন্তত চার থেকে পাঁচ হাজার গরু অনায়াসে বিক্রি করা যায়! টনটো বেসিনের এধারে এলাকার আর কোন রেঞ্জ কিছুতেই একসঙ্গে এত গরুর যোগান দিতে পারবে না। এসব তথ্য খুব ভাল করে জানা আছে ম্যাককার্থির।

জোট বেঁধে লড়াই করে জিততে পারলে, দুটো বিশাল আউটফিট দখল করে নিতে পারবে ওরা; ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হবে অনায়াসে। বখরা দাবী করবার মত দুটো লোকই ইতিমধ্যে বিদায় নিয়েছে এই দুনিয়া থেকে। এখন ও যদি যোগ দেয়, ওরাও মনেপ্রাণে এটাই চাইছে, মাত্র তিনজনে দাঁড়াবে ভাগিদারের সংখ্যা। মোটামুটি প্রায় লক্ষ একর জমি পড়বে ওর ভাগে! বাব্বাহ! এ যে ওর জমির তুলনায় চারগুণ বেশি!

এই বিশাল সম্পদ অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র একটি লোক। সাডেন শেভলিন। সে মারা গেলে একেবারেই নিজীব হয়ে যাবে প্রতিপক্ষ। শেভলিনের কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় উকিল ব্যাটার আর কিছুই করবার থাকবে না; মোটা টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিদায় করা যাবে তাকে। আশ্বাসের পর আশ্বাস দিয়ে আস্তে আস্তে নিঃশ্ব করে একদম শূন্য হাতে কিংবা সামান্য কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে চিরতরে বিদায় করে দেওয়া যাবে মেরি ব্ল্যাককে। তখন হয়তো যা পাবে তাতেই কৃতার্থ হয়ে যাবে মেয়েটা।

ম্যাককার্থি জানে, এই মুহূর্তে ব্যাংকে খুব বেশি হলে শ'তিনেক ডলার জমা আছে মেরি ব্ল্যাকের।

ন্যারোজ...এই জিম ন্যারোজ লোকটারও একটা ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্য শেভলিনকে সরিয়ে দেওয়ার পর জলের মত সহজ হয়ে যাবে কাজটা স্ট্যাগ

হারভের জন্যে।

আর তারপর ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্য তৈরি হয়ে যাবে বিরাট রসালো তরমুজটা।

কিছুটা নার্ভাস ভঙ্গিতে হাত দিয়ে গাল ঘষল ম্যাককার্থি। সিদ্ধান্তটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একবার সরাসরি ওদের সঙ্গে ভিড়ে যাবার পর ইচ্ছে করলেই আর বেরিয়ে আসতে পারবে না। ওদিকে লী উইলকক্সকে নিয়ে যত ভয়। লোকটা বুনা, অস্থির প্রকৃতির, কখন যে কী করে বসে! বলা যায় না। হঠাৎ করে হয়তো মারা পড়তে পারে লোকটা, মারা যেতে পারে জ্যাকসনও!

ঝট করে সিঁধে হয়ে বসল ম্যাককার্থি। জ্যাকসন আর উইলকক্স মারা যাবে! তার মানে...ঠোট দুটো ফাঁক হলো ম্যাককার্থির, কাঁপা কাঁপা জিভটা বেরিয়ে এসে ভেজাল ওগুলোকে। তা হলে তো সব কিছুই চলে আসতে পারে ওর হাতে-সব!

ওদের মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় কীভাবে? শেভলিন যখন আছে, কত কিছুই তো ঘটে যেতে পারে! ওদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ আছে লোকটার, শীঘ্রি হয়তো ওদের খুঁজে বের করে প্রতিশোধ নেবে। মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার পরও লুড ফেলারকে খুন করে গেল না শেভলিন? কিন্তু সে যদি না মারে ওদের? স্ট্যাগ হারভের শীতল ভয়ঙ্কর চোখজোড়া ভেসে উঠল ম্যাককার্থির চোখের সামনে।...নগদ টাকা হলে...মোটাসোটা একতোড়া নোট...টাকা দিয়ে এই সব লোক অনায়াসে কিনে নেয়া যায়।

আগুতে আগুতে উঠে দাঁড়াল ম্যাককার্থি। পায়চারি করতে করতে ভাবতে লাগল। বিল কোফিন রয়ে যাচ্ছে এদিকে। লোকটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাঁচবে না। যাতে না বাঁচে তার ব্যবস্থা করবে ও। হ্যাঁ, এবার সত্যি সময় হয়েছে আসরে নামবার, সামনে এগোনোর...তবে সাবধানে, ম্যাক, আপনমনেই বলল ম্যাককার্থি, খুব খুব সাবধানে!

দরজার দিকে এগোতেই কী যেন হয়ে গেল ওর, স্রেফ একটা ঝলক যেন খেলে গেল চোখের সামনে, মুহূর্তের জন্যে মাত্র। কিন্তু এই একটি মুহূর্তের কথা সারা জীবনেও স্মৃতির পাতা থেকে মুছবে না ওর। মুহূর্তের জন্য সাডেন শেভলিনের শীতল চাউনি স্পষ্ট দেখতে পেল সে, অনুভব করল তার দুঃসাহস আর অদম্য প্রাণশক্তি। মনে পড়ল বিল কোফিনের দেয়ালে আছড়ে পড়বার দৃশ্যটি। ট্রিপার টিপে চলেছে বিল, মরছে শত্রুরা-মাটিতে লুটিয়ে পড়বার আগ পর্যন্ত একনাগাড়ে গুলি চালিয়ে গেছে সে। এবং জীবনকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে এখনও!

কী সেই শক্তি যা বাঁচিয়ে রাখে এদের? কোথেকে পায় এই শক্তি আর সাহস? ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছিল সেদিন বিল কোফিন। মনে হচ্ছিল সাডেন শেভলিন নামের লোকটারই আত্মা বুঝি ভর করেছে ওর উপর। দরজার নবে হাত রেখে সাডেন শেভলিনের কঠিন সবুজ চোখজোড়া দেখতে পেল ম্যাককার্থি লহমার জন্য, আতঙ্কে শিউরে উঠল সে। কেঁপে উঠল শরীরের প্রতিটি পেশী। যেন কবরে পা রাখতে যাচ্ছে, এমন একটা অনুভূতিতে ছেয়ে গেল মন।

পেরিয়ে গেল ভয়ঙ্কর মুহূর্তটা। অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে এল ম্যাককার্থি। স্যালুনের জানালা গলে আলো এসে রাস্তার উপর আয়তক্ষেত্রের সৃষ্টি করেছে। অন্ধকারে ঢাকা প্রিন্ট শপের দিকে চোখ গেল তার—ওখানে প্রিন্টিং মেশিন আগলে বসে আছে জিম ন্যারোজ। এখনও হার মানেনি সে...এরপর কী বার করবে লোকটা? জ্যাকসন আর উইলকক্সকে আক্রমণ করে হ্যান্ডবিলগুলো ছাপিয়ে যে দুর্দান্ত দুঃসাহস দেখিয়েছে—প্রশংসা না করে পারা যায় না। স্বীকার করতেই হয় শক্ত ধাতুতে গড়া এই ন্যারোজ।

ক্লান্তভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে ঠেলা দিয়ে দরজা খুলে স্যালুনে ঢুকল ম্যাককার্থি। বার থেকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একলোক। জেনারেল স্টোরের মালিক লুক অ্যানড্রেস। ম্যাককার্থি পাশে এসে দাঁড়াতেই জিজ্ঞেস করল, ‘ম্যাক, সব মিলিয়ে কী মনে হচ্ছে তোমার? কী হবে শেষ অবধি? কে যে ঠিক কাজটি করছে আর কে যে বেঠিক করছে কিছুই তো বুঝছি না আমি।’

‘বেশ,’ সাই জানাল ম্যাককার্থি, ‘এ নিয়ে আমিও ভেবেছি, বুঝলে!’ ড্রিঙ্কের ফরম্যাশ দিল সে। ‘জ্যাকসনকে তো বহুদিন থেকেই চিনি। আমার সঙ্গে বরাবরই ভাল ব্যবহার করে আসছে ও।’

‘হ্যাঁ,’ অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাই দিল লুক অ্যানড্রেস, ‘তা ঠিক।’

‘দেনা শোধের বেলায়ও কোনরকম গোলমাল করে না। বোধহয়, শেভলিনের মত একটা লোক এসে এখানকার সবচেয়ে ভাল রেঞ্জটা হাতিয়ে নেবে—এই ব্যাপারটাই একটু খেপিয়ে তুলেছে ওকে। তবে,’ আবারও বলল ম্যাককার্থি, ‘শেভলিন হয়তো ন্যায়ের পক্ষেই আছে...যদি না ওই উকিলের সঙ্গে তার কোন ষড়যন্ত্র থেকে থাকে। স্ট্যাগ ও’নীলকে খুন করেছে ঠিক, কিন্তু কার হুকুম?’

‘কেন, স্ট্যাগ তো জ্যাকসনেরই লোক,’ অস্বস্তির সঙ্গে জবাব দিল লুক অ্যানড্রেস।

‘ঠিক, হ্যাঁ, কিন্তু এসব লোকের চরিত্র বুঝার সাধ্য নেই কারও। নগদ কিছু টাকা ধরিয়ে দাও ওদের হাতে—মাঝেমধ্যে ভাবি, সত্যি ওরা শেভলিনকে খুঁজছে কি না! একা একটা লোক এভাবে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না আমার।’

আরও কিছুক্ষণ আলাপ করল ওরা, তারপর বিদায় নিল ম্যাককার্থি। সিঁড়িতে মুহূর্তের জন্য থামল সে। তা হলে শুরু করে দেওয়া গেছে। এখনও পিছিয়ে আসবার সময় হয়তো আছে...কিন্তু মনে মনে ও স্পষ্ট জানে, আসলে সে সময় ফুরিয়ে গেছে। শেষ সীমা পেরিয়ে এসেছে ও।

নদীর ধারে কেবিনে একা রয়েছে বেটি কনসিডাইন। বিছানায় অস্থিরভাবে শুধু এপাশওপাশ করছে। ঘুম পালিয়েছে দুচোখের পাতা থেকে। রাতের আধারে কোথায় না কোথায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে সে...আহত...রক্তাক্ত...একা। ওর মনের মানুষ।

মনের মানুষ?

‘হ্যাঁ,’ অন্ধকারে ছাদের দিকে তাকিয়ে নিজেকেই বলল ও। যদি মারা যায় ও, যদি ধূলিধূসরিত রাজপথে ওকে গুলি করে মেরে ফেলে কেউ, যদি দূরে কোথাও চলে গিয়ে আর কোন মেয়েকে নিয়ে ঘরও বাঁধে—তবু ওরই থাকবে সাডেন, কেড়ে নিতে পারবে না কেউ। হৃদয়ের গভীরে ওকে স্থান দিয়ে ফেলেছে বেটি। সেই সিকামোরের নীচে প্রথম সাক্ষাতের পরই অন্তর থেকে জেনে গেছে, সাডেনই ওর জীবনে প্রথম এবং শেষ পুরুষ।

আবার পাশ ফিরল বেটি। খসখস শব্দ উঠল চাদরে। ঘুম আসছে না। পাতার মর্মর ধ্বনি উঠছে বাইরে। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল ও। বাতি জ্বালল। পা গলাল চপ্পলে। গায়ে রোব চাপিয়ে আগুন জ্বলে কফি তৈরি করল। এখন কোথায় আছে ও? কোথায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে মানুষটা?

এই রেঞ্জ কান্ট্রিতে বাতাসের আগে ছড়িয়ে পড়ে সব কথা আর সবার মত বেটিরও কিছু অজানা নেই। লুড ফেলারের মৃত্যু; তার আগে ক্রসিংয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ তিক্ত লড়াইয়ের সংবাদ; হারভের খুলে বাহিনীর ব্যুহ ভেদ করে শেভলিনের বেরিয়ে আসা—সবই ও জেনে গেছে। স্ট্যাগের নাকটা নাকি ভেঙে দিয়েছে সাডেন। ওকে হাতের কাছে পেলে কীভাবে নরক যন্ত্রণা দিয়ে খুন করবে, চেষ্টায়ে সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে এখন লোকটা।

সাডেন শেভলিন আহত, এ খবরটিও চাপা থাকেনি ওর কাছে। রক্তের দাগ দেখে অনেক দূর পর্যন্ত তাকে ট্রেইল করেছে ওরা। গুলি খাওয়ার পরও পালিয়েছে ও। সাডেন কোথায় আছে জানলে, সোজা এখন তার কাছে গিয়ে হাজির হতে পারত বেটি। সামান্যতম ধারণাও যদি থাকত...না, এখন ওর এখানে থাকাই সবচেয়ে বেশি দরকার। সাডেন জানে, এখানেই পাওয়া যাবে ওকে। এখানেই অপেক্ষা করতে হবে ওর জন্যে, হয়তো আসবে ও।

কাল ‘জে-ডট-ও’তে গিয়ে সাডেনের ডান স্ট্যালিয়নটা নিয়ে আসতে হবে। শক্তিশালী কালোমুখো ঘোড়াটা নিয়ে এসে ভাল মত খাইয়ে দাইয়ে শেভলিনের জন্যে তৈরি করে রাখতে হবে। যে কোন সময় ঘোড়াটা প্রয়োজন হতে পারে শেভলিনের।

অনেকক্ষণ পর আবার বিছানায় ফিরে এল বেটি। অবশেষে ঘুম নেমে এল দুচোখ ভেঙে। কামকাম করে বৃষ্টি নামল রাতে। দীর্ঘ ক্যানিয়নের গোলকধাঁধায় পাহাড়ে পাহাড়ে আর রাতের অন্ধকার গহ্বরে আতর্নাদ করে ফিরল বজ্রের ধ্বনি।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই অক্লান্ত হাতে কাজ করে চলল বেটি। মন থেকে দূর করে দিতে চাইল সব রকম অশুভ ভাবনা। ঘর ঝাঁট দিল; ঝাড়পোছ করল সবকটা ঘর; এমনি ফেলে রাখা রাজ্যের কাপতশতরি পর্যন্ত ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলল। সেলাই করতে বসল একবার, কিন্তু সেলাই করতে গেলেই, যা এড়াতে চাইছে, সেই হাজারটা চিন্তাই ভিড় করে আসতে চায় মনে। তাই সে চেষ্টা বাদ দিল। খাবার তৈরি করল। কফি বানিয়ে সাডেন সহজেই খুঁজে পাবে এমন জায়গায় রেখে দিল। জ্বলে রাখল আগুনটা। কাজ শেষ হলে শ্লিকার পরে নিল ও। নিজের

মেয়ারে পিঠে জিন চাপিয়ে রওনা হলো 'জে-ডট-ও'-র উদ্দেশে।

হয়তো বিপদ হতে পারে ওখানে, কিন্তু পুরোনো সব কর্মীই এখন চলে গেছে, হয়তো কেউ নেই-ই এখন র‍্যাপ্টায়। সহজেই ফিরিয়ে আনতে পারবে স্ট্যালিয়নটা। শুধু সাডেনের চোখে পড়বে এমন জায়গায় একটা চিঠি রেখে আসলেই হবে।

বৃষ্টির ছাঁট প্রবল হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে, একটা পর্দা ঝুলছে ওর চোখের সামনে। 'জে-ডট-ও' খুব দূরের পথ নয়, কিন্তু বৃষ্টির পানিতে পথঘাট সব পিচ্ছিল হয়ে গেছে। মেয়ারটাকে সাবধানে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল বেটি। টুপির কিনারা বেয়ে টুপ্ টাপ্ ঝরেছে বৃষ্টির ফোঁটা। ভিজে আরও গাঢ় হয়ে উঠছে ঘোড়াটার রঙ। প্রত্যেক চড়াইতে থেমে চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর বুলাচ্ছে ও। আনত মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে সুউচ্চ পাহাড়চূড়োগুলো। গিরিখাতে পানির স্রোত। নিরাপদ জায়গা বেছে নিয়ে এগোতে হচ্ছে ওকে।

'জে-ডট-ও' দৃষ্টিসীমায় আসতেই র‍্যাপ্টার উঠানে একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে দেখে অবাক হলো বেটি কনসিডাইন। এবার আস্তাবল থেকে শ্লিকার পরা এক লোক বেরিয়ে এল, ভিতরে নিয়ে গেল ঘোড়াটা। এত দূর থেকে চেনা গেল না লোকটা কে?

বুকের ভিতর ধুপধাপ শুরু করে দিল হুৎপিও। ও যে শেভলিনের পক্ষে আছে কাউকে জানতে দেওয়া যাবে না; এখান থেকে নিজের কেবিনে নিয়ে গেছে ও ঘোড়াটা, তাও জানতে দেওয়া যাবে না। জানলেই ওর উপর নজর রাখতে শুরু করবে শত্রুপক্ষ।

গাছপালার ভিতরে ভিতরে বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে র‍্যাপ্টা হাউসকে কেন্দ্র করে ঘুরতে লাগল বেটি। আস্তাবলের উপর থেকে চোখ সরাল না, দেখতে চায় কে বেরিয়ে আসে। লোকটা যেই হোক শিগ্গিরই বেরিয়ে এসে ঘরের দিকে যাবেই। মানসচক্ষে লোকটাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামিয়ে গা থেকে বৃষ্টির পানি মুছে দিতে দেখল ও! শীঘ্রি, খুব শীঘ্রিই বেরিয়ে আসবে সে।

বিশাল একটা গাছের নীচে বৃষ্টির আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে আশ্রয় নিল ও। বিদ্যুতের নাচন-খেমে গেছে। দূরে হার্ডস্কাবল আর হোয়াইট রকের ক্যানিয়নে ক্যানিয়নে গুমরে মরছে বজ্র-ধ্বনি। চোখ খোলা রেখে নজর রাখছে বেটি কনসিডাইন। নাকে লাগছে সোঁদা সোঁদা গন্ধ। গাছের পাতা থেকে গায়ে, টুপিতে টুপটাপ ঝরে পড়ছে বড় বড় জলের ফোঁটা। ঘটছে না কিছুই। হঠাৎ আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল লোকটা। পায়ের ছাপ গোপন করতে শক্ত মাটি কিংবা পাথরে পা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ঘরের দিকে। লোকটা কে, আহত কি না, বোঝা গেল না কিছুই।

অন্যান্য ঘোড়ার সঙ্গে কোরালাই রয়েছে সাডেনের ডান স্ট্যালিয়নটা, মাথা নিচু করে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছে। লোকটা শেভলিন হলে, ওর সঙ্গে এক্ষুণি দেখা করাটা জরুরি; উল্টোটি হলে তো বিপদ! ঘোড়াটা বের করে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে পড়তে চায় ও এখান থেকে। সহজাত প্রবৃত্তির

বইঘর, কম
যেরাও

বশেই যেন বুঝতে পারছে, সম্ভব হলেই ওর কাছে চলে আসবে শেভলিন। এলে যেন ঘোড়াটা হাতের কাছে পায়, সে ব্যবস্থাই করতে চায় ও।

লোকটা যেই হোক না কেন, সন্দেহ নেই, ট্রেইলের দিকে নজর রাখবে সে। তাই গাছপালার ভিতর দিয়ে বিপজ্জনক পথ ধরে পাহাড়ী ঢাল বেয়ে নেমে এল ও ঘোড়া নিয়ে।

এবার ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে হেঁটে খালি একটা ফ্রেইট ওয়াগনের পেছন দিয়ে আস্তাবলের পেছনে এসে দাঁড়াল। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে খুঁজে বের করল ঘোড়াটা। ঘোড়াটা দেখেই হতাশ হলো ও। ব্র্যান্ড চিনতে না পারলেও শেভলিন যে বিশাল স্ট্যালিয়ন হাঁকাচ্ছে বলে শোনা গেছে, এটা সেটা নয়—বুঝতে অসুবিধে হলো না।

রায়সহ হাউসের দিকে মুখ করে বানানো হয়েছে কোরালের গেইটটা। ও পথে ঘোড়া বের করবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু কোরালের বারগুলো যদি খুলে ফেলা যায়...লোহার মত শক্ত চামড়ার ফালি দিয়ে বাঁধা ওগুলো। পকেট হাতড়ে একটা ছুরি বের করল বেটি। মুখ দিয়ে শব্দ করে ডাকল ঘোড়াটাকে।

কান খাড়া করে এগিয়ে এল ডান স্ট্যালিয়ন। আস্তে আস্তে ওটার সঙ্গে কথা বলল বেটি। নাক বাড়িয়ে দিল ঘোড়াটা, কিন্তু বেটি হাত বাড়াতেই ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। শেভলিন ওটাকে রুটির টুকরো খাইয়েছিল, সে কথা ভেবে তৈরি হয়ে এসেছে ও, আশা করছে রুটি খাইয়ে ভাব জমানো যাবে ঘোড়াটার সঙ্গে। আগ্রহের সঙ্গে রুটিটুকু শুকল ডান স্ট্যালিয়ন, তারপর প্রায় কেড়ে নিল টুকরোটো।

সাবধানে ঘোড়াটার ঘাড়ের হাত বুলিয়ে দিল বেটি কনসিডাইন। তারপর ছুরি চালিয়ে কাটতে শুরু করল কোরালবারের বাঁধন।

‘আমি হলে,’ বলে উঠল মোলায়েম একটা কণ্ঠ, ‘করতাম না কাজটা!’

চমকে উঠে পাই করে ঘুরল বেটি কনসিডাইন। ঠিক সামনেই পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে লী উইলকিন্স!

ষোল

পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে স্ট্যালিয়নটা। পিঠে একজন সওয়ারী আছে বুঝতে পারছে, অথচ লোকটার আচরণের কোন মানে খুঁজে পাচ্ছে না। অদ্ভুত কাণ্ড—লাগামে কোনরকম টান পর্যন্ত পড়ছে না। ঘরে ফিরবার ইচ্ছে হলেও আরোহীর নির্দেশ অমান্য করবার সাহস হলো না, হেঁটে চলল ঘোড়াটা। হাঁটতে হাঁটতে পুরোনো দিনের স্মৃতি ফিরে এল ওটার, বছর তিনেক আগেও অক্সিসন্ধি সব জানা ছিল এই এলাকার। চারদিকের পরিবেশ পরিচিত মনে হতেই দ্রুততর হলো চলবার গতি।

স্মৃতিশক্তি বেশ তীক্ষ্ণ বটে ঘোড়াটার। এই পথে আগেও গিয়েছে সে, মনে করতে পারছে। একটা ক্যানিয়ন পার হয়ে এল ঘোড়াটা। তারপর এগিয়ে চলল অস্পষ্ট একটা ট্রেইল ধরে। উত্তরে রয়েছে একটা মেসা, দক্ষিণে বার্না থেকে নেমে আসা নদী।

চোখ মেলে তাকাল সাডেন শেভলিন। ব্যাথায় আড়ষ্ট হয়ে আছে সমস্ত শরীর, বৃষ্টিতে ভিজে যেন বরফের মত জমাট বেঁধেছে পেশীগুলো। রূপালি বিদ্যুৎ চমকে উঠল। পলকের জন্য ফর্সা হয়ে গেল চারদিক। ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়েছে কেন বুঝতে পারল ও। হাঁতের ডানে প্রচণ্ড স্রোত বৃকে নিয়ে গর্জন করতে করতে ছুটে যাচ্ছে একটা ওশ; বায়ে আকাশছোঁয়া মেসার খাড়া দেয়াল। মাঝখানে সংকীর্ণ ট্রেইলের উপর পড়ে আছে বিশাল একটা বোল্ডার। আর অসংখ্য নুড়ি পাথরের স্তূপ। মেসার নীচের শরীর ঢালু হয়ে মিশে আছে মাটির সঙ্গে।

দপদপ করছে মাথার ভিতর। অসাড় হয়ে আছে হাতজোড়া। পমেলের সঙ্গে ফালি করা চামড়া দিয়ে হাত বেঁধে রেখেছিল ও, কেটে চামড়ার গভীরে বসে গেছে ওগুলো। টানাটানি করে বাঁধন খুলে ফেলল। সামনে বাড়াল ঘোড়াটা। ট্রেইল আর বোল্ডারের মধ্যবর্তী একচিলতে ফাঁকা জায়গাটুকু দেখে ভয় পেল ওটা। পা বাড়িয়ে পরখ করল, তারপর পিছিয়ে এল চট করে। ‘ঠিক আছে, বয়,’ ঘোড়ার উদ্দেশে বলল সাডেন, ‘আয় ওদিকে চেষ্টা করে দেখি।’

বাঁ দিকে রয়েছে মেসার ঢালু পাদদেশ, শেভলিনের কথামত পিছলে ঢালে উঠে এল ঘোড়াটা। হঠাৎ মাথার উপর থেকে গুরু গুরু একটা শব্দ ভেসে এল। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটা। জিন থেকে ছিটকে পড়ল অর্ধচেতন শেভলিন। অবচেতন মনের নির্দেশেই যেন রেকাব থেকে চট করে পা বের করে নিল ও। সশব্দে আছড়ে পড়ল ট্রেইলের উপর।

কানে তালা লাগিয়ে হুড়মুড় করে নেমে এল পাথরের ধস। পাথর আর ধুলো ময়লার আক্রমণে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল সাডেন। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। দড়াম করে মাথায় এসে পড়ল বড়সড় একটা পাথর, আঁধার হয়ে এল পৃথিবী।

আস্তে আস্তে থিতিয়ে এল ধূলির মেঘ। এবার ধসের সঙ্গে তাল মিলিয়েই যেন নেমে এল বৃষ্টি-মুষলধারে। পাথর ধসের ওপাশে আতঙ্কিত চোখে অপেক্ষা করছে কালো ঘোড়াটা। ট্রেইলটা অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে ওটাকে। মিনিট কয় অপেক্ষা করবার পর হাল ছেড়ে দিয়ে এগোতে শুরু করল জানোয়ারটা। পিছনে ধুলো আর কাদায় পড়ে রইল আহত শেভলিন।

বৃষ্টির ছাঁটে চেতনা ফিরে এল। গড়িয়ে উপড় হলো শেভলিন। হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাজারটা ছুঁচ ফুটিয়ে দিল যেন কেউ সারা গায়ে। দ্রিম দ্রিম বাদ্য বাজছে মাথার ভিতর। কাদা পানিতে মাখামাখি হয়ে গেছে পুরো শরীর। টলমল পায়ে পাথরের স্তূপ থেকে সরে এল সাডেন। ত্রিসীমানায় চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না ঘোড়াটার। হাঁটুতে হাঁটুতে এগোল ও। পড়ছে, উঠে দাঁড়াচ্ছে, ফের হাঁটছে;

আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছে ঝোপঝাড়ে-তবু হাঁটছে। অবশেষে হামাগুড়ি দিয়ে বিশাল একটা গাছের নীচে এসে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল-মনে হচ্ছে বুকের খাঁচা ছেড়ে এখুনি বেরিয়ে যাবে বুঝি প্রাণপাখিটা। দুচোখের পাতা চেপে এল ওর।

সকাল হয়েছে, অথচ সূর্যের নাম-নিশানাও নেই। গাঢ় মেঘের গায়ে ছাইরঙা একটা আভা দেখা যাচ্ছে কেবল। কালো পাইনের সারি দাঁড়িয়ে আছে আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে, বাতাসের ঝাপটায় নুয়ে যাচ্ছে ওগুলোর মাথা। গাছের পাতা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি ঝরছে। আবার চোখ মেলে তাকাল সাডেন শেভলিন। ঝরা পাইন পাতার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে ও। চিৎ হয়ে শুয়ে উঠে বসল। ক্ষতস্থান থেকে আবারও রক্ত বেরিয়েছে, রক্ত শুকিয়ে গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে শার্ট। মাথার ভিতর চলছে দুপদাপ। কাদা আর রক্তে জট পাকিয়ে গেছে মাথার চুল। পাথরের আঘাতে মাথাটা কেটে গেছে সম্ভবত। হাতড়ে হাতড়ে পিস্তল খুঁজল ও। আছে, জায়গামতই বাঁধা ওগুলো।

আস্তে আস্তে সাবধানে মাথায় হাত বুলিয়ে কাটা জায়গা খুঁজে বের করল সে, ক্ষতটার চারপাশ ফুলে কেমন যেন তুলতুলে হয়ে গেছে। বেশ জোরেই লেগেছিল আঘাতটা। দাঁতে দাঁত চেপে পাজোড়া মাজার নীচে নিয়ে এল সাডেন। গাছের নুয়ে পড়া একটা ডাল ধরে কোনমতে টেনে তুলল নিজেকে। লাটিমের মত ঘুরে উঠল দুনিয়াটা, সমুদ্র গর্জে উঠল যেন মাথার ভিতর। চোখের সামনে জ্বলে উঠল লাল নীল সবুজ আলো। গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল ও। কালো স্ট্যালিয়নটা চোখে পড়ল না কোথাও।

নিজেকে সামলে নিয়ে পা বাড়াল সাডেন, সোজা থাকবার চেষ্টা করছে। কাছেই বয়ে যাচ্ছে একটা জলের ধারা। আস্তে আস্তে কাছে গেল শেভলিন। বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ। উপড়ে পড়া একটা গাছের গুঁড়ির নীচে মাটি খুঁড়ে গর্ত বানাল। গাছের গুঁড়িটারই শুকনো দিক থেকে বাকল ছাড়িয়ে নিল। জড়ো করল একমুঠো শুকনো ঘাস। গাছ থেকে ছোট ছোট শুকনো ডাল ভেঙে ফেলল। তারপর সব একসাথে স্তূপ করে কিছুক্ষণের ভিতরেই আগুন জ্বলে নিল।

আগুনটা বেশ ভালভাবে জ্বলে উঠলে গাছের বাকল দিয়ে পাত্র বানিয়ে পানি তুলে নিল ওটায়। দু'তিনটি পাথর ত্রিকোণাকারে বসিয়ে চুলো বানিয়ে চড়িয়ে দিল পানিভর্তি বাকলটা। শরীরের একপাশে আগুনের মত জ্বলছে ক্ষতটা। মাথার ভিতর সেই অবিরাম বাদ্য। আড়ষ্ট অসাড় সারা শরীর। স্কার্ফ খুলে আগুনের উপর ধরে শুকাল সাডেন। এবার ডান হোলস্টারের পিস্তলটা বের করে যত্নের সঙ্গে পরিষ্কার করল, মুছে ফেলল সবকটা গুলি। কাজ শেষ করে আবার হোলস্টারে রাখল ওটা। ইতিমধ্যে টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে পানি।

পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে আস্তে করে ক্ষতস্থান থেকে ব্যান্ডেজটা খুলে ফেলল সাডেন। যতটা সম্ভব ভাল করে পরখ করল ওটা। হিপ বোনের ঠিক উপরে মাংস ভেদ করে চলে গেছে গুলিটা। তেমন বিপজ্জনক কিছু নয়। তবে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্ত বেরিয়ে গেছে-দুর্বল হয়ে পড়েছে সেজন্যে। লাল হয়ে আছে

ক্ষতটা। আশপাশের ঝোপঝাড় হাতড়াতে শুরু করল সাডেন। ইয়েরবা দেল পেসকাদো নামের এক জাতীয় উদ্ভিদ খুঁজে পেল ও, গাছটার পাতার ওপর রাখা গাঢ় রঙের এবং নীচের দিকটা একবারেই শাদা! গাছটার কাছেই পেয়ে গেল ওটার সমগোত্রীয় ইয়েরবা দ্য সানপেদ্রো। গাছগুলোর নীচে মাটিতে বেশ কিছু শুকনো পাতা পেল। পাতাগুলো একসঙ্গে পিষে ক্ষতস্থানটা সাবধানে ধুয়ে লাগিয়ে দিল ওগুলো। এবার যতটা সম্ভব ভাল করে আবার আগের জায়গায় বসিয়ে দিল ব্যান্ডেজটা। খানিকটা আরাম বোধ করছে এখন।

আকাশ এখনও গম্ভীর। হাতে পায়ে ঢিল দিয়ে চিৎ হয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল সাডেন। কেটে গেল কয়েকটা দীর্ঘ মুহূর্ত। উঠে আগুনটা নিভিয়ে ফেলল ও। পরিষ্কার করে নিল বাঁ হোলস্টারের পিস্তলটাও। তারপর উঠে দাঁড়াল। এ অবস্থায় কদুর যেতে পারবে জানে না। কিন্তু এখানে থাকলে যে কোন মুহূর্তে বিপদ দেখা দিতে পারে—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে পড়া দরকার। ঘোড়াটা র‍্যাক্ষে ফিরে গিয়ে থাকলে ব্যাক ট্রেইল করে ওর কাছে পৌঁছে যাবে শত্রুরা।

দক্ষিণের আকাশছোঁয়া মেসাসটা বোধ হয় ‘ডেডম্যান’ই হবে, অবশ্য ওর যদি পথ ভুল না হয়ে থাকে। পাথরের উপর দিয়ে পথ করে এগোতে শুরু করল সাডেন। মাঝে মাঝে থেমে বিশ্রাম নিচ্ছে, এগোচ্ছে। প্রায় প্রতি পঞ্চাশ গজেই থামতে হচ্ছে ওকে। তবু অনেকটা পথ পেছনে ফেলে এল। সারাক্ষণ সতর্ক চোখ রাখছে চারদিকে, লুকানোর মত কোন আশ্রয় কিংবা গুহা পাওয়া যায় কি না, এই আশায়।

একটা জায়গায় এসে দেখল ওখানে ঘাসের নীচে ঢাকা পড়ে গেছে মেসার ঢালু শরীর। ঘাসের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল ও। ট্রেইল থেকে ইচ্ছে করেই সরে থাকছে। ফলে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে ওর। ক্রমাগত আরও উপরে উঠে এল সাডেন। অনেকক্ষণ পর হঠাৎ একটা গর্জনের শব্দে সচকিত হয়ে উঠল, বুঝতে পারল এটা ওর কল্লনা নয়। যতই এগোচ্ছে ততই ধ্বড়ে উঠছে শব্দটা।

গাছপালার ভিতর থেকে বেরিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সাডেন। সামনেই ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা পুরোনো পোল কোরাল আর একটা লগ কেবিন। ওটার পেছনেই ফেনায়িত পানি বুকে নিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা ঝর্না। এটারই গর্জন শুনেছে ও। কোরালে ঘাস খাচ্ছে কালো স্ট্যালিয়নটা। সোজা কেবিনের দিকে এগিয়ে গেল সাডেন, সতর্ক দৃষ্টি চোখে। কাউকে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আরও কাছে এগোল ও, তারপরও কোন ট্র্যাক বা স্ট্যালিয়ন ছাড়া আর কোন প্রাণীর অস্তিত্ব চোখে পড়ল না।

হঠাৎ মাথা তুলে তাকাল কালো ঘোড়াটা, সাডেনকে দেখেই চিহ্নি-হিঁ করে ডেকে উঠল। এগিয়ে গিয়ে ওটার পিঠ থেকে জিন লাগাম খুলে নিল সাডেন। এবার কেবিনে এসে ঢুকল ও।

পুরূ ধুলোর আন্তরণ প্রতিটি জিনিসের উপর। তিনতাক'অলা দুটো বাংক রয়েছে কেবিনে, কয়েকটা বেঞ্চ, চেয়ার আর একটা টেবিল। লাকড়ি স্তূপ করে রাখা ফায়ারপ্লেসে। যেন আগুন জ্বালানোর প্রস্তুতি সেরে এইমাত্র কোন জরুরি

কাজে বেরিয়ে গেছে ঘরের মালিক। বেশ কয়েকটা হাঁড়ি পাতিলও রয়েছে কেবিনে।

দরজার কাছে এসে বসে পড়ল শেভলিন। রাইফেলটা ফেলে রাখল হাঁটুর উপর। স্ট্যালিয়নটা ব্যাঞ্চে ফিরে গেলে এতক্ষণে সম্পূর্ণ নাজুক হয়ে যেত পুরো পরিস্থিতি। কিন্তু এখানে আসায় সুবিধে হয়েছে। কাল রাতের বৃষ্টির পর এখন আর ওকে ট্রেইল করতে পারবে না কেউ। অনেকদিন কারও পা পড়েনি এই হাইডআউটে; জায়গাটার কথা আগে কেউ জানে কি না সন্দেহ আছে। ও'নীল জানলেও ও ছিল চাপা স্বভাবের মানুষ।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে উঠে দাঁড়াল সাডেন। খুঁজে পেতে একটা পুরোনো ব্যাড পেয়ে ঘরের খানিকটা অংশ পরিষ্কার করে নিল। তারপর আগুন জ্বেলে কফি তৈরি করল। ঘোড়াটার পিঠে যথেষ্ট খাবার বেঁধে রেখেছিল ও, গত কয়েকঘণ্টার ভিতর এই প্রথম পেট পুরে খেলো। তারপর আবার বিশ্রাম নিল কিছুক্ষণ। কিছুটা সুস্থ বোধ করতেই বাইরে এসে চারদিক জরিপ করল। কেবিন থেকে অনেকটা পেছনে মাদ ট্যাক্স ড্রতে আরেকটা অপেক্ষাকৃত ভাল কোরাল আর কেবিন পেয়ে গেল। বার্নার পাশের কেবিনটার চেয়ে অনেক নির্জন আর নিরাপদ এটা।

কালো স্ট্যালিয়নটাকে নিয়ে আবার মাদ ট্যাক্স ড্রয়ে ফিরে এল ও। কোরালে ছেড়ে দিল ওটাকে। তারপর রসদপত্র দ্বিতীয় কেবিনে রেখে, বার্নার পাশের কেবিনে ওর উপস্থিতির সব প্রমাণ মুছে ফেলল। কাজটা শেষ করতে করতে একেবারে ক্লান্তির শেষসীমায় পৌঁছে গেল সাডেন। ফিরে এসে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল একটা বাংকে; অর্চিরেই তলিয়ে গেল ঘুমের অতলে।

ঘুম ভাঙল যখন, চারদিক আঁধার করে রাত নেমে এসেছে। বৃষ্টি পড়ছে অব্যাহত ধারায়। বাইরে পুরোনো একটা আস্তাবল আছে, তাই শিকার পরে বাইরে এসে ঘোড়াটাকে আস্তাবলের একটা স্টলে রেখে কয়েকমুঠি ঘাস এগিয়ে দিল। তারপর ফের কেবিনে ফিরে গিয়ে কফি খেয়ে শুয়ে পড়ল, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

হঠাৎ চমকে জেগে উঠল ও। সকাল হয়ে গেছে। আক্ষরিক অর্থেই বৃষ্টি বরছে কেবিনের ভিতর। অন্তত ডজনখানেক জায়গায় ফুটো কেবিনটার ছাদ, অবশ্য ফায়ারপ্লেসের সামনের জায়গাটুকু একদম খটখটে শুকনো। ওখানে গিয়ে একটা ভাঙাচোরা বেঞ্চ ভেঙে আগুনে ফেলে উষ্ণে দিল আগুনটা, তারপর কফি বানিয়ে খেলো।

বেশ ভাল বোধ করছে এখন, যদিও সুস্থ হতে এখনও ঢের বাকি। জ্বলছে ক্ষতস্থানটা, তবে আগের মত ভয়ঙ্কর নয় জ্বলুনি। এই বৃষ্টির মধ্যে বাইরে বেরুনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই ক্ষতস্থানটুকু ব্যান্ডেজ করে একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়ল ও।

এই প্রথমবারের মত পরিস্থিতি গুরুত্ব সহকারে বিচার করল সাডেন। ও আহত এবং দুর্বল। প্রচুর রক্ত হারাতে হয়েছে। কাজ চালিয়ে নেয়ার মত খাবার এবং অস্ত্র রয়েছে সঙ্গে। কিন্তু স্টক বাড়াতে এখন শিকার করতে গেলে

গোলাগুলির শব্দে কেবল প্রতিপক্ষের দৃষ্টিই আকর্ষণ করা হবে। আপাতত বেশ নিরাপদ মনে হচ্ছে এ জায়গাটা। অবশ্য স্ট্যাগ হারভের মত শিকারী কুকুর পিছনে থাকলে দুনিয়ার কোন জায়গাই নিরাপদ নয়।

ছাদের কথা বাদ দিলে বেশ মজবুতই বলা যায় কেবিনটাকে। এখানে থেকে শত্রুর হামলা প্রতিহত করতে পারবে ও। কিন্তু ওরা যদি ঘেরাও করে আগুন লাগিয়ে দেয় কেবিনটায়? মরণ ফাঁদে আটকা পড়ে যাবে। জনসন কাউন্টি ওঅরের নেট চ্যাম্পিয়নের মতই অবস্থা হবে ওর। প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে।

পর পর দুটো দিন-বিশ্রাম নিল সাডেন। তৃতীয় দিনে স্ট্যালিয়নের পিঠে জিন চাপিয়ে কেবিনের পেছনে সহজে সটকে পড়া যাবে এমন একটা জায়গায় এনে লুকিয়ে রাখল। মন বলছে, শিগগিরই এখান থেকে সরে পড়তে হবে। পাথরের খাঁজে খাঁজে কেবিনে ফিরে এল শেভলিন। বিছানাপত্র ভাঁজ করছে, এমন সময় কানে এল ঘোড়ার খুরের শব্দ।

‘বললাম তো, এখানে কিছুতেই থাকতে পারে না সে!’ জ্যাকসনের কণ্ঠস্বর, ‘সবকটার মাথা বিগড়ে গেল নাকি!’

‘তা হলে,’ এবার কথা বলল কিলবার্ন, ‘আর কোথায় থাকবে!’

‘বস,’ বলল আরেকটা কণ্ঠস্বর, ‘এই যে ট্র্যাক! কেউ একজন আছেই এখানে!’

‘সাডেনই হবে! খোঁজো ভাল করে!’

দৌড়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল সাডেন শেভলিন। রাইফেল আর বিছানা ফেলে রুখে দাঁড়াল। ‘হ্যাঁ, আমিই!’ চিৎকার করে বলল ও। বিদ্যুৎ চমকের মত একসঙ্গে উঠে এল দুটো পিস্তল। বুটিদার একটা ঘোড়ার আরোহী পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়েছিল। আগুন ঝরল সাডেনের পিস্তলে। ফুটো হয়ে গেল লোকটার বুক। ক্ষীণ কণ্ঠে আত্ননাদ করে লাগাম ছেড়ে দিল সে। গড়িয়ে পড়ে গেল জিন থেকে। এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঝোপের ভিতর গিয়ে আশ্রয় নিল জ্যাকসন। আরও একজন লোক লুটিয়ে পড়ল সাডেনের গুলিতে। ওর পেছনেই গাছে এসে লাগল একটা বুলেট। গলা চড়াল সাডেন, ‘কই, কিলবার্ন, এসো! এই যে আমি! এক হাজার ডলার নেবে না! কই, এসো!’

ঘোড়ার পেটে স্পারের গুতো মারল বিশালদেহী গানম্যান। ঝড়ের বেগে সাডেনের দিকে ছুটে এল ঘোড়াটা। কিন্তু ঝজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল সাডেন। লক্ষ্যস্থির করল কিলবার্নের মাথায়। পর পর তিনবার ট্রিগার টিপল ও।

চোখের পলকে সড়সড় করে জিন থেকে পিছলে পড়ল লোকটা। কিন্তু এগিয়ে আসছে ঘোড়াটা! অবশিষ্ট লোকটার উদ্দেশ্যে একটা গুলি ছুঁড়েই ঝটকা মেরে রাইফেল আর বিছানার বাউলিটা তুলে নিল শেভলিন। পরক্ষণেই এক লাফে উঠে বসল ঘোড়ার পিঠে। এগিয়ে গেল দ্রুত।

কিন্তু পালাল না ও। ঘুরে একটা উঁচু টিবিবর মাথায় উঠে এল। নীচে মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে তিনজন লোক। ঝুকে পড়ে ওদের দেখছে আরও দুজন। রাইফেল হাতে তীক্ষ্ণ চোখে নজর রাখল সাডেন। খানিক পরই আরেকজন লোক

নিয়ে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল রাশ জ্যাকসন। কিলবার্নসহ অন্তত দুর্জন লোককে ঘায়েল করেছে সাডেন। হিসাবের খাতা আরেকটু পূর্ণ করে তুলতে চায় ও। চ্যাপ্টা একটা পাথরের পেছনে হাঁটু গেড়ে বসে রাইফেল উঁচিয়ে জ্যাকসনের দিকে পর পর তিনটে গুলি ছুঁড়ল। লোকটাকে মারতে চায় না ও। বাঁচিয়ে রেখেই পরাজয় স্বীকার করাতে হবে—অন্তত দেখিয়ে দিতে হবে শেষটা।

প্রথম গুলিটা জ্যাকসনের নিতম্ব জ্বালিয়ে দিয়ে চলে গেল। পাই করে ঘুরল সে। দুপাশ দিয়ে চলে গেল বাকি দুটো গুলি। জ্যাকসন লাফিয়ে ওঠায় পাশ দিয়ে যাবার সময় গায়ে আগুন জ্বালিয়ে দিল সেগুলোর একটা। সটান মাটিতে আছড়ে পড়ল সে। পরমুহূর্তে দুহাতে পেট চেপে ধরে লুটিয়ে পড়ল আরেকজন। গুলির বৃষ্টি থেকে রেহাই পেতে ঝোপঝাড়ে আশ্রয় নিতে ছুটে গেল বাকিরা। শেষ গুলিটায় একটা রাইফেলের বাঁট গুঁড়িয়ে দিল সাডেন। বন্দুকে গুলি ভরতে ভরতে দেখল হামা দিয়ে এগোঁলার চেষ্টা করছে জ্যাকসন। সাথে সাথে মাত্র একফুট তফাতে একটা বুলেট মাটিতে সঁধিয়ে দিল সাডেন।

‘নোড়ো না, গর্দভ!’ বলল ও চিৎকার করে, ‘ভীতুর ডিম, এক চুল নড়লেই দেব শেষ করে!’

ঝোপ থেকে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। জবাবে উপর্যুপরি তিনবার অগ্নিবর্ষণ করল শেভলিনের পিস্তল। ভারি কিছু পতনের শব্দ ভেসে এল ঝোপ থেকে। টিবির উপর থেকে পিস্তল লোড করতে করতে নেমে এল সাডেন, চেপে বসল ঘোড়ার পিঠে, রওনা হলো র‍্যাঞ্চার দিকে।

শরীরটা খুব খারাপ, জানে সাডেন। কিন্তু পালিয়ে বেড়ানোর পালা শেষ হয়েছে এবার।

ডেডম্যান মেসার চুড়োর দিকে চলে যাওয়া একটা ক্যাটল ট্রেইল ধরে দ্রুত এগিয়ে গেল শেভলিন। দূরে দেখা যাচ্ছে ‘টুইন বাটস’। এক সময় ঘোড়া হাঁকিয়ে পেছনে ফেলে এল ওগুলো। হার্ডক্রাবল্ পার হয়ে একটা চাতালের পেছন দিককার ক্যানিয়নে নেমে পড়ল সাডেন। চাতালটা থেকে বেটির কেবিন আবছাভাবে চোখে পড়ে।

এখন কি কেবিনে আছে বেটি কনসিডাইন? গত কয়েকদিনের ভিতর এই প্রথম হাসল সাডেন। ‘বুঝলি, দারুণ ব্যাপার,’ ঘোড়াটার কানে কানে বলল ও, ‘ওর সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে!’

আস্তে আস্তে সিকামোরের ভিতর দিয়ে কেবিনের কাছে এসে পৌঁছল সাডেন। কোনরকম নড়াচড়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। কোন ধোঁয়ার রেখাও নেই চিমনির মুখে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দাঁড়াল শেভলিন। এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলল। সতর্ক তৈরি হাত পিস্তলের বাঁটে।

ঠাণ্ডা হয়ে আছে শূন্য ঘর। চুলো ছুঁয়ে দেখল, ঠাণ্ডা। অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে বেটি। দুপুরের খাবার থালাবাসন সাজানো রয়েছে টেবিলে। তার মানে হঠাৎ করেই বেরিয়ে গেছে মেয়েটা। অন্তত একদিন আগে; কিংবা তার আগেও হতে পারে।

অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে পাকস্থলীর ভিতর। আস্তে আস্তে চারপাশে চোখ বোলাল ও। বেটির রাইফেল কিংবা পিস্তল কোনটাই নেই।

ক্যালেন্ডারের দিকে তাকাল সাডেন। পাঁচ তারিখের ঘরে দাগ কাটা দেখা যাচ্ছে, তা হলে আজ ছ'তারিখ। তার মানে গতকালই বেরিয়েছে ও। কমপক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা আগে।

বাইরে এসে ট্রেইলের দিকে তাকাল সাডেন। পাহাড়গুলোর ওপাশে রয়েছে রেডফ্রিক; উত্তর-পশ্চিমে 'জে-ডট-ও' র‍্যাঞ্চ। কোথায় গেছে মেয়েটা? কান্দিকে?

সতের

ঠাঙা চোখে লী উইলকক্সের দিকে তাকাল বেটি কনসিডাইন। আতঙ্কিত হয়ে উঠল ভিতরে ভিতরে। দু'চোখে আগুন ঝরছে যেন লোকটার। এমনিতেই খেয়ালি চরিত্রের লোক লী উইলকক্স; কখন যে কী করে বসবে জানবার উপায় নেই। এই মুহূর্তে ভয় হচ্ছে লোকটা একেবারে বিগড়ে না যায়! মনের ভিতর থেকে কেউ যেন সতর্ক করে দিচ্ছে ওকে, সাবধান, বিপদ আসতে পারে এর কাছ থেকে।

তবে উইলকক্স সম্পর্কে যদূর জানে, তাতে কিছুটা ভরসাও পাচ্ছে বৈকি বেটি কনসিডাইন। একজন কঠোর পরিশ্রমী ধর্মভীরু পাইওনিয়ারের ছেলে উইলকক্স; ওর মা ছিলেন স্বামী অন্তপ্রাণা এক মহিলা। ওদের দুজনের কিছুটা শুভ প্রভাব এর মধ্যে না থেকেই পারে না।

'ঘোড়াটা নিতে এসেছি আমি,' আস্তে করে বলল বেটি, 'সাডেন শেভলিনের ঘোড়া এটা।'

'সেজন্যেই তো আমি এখানে,' বেটির দিকে চেয়ে জবাব দিল উইলকক্স। 'ঘোড়া নিতে ফিরে আসবেই সে।'

'আমার তা মনে হয় না। তা হলে ঘোড়াটা নিতে আসতাম না আমি। যত্ন করে রাখার জন্যে নিতে চাচ্ছি ওটাকে। এ রকম ভাল একটা ঘোড়া খামোকা ফেলে রাখার কোন মানে নেই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল লী উইলকক্স, কিন্তু লোকটা আসলে কী ভাবছে বোঝা গেল না। 'সে তোমার কে?' হঠাৎ বলে উঠল লী, 'সাডেনের সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক?'

বরাবরই খোলা মনের মেয়ে বেটি কনসিডাইন। সরাসরি উইলকক্সের চোখে চোখ রেখে সত্যি কথাটাই বলল ও। 'ওকে আমি ভালবাসি। জানি না, ও আমাকে বাসে কি না। এ নিয়ে ওর সঙ্গে কোন কথাও হয়নি। তবুও তোমার মা যেমন তোমার বাবাকে ভালবাসত, তেমনি মনে প্রাণে সাডেনকে ভালবাসি আমি।'

একটু যেন নরম হলো লী উইলকক্সের অগ্নিদৃষ্টি। তারপর আচমকা উচ্চ কণ্ঠে

হেসে উঠল সে। হাসির বানে নিভে গেল চোখের আগুন। ‘তা হলে দেখছি, মহা ভাগ্যবান বলতে হয় লোকটাকে! কপাল বটে! ঠিক আছে, স্ট্যালিয়নটাকে গেইট দিয়েই বের করা যাক এসো। অনর্থক একটা ভাল কোরাল নষ্ট করারই বা কী দরকার!’

একেবারে সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার। বেটির সং সরল স্বীকারোক্তিতে হয়তো সম্ভ্রষ্ট হয়েছে উইলকক্স! ঘুরে এসে কোরালে ঢুকে স্ট্যালিয়নের পিঠে জিন চাপিয়ে দিল সে। ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল বেটি। ও বেরিয়ে আসবার জন্য গেইট খুলে ধরল লোকটা। বেটি বেরিয়ে আসতেই নিজের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল সে। ‘আমিই বা আর এখানে থেকে কী করব? তুমি তো আগেই বলে দেবে ওকে। তারচেয়ে তোমার সঙ্গেই আসছি, জ্যাকসন কিংবা তার লোকজন মেয়েদের সম্মান করতে জানে না।’

চুপচাপ অনেকক্ষণ এগিয়ে চলল ওরা। হঠাৎ এক সময় নীরবতা ভেঙে কথা বলে উঠল লী উইলকক্স। ‘মায়ের কথা তা হলে জানো তুমি? আমার মায়ের মত এমন মহিলা আর চোখে পড়েনি। বাবাকে কী যে ভালবাসত সে। আমিও যদি তেমন একটা মেয়ে খুঁজে পেতাম; যেমন শেভলিন পেয়েছে তোমাকে। তবে, কে জানে সাডেন মারা গেলে হয়তো তাকে ভুলে যাবে তুমি।’

‘না, মরবে না ও। অন্তত এখন নয়। ওর সামনে দাঁড়ানোর মত কেউ এ এলাকায় নেই।’

কাঁধ ঝাঁকাল উইলকক্স। এখন অনেক স্বাভাবিক মনে হচ্ছে ওকে।

‘হয়তো নেই। কিন্তু এখানে সবাই ওর বিরুদ্ধে খেপে উঠেছে। জ্যাকসনকে এখন আর থামানো যাবে না।’ ওদিকে ম্যাককার্থি সীমানা পেরিয়ে এসেছে। বাঁচতে হলে শেভলিনের সামনে একটা পথই এখন খোলা আছে—কেটে পড়া।’

‘এবং সেটা করবে না ও।’

‘ঠিক।’

ত্রসিংয়ে বেটির কাছ থেকে বিদায় নিল লী উইলকক্স। সম্ভ্রুত রেডক্রিকে যাচ্ছে। জিনের উপর বসে ওকে চলে যেতে দেখল বেটি। একেবারে চলে যাচ্ছে—নাকি ঘুরে আবার ফিরে আসবে? আসতেও পারে। ভাল হোক খারাপ হোক পশ্চিমেরই মানুষ লী উইলকক্স। মেয়েদের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করে না পশ্চিমের কোন পুরুষ। স্বামী, ছেলে, ভাই সবাইকে হত্যা করলেও মেয়েদের অসম্মান করবে না সে।

নদী পেরিয়ে ওপারে উঠে সিকামোরের নীচে নিজের কেবিনের দিকে এগোল বেটি। যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনি শান্ত নির্জন কেবিন। ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রেখে কেবিনে ঢুকল ও। আগের মতই আছে সবকিছু। ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল বেটি। চিরুনি তুলতে গিয়েই দেখতে পেল চিরকুটটা। তুলে নিল।

“এখানেই থেকে। যাচ্ছি ‘জে-ডট-ও’তে। পরে দেখা হবে।”

‘ওটা আমার হাতে দাও!’

কোন পায়ের আওয়াজ পায়নি বেটি চমকে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল ও। সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুদূত স্ট্যাগ হারভে। আতঙ্কে কলজে শুকিয়ে এল। চিরকুটটার জন্য হাত বাড়াল হারভে।

স্ট্যাগ হারভের নাম আর কীর্তিকলাপের কাহিনী বহুবার শুনলেও কাছাকাছি ভাকে এই প্রথম দেখছে বেটি। স্নান নীল চোখের দিকে তাকাল ও। ঝকঝকে শাদা দুপাটি দাঁত দেখা যাচ্ছে ঠোঁটের ফাঁকে—হাসছে লোকটা। কোমরে বেশ নিচু করে বেঁধে রেখেছে গানবেল্টটা। বহু লোকের প্রাণসংহারী পিস্তল দুটো ঝুলছে হোলস্টারে।

স্ট্যাগ হারভে, শোল বছর বয়সে স্ক্যালপ হান্টার, ক্যাটল ওঅরে পেশাদার লড়য়ে আঠারোয়, বিশেষ জুয়াড়ী আর অপরাধী স্যালুন মালিকদের ভাড়াটে খুনী; রাসলিং; ঘোড়াচুরি, রাহাজানি—হেন কুকার্জ নেই যা স্নে করেনি। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে তার একটা পরিচয়ই উঠে আসে—খুনী। শেলবিভিল ওঅরে ওঅট মুরমোনের সাগরেদ ছিল। সামনাসামনি কিংবা আড়াল থেকে সমান ক্ষিপ্ৰতায় মানুষ হতায় তার জুড়ি নেই। মায়া মমতাহীন ভয়ঙ্কর এক মানুষ মারার মেশিন বৈ আর কিছু নয় সে। লড়াই যত ভয়ঙ্কর হয়, উত্তপ্ত হয়, ততই স্থির অচঞ্চল রূপ নেয় সে। কোন কিছুকে পরোয়া করে না।

উপায় নেই। চিরকুটটা দিতে না চাইলে জোর করে কেড়ে নেবে। তার চেয়ে বরং এটা এর হাতে দিয়ে উপযুক্ত সময় আর সুযোগের অপেক্ষায় থাকাই উচিত হবে। কোন কথা ছাড়াই স্ট্যাগের হাতে চিরকুটটা তুলে দিল বেটি।

চিরকুট হাতে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত ঠাণ্ডা চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল হারভে। তারপর পড়ল ওটা।

এবার ঘুরে দাঁড়াল সে। ‘সিমনস্, তুমি এখানে থেকে বাকি সবাইকে “জে-ডট-ও”তে চলে যেতে বলো। সাডেন শেভলিন এখানে এসেছিল, এখন ওদিকেই গেছে সে। ব্যাঞ্চে গিয়ে তাকে না পেলো কিংবা ট্রেইল হারিয়ে ফেললে ওরা যেন রেডক্রিকে ফিরে যায়। ওদের আবার এখানে আসার কোন দরকার নেই।’

দুমড়ে মুচড়ে ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলল স্ট্যাগ সে চিরকুটটা। ‘একটু কফি দাও দেখি,’ হঠাৎ কথাটা বলেই বেটির রাইফেল আর পিস্তল তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হারভে।

কাবার্ড থেকে ‘কফি মিল’ বের করে আস্তে আস্তে কফি গুঁড়ো করতে লাগল বেটি। মনে মনে পরিস্থিতি বিচার করছে। বিপদে পড়েছে ও। কিন্তু বোকার মত তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে যাওয়া ঠিক হবে না। চিন্তা-ভাবনা করে এ অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার সুযোগ খুঁজতে হবে, নইলে সাডেনকে কোনভাবেই সাহায্য করতে পারবে না।

চুলো ধরিয়ে পানি চাপিয়ে দিল বেটি। সাডেন অবশ্য সাবধানেই থাকবে। খামোকা ঝুঁকি নেয়ার মত অনভিজ্ঞ ও নয়। এই মুহূর্তে ওর বিচারবুদ্ধির উপর আস্থা রাখা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। ও হয়তো ‘জে-ডট-ও’তে গিয়ে দেখবে ঘোড়াটা নেই—ওর পায়ের ছাপও নিশ্চয়ই চোখ এড়াবে না তার।

বইঘর, কম
ঘেরাও

আসলে উইলকব্রের সঙ্গে যখন ক্রসিংয়ের দিকে আসছিল বেটি, ঠিক তখনই মাত্র দুশো গজ দূরে ওদের অতিক্রম করেছে সাডেন শেভলিন 'জে-ডট-ও' র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছেই একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে পড়ল সাডেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট রোল করল। শরীরটা বেশ ভাল লাগছে আজ। ক্ষতটায় জ্বলুনি হলেও চলাফেরা করতে অসুবিধে হচ্ছে না। সিগারেট টানতে টানতে বেশ কিছুক্ষণ র‍্যাঞ্চ হাউসটা পরখ করল। কেউ নেই ঘরে, অনুমান করে আড়াল ছেড়ে বেরুতে যাবে, হঠাৎ চোখে পড়ে গেল বেটির জুতোর ছোট ছোট অথচ গভীর ছাপ। ট্র্যাক পরীক্ষা করতে শুরু করল ও। গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ওর মতই অপেক্ষা করছিল বেটি, তারপর ঘুরে আস্তাবলের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মানে ঘরে লোক ছিল তখন।

সতর্ক পায়ে ট্রেইল অনুসরণ করে কোরালের কোণে এসে দাঁড়াল সাডেন। কোরাল বারের বাঁধনে ছুরির পোঁচ দেখতে পেল। ওখানেই চোখে পড়ল আরেকটা ট্র্যাক, পুরুষের। কিন্তু কার বুঝতে পারল না।

ধস্তাধস্তির কোন আলামত নেই...একসঙ্গে গেইটের দিকে এগিয়ে গেছে ওরা...লোকটাই গেইট খুলেছে...বের করে আনা হয়েছে স্ট্যালিয়নটা।

ছাপা হরফের মত ট্রেইল পড়ে যাচ্ছে ও। চোখের সামনে যা দেখছে তা-ই নয় নেপথ্যের ঘটনাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ওদের আচরণ, চিন্তা ভাবনা, এমনকী পরস্পরের প্রতি মনোভাব পর্যন্ত গোপন থাকছে না।

এখানে ঘোড়ায় চেপেছে মেয়েটা...তারপর নিজের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেছে লোকটা...দীর্ঘদেহী, কিংবা হয়তো লম্বা পায়ের অধিকারী। হারভে নয়, জ্যাকসনও নয়। লম্বা লোকটার ঘোড়ার খুরের চাপ পরীক্ষা করল শেভলিন; এবার চিনতে পারল লোকটা কে: লী উইলকব্র।

এক সঙ্গে কেবিনের দিকে গেছে ওরা দুজন। তা হলে কেবিনেই ফিরে গেছে বেটি কনসিডাইন। হয়তো পথেই কোথাও ওদের ক্রস করেছে ও, কিংবা ট্রেইল ধরে না আসবার জন্যই হয়তো দেখা হয়নি।

দাঁড়িয়ে পড়ে একটু ভাবল সাডেন। শো ডাউন একটা হবেই। কিন্তু ঠিক এ মুহূর্তেই উইলকব্রের মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় না ও। সবার আগে জ্যাকসন আর স্ট্যাগ হারভের ব্যবস্থা করতে হবে। একটু বেতালের লোক হলেও কথারার্থা বলে শেষ পর্যন্ত হয়তো আপোষ করা যাবে লী উইলকব্রের সঙ্গে। কিন্তু জ্যাকসনের ক্ষেত্রে তেমন কোন সম্ভাবনা নেই।

ম্যাককাথির কথা ঠাই পেল না ওর চিন্তায়। এ লড়াইয়ের বাইরে ছিল লোকটা। সে যে সীমা অতিক্রম করেছে তা জানবে কী করে সাডেন?

পালিয়ে বেড়ানোর পালা চুকেছে এবার। তার আর প্রয়োজন নেই। স্পষ্টতই ন্যায়ের পক্ষে আছে ও-প্রাণ গেলেও দায়িত্ব পালনে পিছিয়ে যাবে না। সোজা রেড ক্রিকে গিয়ে হাজির হতে হবে ওকে। যদি সামনাসামনি মোকাবিলায় নামতে চায় ওরা-বেশ তো, আপত্তি নেই।

ধীরে ধীরে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে রওনা হলো সাডেন। এগোচ্ছে ও। সামান্যতম

শব্দও ফাঁকি দিতে পারছে না ওর কানকে। সতর্ক চোখে নজর রাখবার চেষ্টা করছে চারদিকে। কিন্তু সারাক্ষণ যেন সচেতন থাকতে পারছে না ও, ভারি হয়ে আসতে চাইছে চোখের পাতা, বুকের কাছে ঝুলে পড়ছে মাথাটা। ঝিমুচ্ছে। অনেক কষ্টে মাথা তুলে চোখ মেলে তাকানোর চেষ্টা করল সাডেন। পারল না-ব্যর্থ হলো ওর চেষ্টা।

মেসা ট্রেইল থেকে বেরিয়ে একটা গালশে ঢুকে পড়ল সাডেন শেভলিন। বেশ কিছুক্ষণ এগিয়ে চলল এটা ধরেই। অবশেষে ছায়াময় সবুজ ঘাসে ভরা ছোট একটা মাঠে এসে পৌঁছল। বেশ গাছ-পালাও দেখা যাচ্ছে এখানে। গাছ-পালার ভিতরে ঘোড়াটা ছেড়ে দিয়ে ছায়ায় বসে জুতো খুলে শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে। শুতে যা দেরি, অমনি ঘুমের কাছে নতি স্বীকার করল ওর চোখজোড়া।

শেভলিন যাবার খানিক পরেই ‘জে-ডট-ও’ র‍্যাঞ্জে এসে পৌঁছল হারভের তিন খুনে। তিনজনই ক্লান্ত, অবসন্ন, ক্ষুধায় কাতর। বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ পেয়ে আবার এগোনোর সব উৎসাহে ভাটা পড়ে গেল ওদের। কফি বানিয়ে খেলো; ‘জে-ডট-ও’-র ভাঁড়ার ঘর উজার করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে উদর পূর্তি করল। তারপর আবার বেরুনোর প্রস্তুতি নিল ওরা।

‘শোনো, কেস্টারসন,’ বলল হারডি। ‘তুমি বরং এখানে থেকে যাও; বসে থাকো ওত পেতে। ব্যাটা আবার ফিরে আসতে পারে।’

আপত্তি করবার কোন কারণ নেই কেস্টারসনের। ঘোড়া হাঁকাতে হাঁকাতে হয়রান হয়ে গেছে, বিনাবাক্যব্যয়ে রয়ে গেল সে। ঘোড়াটা আস্তাবলে লুকিয়ে রেখে র‍্যাঞ্চ হাউসের ভিতরে চারদিকে নজর রাখা যাবে এমন একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ল।

এবার, ভাবল হারডি, নির্দিষ্ট চেহারা নিচ্ছে পুরো ব্যাপারটা। স্ট্যাগ হারভে আর পিট সিমনস্, ওরা দুজন আছে মেয়েটার কেবিনে; ‘জে-ডট-ও’তে আছে কেস্টারসন; ওদিকে ‘বক্সড-আরে’ও লোক থাকায় রসদ সংগ্রহের প্রায় সবকটা উৎসই এখন বন্ধ হয়ে গেছে সাডেনের জন্য। যা হোক, ‘জে-ডট-ও’ থেকে মাত্র দুমাইল দূরে এসেই সাডেনের ট্রেইল হারিয়ে ফেলল ওরা। তারপর রেডক্রিকে ফিরে এসে দেখল এখানেও নেই সে। সোজা ম্যাককার্থির কাছে গিয়ে রিপোর্ট করল হারডি।

পুরো ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ম্যাককার্থির কাছে-বেশ সুবিধেজনক মনে হচ্ছে পরিস্থিতি। উপযুক্ত সময়েই মাঠে নেমেছে ও। শেষ হয়ে এসেছে খেলাটা। লুড ফেলার আর ক্রে মিলার পটল তুলেছে, বাজি ধরে বলা যায় লড়াই শেষ হওয়ার অনেক আগেই শেষ হয়ে যাবে রাশ জ্যাকসন আর লী উইলকক্স। তারপর মাত্র একজনের সঙ্গে ভাগাভাগিতে যেতে হবে ওকে।

‘চমৎকার,’ বলল ম্যাককার্থি, ‘কেস্টারসনকে “জে-ডট-ও”তে রেখে এসে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। এখন ওখানে গেলেই মারা পড়বে সাডেন।’ পকেট

থেকে একমুঠো স্বর্ণমুদ্রা বের করে তা থেকে বিশ ডলারের একটা মুদ্রা বেছে নিয়ে হারডিকে দিল ম্যাককার্থি। ‘যাও, একটু ড্রিঙ্ক করো গে,’ সহজ কণ্ঠে বলল ও, ‘কিন্তু দেখো আবার বাড়াবাড়ি কোরো না যেন।’

মুদ্রাটা পকেটে ভরে ঘুরে দাঁড়াল হারডি, পা বাড়াতে গেল সে সামনে।

‘টাকাটা কোথেকে এল মনে রেখো,’ নিচু গলায় বলে উঠল ম্যাককার্থি।

ফিরে তাকাল না হারডি। ‘সহজে কিছু ভুলি না আমি, মিস্টার ম্যাক, বিশেষ করে টাকা পয়সার ব্যাপার তো নয়ই। কথাটা মনে থাকবে আমার। ওই যে দেখছো, সান ক্যামবল, ও-ও কিন্তু খুব ভাল মানুষ।’

পকেট থেকে আরেকটা ‘স্বর্ণ-ঈগল’ বের করল ম্যাককার্থি। ‘এটা তা হলে ওকে দিয়ো। আর হ্যাঁ, কী ঘটছে না ঘটছে জানিয়ো আমাদের, কেমন?’ একটু ইতস্তত করল সে, বুঝছে না, কদম্বর বলা উচিত এদের। শেষে বলেই ফেলল, ‘তোমাদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ রাখতে চাই। এ ধরনের একটা লড়াই শেষে টাকা দেয়ার মত খুব বেশি লোক বেঁচে থাকে না।’

হাঁটতে হাঁটতে ব্যাংকে ফিরে এল ম্যাককার্থি। ওর ইঙ্গিত লোকটার মাথায় ঢুকছে কি না কে জানে। বোঝা তো উচিত, লোকটাকে বেশ ধৃত বলেই মনে হয়; টাকা খাওয়ার ব্যাপারেও উৎসাহী দেখা গেল তাকে। যাই ষ্টুক না কেন, চল্লিশ ডলার খরচটা নেহাত জলে যাবে না, এটা নিশ্চিত। তা ছাড়া স্ট্যাগ হারভের চাইতে অনেক নিরাপদ এরা। স্ট্যাগের দিকে তাকালেই যেন হাত-পা হিম হয়ে আসতে চায়-জলজ্যাস্ত একটা পিশাচ!

ঘুম ভাঙল সাডেনের। চোখ মেলেই দেখল একজোড়া বিশাল পা, একটু উঠল ওর দৃষ্টি, হাঁটুর উপর ফেলে রাখা একটা রাইফেল চোখে পড়ল। এবার পুরোপুরি চোখ মেলে তাকাল ও। চোখাচোখি হয়ে গেল ক্ষতবিক্ষত চেহারার হুইলারের সঙ্গে।

বিস্ময়করভাবে হেসে উঠল বিশালদেহী হুইলার। ‘বাহ,’ বলল সে, ‘মারপিটের মত ঘুমেও ওস্তাদ দেখছি তুমি।’

‘তুমি, তুমি এলে কোথেকে?’ সাবধানে উঠে বসে জানতে চাইল সাডেন। হুইলারের হঠাৎ আবির্ভাব হতবাক করে দিয়েছে ওকে। মারপিটের পর আর একটি বারের জন্যও এর কথা ভাবেনি ও। অথচ ভাবা উচিত ছিল-বুঝতে পারছে এখন। হুইলার ভেবেছে, কোন সন্দেহ নেই।

‘এমনি ঘুরঘুর করছিলাম,’ মাটিতে দাবিয়ে সিগারেট নেভাল হুইলার। ‘তোমাকে বেঘোরে ঘুমাতে দেখে ভাবলাম পাহারা দিয়ে রাখা দরকার। এই তো ঘণ্টা দুয়েক আগে জ্যাকসনের কয়েকজন লোক চলে গেল ওদিক দিয়ে।’

‘দুঘণ্টা ধরে এখানে আছ তুমি?’

‘প্রায় তিন ঘণ্টা। তোমাকে জাগাতে ইচ্ছে করছিল না।’

পকেট হাতড়ে তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট রোল করতে শুরু করল শেভলিন। জিভে কাগজ ছুঁয়ে চোখ তুলে তাকাল ও। ‘মতলব কী, হুইলার?’

হেসে উঠল হুইলার। সূক্ষ্ম কৌতুকের ছোঁয়া চোখের তারায়। এখনও টকটকে লাল হয়ে আছে একটা চোখ। 'কিসের মতলব? তোমাকে দেখেই মারপিটের কথা মনে পড়ল, আমাকে হারিয়ে দিয়েছিলে—বাস, ঠিক করে ফেললাম কিছুতেই মরতে দেয়া যাবে না তোমাকে, তাই মাঠে নেমে গেলাম।'

হুইলারের দিকে চেয়ে রইল সাডেন শেভলিন। 'তার মানে,' অবিশ্বাসের সঙ্গে বলল ও, 'আমার পক্ষে তুমি?'

'নিশ্চয়ই,' হাই তুলে এক হাতের কনুইতে হেলান দিয়ে বসল হুইলার। ঘাসের ডগা চিবুচ্ছে। 'তোমার সঙ্গে তো আমার কোন শত্রুতা নেই। একটুকরো ভাল জমির দরকার ছিল; ভেবেছিলাম "জে-ডট-ও"-র কিছু জমি নিয়ে নেয়া কঠিন হবে না। সবাই-ই অবশ্য তা-ই ভেবেছিল। কেউ হয়তো ঝামেলা বাধাতে চেয়েছে—কেউ চেয়েছে ফাঁকতালে ফায়দা লুটতে।

'সবাই বলাবলি করছিল, তুমি নাকি একজন গানম্যান, খুনী। সে জন্যেই তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। কিন্তু যেই পিস্তল ফেলে আমারই স্টাইলে মারপিট করে শুইয়ে দিলে আমাকে—অমনি ভাল লেগে গেল তোমাকে।'

উঠে দাঁড়াল সাডেন শেভলিন। হাত চালিয়ে চুল আঁচড়ে নিল। টুপিটা মাথায় বসিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল সামনে। 'তোমাকে পাশে পেয়ে খুব খুশি হলাম, হুইলার,' সহজ কণ্ঠে বলল ও।

কোন জবাব দিল না হুইলার। কিছুক্ষণ ভাবল সাডেন শেভলিন। তারপর বলল, 'এবার একটা কথা সোজা বলে রাখছি। তোমার সাহায্য নিচ্ছি আমি, কিন্তু আর কাউকে চাই না এর মধ্যে। জানোই তো, অতি সন্ধ্যাসে গাজন নষ্ট। আর কাউকে লাগবেও না, আমরা দুজনই যথেষ্ট।' একটু থামল ও। 'ভাল লোক আর কজন আছে তোমার সঙ্গে বলো তো?'

'পাঁচ ছজন হবে—বেশির ভাগই পূব থেকে আসা ফার্মার, একজন আইরিশ রাজমিস্ত্রীও আছে অবশ্য।'

'ঠিক আছে,' সিগারেটে টান দিল শেভলিন, 'লড়াইটা শেষ হোক, তোমাদের প্রত্যেককে দেড়শো একর করে ভাল জমি দেয়ার ব্যবস্থা করব আমি। জমির মালিকানা র‍্যাঞ্চার হাতেই থাকবে। অংশীদার হিসেবে ওখানে চাষাবাদ করবে তোমরা। র‍্যাঞ্চ থেকেই বীজের ব্যবস্থা করা হবে। ফসলের আধাআধি নেবে তোমরা, আর অর্ধেক পাবে র‍্যাঞ্চ। তবে পাঁচ বছর পরেও যদি এখানে থাকো, জমির পুরো মালিকানাই তোমাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে।'

'ঠিক আছে,' লম্বা করে দম নিল হুইলার। 'বিনা আপত্তিতেই রাজি হয়ে যাবে সবাই। ওদের, আমি চিনি—মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেই চমৎকার।' রাইফেল হাতে তুলে নিল ও। 'হ্যাঁ, এবার বলো, কোথায় যেতে হবে?'

'কেন, রেড ক্রিকে,' শান্ত কণ্ঠে বলল শেভলিন, 'সবচেয়ে আগে রেড ক্রিকে যাব আমরা!'

আঠার

নতুন করে আর হামলা হয়নি জিম ন্যারোজ কিংবা তার প্রেসের উপর। একটা সতর্ক চোখ খোলা রেখে যেন সূর্যের তাপে পুড়ছে রেড ক্রিক শহর। শান্ত নিস্তর্র চারদিক। কিন্তু এই নিস্তর্রতা যে প্রলয়ঙ্কর ঝড়েরই পূর্বাভাস, পরিষ্কার বুঝতে পারছে সবাই। রেড ক্রিকের অধিবাসীদের অনেকেই টেক্সাস কিংবা মেক্সিকো থেকে এসেছে। মডারেট আর রেগুলেটরদের মাঝে তিজ্ঞ সংঘর্ষের কথা ভোলেনি ওরা কেউ-ভুলবার নয়।

হারডি আর সান ক্যামবল্ শহরে ফিরে এসেছে নজর এড়ায়নি কারো। শহরের সবার কাছে পরিচিত ওরা দুজন। ম্যাসন কাউন্টি ওঅরে ছিল হারডি-জেল পলাতক আসামী; সনোরাযও একবার জেল ভেঙে পালিয়েছিল সে। সান ক্যামবল্ একজন ইন্ডিয়ান ফাইটার, খুন-খারাবিতে অভ্যস্ত, কিন্তু কখনও কোনরকম কৌতূহল প্রকাশ করে না। অনুভূতিহীন কঠিন মানুষ দুজনই। ন্যায়-অন্যায় বোধের বালাই নেই। হুইস্কি ছাড়া আর কিছুতে উৎসাহ নেই। যার পয়সায় খাটছে, তার কথাই ওদের কথা।

রেড ক্রিক হোটেলের নিজের ঘরের বিশাল জানালার সামনে বসেই পুরো রাস্তার উপর চোখ রাখতে পারছে মরটন শবি। তথ্য সংগ্রহে সিদ্ধহস্ত মরটন, এ শহরের জনমত বুঝে নিতে খুব একটা সময় লাগেনি ওর। সাডেন শেভলিনের হাতে ও'নীলের র্যাপ্ত হস্তান্তর সংক্রান্ত যে কোন আইনগত ঝামেলা সামাল দেওয়ার জন্য অগ্রিম টাকা পেয়েছে মরটন শবি। এবং রেড ক্রিক ছাড়বার আগে শেভলিনকে জায়গামত বসা অবস্থায় দেখে যেতে চায় ও।

হারডি আর সান ক্যামবল্কে শহরে পৌছতে দেখেছে মরটন শবি, ম্যাককার্থির সঙ্গে হারডিকে কথা বলতে দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে ও। টাকা-পয়সার হাত বদলও নজর এড়ায়নি। ম্যাককার্থির সঙ্গে পরামর্শ শেষে স্যালুনে গিয়ে ঢুকেছে হারডি-তার পিছন পিছন সান ক্যামবল্।

শহরের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কুশলী এই তরুণ আইনজীবী সুযোগ পেলেই সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলে শহরবাসীর মনোভাব বুঝে নিয়েছে, জায়গামত নিজের মতামত জানাতেও ভুল করেনি। যদূর বুঝতে পেরেছে, এই শহরের প্রতিটি লোক এখন লড়াইয়ের একটা পরিসমাপ্তি চায়; কারণ কেউ জানে না কার মরণ ঘনিয়ে আসছে এরপর। বিনা দোষে গিড ব্ল্যাক আর জ্যাক ও'নীলেকে হত্যা করেছে শান্তি বাহিনীর লোকেরা।

হোটেলের জানালায় বসে হারডি আর সান ক্যামবল্কে দেখে মরটন শবি ভাবল, আরও অনেক দূর গড়াবে ঘটনাধারা।

হারডি। ছিপছিপে লম্বা, একহারা গড়নের শরীর, রুক্ষ চেহারায়ে শেয়ালের চোখের মত ধূর্ত একজোড়া চোখ। বারের উপর হাতে ভর দিয়ে ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিল সে। স্থূলদেহী সান ক্যামবল তার পাশে এসে দাঁড়াল। একদফা মদ গলায় ঢেলে ফের ফরমাশ দিল ওরা।

রাস্তায় দুটো ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠল। শুনতে পেল না দুজনের কেউ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওদের দেখতে পেল মরটন শবি। মুহূর্তে টান টান হয়ে গেল শরীরের প্রতিটি পেশী। ও'নীলের সঙ্গে শেভলিনকে দেখেছিল ও, চেনে। কিন্তু ওর সঙ্গে কালো টুপিঅলা বিশালদেহী লোকটাকেও চিনে ফেলল একনজরে—লোকটা হুইলার ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

হোটেল থেকে ঝটপট বেরিয়ে এল মরটন শবি। হোটেল বিন্ডিংয়ের পেছন দিয়ে ঘুরে দৌড়ে প্রায় ওদের সঙ্গে সঙ্গেই আস্তাবলের গেটে পৌঁছে গেল। স্যালুনের দুই খুনীর কাছে খবরটা পৌঁছে দিতে দৌড়ে গেল কে একজন।

মরটন শবিকে দেখে থামল শেভলিন। আরেকটু কাছাকাছি হতেই চিনতে পারল ওকে। 'ও'নীল ওর র‍্যাক্সটা আমাকে দিয়ে গেছে, সত্যি নাকি কথাটা?' জানতে চাইল ও।

'বাজি রাখতে পারো। কিন্তু সাবধান, নইলে হারাতে হবে সব। স্ট্যাগ হারভের দুই স্যাক্সাং রয়েছে স্যালুনে। হারডি আর সান ক্যামবল।'

'হাড় বজ্জাত,' তামাক চিবুতে চিবুতে বলল হুইলার, 'কোন দরজা দিয়ে ঢুকতে হবে বলো?'

'ওদের বন্দী করার চেষ্টা করব আমরা,' একটু ভেবে বলল সাডেন শেভলিন। 'খুনোখুনি অনেক হয়েছে।'

'বন্দী করে ওদের রাখবে কোথায়?' সমস্যাটা তুলে ধরল মরটন শবি। 'দেখো, সম্ভব হলে আমিও চাই শান্তিতে মিটুক সব ঝামেলা। কিন্তু পথের ওপর কেউটে ফণা তুলে বসে থাকলে ছোবল হানার আগে ওটাকে মেরে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ।'

'ঠিক বলেছ,' সাই দিল হুইলার।

কথাটা নিয়ে মনে মনে একটু ভাবল সাডেন শেভলিন। তারপর মরটন শবির দিকে তাকাল। 'বেটি কনসিডাইন কি এখন শহরে আছে?'

'না,' জবাব দিল মরটন শবি। 'থাকলেও আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে থাকলে জানতাম—মেরি ব্ল্যাক চেনে ওকে।'

বেটি কি র‍্যাক্সে ফিরে গেছে? যদি তাই হয়, তা হলে স্ট্যাগ হারভে এখন কোথায়? মনে মনে বিভিন্ন সম্ভাবনা খতিয়ে দেখল সাডেন, জুৎসই মনে হলো না কোনটাই। এদিকে আবার শহরের ব্যাপারটাও রয়েছে। 'তুমি বরঞ্চ হোটেলে ফিরে যাও, মরটন শবিকে পরামর্শ দিল শেভলিন, 'এসবে তোমার জড়িয়ে কাজ নেই।'

'কিন্তু আমি—' প্রতিবাদ করতে চাইল মরটন শবি।

‘না,’ আপোষহীন কণ্ঠ বলল সাডেন, ‘বাইরে থেকেই বরং অনেক বেশি কাজে আসতে পারবে তুমি।’

ফিরতি পথ ধরল মরটন শবি। বড়জোর তিন চার কদম এগিয়েছে ও, রাস্তা পেরুতে যাবে, স্যাণ্ডনের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল হারডি। দরজার হাতলে হাত রেখে তাকাল ওর দিকে। হিংস্র লোকটা মনে মনে শিকার খুঁজে ফিরছিল। মরটন শবিকে দেখে ভাবল, এই লোকই খবর নিয়ে এসেছে শেভলিনের কাছে—এবার মওকা মত পাওয়া গেছে!

‘তুমি!’ সামনে এগোল হারডি। ‘এদিকে শোনো!’

পাকস্থলীতে যেন বরফ জমাট বেঁধে গেল মরটন শবির। সঙ্গে পিস্তল নেই ওর; অবশ্য থাকলেও লাভ হত না, ও কাজে তেমন দক্ষ নয় সে। কয়েক কদম এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। জানতে চাইল, ‘কী ব্যাপার? উকিলের সাহায্য দরকার পড়ল নাকি?’

হাসল হারডি। ‘উকিল দিয়ে কী করব? ওসব আইনের পরোয়া আমি করি না, বুঝলে!—বন্দুকেই ফয়সালা করি সব ঝামেলার।’

‘তাই নাকি? তা হলে একদিন না একদিন পরোয়া করতেই হবে,’ হেসে বলল মরটন শবি, ‘অবশ্য তার আগেই যদি পটল না তোলো।’

বারান্দা থেকে নেমে মরটন শবির দিকে এগিয়ে এল হারডি। দরজা বন্ধ হবার শব্দ ভেসে এল তার পেছন থেকে। অর্থাৎ সান ক্যামবলও বেরিয়ে এসেছে। ‘ব্যাটাকে আমার হাতে দাও, হারডি,’ বলল সান ক্যামবল, ‘পাছায় একটা ব্র্যান্ড বসিয়ে দিই!’

চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল মরটন শবির। কিন্তু সাহস হারাল না ও। ‘দেখো, খামোকা ঝামেলা করতে যেয়ো না,’ বলল গলা শান্ত রেখে, ‘ম্যাককার্থি খেপে যেতে পারে।’

কথাটা শুনেই জমে গেল হারডি, বিভ্রান্ত। শেভলিনের উত্তরাধিকারের খবর বয়ে এনেছে এই লোক। সে আবার উকিল। অভিজ্ঞতা থেকে হারডি জানে ব্যাংকার আর উকিলরা হলো টাকার কুমীর। ম্যাককার্থির দেওয়া টাকার ভাংতি এতটাই ঝড় ঝান করছে পকেটে। উল্টাপাল্টা কিছু করে এই স্রোত বন্ধ করতে চায় না সে।

‘ম্যাককার্থির সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?’

বিভ্রান্ত আর উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়েছে আউট-ল বেচার। এই সুযোগটাই গ্রহণ করল মরটন শবি। ‘সেটা,’ বলল ও তীক্ষ্ণ স্বরে, ‘তোমার না জানলেও চলবে। প্রয়োজন মনে করলে ম্যাক নিজেই জানাবে। সেটা তার মাথাব্যথা, আমার নয়। নাও, এবার সরে যাও!’

লম্বা একটা দম নিয়ে হাঁটতে শুরু করল মরটন শবি। নিজেকে স্থির রাখবার আশ্রয় চেষ্টা করছে। দ্রুত পদক্ষেপে হোটেলের পৌঁছে গেল ও। ভিতরে ঢুকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, দুর্বল লাগছে শরীরটা—মনে হচ্ছে এই মাত্র এক মাইল রাস্তা দৌড়ে এল। কটাচুলো হোটেল ক্লার্ক মাথা তুলে তাকাল।

‘আরেকটু হলেই গেছিলাম আজ!’ বলল মরটন শবি।

কিন্তু স্বাভাবিক হয়নি রাস্তার পরিস্থিতি।

একে শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে, তার উপর মনে হচ্ছে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে তাকে—ফলে রেগে উঠছে হারডি। নতুন শিকারের আশায় এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। মাত্র গজ পঞ্চাশেক দূরে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক।

দীর্ঘদেহী লোকটা। টুপি চওড়া কার্নিশের নীচে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে চেহারা। রঙ-জ্বালা কোঁচকানো নীল একটা শার্ট পরে আছে। আড়াআড়ি ভাবে গানবেন্ট দুটো চলে গেছে তলপেটের উপর দিয়ে। উরুর সঙ্গে নিচু করে বাঁধা হোলস্টারগুলো। একজোড়া কাহিল চেহারার জুতো তার পায়ে। লোকটাকে আগে কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না হারডি।

তাকিয়ে আছে হারডি। হঠাৎ এগোতে শুরু করল আগন্তুক। রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে দীর্ঘ ছায়াটা। ইতিমধ্যে যথেষ্ট হুইস্কি পেটে পড়েছে হারডির, ক্রমেই মেজাজ তেতো হয়ে উঠছে তার। কেমন যেন অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে ওকে এই লোকটার হাঁটবার ভঙ্গি। চোখ ছোট ছোট করে ভাল করে তাকিয়ে লোকটাকে চিনবার চেষ্টা করল হারডি। হঠাৎ পিছন থেকে কথা বলে উঠল সান ক্যামবল, ‘সাদেন শেভলিন!’ ফিসফিস কর্তৃক, ‘সাবধান!’

হঠাৎ ধাক্কাটা খেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল হারডি। ভিতরে ভিতরে হাঁচট খেলো সে। শেভলিনের সমকক্ষ গানফাইটার হিসাবে নিজেকে কখনও ভাবেনি হারডি। ও হলো একজন ভাড়াটে খুশী-ঢাকা দাও, যাকে বলবে খুন করে আসবে। কিন্তু খুন করা আর সাদেনের মুখোমুখি দাঁড়ানো এক কথা নয়!

কিছু বলছে না শেভলিন। কেবল এগিয়েই আসছে। হারডিই কথা বলে উঠল প্রথমে।

‘কে তুমি? কী চাও?’

‘হারডের লোক না তুমি? আমি শেভলিন। আমাকেই তো খুঁজছ তোমরা!’

তোক গিলল হারডি। এটাই তো সঙ্কেত, এখন পিস্তলের দিকে হাত বাড়ানো উচিত। আচমকা অনেক বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠল যেন সূর্যটা। দরদর করে ঘামতে শুরু করল সে। মনে মনে ভাবল, কোন দুঃখে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল! স্যালাুনের নিরাপদ পরিবেশ ছেড়ে কেন খামোকা রাস্তায় বেরিয়ে এল ঝামেলা করতে! কেন স্যালাুনে থাকল না?

‘মোটাই না!’

‘মাদ ট্যাংকে খুব তেজ দেখলাম,’ বলল শেভলিন। ‘ঠিক আছে, একটা সুযোগ দিচ্ছি তোমাদের। অস্ত্র ফেলে দিয়ে পরের ট্রেনেই শহর ছেড়ে ভাগতে হবে—নইলে এখানেই খোয়াতে হবে পৈতৃক প্রাণটা।’

চূড়ান্ত মুহূর্ত উপস্থিত। যেন অনেক আগে থেকেই জানত হারডি, এই মুহূর্তটির মুখোমুখি তাকে হতে হবে। অনিবার্য শো-ডাউন। তবে বুলেটের চেয়ে ফাসির দড়িকেই বড় বেশি ভয় ওর। গোলাগুলিতে হয়তো দেখা যাবে ও-ই ভাগ্যবান বলে প্রমাণিত হয়েছে।

গলা চড়াল শেভলিন। ‘সান ক্যামবল, তোমাকেও বলাছি—যেখানে আছ সেখানেই গানবেল্ট খুলে রেখে ট্রেনে চেপে’ ভাগতে হবে শহর ছেড়ে।’

স্যালুনের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল সান ক্যামবল। ভাবল, সুযোগ মিলে গেছে। সাডেন যদি গুলি করেও, প্রথমে করবে হারডিকে, ওকে নয়, মরবে হারডি। সেই সুযোগে সাডেন শেভলিনকে শেষ করে বাগিয়ে নিতে পারবে জ্যাকসন ঘোষিত এক হাজার টাকা।

জবাব দেওয়ার আগে সান ক্যামবলের ইতস্তত ভাবই জানিয়ে দিল হারডিকে কী ঘটতে যাচ্ছে।

‘তোমাকে আমি ডরাই না, শেভলিন!’ চিৎকার করে বলল সান ক্যামবল। ‘শহর ছেড়ে যাচ্ছি না আমি। গানবেল্টও খুলছি না!’ বলতে বলতেই হাত বাড়িয়ে দিল পিস্তলের দিকে।

চোখের সামনে ঘটতে দেখল হারডি ঘটনাটা। হাত বাড়াল সে-ও। এক সঙ্গে নেমে গেল দুটো হাত...পিস্তলের বাঁটের কঠিন স্বস্তিকর স্পর্শ পেল হাতে...বাঁটের উপর চেপে বসল আঙুলগুলো...পরক্ষণে প্রচণ্ড এক ধাক্কাই কেঁপে উঠল শরীরটা...শেভলিন কী ঘুসি মারল ওকে? ...কিন্তু সেতো বিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে...আবার যেন উত্তপ্ত একটা সূর্য ঢুকে গেল হারডির শরীরে। রাস্তা বরাবর সামনে তাকাল সে। টুপিঅলা লোকটা দুলছে...আরেকটা পিস্তল গর্জে উঠল কোথাও...এখন আরও বেশি দুলছে সামনের ছায়াটা। দৃষ্টি সরিয়ে নিল সে। তাকাল নিজের পায়ের কাছে ধূসর ধুলোর দিকে। আরে!...বড় বড় লাল টকটকে ফোঁটা...টপ টপ করে পড়ছে বালিতে...লাল... রক্ত...কিন্তু কার...নিজের দিকে তাকিয়েই বিচিত্র করণ সুরে আত্ননাদ করে উঠল হারডি। মাথা তুলে শেভলিনের দিকে। তাকাল। ‘না!’ ঢোক গিলে কাতর কণ্ঠে আবেদন জানাল সে, ‘না! গুলি কারো না, প্রিজ!’ বলেই মুখ খুবড়ে সটান মাটিতে পড়ল হারডি। মারা গেছে।

তাড়াহুড়ো করে ছোঁড়া গুলিটা ফক্ষে গেল সান ক্যামবলের। এবং তাতেই মনের জোর হারিয়ে ফেলল সে। সোজা হারডির পেটে গিয়ে ঢুকল বুলেটটা। সঙ্গে সঙ্গে পাই করে ঘুরল সান ক্যামবল। ছুটে গেল ভিতরে...নিরাপদ অবস্থান থেকে আবার গুলি করতে হবে...ঝড়ের বেগে ভিতরে ঢুকেই বরফের মত জমে গেল সে।

স্যালুনের পেছনের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে হুইলার। শটগান হাতে স্যালুনের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ও। ‘হাওডি, সান!’ বলল হুইলার। ‘আমার বন্ধুর দিকে গুলি ছুঁড়েছ তুমি।’

‘তোমার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই!’ ফ্যাসফেসে কণ্ঠে বলে উঠল সান ক্যামবল। পেছনে রয়েছে শেভলিন, এখনি আসবে সে। মরিয়া হয়ে শেষ সাহসটুকু সঞ্চয় করল সান ক্যামবল। চকিতে পিস্তলটা উঁচিয়ে ধরেই টিপ দিল ট্রিগারে। হুইলারের এক ফুট তফাৎ দিয়ে পেছনের দরজার পাশে তাকে গিয়ে লাগল গুলিটা। বনবন করে ভেঙে পড়ল একটা মদ ভর্তি বোতল। নিমেষে গর্জে উঠে অগ্নি উদ্দারণ করল হুইলারের শটগান। এত কাছ থেকে ফস্কানোর প্রশ্নই

ওঠে না। সান ক্যামবলের পেটে আগুন ধরিয়ে দিল গোলাটা। দড়াম করে দরজার উপর আছড়ে পড়ল সে। ধাক্কার চোটে কঁজার উপর ঘুরে খুলে গেল দরজাটা। মুখ খুবড়ে হুড়মুড় করে বারান্দায় গিয়ে পড়ল ক্যামবল। হাত থেকে ছিটকে গেল পিস্তল। দূরে। চোখ মেলল...বুজল...আবার মেলল ক্যামবল...বারান্দার ছায়াতে কী আরাম লাগছে...কী ঠাণ্ডা এখানে...

মুখ থেকে ঘাম মুছল মরটন শবি। হারডি পথরোধ করবার পর তিন মিনিটও কাটেনি। এর মধ্যে মরে শেষ হয়ে গেল লোক দুটো। পিস্তলে গুলি ভরে ঘুরে দাঁড়াল শেভলিন-দেখছে মরটন শবি-তারপর হাঁটতে শুরু করল রাস্তা ধরে।

নিজের অফিসে ডেস্কের পেছনে বসে আছে ম্যাককার্থি। গুলির শব্দ কানে এলেও নড়েনি সে। এই মুহূর্তে কী ঘটছে, জানতে ব্যাকুল নয় ম্যাককার্থি। এই সময় যত কম লোক কাছে থাকে তত ভাল। কেউ না কেউ এসে কী হয়েছে ঠিকই জানিয়ে যাবে ওকে।

শেভলিনই জানাল।

দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে মাথা তুলে তাকাল ম্যাককার্থি। দাঁড়িয়ে আছে সাডেন শেভলিন। ঢোক গিলল সে। 'কী-আরে-হাওডি, সাডেন। বলো, কিছু করতে হবে?'

'হ্যাঁ। শহর ছেড়ে ভাগতে হবে তোমাকে।'

'ভাগব?' উঠে দাঁড়াল ম্যাককার্থি। 'এসব কী বলছ তুমি, শেভলিন! কেন আমি-এসব কথা বলে কোন কাজ হবে না, সাডেন-এই ব্যাংকের মালিক আমি-একটা র‍্যাঞ্চ আছে-আমার-আমার-'তোতলাতে তোতলাতে থেমে গেল ম্যাককার্থি।

'পুরো ষড়যন্ত্রে আঁটেপুঁটে জড়িয়ে আছ তুমি, ম্যাক।' শেভলিনের কণ্ঠ স্থির। 'শেষ বয়সে প্রথম শ্রেণীর গর্দভের মত মারাত্মক একটা ঝুঁকি নিয়েছ। মালপত্র গুটিয়ে ভাগো এবার।'

সময় পেতে চাইছে ম্যাককার্থি...একটা কিছু ফন্দি বের করতে সময় দরকার...সময় দরকার...এতটুকু সময়। 'ওদিকে রাস্তায় কী ঘটল?' জানতে চাইল সে।

'বারুদের ধোঁয়ায় চেপে নরকে চলে গেল হারডি আর সান ক্যামবল।'

'তুমি...ওদের দুজনকেই মেরেছ?'

'হারডিকে। সান ক্যামবল মরেছে হুইলারের হাতে।'

'হুইলার?' হাত দিয়ে মুখ মুছল ব্যাংকার। 'সান ক্যামবল আবার ওর কী করল?'

'হুইলার আমার পাটনার।' কথাটা হজম করতে ম্যাককার্থিকে সময় দিল শেভলিন। ব্যাংকারের প্রতিক্রিয়ায় সন্তুষ্ট হলো ও। 'এবার আসল কথা শোনো,' লৌহ-কঠিন-দৃঢ়তা শেভলিনের কণ্ঠে। 'শহর ছেড়ে যাবার কথাটা ঠাট্টা করে বলিনি আমি। যেতেই হবে তোমাকে। স্ট্যাগ হারভে, জ্যাকসন, আর লী উইলকিন্সের ব্যবস্থা করে আমি আবার আসব। তোমার চেহারা যেন দেখতে না

বইঘর কম
ঘেরাও

হয়।’

ম্যাককার্থির কুটবুদ্ধির ধার যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। তলে তলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল সে। এবং তা বুঝতে পেরে খেপে উঠল নিজের উপরে। নাকের পাটা ফুলে উঠল। পস্তাত্তে হবে জেনেও শেষে কথাটা বলে ফেলল সে। ‘লিস্টটা অনেক লম্বা, সাডেন। হারভে, জ্যাকসন, উইলকক্স-তারপর আমি। এত দূর পৌঁছুতে পারবে না তুমি।’

‘অতটা ভরসা করতে যাঁয়ো না।’ রেলের উপর বিশাল হাতজোড়া রেখে সামনে ঝুঁকল শেভলিন। ‘শোনো, তোমার মত সুবিধাবাদী লোভী ব্যক্তিদের ঘৃণা করি আমি-নিরাপদ দূরত্বে থেকে ফায়দা লুটবার জন্য তোমরা বসে থাকো।’

‘লোক হিসেবে তুমি খুব চৌকশ নও, ম্যাক। এ কদিন দেখেই তা বুঝে গেছি। কিছু টাকা-পয়সা, বন্ধকী সম্পত্তি, আর হামবড়াই একটা ভাব-বাস, এ ছাড়া আর কিছু নেই তোমার। এই হামবড়াই ভাব দেখাতে গিয়ে শুধু শুধু প্রাণটা হারিয়ে না।’

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল শেভলিন, বেরিয়ে এল ব্যাংক থেকে। ক্লান্ত আর অবসন্ন বোধ করছে। দাঁড়িয়ে পড়ে ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট রোল করল। উইলের সূত্রে বিশাল এক সম্পত্তির মালিক বনে গেছে ও; সেই সঙ্গে একটা দায়িত্বও চেপেছে কাঁধে-সম্পত্তি রক্ষা করতে হবে; একটা কিছু গড়ে তুলতে হবে। ভবঘুরে জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে ভেবে মনটা যেন একটু খারাপ হয়ে গেল ওর।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাডেনের জন্য অপেক্ষা করছিল নোবল হুইলার। শেভলিন এগিয়ে যেতেই হাসল সে। ‘নিজেদের মধ্যে মারপিট করার চেয়ে একসঙ্গেই দেখছি ভাল লড়তে পারি আমরা।’

হাসল শেভলিন। ‘ঘুসি মারার মত শটগানটাও চমৎকার চালিয়েছ তুমি।’

‘সান ক্যামব্লকে ভাল করে চিনতাম। ভয়ঙ্কর খুনী। অন্তত ডজন খানেক লোককে খুন করেছে, দু’একজন ছাড়া পাঁচটা গুলি করার সুযোগ পায়নি কেউ।’ শেভলিনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে শুরু করল হুইলার। ‘এবার?’

পত্রিকা অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল শেভলিন। দরজা খুলে বেরিয়ে এল জিম ন্যারোজ। হাঁটতে হাঁটতে এদিকেই আসছে মরটন শবি। ‘তোমাকে পত্রিকার একটা সংখ্যা বের করতে হবে, জিম,’ বলল সাডেন, ‘প্রথম পাতায় আমার একটা খবর ছেপে দেবে। লাগলে আমিই খরচ দেব।’

‘লাগবে না। তোমার শেষ কোন কথাই এখন প্রথম পাতার খবর হওয়ার যোগ্যতা রাখে।’ বলে ফেলো।’

‘ঠিক আছে,’ মাটিতে ফেলে গোড়ালি দিয়ে পিষে সিগারেট নেভাল শেভলিন। ‘তা হলে লিখে দিয়ো, আগামী কাল দুপুর নাগাদ “জে-ডট-ও”-র দায়িত্ব নিতে যাচ্ছি আমি। সোমবার থেকে লোক নেয়া শুরু করব। রাউন্ডআপের জন্যে জনাবিশেক লোক দরকার হবে আমার। আর লিখবে, সব সম্পত্তি বিক্রি করে চলে যাবার জন্যে জ্যাকসনকে দশদিন সময় দেয়া হয়েছে। এরপর ওকে দেখামাত্রই গুলি করব আমি।’

‘সত্যি সত্যি ছাপতে বলছ এসব?’

‘নিশ্চয়ই। আর,’ বলে চলল শেভলিন, ‘উইলকক্সের উদ্দেশ্যে বলবে, তাকেও এই দশ দিনের মধ্যে “জে-ডট-ও” থেকে সব স্টক সরিয়ে নিতে হবে। সে ঝামেলা না করলে আমার দিক থেকেও কোনরকম ঝামেলা হবে না।’

‘শুনবে না সে,’ বলল হুইলার।

‘হয়তো। কিন্তু একটা সুযোগ ওকে দিচ্ছি।’ লম্বা করে দম নিল শেভলিন। ‘রাতেরি “জে-ডট-ও”-র দিকে রওনা দেব আমরা, ঠিক আছে?’

উনিশ

খবরটা ম্যাককার্থি বয়ে নিয়ে গেল ‘বল্লভ-আরে’ জ্যাকসনের কাছে।

‘তা হলে “জে-ডট-ও”তে ফিরে যাচ্ছে সাডেন?’ চিন্তিত কণ্ঠে বলল জ্যাকসন। ‘বেশ, যাক-অসুবিধে নেই-বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না সে।’

চিন্তার ঝড় বইছে ম্যাককার্থির মাথায়-আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সে মৃত্যু ভয়ে। শেভলিন ওকে শহর ছাড়বার হুমকি দিয়েছে, সে কথা জ্যাকসনকে জানায়নি ম্যাককার্থি। জানে এখন সাডেন শেভলিনের মৃত্যুই কেবল বাঁচাতে পারে তাকে। কেমন যেন অসহায় লাগছে-জ্যাকসনের আত্মপ্রত্যয়ী উচ্চারণও আশা সপ্নগারে ব্যর্থ হলো ওর প্রাণে।

‘“জে-ডট-ও”তে কে আছে এখন?’

‘কেস্টারসন। মেয়েটার কেবিনে আছে স্ট্যাগ আর পিট সিমনস।’

অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়াল ম্যাককার্থি। ‘খুব খারাপ! মেয়েদের উত্তাক্ত করা যে কেউ সহ্য করবে না, খুব ভাল করে জানো তুমি, জ্যাকসন। মেয়েটার কিছু হলে আমার লোকরাই মারমুখো হয়ে উঠবে।’

‘স্ট্যাগের কাছে নিরাপদেই থাকবে বেটি। মেয়েদের সঙ্গে বরাবরই সংযত আচরণ করে ও। তবে,’ ম্যাককার্থির দিকে তাকাল জ্যাকসন, চকচক করছে দু’চোখ। ‘এবার আমি যাচ্ছি ওখানে। একটু শিক্ষা হওয়া দরকার মেয়েটার। অন্যের ব্যাপারে নাক গলিয়েছে-টের পাবে মজা।’

‘মেয়েটার কোন ক্ষতি হলে,’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল ম্যাককার্থি, ‘মহা ঝামেলায় পড়তে হবে কিন্তু! ওকে ওর মত থাকতে দাও।’

‘আরে রাখো, আমাদের গায়ে ফুলের টোকাও দিতে পারবে না কেউ। তা ছাড়া, দেখো শেভলিনের ঘাড়েই চাপবে সব দোষ। কোন চিন্তা নেই।’

বেটি কনসিডাইন মুখ খুলতে পারে, এনিয়ে কোন কথা হলো না ওদের মধ্যে। মুখ খুলবার জন্য বেটিকে বাঁচিয়ে রাখবার কোন ইচ্ছে নেই জ্যাকসনের বোঝাই যাচ্ছে। কোথায় নেমেছে লোকটা! এই তো কয়েক হণ্টা আগেও চুপচাপ

বইঘর কম
ঘেরাও

ব্যাঙ্কের কাজকর্ম করতে করতে ‘জে-ডট-ও’-র সবুজ ঘাসে ভরা মাঠের দিকে তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছে সে! এর মধ্যে ঘটে গেল কত কিছু! প্রথমে দুই জুয়াদীর ফাঁসি, পরে গিড ব্যাঙ্কের হত্যাকাণ্ড, তারপর ও’নীলের প্রাণনাশ। কার ছিল এই সর্বনাশা বুদ্ধি? কিছুটা জ্যাকসনের আর কিছুটা বোধ হয় মিলারের।

হাতের পিঠে গাল ঘষতে ঘষতে ভাবছে ম্যাককার্থি, কেবিনে একাকী আছে বেটি কনসিডাইন...তার কাছে যাচ্ছে এখন রাশ জ্যাকসন। ঘামতে শুরু করল সে।

বেরিয়ে গেল জ্যাকসন। সশব্দে বন্ধ হলো দরজাটা। তাকের উপর রাখা শটগানটার উপর চোখ পড়ল ম্যাককার্থির...হুইলার শটগান ব্যবহার করেছিল...বাংক হাউসে বাতি জ্বলছে দেখে ইতস্তত করল ম্যাককার্থি-বেইজ্জতি হতে হবে শেষে। আচ্ছা, জ্যাকসনকে ও খুন করতে চাইছে কেন? বেটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে-নাকি মেয়েটাকে কজা করবার জন্যে?

গলা শুকিয়ে এল ম্যাককার্থি। ঢক ঢক করে এক গ্লাস পানি খেয়ে নিল সে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গেল বাংক হাউসের দিকে। রক্ষ চেহারার এক বুড়ো কাউন্সিলর বাংকে বসে কী যেন পড়ল। লোকটাকে আগেও দেখেছে ম্যাককার্থি। একটা কটে ঘুমোচ্ছে আরেকজন। ঘরের ম্লান আলোয় তিনটে খালি বাংক চোখে পড়ল। ওগুলো একনজর দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে বুড়োকে জিজ্ঞেস করল, ‘চাকরি ছেড়ে ভেগেছে মনে হচ্ছে?’

‘হ্যাঁ, আজ সকালেই ভেগেছে ওরা তিনজন। সেজন্যে অবশ্য ওদের দোষ দেয়া যায় না।’

‘কেন?’

‘বক্সড-আর’ শেষ হয়ে গেছে।’ বুড়ো কাউন্সিলরের কণ্ঠে হতাশার ছোঁয়া। ‘শেভলিনের সঙ্গে লাগাটাই কাল হয়েছে জ্যাকসনের। এ তো সব শুরু। শেষ হয়ে যাবে ও।’

‘একটা মাত্র লোক।’

‘বোঝো তবে, কেমন লোক! কী ঘটেছে তলিয়ে দেখো একবার। সবাই ওকে খুঁজছে-সেই সময় সোজা নিজেই ইয়েলোজ্যাকেটে হাজির হলো সে; পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দিল হুইলারের মত লোককে। জ্যাকসন, তুমি, উইলকক্স, মিলার, ফেলার স্ট্যাগ হারভে-তোমরা সবাই যোট বেঁধে লাগলে শেভলিনের বিরুদ্ধে; অথচ সবাইকে একা টেক্কা দিয়ে গেল সে। মিলার মারা গেল, মারা পড়ল ফেলার। কিলবার্নও অক্স পেয়েছে। এ ছাড়াও মরেছে আরও দু’তিনজন। হারডি, সান ক্যামবলরাও শেষ। এত কিছুর পরও মরেছে কী শেভলিন? দেখতেই পাচ্ছ সেটা।’

‘ভাগ্য ভাল বলে বেঁচে গেছে আরকী!’

বুড়ো কাউন্সিলর থুতু ফেলল। ‘একে ভাগ্য বলে না। এ হচ্ছে বুদ্ধির জোর। একবার দুবার ভাগ্য হতে পারে, তাই বলে বারবার? একের পর এক তোমাদের সবাইকে ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছে ও। তোমাদের ধারণার চেয়েও দ্রুত গতিতে

চিন্তা চলে ওর মাথায়; ঝড়ের মত ওর গতিবিধি। ওর সঙ্গে পারবে না তোমরা। তা ছাড়া, এই রক্তাক্তির পর সব লুকোচুরির অবসান ঘটবে, আইন এবার হাত বাড়াবে এখানে। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে সবার। রসাতলে যাবে তোমরা।

বুড়োর সত্যকথন বিন্দুমাত্র পছন্দ হলো না ম্যাককার্থির। বিরক্তির সঙ্গে সরে এল সে। জ্যাকসনের নিজের লোকরাই কেটে পড়ছে। ঘোড়ার কাছে ফিরে এসে চুপচাপ কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল ব্যাংকার। একেবারে নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে নিজেকে।

বেটির সঙ্গে জ্যাকসন একা...ভাবনাটা ফের উদয় হলো ম্যাককার্থির মনে। বেটি। উফ, মেয়ে বটে!...কী তার হাঁটবার ভঙ্গি!...আর শরীর!...আর...লাফিয়ে জিনে চেপে বসল ম্যাককার্থি। এক ঝটকায় ঘুরিয়ে নিল ঘোড়াটা। আচমকা প্রচণ্ড শক্তিতে স্পারের গুঁতো লাগাল গেল্ডিংটার পেটে।

জ্যাকসনের পরপরই কেবিনে পৌঁছে যাবে সে। ঠেকাতে হবে স্ট্যাগকে। স্ট্যাগ আর জ্যাকসন দুজনেরই মোকাবিলা করতে হবে...নিজ হাতে জ্যাকসনকে যমের বাড়ি পাঠাবে সে...নিজ হাতে...এবং তারপর...তারপর...আবার স্পারের গুঁতো পড়ল ঘোড়ার পেটে। তুফানের মত ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলল ঘোড়াটা। বাতাসের ঝাপ্টা লাগছে ম্যাককার্থির চোখে মুখে।

ব্লাডি বেসিনের উপর দিয়ে চলে যাওয়া ট্রেইল ধরে ছুটছে ম্যাককার্থি। জ্যাকসনের আগেই পৌঁছে যেতে পারলে...তুফান উঠছে ঘোড়ার খুরে। এ গতিতে চললে মারা যেতে পারে ঘোড়াটা...কিন্তু এখন আর পরোয়া করে না ম্যাককার্থি।

রেড ক্রিক।

রেস্তারায় মুখোমুখি বসে আছে জিম ন্যারোজ আর মেরি ব্ল্যাক। গত কদিনে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ওরা। মুখ তুলে মেরির দিকে তাকাল ন্যারোজ। এই মুহূর্তে অস্থিরতায় ভুগছে ও। উত্তেজনায় যেন ফুটছে পুরো শহরটা, বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি বলে যদি কিছু থাকে, এ হচ্ছে তা-ই। কোমরে পিস্তল বুলিয়ে রাইফেল আর শটগান হাতে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকজন-অথচ এদের সবাইকে শান্তি প্রিয় ভদ্রলোক হিসাবেই জানত জিম ন্যারোজ।

‘শহরের বাইরে কোথায় যেন গেছে ম্যাককার্থি,’ জানাল মেরি।

‘সেও আছে এসবের মধ্যে, একদম নাক অবধি ডুবে আছে। একজনের কাছে গুনেছি আমি, লুড ফেলাররা তোমার বাবাকে হত্যা করার আগমুহূর্ত পর্যন্ত ওদের সঙ্গে ছিল ম্যাককার্থি। পরেও সে ওদের সঙ্গে দেখা করেছে। খবরটা পাওয়ার পরই বুঝে গেছি, পর্দার আড়াল থেকে কলকাঠি নেড়েছে সে-ও-কিন্তু চালিয়াতি করে আবার সবার চোখে নিজেকে পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করেছে।’

‘অথচ ম্যাককার্থিকে বন্ধু হিসেবেই জানত বাবা।’

‘লোকটা অর্থ-পিশাচ। এটা এখন একরকম বিকৃতির পর্যায়ে চলে গেছে, এরচেয়ে খারাপ কিছু আর হয় না। এ অবস্থায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে

মানুষ। টাকা পাওয়াটাই হয়ে দাঁড়ায় মুখ্য-কীভাবে আসছে তা নয়।’

‘এর শেষ কীসে, জিম?’

‘সম্পদ মানুষকে আরও সম্পদ অর্জনের জন্যে খেঁপিয়ে তোলে।’ কাঁধ ঝাঁকাল জিম ন্যারোজ। ‘কী জানো, মাঝে মাঝে ভাবি, দেশের সবগুলো মানুষ বুঝি উন্মাদ হয়ে গেছে। বিশাল এই দেশের অপরিমেয় সম্পদ-যতটুকু পাড়া যায় দখল করে নেয়ার জন্যে প্রলুদ্ধ করেছে সবাইকে। লড়াই, হত্যা কিংবা যে কোন কূটকৌশল-যে ভাবে সম্ভব। অনেকে তো ভুলেই গেছে যে, আর কোন উপায় থাকতে পারে। তবে আমাদের সৌভাগ্য, এর উল্টো স্বভাবের লোকও আছে, সং লোকও জন্ম দিয়েছে এদেশের মাটি, ভবিষ্যতেও দেবে। এই লোভী লোকগুলো দেখো সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় একদিন ছিন্নভিন্ন, ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তারপর ওই ধ্বংস থেকে আবার নতুন করে দেশটাকে গড়ে তুলবে সং ভালমানুষেরা।’

মরটন শবি এসে ঢুকল রেস্তোরাঁয়। মেরিকে বাউ করে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল সে। ‘শহরের প্রায় ছ’সাতজন লোক,’ বলল মরটন শবি, ‘আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সিটি কাউন্সিল, মেয়র, আর মার্শাল নিয়োগের জন্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সাহায্য করতে বলছে ওরা।’

‘আমিও তাই চাই!’ টেবিল চাপড়ে বলল জিম ন্যারোজ, ‘আরও আগেই করা উচিত ছিল কাজটা।’

‘কিন্তু মার্শাল হবে কে?’ জানতে চাইল মরটন শবি। ‘শহরের লোকদের তো জানো তুমি। আমি শেভলিনের পক্ষে-কিন্তু ওরা কেউ রাজি হবে না।’

‘সেটা আশা করাও ঠিক হবে না। লড়াইয়ের সে-ও একটি পক্ষ।’ একটু ভাবল ন্যারোজ। ‘আমি হলে ফ্র্যাংক চেয়ের কথাই বলতাম।’

‘লোকটা না “বল্লভ-আরের” কাউন্সিল ছিল?’

‘ও নীল, জ্যাকসন, ম্যাককার্থি-সবার র‍্যাঞ্জেই কাজ করেছে ও। লোক হিসেবে খুব ভাল। যে কোন দায়িত্ব গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে-বোঝে এবং সবচেয়ে বড় কথা, -সে খুনী নয়।’

‘তা হলে আর অসুবিধে কী।’

‘জিম? সাডেন সমস্যায় পড়ে যাবে না তা হলে?’ জিজ্ঞাসা মেরির।

‘হয়তো! কিন্তু সে-ও এটাই চাইবে। এই সংঘাত আর রক্তপাতের অবসান হওয়া দরকার।’

কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা নেমে এল। গম্ভীর চেহারায় নিজের প্লোটের দিকে চেয়ে রইল ন্যারোজ। মেরি তাকিয়ে আছে ওর দিকে। অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসছে বারবার। ‘কী করতে চাচ্ছে ওরা, জিম?’ জিজ্ঞেস করল মেরি। ‘গ্রেন্ডার করবে শেভলিনকে?’

‘কী জানি। শেভলিনের সঙ্গে ওদের কোন শত্রুতা নেই। ওরা জানে, শেভলিন এ গোলামালের হোতা নয়। আর “জে-ডট-ও”-র ওপর তার দাবী বৈধ। কিন্তু সাডেনের খ্যাতি বা কুখ্যাতি যা-ই বলো, সেটাই ওর বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। মোট কথা, ও একজন গানফাইটার এবং সবাই-ই জানে সেটা।’

‘বিল কোফিনকে দেখতে গিয়েছিলে?’ এবার জানতে চাইল মেরি।

‘হ্যাঁ। এখন কিছুটা ভালর দিকে। চোখ মেলে তাকিয়েছে আজ। খাওয়ানোর সময় জ্ঞানও ছিল। খাবার পর পরই অবশ্য ফের ঘুমিয়ে পড়েছে।’

উঠে দাঁড়াল মেরি ব্ল্যাক। ‘বেটিকে নিয়ে চিন্তায় পড়ে যাচ্ছি আমি, জিম। কেবিনে একা রয়েছে ও। কয়েক হপ্তা আগে হলে ভাবতাম না মোটেই। কিন্তু অবস্থা এখন যা দাঁড়িয়েছে, কোন ভরসা পাচ্ছি না, যাচ্ছেতাই কাণ্ড ঘটে যেতে পারে।’

ঘাড় ডলতে ডলতে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল জিম ন্যারোজ। ‘হ্যাঁ, ও নিয়ে মরটন শবির সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার।’ অস্থির পায়ে পায়েচারি করতে শুরু করল জিম। অপেক্ষা করছে মেরি। বেটির প্রতি সব ঘৃণা, ঈর্ষা উবে গেছে। ওটা ছিল একটা সাময়িক ব্যাপার। বাবার ব্যাঞ্চ রক্ষার জন্যে, তার হত্যার প্রতিশোধ নিতে, শেভলিনের দুটি শক্তিশালী হাত আর ওর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের আকস্মিক প্রয়োজনীয়তা থেকেই জন্ম নিয়েছিল ওই ঈর্ষাবোধ।

কিন্তু এখন, জিম ন্যারোজের সঙ্গে বেশ কটা দিন কাটানোর পর, পরিবর্তন এসেছে ওর মনোজগতে। শেভলিনের প্রচণ্ডতা, প্রতিশোধ স্পৃহা আর প্রতিরোধ শক্তি না থাকলেও সাভেনের মতই লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ জিম।

‘একটা পসি গঠন করতে হবে, মরটন,’ হঠাৎ বলে উঠল ন্যারোজ। ‘ওখানে যেতে হবে।’

‘আরে, দাঁড়াও। প্রস্তুতি ছাড়া হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে লাভ নেই। ফ্র্যাংক চেযকে খবর পাঠিয়েছি—ও আগে আসুক।’

আবার নীরবতা নামল রেস্তুরায়। ওয়েটার এসে কফি কাপ পূর্ণ করে দিয়ে গেল। নিজের ভাবনায় ডুবে আছে ন্যারোজ। মরটন শবিও ভাবছে। বেশ খানিকটা সময় পেরিয়ে গেল। জেনারেল স্টোরের মালিক কেন্ট এসে ঢুকল। সঙ্গে ব্ল্যাকস্মিথ, ড্যান করবিট আর ডাক্তার রায়ান।

সবশেষে এল ফ্র্যাংক চেয। দীর্ঘদেহী একহারা গড়নের যুবক। একটু যেন গম্ভীর চেহারা। প্রচণ্ড শক্তি ধরে সে দুটি হাতে। সবার উপর একবার নজর বোলাল সে। ‘সুনলাম তোমরা নাকি আমাকে টাউন মার্শাল করতে চাইছ?’

‘ঠিকই শুনেছ।’ মুখ খুলল ন্যারোজ। ‘আলোচনা করে আমরা সবাই একমত হয়েছি, এ কাজের জন্যে তুমিই যোগ্য। শহর দেখাশোনা করবে তুমি; ভায়োলেন্স প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেবে; শহরে ঢোকার আগে বন্দুক চেক করাবে সবার। দেখবে, শহরে কেউ যেন কোনরকম লড়াই কিংবা সম্পদ ধ্বংস করতে না পারে। শহরবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব তোমার ওপর।’

‘আর শহরের বাইরে?’

‘আসছি সে কথায়। নিজের কেবিনে একা পড়ে গেছে বেটি কনসিডাইন। কেবিনটা এখন মোটেই নিরাপদ নয়। ওকে আনতে যাব আমরা। যদি দেখি লড়াই চলছে—থামাব, তারপর গ্রেপ্তার করব সবাইকে। বেটিকে নিয়ে ফিরে আসব এখানে।’

আস্তে আস্তে মাথা বাঁকাল ফ্র্যাংক চেয়। তারপর চোখ বোলাল সবার উপর। ‘আমার বাবা একজন জে.পি. ছিল, এক সময় শেরিফের দায়িত্ব পালন করেছে। কী করতে হবে বোধ হয় জানি আমি। তবে একটা কথা, এড়ানো গেলে কাউকে হত্যা করতে পারব না আমি—যতক্ষণ পারছি, শান্তিপূর্ণভাবেই গ্রেপ্তারের কাজটি করার চেষ্টা করব—কিন্তু উল্টো কিছু হলে, তোমাদের কি পাশে পাব?’

‘অবশ্যই।’ বলল কেন্ট। ‘শহরে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাটা এখন জরুরি হয়ে পড়েছে।’

আর সবার মত ন্যারোজও মাথা দুলিয়ে সায় দিল। আবার একবার সবাইকে দেখল ফ্র্যাংক চেয়। ‘আরেকটা কথা। সাডেন শেভলিনের কী করবে?’

‘কী করতে চাও?’

‘সাডেন তোমার বন্ধু মানুষ, ন্যারোজ। মরটন শবি হলো ওর উকিল। তারপরও আমি কিন্তু কাউকে ছেড়ে কথা কইব না। প্রয়োজন মনে করলে সাডেনকেও গ্রেপ্তার করব।’

সম্মতি জানাল ন্যারোজ। ‘ঠিক আছে।’

নড়েচড়ে দাঁড়াল ফ্র্যাংক চেয়। ‘আমাকে ভুল বুঝো না যেন কেউ। শেভলিনের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই। ও ঠিক পথে আছে জেনেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখনও তাই বিশ্বাস করি। রেঞ্জ রক্ষা করার জন্যে লড়াই করার অধিকার অবশ্যই শেভলিনের আছে।’ তবু, আদৌ যদি আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই—ওকেও হিসেবে ধরতে হবে।’

‘ঠিক।’

টেবিল থেকে সরে গেল ফ্র্যাংক চেয়। ‘তা হলে এবার রওনা দেয়া যায়।’

নিজের হাতে রান্না করে পেট পুরে খেলো কেস্টারসন। খুঁজেপেতে একটা হুইস্কির বোতল বের করল সে। একটা গ্লাসে ঢেলে নিল খানিকটা। তারপর বারান্দায় বেরিয়ে এল। এখান থেকে ট্রেইলের দু’মাথাতেই নজর রাখা যায়। অনেকগুলো ঘণ্টা ব্যাপ্ত একা রয়েছে কেস্টারসন, কোথায় কী ঘটছে জানতে না পেরে অস্থির হয়ে উঠেছে সে।

বারান্দায় বসে মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে আর সিগারেট ফুঁকে সময় কাটাতে লাগল কেস্টারসন। চোখ দুটো সদা সতর্ক। জানে, শেভলিনকে মারতে পারলে এক হাজার ডলার মিলবে—সারা জীবনেও এক সঙ্গে এত টাকা দেখেনি সে। হয়তো এখানে আবার ফিরে আসবে শেভলিন। মিলে যাবে সুবর্ণ সুযোগ!

রান্নাঘরে এসে হুইস্কির বোতলটা নিয়ে আবার বারান্দায় এল কেস্টারসন। চোখ গেল ট্রেইলের দিকে। থমকে দাঁড়াল সে। কুঁচকে উঠল ভুরুজোড়া। ধুলো দেখল কী?

রাইফেল তুলে নিয়ে বারান্দার ধারে এসে দাঁড়াল কেস্টারসন। তারপর নেমে এল সিঁড়ি ভেঙে। কোনরকম শব্দ কানে গেল না তার। ধুলো হলেও খুব সামান্যই হবে—বাতাসে ঘূর্ণি খেয়েছে হয়তো পথের ধুলো।

আকস্মিক ঘটনাটা একটু নার্ভাস করে তুলল ওকে। অস্বাভাবিক রকম শান্ত চারদিক। শক্ত করে রাইফেলটা আঁকড়ে ধরে আস্তে আস্তে র‍্যাঙ্কের উঠোনের এদিক ওদিক তাকাতে লাগল কেস্টারসন। সব কিছু যেন বিম ধরে আছে... অপেক্ষা করছে?

‘খেং’ বেশ জোরেই বলে উঠল সে, ‘দিন দিন মেয়েদের স্বভাবে পেয়ে বসছে আমাকে!’

হাতের ভাঁজে রাইফেল ফেলে পায়ে পায়ে কোরালে গিয়ে ঢুকল কেস্টারসন। ঘোড়াগুলোকে খড় এগিয়ে দিল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওগুলোর খাওয়া দেখল। তারপর ঘুরে অলস ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে বড়সড় একটা গাছের নীচে এসে থামল। গাছটাকে ঘিরে বানানো বেঞ্চ বসে গাছপালার সীমানা, র‍্যাঙ্ক ভবনের প্রতিটি কোণ-সর্বত্র নজর বুলাতে লাগল। কিছু নেই কোথাও।

নার্ভাস হওয়া কেস্টারসনের স্বভাব বিরুদ্ধ। উঠে দাঁড়াল সে। এগিয়ে গেল র‍্যাঙ্ক হাউসের দিকে। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। কিছু না। বাতাসের তোড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে একটা ঝরা পাতা। বিরক্তির ছাপ পড়ল তার চেহারা। আবার এগোল কেস্টারসন। সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল। বসে পড়ল বারান্দার সবচেয়ে ছায়ায় শীতল জায়গাটায়।

আবার হুইস্কি ঢেলে নিল গ্লাসে। চুমুক দিল। রক্তের সঙ্গে শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ল তরল আগুন। অনেকটা স্বস্তি বোধ করল সে। বেশ ভাল লাগছে। আচমকা ঝট করে উঠে দাঁড়াল কেস্টারসন। আর কাউকে রেখে গেল না কেন ওরা? এখানে যে কবরের নিস্তব্ধতা! একটা পাখি ডাকছে না কোথাও... একটা কোয়েলও না। সিকাদার ডাকও শোনা যাচ্ছে না। কোরালে পা ঠুকে ডেকে উঠল একটা ঘোড়া। হাতের পিঠে মুখ মুছল কেস্টারসন। ঘামছে। ঘামবেই তো, গরম পড়ছে না! আবারও গ্লাসে মদ ঢালল সে... খেলো... হুইস্কিটা ভাল... গ্লাস নামিয়ে রেখে সাবধানে আস্তে আস্তে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাল। বরফের মত জমাট নিস্তব্ধতা! গাছের পাতায়ও আন্দোলন নেই!

আচমকা ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এল ট্রেইল থেকে। দুলকি চালে এগিয়ে আসছে ঘোড়াটা। ঝট করে উঠে দাঁড়াল কেস্টারসন। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উঠোনে নেমে এল সে। এখনও গাছপালার আড়ালে রয়েছে ঘোড়াটা। এবার আরও কাছে এগিয়ে এল ওটা। গাছপালা ছাড়িয়ে আস্তাবলের পেছনে এসে পড়ল। তারপর আস্তাবলের পেছন থেকে ঘুরে উঠোনে এসে থামল। টুপির কারনিশের নীচে ঢাকা পড়ে থাকায় চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে না কেস্টারসন। লাক্ষিয়ে জিন থেকে নামল আরোহী, লাগাম হাতে নিয়ে ঘোড়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। হাঁ হয়ে গেল কেস্টারসনের চেহারা, চিনতে পেরেছে লোকটাকে। সাডেন শেভলিন!

নিজের উপর খেপে উঠল কেস্টারসন। মুহূর্তের জন্যও তার কল্পনাতে আসেনি, অশ্বারোহী লোকটা শত্রু হতে পারে। এরকম নির্লিপ্তভাবে কোন শত্রু র‍্যাঙ্কের উঠোনে ঢুকতে পারে না। অথচ সেটাই ঘটেছে। যাকগে, সুযোগ পাওয়া

গেছে—শেভলিনের খুলি উড়িয়ে দিয়ে পেতে পারে সে এক হাজার ডলার। বিশ বাইশ জন লোকের হত্যাকারী চালু হাতের সেই বিশাল লোকটা—এই তো সামনেই দাঁড়িয়ে!

‘তুমি কেস্টারসন?’

কথা বলবার চেষ্টা করল কেস্টারসন। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ‘হ্যাঁ,’ কোনমতে জবাব দিল।

‘তোমার জন্যে একটা খবর, রেড ক্রিকে তোমার দুই বন্ধু গানফাইটে পটল তুলেছে। হারডি আর সান ক্যামবল।’

‘পটল তুলে...মারা গেছে?’ অস্বস্তিভরা চোখে শেভলিনের দিকে তাকাল কেস্টারসন। ভাবল, বারান্দায় থাকলেই ভাল হত! সূর্যের কী তেজরে বাবা! আর হুইস্কি বা খেতে গেল কোন দুঃখ? মদ খেলে কি আর দরকারের সময় হাত-পা কথা শুনতে চায়? ‘তুমি মেরেছ ওদের?’

‘হারডিকে। স্যালুনের দরজায় দাঁড়িয়ে এই সুযোগে ফায়দা লুটতে চেয়েছিল সাম ক্যামবল। কিন্তু ওর পেছনে শটগান হাতে দাঁড়িয়েছিল আরেকজন—হুইলার। একেবারে দুটুকরো করে দিয়েছে সান ক্যামবলকে।’

‘আমাকে বলছ কেন?’ রাইফেল উঁচিয়ে ধরবার জন্য মায়ুর উপর জোর খাটাচ্ছে কেস্টারসন।

‘ভাবলাম, তোমার জানা দরকার। তা হলে হয়তো প্রাণে বেঁচে যেতে পারো। কী জানো, হুইলার কিন্তু তোমার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে—সেই শটগানটাই এখন ওর হাতে।’

সরসর করে একটা সাপ উঠে এল কেস্টারসনের শিরদাঁড়া বেয়ে। কথা বলে উঠল হুইলার। ‘ও মিথ্যা বলেনি, ফ্রেন্ড। আর আমার গুলির লাইনেও নেই সাডেন। বন্দুকটা ফেলবে নাকি ঝুঁকি নেবে?’

নড়তেও ভয় হচ্ছে কেস্টারসনের। যদি উল্টাপাল্টা ভেবে বসে ওরা? হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চেহারা। ঢোক গিলল সাবধানে। ‘কেস্টারসন অত বোকা নয়, বলল সে। ‘আমি আর নেই এসবে।’

সাবধানে রাইফেলটা ফেলে দিল কেস্টারসন। তারপর গানবেল্ট খুলে ফেলল এবার পরবর্তী নির্দেশের আশায়। তাকাল শেভলিনের দিকে।

‘এবার নিজের ঘোড়ায় চেপে,’ বলল শেভলিন, ‘ভাগো, কেস্টারসন। ফের যদি তোমাকে দেখি—সোজা লটকে দেব, মনে থাকে যেন!’

বিমূঢ় দেখাল কেস্টারসনকে। ‘তোমরা-তোমরা আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ?’

‘ঠিক—এবার কেটে পড়ো জলদি—আমাদের মত পাণ্টে যাবার আগেই।’

এলোপাতাড়ি পা ফেলে ঘোড়া বের করতে ছুটে গেল কেস্টারসন। পাইন...ওখানেই...পাইনের দিকে চলে যাবে ও...তারপর সিলভার সিটিতে...মোট কথা এখান থেকে দূরে কোথাও!

বিশ

সম্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে বেটি কনসিডাইন। সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরা করছে ও। হঠাৎ মনে পড়ল, পুরোনো একটা নেভি রিভলবার আছে ঘরে, বাবার। ক্লোজিটের তাকে একটা কাঠের বাক্সে রাখা-লোডেড। ওটার কথা ভেবে একটু যেন স্বস্তি পেল বেটি। কিন্তু বের করবার চেষ্টা করল না। রিভলবারটা লুকিয়ে রাখবে কোথায়? তা ছাড়া খুব জরুরি না হলে ওটার দিকে হাত বাড়ানোর ইচ্ছেও ওর নেই।

স্ট্যাগ হারভে এখানে আসবার কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই লোকটার হাবভাব বুঝে নিয়েছে বেটি। পশ্চিমের পুরুষদের চেনা না থাকলে হারভের আচরণ অবাক করত ওকে। লড়াইতে ভয়ঙ্কর, নশংস খুনী-স্ট্যাগ হারভে; কিন্তু পশ্চিমেরই মানুষ সে-মেয়েদের প্রতি রয়েছে আন্তরিক সৌজন্যবোধ।

পিট সিমন্স লোকটা আবার উল্টো ধাঁচের, বুঝতে অসুবিধে হয়নি ওর। চুল বাঁধবার সময় তাই ইচ্ছে করেই যতটা সম্ভব নিজেকে অনাকর্ষণীয় করবার চেষ্টা করেছে ও। কিন্তু কোন লাভ হয়নি।

বিশালদেহী লোক পিট সিমন্স; লোমশ শরীর, মোটা কণ্ঠস্বর। বেটির উপর আঠার মত সঁটে আছে তার চোখজোড়া, লোভে চকচক করছে। তবে স্ট্যাগ হারভে যতক্ষণ আছে পিট সিমন্সের কাছ থেকে বিপদের কোন আশঙ্কা নেই। স্ট্যাগ থাকলে ওর দিকে এগোনোর সাহস করবে না লোকটা। বদমেজাজি লোক স্ট্যাগ হারভে, ওকে খেপানোর ঝুঁকি সে নেবে না কিছুতেই।

ইন্ডিয়ানদের মতই অসীম ধৈর্য ধরতে জানে স্ট্যাগ হারভে।

শেভলিন যখন লিখেছে আসবে, সন্দেহ নেই আসবেই। অপেক্ষা করছে সে। বুঝতে পেরেছে, সাডেন শেভলিনের প্রেমে পড়েছে বেটি। খুশিই হয়েছে, কারণ শেভলিনকে হত্যা করতে চাইলেও ভিতরে ভিতরে লোকটার ভক্ত হয়ে পড়েছে হারভে। সাডেন শেভলিন একজন ফাইটার-ভক্তির কারণ সেটাই।

ধুলোর মেঘ দেখা গেল ট্রেইলে। যেভাবে ছিল, সেভাবেই বসে রইল স্ট্যাগ হারভে, নড়ল না। দেখছে। অতিথির চেহারা কিংবা পোশাক স্পষ্ট দেখবার আগেই বুঝে ফেলল-আগন্তুক শেভলিন নয়। স্বভাবতই মেজাজটা খিঁচড়ে গেল তার।

অশ্বারোহী যে-ই হোক, এখানে আসা মোটেই উচিত হয়নি তার। অথবা এখানে আসবার দরকারটাই বা কি! ধুলো চোখে পড়লে মাত্রাতিরিক্ত সতর্ক হয়ে উঠতে পারে সাডেন। তখন আর সে ঝুঁকি নিতে চাইবে না। ঘোড়সওয়ারের আকস্মিক উপস্থিতিতে বিরক্ত হলো স্ট্যাগ হারভে।

অশ্বারোহী আর কেউ নয়, রাশ জ্যাকসন। উঠোনে পৌছেই চট করে জিন থেকে নেমে পড়ল সে। বিড়বিড় করে গাল বকতে বকতে উঠে দাঁড়াল হারভে। ঘোড়াটা ফাঁকা জায়গায় রেখে দরজার দিকে এগিয়ে আসছে জ্যাকসন। বোকা নাকি! সাডেনকে কী মনে করেছে! কচি খোকা!

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল জ্যাকসন। ইতিউতি তাকাল বেটির খোঁজে। ‘মেয়েটা কই?’

‘পাশের ঘরে!’ মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা করল স্ট্যাগ। ‘ব্যাপার কী? মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ঘোড়া দেখার পর শেভলিন আর পা বাড়াবে এদিকে?’

“‘জে-ডট-ও’তে গেছে সাডেন। ওখানেই পাওয়া যাবে তাকে। পিট সিমনসকে নিয়ে চলে যাও তুমি।’

কথাটা পছন্দ হলো না স্ট্যাগের। ‘কিন্তু এখানে আসবে বলে চিরকুট রেখে গেছে যে সে?’

‘তাতে কী? শহরেই তো তার সঙ্গে দেখা হলো ম্যাককার্থির। নিজের মুখেই বলেছে, “জে-ডট-ও”তে উঠতে যাচ্ছে, ওখান থেকে তাকে নড়ানো যাবে না।’

তা হলে ঠিক আছে। কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে। কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকছে জ্যাকসনের আচরণ। একটা কিছু ঘাপলা আছে; কিন্তু বুঝে উঠতে পারছে না সেটা কী? হঠাৎ আরেকটা প্রশ্ন উঁকি দিয়ে গেল স্ট্যাগের মনে। ‘শহরে ম্যাককার্থির সঙ্গে সাডেনের দেখা হয়েছে, আমার লোকরা তা হলে কী করছিল?’

অনেক কষ্টে ধৈর্য ধরল জ্যাকসন। ‘তোমার লোক?’ অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাগ প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে। ‘কিনা করেছে! শেভলিন আর হুইলার একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে ওদের। শেভলিনের হাতে মারা পড়েছে হারভি। আর মাতবরি করতে গিয়ে হুইলারের হাতে প্রাণ খুইয়েছে সান ক্যামবল।’

হুইলার আবার শেভলিনের সঙ্গে হাত মেলান কেন? বিরক্তির সঙ্গে সংক্ষেপে জবাব দিল জ্যাকসন। সিগারেট ফুকতে ফুকতে এতক্ষণ ওদের লক্ষ্য করছিল পিট সিমনস। ওর চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি জ্যাকসন। জ্যাকসনের মতলব পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে।

ইতস্তত করল স্ট্যাগ হারভে। বুঝতে চাইল জ্যাকসনের উদ্বেগ বা বিরক্তির কারণ। ব্যর্থ হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল সে। ‘বেশ, তা হলে “জে-ডট-ও”তেই যাচ্ছি আমরা। কেস্টারসন আছে ওখানে। এক-আঁধটা গুলি অন্তত ছুঁড়তে পারবে নিশ্চয়ই।’

ঘুরে দাঁড়িয়ে পিট সিমনসের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল স্ট্যাগ হারভে। ‘চলো, পিট।’

জ্যাকসনের উপর চোখ রেখে আপত্তি জানাল বিশালদেহী গানম্যান। ‘না গেলে হয় না?’ মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল সে। ‘আমি না হয় এখানেই থাকি?’

ঘাড় ফিরিয়ে চোখ কটমট করে পিট সিমনসের দিকে তাকাল রাশ জ্যাকসন। “‘জে-ডট-ও’তেই যাবে তুমি!’ ত্রুদ্র কণ্ঠে বলল সে। ‘কার টাকা খাচ্ছ, জানো

না?’

‘তোমার,’ সিমনস বলল, ‘ধরো, আর নেব না, ঠিক করলাম।’

পালা করে দুজনের দিকে তাকাচ্ছে স্ট্যাগ হারভে। ‘তুমি যাবে?’ সিমনসকে জিজ্ঞেস করল ও, ‘নাকি শেভলিনের ভয় করছে?’

বাট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সিমনস, চেহারা য় রাগের ছাপ। ‘ভাল করেই জানো, স্ট্যাগ, আমি পিট সিমনস, কাউকে ডরাই না!’ হাত বাড়িয়ে টুপি আর রাইফেল তুলে নিল সে। ‘চলো!’ দরজা অবধি এসে একবার থামল সিমনস। ‘শিগুগিরই আবার এসে পড়ব হয়তো,’ বলল জ্যাকসনের উদ্দেশে।

দরজায় দাঁড়িয়ে ওদের চলে যেতে দেখল জ্যাকসন। ওরা চোখের আড়াল হতেই চট করে ঘুরে দাঁড়াল। রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে বেটি কনসিডাইন। ‘সে কী! ওরা চলে গেল?’

‘হ্যাঁ।’ ভারি শোনালা জ্যাকসনের কণ্ঠ। কথার সুরে এমন কিছু ছিল, বুকটা ধক করে উঠল বেটির; অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল অন্তরাত্মা।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জ্যাকসনকে দেখল বেটি কনসিডাইন। জ্যাকসনকে কখনোই পছন্দ করত না ও। লোকটা কেমন যেন। মনে হয় অশুভ একটা শক্তি বাসা বেঁধেছে লোকটার ভিতরে। টেবিলের ও-পাশে দাঁড়ানো বেটির দিকে তাকাল বিশালদেহী জ্যাকসন। ‘একটা লোকের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে,’ ভারি কণ্ঠে বলল সে, ‘আরেকজনের মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে তুমি, বেটি।’

‘তাই?’ বিপদের স্বরূপ যেন বুঝতে পারছে বেটি। মাথা ঠাণ্ডা রাখল ও। চোদ্দ বছর বয়স থেকেই এ ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করে আসছে ও; সব সময়ই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার একটা না একটা উপায় ঠিকই বেরিয়ে গেছে। কিন্তু রাশ জ্যাকসনকে অন্যরকম লাগছে আজ, কী একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে যেন লোকটা।

‘ভাল করেই জানো,’ জ্যাকসন বলল ‘শেভলিনের দলে ভিড়তে গিয়েছিল কেন?’

‘কারণ তোমাদের সবার চেয়ে সেরা লোক সাডেন,’ শান্ত কণ্ঠে বলল বেটি। ‘নিজের শক্তিতেই দাঁড়ায় ও, ভাড়া করা গানহ্যান্ডদের আড়ালে নয়।’

লাল হয়ে গেল জ্যাকসনের চেহারা। দুচোখে হিংস্র দৃষ্টি। ইচ্ছে হচ্ছে এখনই ধরে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেয় বেয়াদব মেয়েটাকে। ‘ওকে ভয় পাই ভেবেছ?’ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল জ্যাকসন। কিন্তু এবার অনেকটা ফাঁকা শোনালা তার কণ্ঠ

‘জানি, ভয় পাও—ভাবার প্রশ্ন আসছে কেন?’ আবার কণ্ঠ শান্ত রেখে বলল বেটি কনসিডাইন। ‘তুমি নিবোধ নও, জ্যাকসন। নিরেট গর্দভই কেবল শেভলিনকে ভয় না পেয়ে থাকতে পারে।’

একটা চেয়ারে বসে পড়ে বেটির দিকে তাকাল রাশ জ্যাকসন। ‘নাও, এক কাপ কফি দাও!’ আদেশ করল সে।

জ্যাকসনের দিকে এক পলক দৃষ্টি ফেলে টুলোর দিকে এগিয়ে গেল বেটি। তুলে নিল কফিপটটা। কাপে কফি ঢালল। জ্যাকসন ভেবেছিল, টেবিল ঘুরে ওর

বইঘর কম
ঘেরাও

দিকে এগিয়ে আসবে বেটি। কিন্তু তাকে নিরাশ করে টেবিলের ওধার থেকেই বাড়িয়ে দিল ও কাপটা। চট করে কজিটা চেপে ধ্বংসে চাইল জ্যাকসন। ছলকে কাপ থেকে কফি পড়ে হাত পুড়িয়ে দিল বেচারার।

চৌচিয়ে উঠল জ্যাকসন। ‘হতচ্ছাড়া মেয়ে, জাহান্নামে যাও! ইচ্ছে করে পুড়িয়ে দিলে হাতটা!’

‘হায় হায়, মিস্টার জ্যাকসন, একী বলছ!’ বিদ্রোহী ঝরল বেটির কণ্ঠে।

চোখ রাঙাল জ্যাকসন। আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে গেল বেটির দিকে। ‘দাঁড়াও, দেখাচ্ছি!’

বাউলি কেটে জ্যাকসনের নাগালের বাইরে সরে গেল বেটি কনসিডাইন। ‘এখন কেউ এলে, তোমার কী অবস্থা হবে, একবার ভাবো তো!’ বলল মেয়েটা, ‘ধরো, সাডেনই এসে হাজির হলো, তখন?’

দাঁড়িয়ে পড়ল জ্যাকসন। ক্রোধে জ্বলে উঠল তার চেহারা। তবু কথাগুলো যেন রাগ ভেদ করে জ্যাকসনের মস্তিষ্কে গিয়ে আঘাত করল। হঠাৎ বুঝতে পারল, ইচ্ছে করেই নিজেকে সব সাহায্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে সে। ঠিকই তো, শেভলিন সত্যি এসে পড়ে যদি?

স্ট্যাগ হারভে ফেলে দেওয়ার পর শেভলিনের চিরকুটটা তুলে নিয়েছিল বেটি। টেবিলের উপর দিয়ে জ্যাকসনের দিকে ঠেলে দিল ওটা। ‘কী, কেমন মনে হচ্ছে?’ জিজ্ঞেস করল ও। ‘আমাকে উত্যক্ত করছ দেখলে শেভলিন কী করবে জানো?’

‘আমাদের নাগাল পাবে না সে।’ বলল জ্যাকসন। “‘জে-ডট-ও’”তেই তাকে খতম করে ফেলবে ওরা।’

কিন্তু ওরা যখন কথা বলছে, অনেক কটা ঘটনা ঘটে চলেছে একই সঙ্গে।

নদী তীরের কেবিনের দিকে ছুটে আসছে ম্যাককার্থি, আর মাত্র অল্প দূরে আছে সে। ওদিকে দুজন সঙ্গী নিয়ে উত্তর দিক থেকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে লী উইলকক্স, ট্রেইল ছেড়ে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে ঘুর পথে আসছে সে।

গাছপালার কিনারায় পৌঁছে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল উইলকক্স। দেখল উঠোনে একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। এবং তারপরই চোখ গেল দ্বিতীয় ঘোড়সওয়ারের দিকে। নদীর ফোর্ডে পৌঁছে পানিতে নেমে পড়েছে সে। সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে কী যেন বলল লী উইলকক্স। তারপর ট্রেইল ধরে তিনজন একসঙ্গে এগোল কেবিনের দিকে।

অন্যদিকে রেড ক্রিক শহরের গুরুত্বপূর্ণ ছ’টি জায়গায় পজিশন নিয়েছে ছ’জন ডেপুটি। শহরের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব পড়েছে ওদের কাঁধে। হোটেলের সামনে অপেক্ষা করছে পনেরজন ঘোড়সওয়ার। হোটেল থেকে বেরিয়ে এল নবনিযুক্ত মার্শাল ফ্র্যাংক চেম। পিছনে জিম ন্যারোজ্ আর মরটন শবি। ঘোড়ায় চাপল ওরা।

ভবঘুরে দুর্ধর্ষ এক গানম্যান কাজের সন্ধানে শহরে এসেছিল। রেস্টরাঁয় গ্লাসে মদ

ঢেলে বারটেভারের দিকে তাকাল সে। ‘আমি ভাগছি!’

‘কেন, কী হলো?’

মাথা নেড়ে রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করল বন্দুকবাজ। ‘দেখলে না, শহর থেকে বেরিয়ে গেল ওরা! ভাল লোকগুলো কেমন খেপে উঠেছে! আরে বাবা, লড়াই অনেক দেখেছি আমি। শহরের সবকটা লোক এরকম খেপে ওঠার পর কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। দশটা মিনিট সময় দাও-তারপর আমার টিকিটির নাগালও আর পাবে না কেউ।’

জ্যাকসন যখন বেটির দিকে এগোচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ট্রেইলে ঝড় তুলে ছুটে এল ম্যাককার্থি। পাশের ঘরের দরজার দিকে ছুটে গেল বেটি। হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে যেতেই থমকে দাঁড়াল জ্যাকসন। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার চেহারা। খপ করে বন্দুকটা তুলে নিয়ে দৌড়ে গেল দরজার দিকে। জিন থেকে পিছলে নেমে এসে সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখতে গেল আগন্তুক। আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে জ্যাকসন। কোন কিছু না ভেবেই বন্দুক উঁচিয়ে ট্রিগার টিপে দিল সে।

দোরগোড়ায় দাঁড়ানো কালো ছায়াটা দেখল ম্যাককার্থি। বন্দুকের নলে গোলাপী আগুনও চোখে পড়ল। পরক্ষণেই কী যেন আঘাত করল তার পেটে। সিঁড়ির ধাপ থেকে ফস্কে গেল পা-টা। ঝড়ে উপড়ানো গাছের মত মুখ খুবড়ে পড়ল সে।

ফের গুলি করবার জন্য বন্দুক বাগিয়ে ছুটে গেল জ্যাকসন। কিন্তু লোকটাকে চিনতে পেরেই ‘থ’ বনে গেল।

ম্যাককার্থি!

বিস্ময়ের ধাক্কায় ঘোঁৎ করে শব্দ করে উঠল জ্যাকসন। ঘর থেকে শব্দটা শুনতে পেল বেটি কনসিডাইন। ক্লোজিট থেকে পিস্তল বের করায় ব্যস্ত। পিস্তলটা অ্যাথ্রনের তলায় লুকিয়ে আবার কিচেনে ফিরে গেল ও।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পায়ের আওয়াজ পেল জ্যাকসন। শূন্য দৃষ্টিতে ঘাড় ফিরিয়ে বেটির দিকে তাকাল সে। ‘ম্যাককার্থি,’ বলল বোকার মত, ‘ম্যাককার্থিকে মেরে ফেলেছি আমি!’

উঠানে এসে ঢুকল লী উইলকক্স। তখনও ফাঁকা দৃষ্টিতে বেটির দিকে চেয়ে আছে জ্যাকসন। প্রথমে ম্যাককার্থির নিখর দেহ তারপর জ্যাকসনকে দেখল উইলকক্স। ‘ওকে গুলি করার কারণ?’ কৌতূহলের সঙ্গে জানতে চাইল সে।

‘আমার দিকে ছুটে আসল...ভাবলাম শেভলিন!’

তীক্ষ্ণ চোখে জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে বেটির দিকে চোখ ফেরাল লী উইলকক্স। আস্তে আস্তে বুঝতে পারল সে ব্যাপারটা। বার দুই ওদের দুজনকে জরিপ করে এমনভাবে মাথা ঝাঁকাল, যেন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে।

‘সরিয়ে ফেলো লাশটা!’ বলল লী উইলকক্স। ‘শেভলিন আসছে।’ সঙ্গীদের দিকে তাকাল এবার। ‘যাও, মেয়েটাকে বেঁধে ফেলো, কিন্তু সাবধান, গায়ে যেন

বৃষ্টির কুসুম

আঁচড়টিও না লাগে।’

অস্পষ্টভাবে ওর কণ্ঠস্বর শুনলেও কথাগুলো বুঝল না বেটি। লাশটা সরিয়ে ফেলবার জন্য উবু হয়ে ম্যাককার্থির একটা হাত ধরল জ্যাকসন। জিন থেকে নেমে যেন জ্যাকসনকে সাহায্য করবে, এমনি ভাব দেখিয়ে বেটির দিকে এগিয়ে এল লোক দুটো। ওদের মতলব বুঝতেই পারল না বেটি। তার আগেই দুদিক থেকে দুজন খপ করে চেপে ধরল ওর হাত। পিস্তল বের করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো ও।

‘ভয় নেই, তোমার কোন ক্ষতি হবে না, বলল লী উইলকক্স। ‘সাডেনকে যাতে সাবধান করতে না পারো, সেজন্যেই বাঁধতে হচ্ছে তোমায়।’

ম্যাককার্থির রক্তের উপর ধুলো ছড়িয়ে দিল ওরা; ঘোড়াগুলো লুকিয়ে রেখে ঢেকে ফেলল ট্রাক। অসহায়ভাবে দেখল বেটি কনসিডাইন। এবার সতর্কতার সঙ্গে যার যার অবস্থান গ্রহণ করল ওরা।

কেবিনের ভিতর রাশ জ্যাকসন...আস্তাবলে লী উইলকক্স...ওর দুজন রাইডারের একজন কোরালে, অন্যজন গাছপালার সীমানায় লাকড়ির শত্বপের পেছনে। মোট চারজন...হত্যার জন্য প্রস্তুত সবাই। ওদিকে ট্রেইলে কোথাও রয়েছে স্ট্যাগ হারভে আর পিট সিমনস্।

সাডেন শেভলিন বেরিয়ে যাবার পর প্রায় বিশ মিনিটের মত সময় পেরিয়ে গেছে। হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল হুইলারের। তীক্ষ্ণ চোখে ট্রেইলের দিকে তাকাল ও। পলকের জন্য দেখতে পেল দুজন অশ্বারোহীকে: স্ট্যাগ হারভে আর পিট সিমনস্।

সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে পিট সিমনসকে নিশানা করল হুইলার। তারপর টিপ দিল ট্রিগারে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গুলিটা। গুলির শব্দে ভয় পেয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিল ওরা। ঠাণ্ডা মাথায় ঝোপ লক্ষ্য করে গুলি-বৃষ্টি ঝরাতে শুরু করল নোবল হুইলার। এই সামনে যাচ্ছে, পরমুহূর্তে পিছিয়ে আসছে, সমানে আগুন ঝরছে রাইফেলের নলে।

মাথা গুঁজে মাটি কামড়ে পড়ে আছে পিট সিমনস্। মাথার উপর দিয়ে বিশ্রী শব্দ তুলে একের পর এক ছুটে যাচ্ছে গুলিগুলো।

‘এ কিছুতেই সাডেন হতে পারে না,’ বলল সিমনস্, ‘তা হলে এত তাড়াতাড়ি গুলি করত না—আমাদের আরও সামনে যাওয়ার সুযোগ দিত!’

‘জানি, এ হুইলার ছাড়া আর কেউ না।’

‘তা হলে আর বসে আছি কেন? চলো, ফিরে যাই! এখন নিশ্চয়ই মেয়েটার কাছে যাচ্ছে সে।’

কথাটা একটু ভেবে দেখল স্ট্যাগ হারভে। সিমনস্ ঠিকই বলেছে। তা ছাড়া জ্যাকসনের সঙ্গে একা রয়েছে বেটি কনসিডাইন। কথাটা যত ভাবছে ততই মেয়েটার নিরাপত্তার ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়ছে সে। কোন কারণে ইচ্ছে করেই ওকে কেবিন থেকে সরিয়ে দিয়েছে জ্যাকসন। কেন? সাডেন শেভলিনকে ‘জে-

ডট-ও'তে পাওয়া যাবে-এটা একটা উসিলামাত্র।

ধীরে ধীরে ক্রল করে নিজেদের ঘোড়ার কাছে ফিরে এল দুই বন্দুকবাজ।
জিনে চেঁপে বসল, তারপর ফিরতি পথ ধরল একসঙ্গে। ছুঁতুল ঘোড়ার খুরের শব্দ
শুনল হুইলার, বিড়বিড় করে গাল বকল ও। ওদের পিছু ধাওয়া করবে, নাকি
এখানেই থাকবে? দোঁটানায় পড়ল মুহূর্তের জন্য। তারপরই শেভলিনের কথা মনে
পড়ল, কোন কারণেই এখান থেকে নড়া যাবে না।

‘তা হলে,’ গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিল সাডেন, ‘কাকে গুলি করলাম ভেবে অস্থির
হতে হবে না আমাকে। বুঝতে পারব, শত্রুর উদ্দেশ্যেই গুলি ছুঁড়ছি, বন্ধুকে নয়!’

খাবার তৈরি করে বাইরের দিকে নজর রেখে টেবিলে বসে খেয়ে নিল
হুইলার। আস্তে আস্তে এগিয়ে এল সূর্যাস্তের সময়। এক সময় টুপ করে ডুবে গেল
সূর্যটা। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে এল অন্ধকার।

বসে আছে হুইলার-অনড়, সতর্ক।

সিকামোরের ছায়ায় দাঁড়ানো কেবিনে রাত নামল। প্রথমে আস্তাবলটাকে গ্রাস
করল অন্ধকার, তারপর আধারে ঢাকা পড়ল উঠোনটা।

পালা করে কেবিনের পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে খেয়ে দেয়ে আবার যার যার
জায়গায় ফিরে গেল লোকগুলো।

উইলকক্স এসে প্রথমে বেটির বাঁধন পরীক্ষা করল। তারপর মুখে গাঁজা
রুমাল বের করে কফি খাওয়াল ওকে।

‘চুপচাপ শান্ত হয়ে থাকো,’ বলল সে, ‘কোন ক্ষতি হবে না তোমার।’

‘শান্ত থাকব?’ তিক্ত কণ্ঠে বলল বেটি। ‘ভাল একটা লোককে তোমরা খুন
করবে আর আমি শান্ত থাকব?’

রাত বয়ে চলল। কেবিনের কাছেই একটা সিকামোরের ডালে ক্লাস্তিহীন গান
গেয়ে চলেছে একটা মকিংবার্ড। পিস্তল হাতে একটা চাদরে শুয়ে অপেক্ষা করছে
লী উইলকক্স। বারবার ঘুম টুটে যাচ্ছে বেটির, খানিক পরই ঘুমিয়ে পড়ছে
আবার।

পাহাড়ের গায়ে একটা চাতালে উপড় হয়ে শুয়ে আছে সাডেন শেভলিন।
পিঠের উপর একটা কমল ফেলে রেখেছে। হিমেল হাওয়া বইলেও বেশ ভাল
লাগছে। ছোট্ট কেবিনটা থেকে ঠিক এক হাজার ফুট উঁচুতে ওর অবস্থান। এখান
থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কেবিনটা, তবে বড় বড় সিকামোরের আড়ালে
আংশিকভাবে ঢাকা পড়েছে উঠোন আর পেছন-দরজাটা। বেটির মেয়ার আর ওর
ডান স্ট্যালিয়নটা দেখা যাচ্ছে কোরালে। কিন্তু বেটির চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না
কোথাও।

সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে এখানে এসে পৌঁছেছে সাডেন। সেই থেকে
অপেক্ষা করছে।

কেবিনের কিচেনে বাতি জ্বলছে। খানিকক্ষণের জন্য বাতিটা অন্য ঘরে নিয়ে
গেল কেউ। একটু পরেই আবার আগের জায়গায় দেখা গেল ওটা বার কয়েক

বইখর, কম
খেরাও

দরজা বন্ধ করবার শব্দ ভেসে এল।

ও দেখবার আগেই যারা আসবার এসে গেছে কেবিনে। কিন্তু সাডেন জানে, এখানে নজর রাখবে শত্রুপক্ষ। কিছুটা পিছু সরে এল ও, সিগারেট ধরাল। ক্রমেই বেড়ে উঠছে শীতের আক্রমণ, কিন্তু আগুন জ্বালবার সাহস করল না ও। অপেক্ষা করতে হবে আরও। একা হলে নিরাপদেই আছে মেয়েটা; যদি না হয়, নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক কোন শব্দ কিংবা সংকেত পাওয়া যাবে।

সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ও। রাত পোহাতে আর খুব বাকি নেই।

হঠাৎ মাথা উঁচু করল লী উইলকক্স। কেবিনের ভিতর থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এসেছে। কাঠের পাটাতনে মৃদু আতনাদ ধ্বনি উঠল। দরজা খুলবার শব্দ। চট করে উঠে দাঁড়াল উইলকক্স। কেবিনের দিকে এগিয়ে গেল দ্রুত, পথে সঙ্গীদের নিচু কণ্ঠে দু-একটা নির্দেশ দিল।

প্রেতাচার মত নিঃশব্দে কেবিনে ঢুকে পড়ল সে। যা ভেবেছিল তা-ই। সন্ত্রস্ত বেটির সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাশ জ্যাকসন। ভয় বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। ঘরের মৃদু আলোতেও দেখা যাচ্ছে জ্যাকসনের চকচকে চোখজোড়া।

‘এখানে কী করছ তুমি, রাশ?’

ক্রোধে কণ্ঠস্বিত হয়ে গেল জ্যাকসনের চেহারা। ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সে। ‘উফ, লী! নিজের চরকায় তেল দিতে পারো না?’

‘তাই তো দিতে এলাম,’ শান্ত উইলকক্স, কিন্তু দুচোখে সেই আগুন জ্বলে উঠেছে। ‘ফাঁসিতে ঝুলতে চাই না আমি!’

‘যেখানে ছিলে সেখানে ফিরে যাও!’ কর্কশ কণ্ঠে বলল জ্যাকসন।

‘না,’ হাসল উইলকক্স। ‘আমি থাকছি এখানে। এবার আস্তাবলে যাবে তুমি।’

‘বললেই হলো!’

আস্তে আস্তে উঠে এল উইলকক্সের রাইফেল। নিশানা করল জ্যাকসনের বুক বরাবর। ‘তা হলে পিস্তল বের করো, রাশ। হয় তুমি যাবে, নয়তো এখানেই মরতে হবে একজনকে।’

এত ঘৃণা আর কখনও কারও প্রতি অনুভব করেনি জ্যাকসন। দীর্ঘ সময় লী’র দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। ‘নিকুচি করি...!’

ঘর থেকে বেরিয়ে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে।

শব্দটা শুনল সাডেন শেভলিন। ভাবনায় পড়ে গেল ও।

একুশ

অন্ধকার থাকতে থাকতেই পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে নেমে এল সাডেন শেভলিন।

সহজাত প্রবৃত্তির বশেই বুঝতে পারছে, শো-ডাউনের আর দেরি নেই। ভোরের প্রথম আলো যখন আকাশে ফুটে উঠল, কোরালের বড় জোর পঞ্চাশ গজ দূরে এসে দাঁড়িয়েছে ও-কেবিনটা হবে মোটামুটি আশি গজের মত দূরে। ছোট একটা ঝোপের আড়ালে রয়েছে ও।

সময় নিয়ে সিগারেট ধরাল সাডেন, কেবিনটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করছে। বেশ অনেকক্ষণ কোনরকম নড়াচড়া কিংবা প্রাণের কোন চিহ্ন চোখে পড়ল না। তারপর হঠাৎ ধোঁয়ার রেখা দেখা দিল চিমনির মুখে। ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকাল শেভলিন। ভাবছে, ঘুম থেকে কখন ওঠে, ওকে বলেছিল কিনা বেটি।

একটুও হাওয়া নেই কোথাও। নির্মেষ নীলাকাশ উত্তপ্ত একটা দিনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। সাডেন ক্লান্ত অথচ তৈরি। অনুভব করছে তৈরি হয়ে আছে দেহের প্রতিটি পেশী। অদ্ভুত এক ধরনের স্থিরতা বোধ করছে ও, বিপদের মুহূর্তে আগেও এমন হয়েছে ওর।

ঘাম আর রক্ত শুকিয়ে গায়ের সাথে সেঁটে গেছে শার্টটা। গোসল করা হয়নি বেশ কদিন। দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। অস্বস্তি লাগছে। চোয়ালের উপর কয়েক দিনের না কামানো দাড়িতে গাল চুলকাচ্ছে। শুকনো আর কচি পাতার মন কেমন করা গন্ধ লাগছে নাকে। একটু দূর থেকে ভেসে আসছে নদীর ছলাং ছলাং উচ্ছ্বাস।

অলস ভঙ্গিতে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে ধোঁয়ার ক্ষীণ রেখা। হঠাৎ কালো হয়ে উঠল রেখাটা। তীক্ষ্ণ হলো শেভলিনের দৃষ্টি। লম্বা টান দিল সিগারেটে। চোখ সরাল না। তেলচিটচিটে কাপড়-বা ওই জাতীয় কিছু-আচমকা ছেদ পড়ল ধোঁয়ার রেখায়। কুণ্ডলী দেখা দিল একটা-আরেকটা-আবার।

ঘরের ভিতর থেকে কেউ-বেটি ছাড়া আর কে হবে?-সংকেত দিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছে ওকে!

কোরাল থেকে হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল কে যেন। ওঅটার ট্রাফের পেছন থেকে আচমকা মাথা তুলে দাঁড়াল একজন। দৌড়ে গেল কেবিনের পেছনের দরজার দিকে। ঠোঁটে খিস্তির ঝড়। লোকটাকে এতক্ষণ দেখতে পায়নি সাডেন।

মুদু হাসি ফুটে উঠল সাডেন শেভলিনের ঠোঁটে। ‘লক্ষ্মী মেয়ে!’ বলল ও। ‘দারুণ দেখিয়েছে!’

বেটির কৌশল ফলপ্রসূ হলো। ধমকের সুর শোনা গেল কেবিনের ভিতর থেকে; জবাবে কী যেন বলল বেটি, এবার কথা বলে উঠল আরেকটা কণ্ঠ। কথাগুলো শুনলেও বুঝতে পারল না শেভলিন। কণ্ঠস্বরে মনে হচ্ছে, বক্তা উইলকক্সই হবে।

পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল আগের লোকটা। চকিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাল। তারপর উঁবু হয়ে দৌড়ে গিয়ে ফের লুকিয়ে পড়ল ওঅটার ট্রাফের পেছনে। লোকটা উইলকক্সের একজন রাইডার। আগেও একবার লোকটাকে দেখেছে সাডেন। নাম, উইলসন।

চিন্তিত চেহারা উঠোনটা জরিপ করল সাডেন শেভলিন। কোরালে একজন,

বইঘর কম
ঘেরাও

কেবিনের ভিতর একজন; আস্তাবলেও একজন আছে নিঃসন্দেহে।

মোটমোট কজন? জ্যাকসনের মত অত লোকবল নেই উইলক্সের। তারপরও ছ'থেকে সাতজন লোক থাকা খুবই স্বাভাবিক। অন্তত চার পাঁচজনের কম হবে না নিশ্চয়ই! সবচেয়ে বিপজ্জনক স্ট্যাগ হারভে আর পিট সিমনস্—এই দুজন তো বাদই রয়েছে। সিগারেটটা শেষ করল সাডেন। মাটিতে ফেলে গোড়ালি দিয়ে পিষে নেভাল।

কিছু না ভেবে এখন তাড়াহুড়ো করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। সবার আগে শত্রুশিবিরে শত্রুর সংখ্যা কজন জানতে হবে ওকে। হিসাবে যদি ভুল না হয়, শিগগিরই সেই সুযোগ পেয়ে যাবে ও। ওর জন্যে ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছে ওরা। কিন্তু এই সকালে আগুন জ্বালাবার একটাই অর্থ হতে পারে, নাশতা, অন্ততপক্ষে কফি তৈরি হচ্ছে।

আবার হাসি দেখা দিল সাডেনের ঠোটে। চোখে ঝিলিক খেলে গেল সূক্ষ্ম কৌতুক। এক কাপ কফি হলে মন্দ হত না। কেবিনটাকে ভাল করে লক্ষ্য করল ও। নিশ্চয়ই পেছনের দরজাটাকে কাভার করে আছে কেউ। এই মুহূর্তে ডানে যাবারও উপায় নেই, ডজন খানেক দোয়েল সভা বসিয়েছে ওদিকে, এগোলেই ওর উপস্থিতি ফাঁস করে দেবে ওগুলো।

উপড়ানো একটা গাছ পড়ে আছে ওর পেছনে। কাত হয়ে পড়ে থাকা কাণ্ডের উপর বসে পড়ল শেভলিন। অপেক্ষা।

কেবিন থেকে বাসন-কোসনের বানবান শব্দ ভেসে আসছে। ভিতরে জ্যাকসন থাকলে এখনি এগিয়ে যেত ও। ধাপ্পা দিয়ে লোকটাকে হয়তো সরিয়ে আনা সম্ভব হত গোলাগুলির রাস্তা থেকে। অথবা গানফাইট হলেও তাকে হত্যা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না ও। কিন্তু লী উইলক্সের ব্যাপারটা ভিন্ন। উইলক্সের মত লোককে ধোকা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বুদ্ধিমানের মতই অবস্থান গ্রহণ করেছে লোকটা।

তামাক আর কাগজ বের করে আরেকটা সিগারেট রোল করতে শুরু করল সাডেন। এই মুহূর্তে ধৈর্য হারালে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এখানে বসে নিজেকে সন্তোষ দেচ্ছে ও সব কিছু। সুতরাং অপেক্ষা করা কষ্টকর হবে না ওর জন্য। ওদের স্নায়ুর উপরই বরং চাপ পড়বে—ওরাই ভেঙে পড়বে আগে।

মাথার ভিতর একের পর এক প্ল্যান জাগছে আর বাতিল হচ্ছে। একটু চিন্তা করতেই একশো একটা ফুটো বেরিয়ে পড়ছে সেগুলোয়। দরজায় এসে দাঁড়াল বেটি। এক গামলা এটো পানি ফেলল। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে চেষ্টা করে ডাকল উইলসনকে। ট্রাফের পেছন থেকে উঠে দাঁড়াল টেবল মাউন্টেন র‍্যাঞ্চ রাইডার। এগিয়ে গেল কেবিনের দিকে। ফের বাসন-কোসনের বানবান শব্দে পেল সাডেন—খিদে চাঙা হয়ে উঠল ওর। একটু পরেই বেরিয়ে এল উইলসন। ট্রাফের পেছনে নিজের অবস্থানে ফিরে যাবার পথে কেবিনে যেতে বলল আরেকজনকে। নামটা ধরা গেল না। কেবিনের দিকে এগিয়ে গেল দু'নম্বর। কাঠের স্তম্ভের পেছন থেকে বেরিয়ে এসেছে। একটু যেন কুঁজো হয়ে হাঁটছে লোকটা। মোট

তিনজনের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে তা হলে। আর কই? আস্তাবলে তো একজন আছেই।

খানিকক্ষণ পর খাওয়ার পালা চুকিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল কুঁজো। ওঁটারিং ট্রাফের সামনে পৌঁছে একটু থামল সে। লোকটার কথা শুনতে পেল শেভলিন।

‘লী বলল, আর বেশিক্ষণ নাকি অপেক্ষা করতে হবে না।’

‘না হলেই বাঁচি। এভাবে বসে থাকতে আর ভাল্লাগছে না।’

‘এদিকে আবার মনে হচ্ছে কাঠ ফাটা রোদ পড়বে আজ।’

‘হুঁ।’

‘তো যাই। জ্যাকসনকে আবার কেবিনে পাঠাতে হবে।’

এগিয়ে গেল লোকটা। আস্তাবলের দরজায় থামল আবার।

উঠোন পেরিয়ে পেছনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল জ্যাকসন। কুৎসিত দেখাচ্ছে তাকে। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে কালো হয়ে গেছে চেহারা। ভাল করে লোকটাকে লক্ষ্য করল সাডেন। উত্তেজিত হয়ে আছে জ্যাকসন, যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়বে। ভালমানুষ কোন কালেই ছিল না সে। এত দিন যে আইনের সীমারেখা পেরোয়নি, সেটা দুর্ঘটনা বৈ আর কিছু নয়। কিন্তু এখন শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে—ফিরতে পারবে না আর।

ঘরে ঢুকল জ্যাকসন। সেই খিদে জাগানো শব্দ আবার। জ্যাকসনের চড়া গলার আওয়াজ ভেসে এল। ‘এখন যে তুমি এখানে?’

সম্ভবত উইলক্সেরই জবাব দিল নিচু স্বরে। তারপর আবার শোনা গেল জ্যাকসনের উচ্চকণ্ঠ। ‘বটে? একদিন না একদিন ভুল জায়গায় হাত দেবে তুমি, লী! তখন দেখো, আমি—’

মাঝ পথে বাধা পড়ায় কথাটা শেষ করতে পারল না জ্যাকসন। এবার অশ্রব্য ভাষায় গলাগালির শব্দ শুনতে পেল সাডেন। ‘মেয়েটা কী এমন? একটা হতচ্ছাড়া—’

‘উহঁ! শব্দটা উচ্চারণ কোরো না!’ কোন সন্দেহ নেই উইলক্সেরই কণ্ঠস্বর এটা। উত্তেজিত সাডেন এগোনের জন্য তৈরি হলো। জ্যাকসনের হয়েছে কী? উইলক্সের মেজাজ টের পাচ্ছে না সে? লোকটা নিজেও অবশ্য খেপে আছে। কিন্তু উইলক্সের মত তো নয়। যখনই লড়াইতে অবতীর্ণ হোক না কেন ওরা, বিজয়ী হবে উইলক্সই।

কথাটা বোধ হয় বুঝতে পারল জ্যাকসন। কারণ এবার কিছুটা নরম শোনা গেল তার কণ্ঠস্বর। অবশেষে বাধ্য হয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল সে। দাঁত খেলাল করতে করতে এগিয়ে গেল আস্তাবলের দিকে, বিড়বিড় করছে অনর্গল।

অপেক্ষা করছে সাডেন... অপেক্ষা করছে। আর কেউ নেই। মোট চারজন। এবং ওদের সবার অবস্থান ও জেনে গেছে।

ফয়সালা হয়ে যেতে পারে এখনই। জ্যাকসন কোথায় আছে ও জানে। তাকে যদি সামলানো যায়, উইলক্সের সঙ্গে হয়তো কোনরকম সমঝোতায় পৌঁছানো

বইস্বাক্ষর

সম্ভব হতেও পারে। সময় সময় যথেষ্ট যুক্তিজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে টেবল মাউন্টেন র‍্যাঞ্চের।

তা হলে জ্যাকসন।

শেষ করতে হবে তাকে।

লী উইলকক্সের কাছ থেকে বেটির কোন বিপদ হবে না। ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল সাডেনের। ম্যাককার্থি কোথায়? শহরে? নাকি ভাগছে?

আস্তে আস্তে ঝোপের পেছনে ফিরে গেল সাডেন। ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে কোরাল এড়িয়ে আস্তাবলের উদ্দেশে এগোল ও। লাকড়ির স্তূপের পেছনে লুকোনো লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার লোভ জাগল একবার, কিন্তু নিজেকে বিরত রাখল। অবশেষে আস্তাবলের পেছনে এসে গেল সাডেন। এবার ফাঁকায় বেরিয়ে আসতে হবে। সাবধানে, পা টিপে টিপে আস্তাবলের কোণে এসে দাঁড়াল ও। তারপর কোণ থেকে বেরিয়ে বিশাল একটা গাছের ছায়ায় মিশে গেল। আর মাত্র এক পা। তা হলেই আস্তাবলে ঢুকতে পারবে।

আস্তাবলটা ছাপরা টাইপের। সামনের দিকটা প্রায় দুই তৃতীয়াংশ আটকানো, দুটো দরজা রয়েছে দুদিকে। এগুলোর একটা দিয়েই ঢুকবার কথা ভাবছে সাডেন। জানে, অন্য দরজায় পাহারায় রয়েছে জ্যাকসন। থেকে থেকে নড়াচড়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে ওদিকে।

মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করল সাডেন, পা বাড়াল সামনে। ঠিক এই সময় পেছন থেকে কথা বলে উঠল শীতল একটা কণ্ঠস্বর—বিজয়ের ছোঁয়া সুরে।

‘এই যে, শেভলিন, তোমাকেই খুঁজছি!’

ঘুরে দাঁড়াল সাডেন। জানে, কাকে দেখবে। স্ট্যাগ হারভে দাঁড়িয়ে আছে—বড়জোর তিরিশ গজ দূরে। নদী তীরের পাথরের স্তূপের ওদিক থেকে এসে হাজির হয়েছে সে। তার ডান দিকে গজ বিশেক দূরে দাঁড়িয়েছে পিট সিমনস্।

একটুও নড়ল না সাডেন শেভলিন। ঘেরাও হয়ে গেছে ও। পেছনে জ্যাকসন, সামনে হারভে আর পিট সিমনস্; কেবিনে আছে লী উইলকক্স, আর তার দুজন রাইডার তো আছেই।

মোট ছজন। ‘হয়েছে, সাডেন,’ আপন মনে বলল শেভলিন, ‘তোমার খেলা শেষ!’

একথা ভাববার পরও মাথার ভিতর চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে ওর। এই শত্রুব্যুহ ভেদ করে প্রাণ নিয়ে বেরুনের আশা খুব কম—নেই বললেই চলে। সুতরাং ওর কাজ হচ্ছে, আসল শয়তানগুলোকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। একজন স্ট্যাগ, নিঃসন্দেহে। স্ট্যাগ আর জ্যাকসন। অর্থাৎ ঝটিতি হারভেকে গুলি করেই ঘুরতে হবে ওকে বিদ্যুৎ গতিতে—গুলি করতে হবে জ্যাকসনকে। মোক্ষম গুলি—মাত্র একটা সুযোগই পাবে ও। এরপরও যদি বেঁচে থাকে ঢুকে পড়বে আস্তাবলে। কিন্তু বাকি চারজনও গুলি করবে ওকে—হাত-পা ছেড়ে বসে থাকবে না।

পা ফাঁক করে দৃঢ় ভঙ্গিতে গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সাডেন শেভলিন।

মাথাটা একটু নিচু করল ও, তেতে ওঠা রোদের ভিতর দিয়ে তাকাল স্ট্যাগ। হারভের জুলন্ত সবুজ একজোড়া চোখের দিকে। চারদিক নিস্তব্ধ। কাঠের পাটাতন ককিয়ে উঠবার শব্দ ভেসে এল কেবিন থেকে। কোথাও যেন ডেকে উঠল একটা দোয়েল। সাডেন শেভলিন জানে, কেবিনে রয়েছে মেয়েটা...নির্ভর করে আছে ওর উপর।

আচমকা বুকের মধ্যে ঘুম ভেঙে জেগে উঠল যেন একটা সিংহ। মুহূর্তে সব ভয়, দ্বিধা আর সংশয় দূর হয়ে গেল ওর মন থেকে। স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করল ও—একাকী এক যোদ্ধা, চারদিকের বিপদ থেকে প্রাণাধিক প্রিয় কিছু রক্ষা করতে লড়ছে শত্রুর বিরুদ্ধে।

হারভের দিকে তাকাল সাডেন। হঠাৎ সশব্দে হাসতে শুরু করল। বুকের গভীর থেকে যেন উথলে উঠছে হাসির জোয়ার। এত চালাকি, এত কৌশল অবলম্বন করে লড়াই করবার পরও ফাঁদে পড়ে গেছে ও, ঘেরাও হয়ে গেছে—নিজেকে বিদ্রূপ করেই যেন ও হাসছে। ওর হাসির আঘাতে ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে নীরবতার দেয়াল।

‘তোমাকে এখানে দেখে কী যে খুশি লাগছে, স্ট্যাগ!’ বলল ও, ‘ভয় হচ্ছিল উৎসব থেকে তুমি আবার বাদ পড়ে যাও কি না!’

‘তোমাকে নরকে পাঠাতে যাচ্ছি আমি, শেভলিন!’ নিচু শীতল কণ্ঠে বলল স্ট্যাগ হারভে

এই শীতলতা, এই বিপজ্জনক বরফ-শীতলতা ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইছে শেভলিন। ‘তুমি?’ কণ্ঠে বিদ্রূপের ছোঁয়া লাগাল ও। ‘আরে, একা কোনখানেই আমাকে পাঠানোর সাধ্য নেই তোমার! তোমার ‘ড্র’ আমার দেখা আছে, স্ট্যাগ। এত মত্বর, তোমাকে পশ্চিমের লোক ভাবতেই লজ্জা হয়। তুমি—গানফাইটার?’

আবার হেসে উঠল সাডেন। ‘আর আমাকে নরকে পাঠানোর কথা বলছ? এদের সবার সাহায্য পেলে পারতেও পারো। কিন্তু, কী জানো, নরকে গেলেও তোমার আর জ্যাকসনের রক্তের উপর দিয়েই যাব আমি। সঙ্গে করে নিয়ে যাব তোমাদের দুজনকে। এখন—’ ওদের মনোযোগ নষ্ট করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এতক্ষণ কথা বলছিল সাডেন। ‘আগে তোমাকেই খতম করছি!’

অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় ঝিলিক খেলে গেল ওর হাতে; চলে গেল পিস্তলের বাঁটে। তৈরি ছিল স্ট্যাগ, কিন্তু এতক্ষণের কথাবার্তায় মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেছে তার—কিন্তু এই মুহূর্তের দ্বিধা না থাকলেও সাডেনের চোখ ধাঁধানো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না সে। লাফিয়ে উঠে এল সাডেনের পিস্তলজোড়া। নিজেরটা উঁচিয়ে ধরতে যাচ্ছিল হারভে। ঠিক এই সময় যমজ পিস্তল দেখল সে। সঙ্গে সঙ্গে রুখে গেল—আয়ু ফুরিয়ে গেছে তার।

ওর আর সাডেনের মধ্যখানের দূরত্বটুকু মুহূর্তের জন্য যেন মিলিয়ে গেল। মনে হলো, সাডেনের সবুজ চোখজোড়ার দিকেই বুঝি সরাসরি তাকিয়ে আছে সে। পরক্ষণেই পিস্তলের নলে আগুনের ফুল ফুটতে দেখল স্ট্যাগ হারভে। প্রচণ্ড

ধাক্কা অনুভব করল শরীরে। কেঁপে উঠল সে থর থর করে। তবুও উঁচিয়ে ধরতে চাইল পিস্তলটা। এবং তখনি এল দ্বিতীয় গুলি, প্রথম গুলিটার পেছন পেছন-কোমরে আঘাত করল ওটা। হাঁটু ভাঁজ হতে শুরু করল ওর। অবশেষে উঠে এল পিস্তল। টিপ দিল ট্রিগারে। থ্যাচ করে গাছের গায়ে এসে লাগল গুলিটা। চরম হতাশা গ্রাস করল হারভেকে। বুঝে গেল সাডেনের গায়ে গুলি লাগানো আর হবে না এ জীবনে। সুতীক্ষ্ণ আত্মনাদ বেরিয়ে এল তার গলা চিরে। আবার টিপ দিল ট্রিগারে-আবার। এলোপাতাড়ি ছিটিয়ে গেল গুলিগুলো। মৃত্যু তার হিমশীতল পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে হারভের চোখের সামনে। ক্রমশ নীচের দিকে টানছে তাকে শীতল বাহু-নীচে-আরও নীচে।

পর পর দুটো গুলি ছুঁড়েই পাঁই করে ঘুরল সাডেন, একটা গাছের আংশিক আড়াল পেয়েছে ও। সামনে দেখল এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য: ওকে গুলি না করে বন্দুক উঁচিয়ে লী উইলকক্সের পেট বরাবর গুলি করছে জ্যাকসন।

উইলকক্স তাকিয়ে আছে জ্যাকসনের দিকে। বিস্ফারিত দুচোখ। সিঁড়ি ভেঙে এলোমেলো পায়ে নামতে শুরু করল সে। এতদূর থেকেও তার চোখের শাদা অংশ স্পষ্ট দেখতে পেল সাডেন। বন্দুক স্থির করবার চেষ্টা করছে লোকটা। 'তোমাকে, তোমাকে-আগেই খুন করা উচিত ছিল!' আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে সাডেনের দিকে চাইল উইলকক্স, আবেদন বরছে দুচোখে। 'ওকে মারো,' বলল সে। 'দোহাই লাগে, ওকে মেরে ফেলো! বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই এর!' বলেই একতাল মাংসপিণ্ডের মত মাটিতে আছড়ে পড়ল উইলকক্স। গড়িয়ে চিত হলো তার প্রাণহীন দেহ।

দৌড়ে সাডেনের পেছনে চলে এল পিট সিমনস্। দ্রুত হাতে পেছন থেকে শেভলিনকে গুলি করল সে। একবার...দুবার...তিনবার।

গুলির শব্দে কেঁপে উঠল পুরো উঠোন। গুলিতে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে সাডেন, গাছের আড়াল থেকে টলমল পায়ে বেরিয়ে এল ও। গুলি করল জ্যাকসনকে। ফুটো হয়ে গেল লোকটার কাঁধ। ফের গুলি করল সাডেন। জ্যাকসনের হাত থেকে ছিটকে পড়ল বন্দুকটা। ঘুরেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সাডেন, লাল হয়ে আছে চোখজোড়া। পিট সিমনস্কে নিশানা করে পিস্তলের ট্রিগার টিপল।

কেঁপে উঠল বিশাল আকারের শরীরটা। পিস্তল সরিয়ে পতনোন্মুখ সিমনস্কে লক্ষ্য করে আবার গুলি করল সাডেন। এবং আবার উল্টো দিকে ঘুরল-দাঁড়িয়ে আছে জ্যাকসন, গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে কাঁধ থেকে।

'তুমি একটা খুনী, জ্যাকসন!' বিস্ময়কর শীতল শেভলিনের কণ্ঠস্বর। 'তুমিই শুরু করেছ এসব! ও'নীলকে ফাঁসিতে ঝোলানোর সময় হাজির ছিলে তুমিও! তোমার গলা শুনেছি আমি!'

উঁচু হলো শেভলিনের পিস্তল। চোঁচিয়ে উঠল জ্যাকসন। সোজা তার হৃৎপিণ্ড বরাবর গুলি করল সাডেন। মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেল জ্যাকসন, আরেকটা গুলির ধাক্কায় কেঁপে উঠল পরক্ষণেই। একটা গাছের গায়ে সটান আছড়ে পড়ল

সে।

কুঁজো লোকটা উইনচেস্টার উঁচিয়ে সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য স্থির করতে যাচ্ছিল, অকস্মাৎ কেবিনের দরজা থেকে গর্জে উঠল একটা রাইফেল।

বিস্মিত সাডেন, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। গিড ব্ল্যাকের স্পেন্সার হাতে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে বেটি কনসিডাইন। ঠাণ্ডা মাথায় ফের ট্রিগার টিপল ও। এবার কোরালের দিকে চোখ ফেরাল শেভলিন। 'বেরিয়ে এসো, উইলসন! মাথার ওপর হাত তুলে, বেরিয়ে এসো!'

ঘাড় ফিরিয়ে বেটির দিকে তাকাল সাডেন। গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে সোজা থাকরার চেষ্টা করছে ও, ঠকঠক করে কাঁপছে! 'বেটি, তুমি-তুমি-তোমার কিছু হয়নি তো?'

আচমকা ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এল। লুটিয়ে পড়ল শেভলিন। ছায়ার ভিতর ধুলোর ঝাণ নাকে লাগছে। গালের উপর শুকনো পাতার স্পর্শ অনুভব করল ও...আর নরম...গভীর অন্ধকারের কোমলতা...ক্রমশঃ গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যেতে লাগল সাডেন শেভলিন।

বাইশ

মৃদু আলো আঁধারিতে চোখ মেলে তাকাল সাডেন। কাছেই একটা আলোর বৃত্ত দেখতে পাচ্ছে ও। লণ্ঠন জ্বলছে। বিছানার পাশেই বসে আছে মেয়েটা, লণ্ঠনের আলো লুকোচুরি খেলছে তার চেহারায়ে। ঘুমোচ্ছে, প্রশান্তির ছাপ চেহারায়ে।

উঠে বসতে গেল সাডেন। ওর নড়াচড়ার শব্দে চোখ মেলে তাকাল বেটি কনসিডাইন। তাড়াতাড়ি বাধা দিল ওকে।

'উহু, নোড়ো না...শুয়ে থাকো চুপ করে।'

আবার বিছানায় এলিয়ে পড়ল শেভলিন। 'কী-কী হয়েছে?'

'আহত হয়েছিলে তুমি, তিনটে গুলি লেগেছে তোমার গায়ে। প্রচুর রক্ত বেরিয়েছে শরীর থেকে।'

'জ্যাকসন? স্ট্যাগ?'

'মারা গেছে। জিম ন্যারোজ এসেছিল। মরটন শবিও-এখনও আছে ও; পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। ফ্র্যাংক চেযও এসেছিল।'

'চেয?'

'হ্যাঁ, রেড ক্রিকের নতুন মার্শাল।'

দীর্ঘদেহী তরুণ পাঞ্চর ফ্র্যাংক চেয, ভাল লোক।

'ম্যাককার্থি কোথায়?'

'তুমি এখানে আসার আগেই তাকে মেরে ফেলেছে জ্যাকসন। হয়তো তাকে

বইঘর, কুমু
ঘেরাও

তুমি ভেবে ভুল করেছিল সে। হয়তো জেনে শুনে ইচ্ছে করেই মেরেছে।
লড়াইয়ের আগে সারারাত আস্তাবলে পড়েছিল লাশটা।’

ম্যাককার্থি...জ্যাকসন...হারভে...পিট সিমনস্...এবং মিলার...আর লুড
ফেলার...এবং এদের আগে গিড ব্ল্যাক আর জ্যাক ও’নীল... কেন, কীসের জন্য?

কথা বলবার জন্য মুখ খুলল সাডেন।

বাধা দিল বেটি। ‘ব্যস, ব্যস—আর কথা নয়, তোমার এখন বিশ্রাম দরকার।’

‘নেব।’ অন্ধকারের দিকে চেয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল সাডেন। ‘জানো,’
অনেকক্ষণ পর আবার বলল ও, ‘“জে-ডট-ও” সত্যি খুব সুন্দর জায়গা।
এখানকার মাঠে গরু চরে বেড়াচ্ছে, ঝর্নার পানি বয়ে যাচ্ছে, আর গাছের পাতায়
লুকোচুরি খেলছে সূর্যের আলো—এসব দেখতে খুব ইচ্ছে করছে আমার।’

‘নিশ্চয়ই দেখবে। এটা তো তোমারই রেঞ্জ। ও’নীলও হয়তো এটাই চাইত।
ওর জন্যেই তো রেঞ্জটা রক্ষা করেছে তুমি, সাডেন।’

‘ওর জন্যে...তোমার জন্যেও। তুমি ছাড়া এসবের মূল্য কোথায়, বেটি?’

সাডেনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল বেটি। ‘আর আমি থাকব নাই বা
কেন?’ মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ও। ‘এ জায়গাটাকে ভালবাসি আমি...ভালবাসি
তোমাকে।’

বিছানায় সোজা হয়ে শুলো সাডেন। শরীরের একটা পাশ একেবারে অবশ
হয়ে আছে শরীরের, তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল ও। ‘এবার আমি ঘুমোই, বেটি।
ভোরে জাগিয়ে দিয়ো, হ্যাং...প্রচুর কফি খাব...’ শেষ হলো না কথাটা। ঘুমে
তলিয়ে গেল শেভলিন। বিছানার পাশে জেগে বসে রইল মেয়েটা। বাইরে কোথায়
যেন চাদের পানে চেয়ে কেঁদে উঠল একটা নিঃসঙ্গ নেকড়ে।

এক

পর্বতমালা পেরিয়ে, দিনে গা ঢাকা দিয়ে রাতে পথ চলে ইন্ডিয়ান এলাকার ভিতর দিয়ে এসেছে ও-লম্বা, সুঠামদেহী এক তরুণ, রোদে পোড়া তামাটে চেহারা, অবসাদের ছাপ চোখেমুখে। শক্তিশালী একটা মাস্ট্যাং ওর সঙ্গী। স্টোনি রিভার বেসিনের উত্তরের ঢালে ড্রাই ক্রীকে থামল ও, নাশতা করবার জন্য। বারবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ব্যাকট্রাইলের দিকে তাকাচ্ছে। গতকাল সকাল থেকে তিনজন মেসকেলারো অ্যাপাচী ক্রমাগত অনুসরণ করে আসছে ওকে। অবশ্য পর্বতমালা পেরিয়ে 'আসবার পর এখন আর ওদের দেখা পাবার সম্ভাবনা ক্ষীণ, তবু অ্যাপাচীদের বোঝা কঠিন।

এক ঘণ্টা কাটল, ইন্ডিয়ানদের দেখা নেই। উত্তপ্ত আর একটা দিনের প্রতিশ্রুতিসহ সূর্য উঠল পুব দিগন্তে। প্রচুর সময় নিয়ে দাড়িগোঁফ কামাল ও। এখন ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে উদ্দিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। স্টোনি রিভার বেসিনে নতুন প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় নামতে হবে ওকে, এখানে সতর্ক থাকতে হবে রবার্ট ওয়ারেন আর তার দলের বিরুদ্ধে।

পাইপে তামাক ভরে আগুন জ্বালল ও, আরাম করে বসল। তারপর একটা চিঠি বের করল পকেট থেকে, দিন দশেক আগে হাতে এসেছে। চিঠিটা পেয়েই তড়িঘড়ি স্টোনি রিভার বেসিনে ফিরে এসেছে ও। বেশ কয়েকবার পড়া হয়ে গেছে, তবু আবার পড়তে শুরু করল ওটা।

প্রিয় ফর্বস,

এ-চিঠি তুমি পাবে কিনা জানি না, তবু পাবে আশা করেই লিখছি। খবরটা তোমাকে না জানিয়ে পারছি না। তোমার বাবার সঙ্গে উপত্যকায় নবাগত র‍্যাঞ্চের রবার্ট ওয়ারেনের বিবাদ শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সংঘাতের রূপ নিয়েছে। কাল রাতে তোমাদের র‍্যাঞ্চে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষে আহত হয়েছে তোমার বাবা, ওর অবস্থা সংকটজনক। মারা গেছে এডি।

মাত্র কদিন আগে তোমার বাবার সাথে আমার কথা হয়েছে, উদ্দিগ্ন মনে হয়েছে ওকে আমার, যেন খারাপ কিছু আশঙ্কা করছে। সেদিনই তোমার বাবা আমাকে বলেছে যদি কোন কারণে ওর বা এডির মৃত্যু ঘটে, আমি যেন র‍্যাঞ্চ আর গরু বিক্রি করে টাকাগুলো তোমার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা নিই, যাতে তোমাকে আর ওয়াইওমিং থেকে এখানে আসতে না হয়। লড়াইটাকে ফিউডে পরিণত করা মারাত্মক বোকামি হবে বলে ভেবেছে সে, আমি ওর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

চিঠি লিখতে কলম সরছে না, তোমার বাবা আমার কতখানি ঘনিষ্ঠ

ছিল তোমার তো অজানা নয়! ও খানিকটা সেরে উঠলে আমি তোমাকে খবর দেব। আর যদি খোদার ইচ্ছে ভিন্ন হয়, যত দ্রুত সম্ভব তোমাদের র্যাপ্ত আর গরু বিক্রির ব্যবস্থা নেব আমি, তোমার স্বার্থ রক্ষার আশ্রয় চেষ্টা করব। সম্পত্তি বিক্রি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব টাকা তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব, তোমাকে আর কষ্ট করে ওয়াগোনারে আসতে হবে না।

এখানে বাজারের হালচাল বিশেষ সুবিধের নয়, র্যাপ্তের ন্যায্য দাম পাওয়ার আশা কম, তবু যাতে তোমার লোকসান না হয় সেজন্যে আমি চেষ্টার ক্রটি করব না। এ ব্যাপারে তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে চিঠি লিখে জানিয়ে।

শুভ কামনায়
অ্যারন হেলার।'

পর পর দুবার চিঠিটা পড়ল ও, তারপর ভাঁজ করে আবার পকেটে রাখল। চুপচাপ বসে ভাবতে শুরু করল এর অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে। নিরাবেগ ভাষা, যেন কোন ব্যবসায়ীর হাতে লেখা। ওর কৌতূহল মেটানোর মত কিছু নেই চিঠিটায়, বাবার র্যাপ্তে গোলমাল বাধবার কারণ, লড়াই কেন হলো-তার ব্যাখ্যা নেই। লড়াই শেষে ওয়ারেনের কী হয়েছে তাও বলেনি হেলার। বাবার মৃত্যুর পর র্যাপ্তের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব থেকে ওকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আবার একই সঙ্গে বেসিন থেকে দূরে থাকতে বলে আবার ফিরে আসবার জন্য চ্যালেঞ্জও করা হয়েছে ওকে।

হঠাৎ অস্থির বোধ করল ও, উঠে দাঁড়াল, নজর বোলাল নীচের বিস্তীর্ণ উপত্যকায়। পর্বতমালার কাছাকাছি হওয়ায় আশপাশের এলাকা এবড়োখেবড়ো, ছোট বড় অসংখ্য টিলা ঢিবিতে ভরা, কিন্তু নদীর কাছে আস্তে আস্তে সমতলে রূপ নিয়েছে ভূমি। বেসিনের উঁচু এলাকায় ছ' থেকে আটটি র্যাপ্ত আছে, নিচু অঞ্চলের র্যাপ্তের সংখ্যাও প্রায় তাই। ফর্বস র্যাপ্তের অবস্থান উঁচু এলাকায়, সামনে, রেড ফিল্ডের রেঞ্জ পেরিয়ে। পূর্বে একটা হগব্যাকের চূড়ায় ম্যাকমিলান র্যাপ্ত; শ্বেবার, ডেনিস স্মিথসহ আরও কয়েকজনের র্যাপ্ত ওদিকে পড়েছে, ওগুলোর কোন একটাতেই এখন রবার্ট ওয়ারেনের বাস।

পাইপ নিভিয়ে ফেলল ও, সাফ করে পকেটে রাখল, কী করবে ভাবছে। ওয়াগোনার আর চার ঘণ্টার পথ। ভাগ্য ভাল হলে কারও চোখে ধরা না পড়ে নদীর কাছে পৌঁছে যেতে পারবে। তারপর শহরসীমান্তে গাছপালার আড়ালে রাত পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়ে অন্ধকারে অ্যারন হেলারের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারে ও। পরিস্থিতির আসল চেহারা বুঝবার আগে উপত্যকায় ওর প্রত্যাবর্তনের খবর জানাজানি না হওয়াই ভাল।

স্যাডলে উঠে বসল ও, ড্রাই ক্রীক ধরে এগোল বেশ কয়েকমাইল, তারপর হঠাৎ ঘোড়া ঘুরিয়ে পাহাড়ের মাঝে একটা সংকীর্ণ ফাঁক দিয়ে কোণাকুণিভাবে এগোল দক্ষিণে। কোন দিকে যাবে আগেই ঠিক করে নিয়েছে। এই বেসিনের অক্সিসি ওর নখ দর্পণে, এখানে জন্মেছে, বেড়ে উঠেছে, আট বছর আগেও এখানেই ছিল ও। রাতের নিকষ অন্ধকারেও এখানে পথ চলতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে

না। এবং শিগগিরই হয়তো সেটা জরুরি হয়ে দাঁড়াবে, ভাবল সে, ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল টোটার কোণে। রবার্ট ওয়ারেন হয়তো ভেবেছে ফর্বসদের খতম করে দিয়েছে সে, কিন্তু কদিনের মধ্যেই নতুন কথা ভাবতে হবে তাকে।

নদীর দিকে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এল ও, এক চলতে খোলা মাঠের উপর দিয়ে এগোচ্ছে, হঠাৎ বাম দিকে একটা অনুচ্চ টিলার চূড়ায় দুজন ঘোড়সওয়ারের দেখা পেল। রাশ টেনে ধরল ওরা, ইতস্তত করল মুহূর্তের জন্যে, তারপর এগিয়ে এল ওর দিকে। স্যাডলে নড়েচড়ে বসল ফর্বস। চলবার পথে লোকজনের সঙ্গে দেখা হওয়া স্বাভাবিক, তবু এবার অন্তত এড়ানো যাবে ভেবেছিল সে। পালিয়ে গেলে অবশ্য এখনও এড়ানো সম্ভব, কিন্তু পালানোর ইচ্ছে বোধ করছে না।

হোলস্টারে ফিতে খুলে পিস্তল আলগা করে নিল ও, গতি না কমিয়ে এগিয়ে চলল। মুখোমুখি হওয়ার পর ওই লোকদুটোকে কী বলতে হবে জানা নেই। অপরিচিত কেউ হলে যা হয় একটা বলে দিলেই চলবে, আর পরিচিত হলে—তাহলে অন্তত ওদের কাছ থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যাবে।

আরও কাছে এল দুই অশ্বারোহী, লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল। একজন মাঝবয়সী, লম্বা ছিপছিপে, একটু যেন কুজো হয়ে আছে। চার্লস রেডফিল্ড, চিনতে পারল ফর্বস। চার্লসের সঙ্গী অল্প বয়সী তরুণ, গাঢ় বাদামী তার গায়ের রঙ, চেহারা য় কৃৎসিত একটা ভাব—যেন সারাক্ষণ ভেঙেচি কাটছে। লোকটা ওকে চেনে না বলেই মনে হলো ফর্বসের, কিন্তু চার্লসের এক মুহূর্তও বিলম্ব হলো না।

‘ফর্বস! কলিন ফর্বস!’

‘ঠিক চিনেছ,’ বলল কলিন। ‘কেমন আছ, চার্লস?’

পিঠ সোজা করে বসল রেডফিল্ড, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল। অস্থিরভাবে একপলক তরুণ সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে ফের চোখ ফেরাল কলিনের দিকে। ‘তুমি ফিরে আসছ, জানতাম না তো! আমি...কলিন, ওর নাম টেরেস মিচেল। এখানকার এক র‍্যাঞ্জে কাজ করে।’

‘হ্যালো, মিচেল,’ বলল কলিন।

মুখভাব স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করল ও, পারল না। ওর নাম কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিচেলের দুচোখে কৃৎসন সৃষ্টি লক্ষ্য করেছে সে, অজান্তে বিপদাশঙ্কায় সতর্ক হয়ে উঠল ফর্বস, কিঞ্চিৎ উত্তেজিত।

‘হাউডি, ফর্বস,’ বলল মিচেল।

দ্রুত কথা বলল রেডফিল্ড। ‘কলিন, এখানে যা ঘটে গেছে, বলার নয়, কী বলে যে তোমাকে সমবেদনা জানাব, জানি না। তোমার বাবা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন ছিল, এডি ছেলেটাকেও আমি পছন্দ করতাম। তোমার যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আমাকে বোলো, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব—’

কাঁধে সকালের সূর্যের উত্তাপ অনুভব করছে কলিন ফোর্বস। মুহূর্তের জন্য রেডফিল্ডদের অস্তিত্ব ভুলে সোজা সামনে তাকাল। রেডফিল্ডের কথায় বোঝা যাচ্ছে বাবা আর বেচে নেই। অথচ বাবার সঙ্গে শেষ দেখা করবার আশাতেই তাড়াহুড়ো করে এখানে এসেছে সে। মনে ক্ষীণ একটা আশা ছিল বাবার সঙ্গে দেখা হবে, যদিও হেলারের চিঠি পড়েই আঁচ করা গেছে বাবা বাঁচবে না।

‘কখন ঘটল ব্যাপারটা?’ ফাঁকা শোনাও ওর কণ্ঠস্বর।

‘সপ্তাহ তিনেক আগে।’

‘বাবার মৃত্যুর কথা জিজ্ঞেস করছি।’

‘র‍্যাঞ্জে লড়াইয়ের দুদিন পর, ডাক্তার মারভিন ওকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু লাভ হয়নি।’

সোজা হয়ে বসল কলিন, লম্বা একটা দম নিল। এখানকার শেরিফ একবার অনুযোগের সুরে বলেছিল, ড্যানিয়েল ফর্বস প্রয়োজনে যেচে লড়াই বাধাবে; শেরিফের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছিল ও, তবে এটা ঠিক লড়াইয়ের ভয়ে পিছিয়ে যাবার মানুষ ছিল না বাবা। ড্যানিয়েল ফর্বস রগচটা, ভয়ঙ্কর এবং একগুঁয়ে ছিল, কিন্তু নিজের ভুল বা অন্যায় স্বীকার করতে কখনও দ্বিধা করেনি। স্টোনি রিভারের সবাই জানত বাবাকে। মুখে এক কথা বলে কাজের বেলায় অন্য রকম করেছে—ড্যানিয়েল ফর্বসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলবে না কেউ।

‘রবার্ট ওয়ারেন লোকটা কে?’ জানতে চাইল কলিন। ‘কী ব্যাপারে ঝামেলা হয়েছিল বলতে পারবে?’

‘আমি যা শুনেছি সেটুকুই কেবল বলতে পারি, কলিন,’ অস্বস্তির সঙ্গে বলল চার্লস রেডফিল্ড।

‘তাই শোনাও।’

‘বছর দুয়েক আগে এখানে এসেছে ওয়ারেন। ম্যাকমিলানের র‍্যাঞ্জেটা কিনে নিয়েছে সে। এখানে সে পা দেয়ার পর পরই ড্যানিয়েলের সঙ্গে ওর বিরোধের কথা ছড়িয়ে পড়ে। তারপর, এই ধরো মাসখানেক আগে, ইঠাৎ একদিন কারা যেন ওয়ারেনের একপাল গরু ক্রেব্যাংকসের ওপর থেকে স্ট্যামপিড করে নীচের ক্যানিয়নে ফেলে হত্যা করে। স্ট্যামপিডের জন্যে তোমার বাবাকে দায়ী করে রবার্ট ওয়ারেন। ড্যানিয়েলের বিরুদ্ধে শ্রেণ্ডারি পরোয়ানা জারি করায় সে, তারপর শেরিফের সঙ্গে লোকজন নিয়ে তোমাদের র‍্যাঞ্জে হাজির হয়। তোমার বাবা ওদের র‍্যাঞ্জে থেকে বেরিয়ে যেতে হুকুম করে—বোধ হয় প্যাসি বাহিনীকে চিনতে পারেনি। তারপর আচমকা কে যেন গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। গোলাগুলি শেষ হওয়ার আগেই এডিসহ মোট তিনজন প্রাণ হারায়, মারাত্মকভাবে আহত হয় ড্যানিয়েল।’

হোলস্টার স্পর্শ করল মিচেল, পরমুহূর্তে একপাশে ছেড়ে দিল হাতটা। আড়চোখে ব্যাপারটা লক্ষ্য করল কলিন। হয়তো গুরুত্বহীন, তবু নিজের প্রকৃত অবস্থা না জেনে কোন রকম ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। ওকে কৌতূহলী করে তুলেছে মিচেল। ওর নাম শুনে চমকে উঠেছিল সে, কেন? চোখের আড়াল হলে সে কী করতে পারে আন্দাজ করবার চেষ্টা করল কলিন।

‘আমার বোধ হয় শেরিফের সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত,’ চিন্তিত চেহারায় বলল ও।

‘হ্যাঁ, সে-ই ভাল,’ সায় দিল রেডফিল্ড।

ঘোড়ার লাগামে টান দিল কলিন, এগোনোর আগে বলল, ‘তোমার সঙ্গে আবার দেখা হওয়ায় ভাল লাগল, চার্লস। মিচেল, তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।’

মাথা দোলাল ওরা, কলিনকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল, সামনে চার্লস পেছনে মিচেল। ঘোড়া নিয়ে সরে এল কলিন, মনে মনে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুনল, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পেছনে। রাশ টেনে ধরেছে মিচেল, চোখের পলকে পিস্তল বের করে আনল সে। নিমেষে স্যাডল থেকে লাফিয়ে পড়ল কলিন, মাটি স্পর্শ করবার আগেই পিস্তল উঠে এল হাতে। গুলি করল মিচেল। ওর স্যাডলের উপর দিয়ে বাতাসে শব্দ তুলে চলে গেল বুলেট। মাটিতে উবু হয়ে বসে ঘোড়ার পেটের নীচ দিয়ে গুলি করল কলিন, একবার, দুবার।

গুলির আঘাতে কেঁপে উঠল মিচেল, পিছিয়ে গেল তার ঘোড়া, বাতাসে আঁচড় কাটল সামনের দুই পায়ে। পিছলে স্যাডল থেকে মাটিতে পড়ল মিচেল, উপুড় হয়ে, আর নড়ল না।

আস্তে, সাবধানে উঠে দাঁড়াল কলিন, চার্লস রেডফিল্ডকে কাভার করে রেখেছে ওর পিস্তল। ঘোড়াকে বাগে আনবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে লোকটা। মিচেলকে পিস্তল বের করতে দেখেছে সে, অথচ ওকে সতর্ক করে দেয়নি। হয়তো তার করবার কিছুই ছিল না। তবে মিচেলের মতলব ঠিকই টের পেয়েছিল।

শান্ত হলো চার্লস রেডফিল্ডের ঘোড়া, শক্ত হাতে লাগাম ধরে রেখেছে সে, কাঁকড়ার মত পাশে হেঁটে কলিনের দিকে এগিয়ে এল ওটা। এক হাতে মুখের ঘাম মুছল রেডফিল্ড। টেরেস মিচেলের নিখর শরীরের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকাল।

‘হায় খোদা, কী। ভয়ঙ্কর!’ বলল সে। ‘ও এমন কিছু করবে ভাবতেও পারিনি। আমি—’

‘ওকে পিস্তল বের করতে দেখছ তুমি,’ বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল কলিন ফর্বস। ‘তুমি কি আমার মৃত্যু কামনা করেছিলে, রেডফিল্ড?’

‘মাথা নাড়ল রেডফিল্ড। ‘আ-আমি...না!’

বাকরুদ্ধ হয়ে গেল তার। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে কপালে। কলিনের পিস্তল থেকে দৃষ্টি সরাতে পারছে না কিছুতেই।

‘গানবেল্ট খুলে ফেলো,’ আদেশ করল কলিন, ‘ফেলে দাও মাটিতে।’

‘কিন্তু আমি—’

‘কোন কথা নয়!’ চড়া গলায় বলল কলিন ফর্বস। ‘যা বলছি, করো, এখুনি!’

বাকলস্ খুলে গানবেলটটা মাটিতে ফেল চার্লস রেডফিল্ড।

‘এবার রাইফেল,’ বলল কলিন।

বুট থেকে রাইফেল বের করে মাটিতে ফেলে দিল রেডফিল্ড।

‘এবার ঘোড়া নিয়ে ওই টিলাটার দিকে এগোও, অর্ধেক পথ গিয়ে থামবে, আমি না যাওয়া পর্যন্ত থাকবে ওখানে, তারপর এসে মিচেলের লাশ নিয়ে শহর কিংবা র‍্যাঞ্চে—যেখানে ইচ্ছে যেয়ো। যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাও, এখানকার ঘটনাবলীতে তোমার কী ভূমিকা? কোন্ পক্ষে তুমি?’

‘আমি দলাদলিতে নেই,’ ভারি গলায় বলল রেডফিল্ড।

‘আমার বাবা আর ভাইয়ের মৃত্যুর দিন প্যাসিতে ছিলে তুমি?’

‘না।’

জাহান্নামে যাক, ভাবল কলিন, এ-ব্যাপারে পরে খোঁজ করা যাবে। আরও অনেক কিছু জানতে হবে ওকে—যদি প্রাণে বেঁচে থাকে।

‘নাও, এবার এগোও,’ বলল ও।

ঘোড়া ঘুরিয়ে সরে গেল রেডফিল্ড, তারপর লাগাম টেনে পেছনে তাকাল, চিৎকার করে বলে উঠল, ‘রবার্ট ওয়ারেনের সঙ্গে তুমি পারবে না, কলিন। অনেক শক্তিশালী সে। লোকবলের অভাব নেই তার, আইন ওর পক্ষে। যদি বুদ্ধিমান হও, বেসিন ছেড়ে চলে যাও, আর কোন দিন ফিরে এসো না।’

‘আমি বুদ্ধিমান নই,’ বলল কলিন।

আবার এগোতে শুরু করল রেডফিল্ড

ঘাড় ফিরিয়ে পাহাড়চূড়াগুলো জরিপ করল কলিন। গুলির শব্দ আরও কাউকে আকৃষ্ট করে থাকতে পারে, এই মুহূর্তে আর কারও মুখোমুখি হতে চায় না ও। মিচেলের পাশে মুহূর্তের জন্য হাঁটু গেড়ে বসল সে, তারপর উঠে দাঁড়াল! পেটের ভিতর কেমন অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি, লালায় ভরে উঠছে মুখ। মিচেল মারা গেছে, সন্দেহ নেই।

নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে এল কলিন, উঠে বসল স্যাডলে, লাফিয়ে সামনে ছুটল মাস্টিং। অসুস্থ বোধ করছে ও, কাউকে হত্যা করা মোটেই সুখের ব্যাপার নয়।

দুই

আস্তে আস্তে পূব থেকে পশ্চিমে পাড়ি দিল সূর্য, তারপর এক সময় পাহাড় সারির আড়ালে হারিয়ে গেল। গোধূলির রঙ লাগল আকাশে, সারাদিনের দুঃসহ গরম থেকে নিস্তার পাওয়া গেল। অন্ধকার আরও গাঢ় হওয়ার অপেক্ষায় রইল কলিন ফর্বস। ওয়্যাগোনারের উপকণ্ঠে স্টোনি রিভারের তীরে গাছপালার মাঝে ঘুরে ফিরে বিকেলটা পার করে দিয়েছে ও। আর কিছুক্ষণ পর শহরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়বে, অ্যারন হেলারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

পাইপে আবার তামাক ভরল কলিন, আগুন জ্বলে ফের বিচার করতে বসল রেডফিল্ডের বক্তব্য। রেডফিল্ডের কথা থেকে যতদূর বোঝা যায়: বছর দুয়েক আগে ওয়ারেন নামে এক লোক স্টোনি রিভার বেসিনে হাজির হয়, ম্যাকমিলান র‍্যাঞ্চটা কিনে নেয় সে, এখানে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ড্যানিয়েল ফর্বসের সাথে তার বিরোধ জন্ম নেয়। ক্রেব্যাকসের উপর থেকে ওয়ারেনের গরুর পাল স্ট্যামপিড করবার অভিযোগ থেকে বোঝা যায় ইদানীং ওদের রেষাণেরি তুঙ্গে পৌঁছে গিয়েছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে আইনের শরণাপন্ন হয়েছে ওয়ারেন, শেরিফকে সঙ্গে নিয়ে ফর্বস র‍্যাঞ্চে গেছে। র‍্যাঞ্চে সংঘটিত সংঘর্ষে এডি আর ড্যানিয়েল

ফর্বস প্রাণ হারিয়েছে।

রেডফিল্ডের কাহিনীতে দুটো বড় ধরনের ফাঁক ধরা পড়েছে কলিন ফর্বসের চোখে। বাবার সাথে কারও বিরোধ দেখা দিলে সামনাসামনি তার ফয়সালা করবার কথা, প্রতিশোধ স্পৃহায় প্রতিপক্ষের পোষা জানোয়ার হত্যা করবার মত নৃশংস কাপুরুষ নয় বাবা। আইনের কর্তৃত্ব অস্বীকার করাও বাবার চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। বরং ড্যানিয়েল ফর্বসের সক্রিয় সহযোগিতায়ই স্টোনি রিভার বেসিনে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পাইপ নির্ভে গেছে কলিনের। আবার ধরিয়ে কিছুক্ষণ পাইপ টানল ও, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল, জমাট অন্ধকারে চোখ কুঁচকে তাকাল ওয়োগোনারের দিকে। এবার এগোনো যায়, ভাবল, যথেষ্ট অন্ধকার হয়েছে। ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে উঠে বসল, তারপর গাছপালার আড়ালে আড়ালে নদীর উজানে সামনে এগোল।

ওয়োগোনারের কাছাকাছি পৌঁছে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল কলিন ফর্বস। ঘুঁটঘুটে অন্ধকার চারপাশে, সামনের ঘরবাড়ির সারি আলাদা করে চেনা দায়। হঠাৎ কোথেকে ছুটে এল একটা কুকুর, খেঁকিয়ে উঠল ওর উদ্দেশ্যে, আরও একটা স্বজাতি এসে যোগ দিল ওটার সঙ্গে। কিন্তু ওদের তীক্ষ্ণ চিৎকার সন্ধ্যার জমাট অন্ধকারে কাউকে কৌতূহলী করে তুলল না দেখে স্তম্ভি বোধ করল কলিন।

যদ্বদ মনে আছে, শহরের নদী তীরের অংশে প্রধান সড়ক থেকে সামান্য ভিতরে অ্যারন হেলারের বিশাল অথচ বিবর্ণ দালান। বাড়িটা খুঁজে বের করতে কষ্ট হলো না কলিনের। পর্দা টানানো জানালায় আলোর আভাস দেখতে পেয়ে স্যাডল থেকে নেমে পড়ল ও, হিচিং পোস্টে বাঁধল ঘোড়াটা। এক মুহূর্ত পর হেলারের দরজায় টোকা দিতে দেখা গেল ওকে।

কলিনের স্মৃতিতে অ্যারন হেলার লম্বা মানুষ, হালকা পাতলা গড়ন, সামান্য কুঁজো; পূব থেকে এখানে এসেছে সে। কথা বলবার সময় অদ্ভুত এক রকম খসখসে শব্দ বেরোয় গলা থেকে; অমায়িক, তাই তার বন্ধু আর শুভাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা প্রচুর। দরজা খুলে দাঁড়াল অ্যারন হেলার, আগের মতই লম্বা এবং কুঁজো, কিন্তু তারুণ্য বিদায় নিয়েছে অবয়ব থেকে, গালের চামড়া যেন লেপ্টে গেছে চোয়ালের হাড়, চোখজোড়া কোটরাগত, বিলোপের পথে মাথার চুল।

‘কী চাই?’ জানতে চাইল হেলার, কণ্ঠে বিরক্তি।

‘আমি কলিন ফর্বস।’

ঝট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল অ্যারন হেলার, এক পা পিছিয়ে গেল সে, ঢোক গিলে বলল, ‘ফর্বস!’ পরমুহূর্তে আবার জানতে চাইল, ‘তুমি এসেছ কেউ জানে? এখানে আসতে দেখেছে কেউ?’

‘বোধ হয় না,’ বলল কলিন।

‘এসো, ভেতরে এসো। দরজাটা আটকে দাও।’

ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল কলিন ফর্বস, বুঝতে পারছে ওর আগমন ভাল চোখে দেখছে না হেলার। কেন কে জানে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

‘আমার চিঠি পাওনি?’ জানতে চাইল অ্যাটর্নি।

‘পেয়েছি,’ জবাব দিল কলিন।

‘তা হলে ফিরে এলে কেন? কোন দরকার ছিল?’

‘না এসে উপায় ছিল না।’

‘এখনও আগের মতই আছ? বাপের মতই বদরাগী।’

‘অনেক সময় বদরাগী না হলে চলে না,’ বলল কলিন, ‘এবার বোধ হয় তার সময় এসেছে। আচ্ছা, কার ভয়ে কুকুড়ে রয়েছ তুমি, ভূতের?’

হাড়সর্বশ হাত দুটো কচলাল অ্যাটার্নি। ‘না, রবার্ট ওয়ারেন আর ওর সাস্তপাঙ্গরা ভূত-পেত্নী নয়, দানব। বেসিনে কয়েক দিন থাকলেই ওদের পরিচয় জানতে পারবে। কিন্তু এখানে থাকা তোমার জন্যে ঠিক হবে না। বরং দেরি না করে যত তাড়াতাড়ি পারো সরে পড়ো, বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তোমার র‍্যাঞ্চ বিক্রির দায়িত্ব আমার হাতে ছেড়ে দাও, মোটামুটি ভাল দাম আদায়ের চেষ্টা করব আমি, টাকাটা হাতে পেলে মনে করবে মহা বাঁচা বেঁচে গেছ। চিঠিতেই তো এখানে আসতে নিষেধ করেছিলাম তোমাকে, বুঝতে পারিনি?’

‘তোমার লেখার ঢঙ এমন ছিল যে না এসে থাকতে পারিনি।’

‘কী বোকার মত কথা বলছ!’

‘নিজেই আবার পড়ে দেখো চিঠিটা।’

পকেট থেকে বের করে বাড়িয়ে ধরল কলিন চিঠিটা। মাথা নাড়ল হেলার।

‘থাক, আর পড়তে হবে না,’ বলল সে, ‘এসে তো গেছ, এখন কী করার কথা ভাবছ তুমি?’

‘র‍্যাঞ্চ চালাব।’

‘অসম্ভব!’

‘কেন?’

‘এক কথায় তোমার প্রশ্নের জবাব দেয়া যায়: ওয়ারেনের জন্যে।’

‘ওয়ারেন আমাকে ঠেকাবে কীভাবে?’

‘বুলেট, ফর্বস, সে নিজের হাতে গুলি করবে কিংবা আর কাউকে দিয়ে সারবে কাজটা। ছেলের জন্যে তোমাদের র‍্যাঞ্চটা দরকার তার, সেদিন আমার কাছে কেনার কথা তুলেওছে। তাই বলে তুমি আবার ভেবে বোসো না যেন র‍্যাঞ্চের জন্যেই তোমার বাবার সাথে লড়াইতে নেমেছে সে। ওদের বিবাদের কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমার মনে হয় না ড্যানিয়েলের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় তোমাদের র‍্যাঞ্চ নেবার কথা ভেবেছে সে। কিন্তু এখন প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে হয়তো কাজে লাগাতে চাইছে ওটা। ওর ছেলেটা বুনো, খামখেয়ালী স্বভাবের, বলগাহীন ঘোড়া একটা; র‍্যাঞ্চিং ওর কাজ নয়, তবু হয়তো চেষ্টা করে দেখতে চায় ওয়ারেন, ছেলেটাকে যদি পোষ মানানো যায়।’

ঘাড় ফিরিয়ে কামরার চারপাশে নজর বোলাল কলিন ফর্বস। ছোট এবং অগোছাল, একপাশে একটা টেবিলে কাগজ আর বইয়ের ছড়াছড়ি।

‘বসো, ফর্বস,’ বলল হেলার, ‘অস্থির হবার কিছু নেই। সন্ধ্যায় সাধারণত আমার কাছে কেউ আসে না।’

মাথা নাড়ল কলিন। ‘ওয়ারেন সম্পর্কে বলো আমায়।’

এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল অ্যাটর্নি, পায়ের উপর পা তুলে দিল। লণ্ঠনের স্নান হলদে আলো ওর চেহায়ায় একটা রোগা ভাব এনে দিয়েছে।

‘ওয়ারেন সম্পর্কে জানতে চাও? কোথেকে শুরু করি? একজন মানুষের পক্ষে আরেকজন মানুষকে মূল্যায়ন করা কী সহজ? কাউকে যখন আমাদের ভাল লাগে আমরা তার ভাল দিকগুলোই সবসময় লক্ষ্য করি, অপছন্দ করলে তার সব আচরণই বাঁকা চোখে দেখি; আর যখন কারও ব্যাপারে নিরাসক্ত থাকি, সেক্ষেত্রে তার সম্পর্কে দায়সারা গোছের এমন কিছু বলি যেটা ভাল বা খারাপ কিছুই বোঝায় না। ওয়ারেন সম্পর্কে আমি তোমাকে অনেক কথাই বলতে পারি, কিন্তু তা কতখানি বিশ্বাস্য তোমাকেই বুঝে নিতে হবে। তবে এটা ঠিক, যথাসম্ভব সত্যের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করব আমি।’

‘শুরু করো,’ বলল কলিন।

মাথা দোলাল হেলার। ‘ওয়ারেনের বয়স আন্দাজ চল্লিশ বছর, বিশাল শরীর ওর, চওড়া কাঁধ, স্বাস্থ্যবান; প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং নিজের শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। অহঙ্কারী লোক। ভারি গলায় কথা বলে, যখন কাউকে নির্দেশ দেয়, মনে হয় ঝগড়া করছে। ওর হাবভাবে একটা রাজকীয় ভাব আছে, উদ্ধত; দুর্বল লোককে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। টেক্সাস থেকে কলোরাডো হয়ে এখানে এসেছে ওয়ারেন, বংশপরম্পরায় র‍্যাঞ্চিং ব্যবসা করে আসছে ওরা, র‍্যাঞ্চিং কীভাবে করতে হয় জানে। প্রচুর টাকা নিয়ে এখানে এসেছে সে, আসামাত্র ম্যাকমিলানের র‍্যাঞ্চটা কিনে নিয়েছে, তারপর খবর পাঠিয়ে লোকজন এনেছে; এখন যারা ওর র‍্যাঞ্চের কাজ করছে বেশির ভাগই পুরোনো লোক। কঠিন একটা দল, সবাই মদ্যপ, কাউকে পরোয়া করে না। কোমরে ঝোলানো পিস্তল চালানো কিংবা গরু চরানো—দুটোতেই ওস্তাদ। এবং চমৎকার কাজ দেখাচ্ছে ওরা। বুড়ো ম্যাকমিলান—এর র‍্যাঞ্চ থেকে এখন প্রচুর টাকা মুনাফা করছে ওয়ারেন, অথচ ম্যাকমিলান কখনও লাভের মুখ দেখেনি।’

‘কিন্তু চিঠিতে তুমি লিখেছ বাজার খুব মন্দা।’

‘ঠিক, কিন্তু ওয়ারেন ঝানু ব্যবসায়ী। বাস্তববাদী লোক এবং দক্ষ। কোন বাধাই তার কাছে বাধা নয়।’

‘আর ওর ছেলে?’

‘বিল ওয়ারেন, দীর্ঘদেহী, সুদর্শন এবং দারুণ মেয়ে ঘেঁষা, মেয়ে দেখলেই বেসামাল হয়ে যায়।’

‘র‍্যাঞ্চ চালাতে পারবে?’

‘আগেই বলেছি সেটা ওকে দিয়ে হবার নয়, তবে বাপ ওকে সাহায্য করলে পারতেও পারে।’

‘ওয়ারেনের স্ত্রী?’

‘এখানে বিপত্নীক অবস্থায় এসেছিল ওয়ারেন। কিন্তু বছর খানেক আগে একবার ক্যানসাস সিটিতে গিয়েছিল সে, ওখানে বিয়ে করে সস্ত্রীক ফিরে আসে। ওয়ারেনের তুলনায় মেয়েটার বয়স অনেক কম, বড়জোর তিরিশ। দীর্ঘ একহারা গড়ন, সুন্দরী এবং আমার বুঝতে ভুল না হয়ে থাকলে ভীষণ অসুখী।’

‘কেন?’

‘কে জানে! তবে আন্দাজ করতে পারি। যে কোন বিচারেই ক্যানসাস সিটির তুলনায় ওয়াগোনার তুচ্ছ, এখানে ওই মেয়েকে সম্ভ্রষ্ট করার উপকরণ কই? তা ছাড়া ওয়ারেন সবসময় এত ব্যস্ত থাকে, স্ত্রীকে সময়ই দিতে পারে না। মেয়েটাকে অবশ্য কালেভদ্রে শহরে নিয়ে আসে, ওই পর্যন্তই।’

‘কী নাম তার?’

‘লিভা।’

‘লিভা? পুরো নাম? ক্যানসাস সিটিতে লিভা ওয়াইল্ড নামে একটা মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।’

‘পুরো নাম জানি না, তবে ওর বাবা শুনেছি ক্যানসাস সিটির হোমরা-চোমরাদের একজন।’

সিমিকিটের কাজ নিয়ে বছর দুই আগে ক্যানসাস সিটিতে গিয়েছিল কলিন। ওখানে লিভা ওয়াইল্ড নামে একটা মেয়েকে বিপদ থেকে বাঁচায়। ওর বাবাও ক্যানসাস সিটির একজন ব্যবসায়ী, বিরাট ধনী। সেই লিভাই কি ওয়ারেনের স্ত্রী এখন? কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব? লিভার বাবা রবার্ট ওয়ারেনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে যাবে কেন?

চিন্তিত চেহারায় মাথা দোলাল কলিন ফর্বস।

‘বাবার সঙ্গে রবার্ট ওয়ারেনের রেষারেষির আসল কারণটা কী?’

‘উপত্যকায় একটা সমিতি গঠনের প্রস্তাব তুলেছিল ওয়ারেন, সে থেকেই বিরোধের সূত্রপাত। সমিতি করার প্রস্তাব গৃহীত হলে রবার্ট ওয়ারেনের হাতেই সব ক্ষমতা চলে যেত, সে-ই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। তোমার বাবা সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দেয় প্রস্তাবটা। ড্যানিয়েল ফর্বস ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে বিশ্বাস করত। নিজের গুরু সবসময় নিজেই বাজারে চালানোর ব্যবস্থা করেছে ও। ওয়ারেনের ইশারায় চলবে এমন কোন সমিতির হাতে সেই কাজ তুলে দেবে তোমার বাবা, চিন্তার বাইরে। কিন্তু ওটা ছিল মতানৈক্যের কেবল শুরু। এরপর প্রায় সব ব্যাপারেই ওদের দ্বিমত পোষণ করতে দেখা গেছে, রাজনীতি, র‍্যাঙ্কের সীমানা ঘেষে বয়ে যাওয়া ইন্ডিয়ান ক্রীকের পানি ভাগাভাগি, রেঞ্জ বেড়া দেয়া-কোন কিছুই বাদ যায়নি। ওয়ারেন যখনই কিছু বলেছে তার বিরোধিতা করেছে তোমার বাবা। ড্যানিয়েল ফর্বস তো নগণ্য কেউ নয় যে তাকে উপেক্ষা করা যায়। কিন্তু ওয়ারেন আর শেষ পর্যন্ত পদে পদে এই বিপর্যয় মেনে নিতে পারেনি। ড্যানিয়েল ফর্বসকে ধ্বংস করা ছাড়া তার কোন উপায় ছিল না এবং সেটাই ঘটেছে।’

‘স্ট্যামপিড সম্পর্কে বলো এবার।’

‘মাস খানেক আগের কথা, হঠাৎ একদিন ওয়ারেনের প্রায় পনেরোশো গরুর একটা বিশাল পাল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পাহাড় থেকে নেমে আসার পথে টোনি ক্রীক যেখানটায় বাঁক নিয়েছে সেখানে বেসিনের পুঁব প্রান্তের দিকে উঁচু একটা মাঠে চরছিল গরুগুলো। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, নদীটা ওখানে কতখানি গভীর, সেজন্যে ক্লেব্যাংকসের ওপর নদীর কিনারে বেড়া দিয়ে ঘেরারও ব্যবস্থা করেছিল ওয়ারেন। কিন্তু একরাতে কে বা কারা সেই বেড়া কেটে ছত্রভঙ্গ করে

দিল গরুর পাল, অত উঁচু থেকে নীচে পড়ায় একটা গরুও বাঁচেনি। তোমার বাবা আর ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে ওয়ারেন, ওদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করায়। তারপর শেরিফ আর স্থানীয় লোকদের সহায়তায় সদলে তোমাদের র‍্যাঞ্জে গিয়ে হাজির হয় সে। গ্রেপ্তারে তোমার বাবা বাধা দেয়ায় সংঘর্ষ বেধে যায়। লড়াইয়ে সে রাতেই মারা যায় তোমার ভাই, মারাত্মকভাবে আহত হয় ড্যানিয়েল, শেষ পর্যন্ত ওকে বাঁচানো যায়নি।

‘চার্লস রেডফিল্ডের কাছে গুনলাম বাবা নাকি প্যাসিকে র‍্যাঞ্জ ত্যাগ করার হুকুম করেছিল?’

‘হ্যাঁ, আমিও তাই শুনেছি।’

‘কিন্তু, হেলার, বাবা তো এরকম কিছু বলতে পারে না! অতীতে কোন সময় বাবা আইনের বিরুদ্ধে যায়নি। গরুর পাল ছত্রভঙ্গ করার অভিযোগও আমি বিশ্বাস করি না। বাবার চরিত্রের সঙ্গে কোনটাই মেলে না।’

‘তোমার বাবা তো অস্বীকারও করেনি।’

‘সেটা তুমি কী করে জানলে?’

‘লোকজনের কথায় সেরকমই মনে হয়।’

‘লড়াইয়ের সময় আমাদের লোকেরা কোথায় ছিল?’

‘র‍্যাঞ্জেই ছিল প্রায় সবাই। ওদের দুজন লড়াইতে মারা যায়। লড়াইয়ের পর আত্মসমর্পণকারীদের শহরে নিয়ে আসা হয়, কয়েক দিন জেলে আটক ছিল ওরা। তারপর বেসিন ছেড়ে চলে যাবে কথা দেয়ায় ছেড়ে দেয়া হয়। ওয়ারেনের মাথা থেকেই বেরিয়েছে বুদ্ধিটা। চমৎকার চাল, এর ফলে সবার চোখে ওর একটা ভাল ইমেজ গড়ে উঠেছে। সে ঝামেলা করতে চায় না—এটাই সবাইকে বোঝাতে চেয়েছে ওয়ারেন। শত্রু হিসেবে ওয়ারেন সাধারণ কেউ নয়, ফর্বস, জীবনের বিনিময়ে তা জেনে গেছে তোমার বাবা।’

ঘরময় পায়চারি করতে লাগল কলিন ফর্বস। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে উপত্যকার পরিস্থিতি সম্পর্কে ঠিক বিবরণই ওকে দিয়েছে অ্যাটর্নি, এখানে থেকে র‍্যাঞ্জিংয়ের চেষ্টা করলে কী পরিণতি হতে পারে তারও আভাস মেলে ওর কথায়। কিন্তু হেলারের বক্তব্যে কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। এডি আর বাবা ওয়ারেনের গরু স্ট্যামপিড করতে পারে ভাবাই যায় না। বাবা তেমন মানুষই নয়। ড্যানিয়েল ফর্বসের লড়াইয়ের কৌশল অমন হতে পারে না। অবশ্য অভিযোগ যদি ভিত্তিহীন হয়, সেক্ষেত্রে গ্রেপ্তারে বাধা দেওয়াই ওর পক্ষে স্বাভাবিক। বাবার যদি মনে হয়ে থাকে যে প্যাসি আইনের প্রতিনিধিত্ব করছে না বা আইন রবার্ট ওয়ারেনের ইচ্ছেয় চলছে, সন্দেহ নেই পরিণাম চিন্তা না করেই অস্ত্র তুলে নেবে।

ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে ওকে, ভাবল কলিন। বাবার ঘনিষ্ঠ কারও সাথে কথা বলতে হবে। ডাক্তার মারভিনের কাছ থেকে হয়তো সাহায্য মিলতে পারে। মৃত্যুর আগে জ্ঞান ফিরে পেয়ে হয়তো ওর উদ্দেশ্যে কোন বার্তা রেখে গেছে বাবা।

আঙুল তুলে কলিনের দিকে ইঙ্গিত করল অ্যারন হেলার। ‘এখন, ফর্বস,’ আন্তে আন্তে বলল সে, ‘ছেলের জন্যে তোমাদের র‍্যাঞ্জটা কিনতে চাইছে রবার্ট

ওয়ারেন। তুমি যদি নিজেই র‍্যাঞ্চ চালাতে যাও, কিছুতেই মানতে চাইবে না সে।
এবং তোমাকে সরিয়ে দেয়া ওর জন্যে কঠিন কিছু নয়।’

‘একথা বলার মানে?’

‘মানে’ খুব সহজ। আজ থেকে আট বছর আগে এখানে একটা গানফাইটে
জড়িয়ে পড়েছিলে তুমি, সেবার একজন প্রাণ হারিয়েছিল তোমার হাতে, এরপর
বেসিন থেকে পালিয়ে গেছ তুমি—অন্তত সবাই তাই জানে।’

‘ওই লোকের অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল। বাবা ভাল—’

‘নিশ্চয়ই। ড্যানিয়েলই তোমাকে পালিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছিল, নইলে
লোকটার কোন বন্ধুর সঙ্গে গানফাইটে নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে হত, সেজন্যেই
পালাতে হয়েছে তোমাকে। সম্ভবত এরপর আর কাউকে প্রাণ দিতে হয়নি তোমার
হাতে, হতে পারে ঝামেলাহীন ভাবে কাটিয়ে দিয়েছ আটটি বছর, কিন্তু মানুষ
হত্যা করেই এখান থেকে পালিয়েছিলে তুমি—এটা ভোলেনি কেউ। সুতরাং
উপত্যাকাবাসীদের সহজেই বোঝানো যাবে যে বাবার মৃত্যুর বদলা নিতেই তুমি
বেসিনে ফিরে এসেছ। ফলে ওয়ারেনের সহজ শিকারে পরিণত হবে। ক্রমাগত
উত্যক্ত করে লড়াইতে নামতে বাধ্য করে অনায়াসে তোমাকে হত্যা করতে পারবে
ওরা। এবং শেষে তোমাকেই দায়ী করবে লোকে, তাই নয় কী? তোমার পক্ষে
কথা বলার কেউ থাকবে না।’

‘ব্যাপারটা আসলেই এরকম?’

‘হ্যাঁ। তোমার কোন সুযোগই নেই।’

‘তোমার কথা আমাকে আগ্রহী করে তুলছে।’

‘মরণ যদি আগ্রহ জন্মানোর মত কিছু হয়...’

এলোচুলে হাত চালান কলিন ফর্বস, বলল, ‘স্ট্যামপিড সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত
জানতে হবে, হেলার। এখন’ ডাক্তার মারভিনের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি
আমি। মৃত্যুর আগে ডাক্তারকে হয়তো কিছু বলে গেছে বাবা। এদিকে আমার হয়ে
কয়েকটা কাজ করতে হবে তোমাকে।’

‘কী রকম?’

‘এক ওয়ারেনকে বলবে, ফর্বস র‍্যাঞ্চ আমি বিক্রি করব না। ওকে জানিয়ে
দেবে, আমি ফিরে এসেছি এবং নিজেই র‍্যাঞ্চটা চালাব।’

‘ও তা মানবে না।’

‘তাতে আমার বয়ে গেল! আর হ্যাঁ, টাকা পয়সার ব্যাপারে কিছু জানো?
বাবার ব্যাংকে জমা কত? তোলা যাবে?’

‘সম্পত্তির একটা নিষ্পত্তি না হলে তোমার বাবার অ্যাকাউন্টে হাত দেয়া যাবে
না, তবে খুব যদি দরকার থাকে, আমার কাছ থেকে ধার হিসেবে নিতে পারো।’

‘তোমার কাছ থেকে? কেন?’

‘প্রশ্ন কোরো না, কলিন। টাকাটা জানি গচ্ছা যাবে, খরচ করার জন্যে বেঁচে
থাকবে না তুমি।’

‘থাকতেও পারি।’

‘অসম্ভব,’ ভুরু কুঁচকে বলল হেলার, ‘যদি না সমস্যার মূলে আঘাত হানতে

পারো।’

‘ওয়ারেনের কথা বলছ?’

‘নয়তো কার? ওয়ারেনের অনুপস্থিতিতে ওর দল ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।’

অ্যাটর্নির দিকে চিন্তিত চেহারায় তাকাল কলিন। লোকটার উদ্দেশ্য যেন ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। কারণটা যাই হোক, ওয়ারেনের বিনাশ চায় হেলার। ওর চিঠি আর এখন টাকা ধার দেওয়ার প্রস্তাব, এসব তারই ইঙ্গিত দেয়।

‘আমি আমার মত কাজ করতে চাই,’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল কলিন।

‘তবে বোকার মত কিছু করো না। এবার বলো কত টাকা লাগবে?’

‘এখনই লাগবে, তা বলিনি। তবে লাগতে পারে।’

‘যখনই লাগবে, বলো। এখন তো ডাক্তার মারভিনের কাছে যাবে বললে, তারপর?’

‘জানি না। র‍্যাঞ্জে কেউ আছে?’

‘আদালত থেকে একজন কেয়ার টেকার নিয়োগ করা হয়েছে। ডার্ক পিট, লোকটা—’

হঠাৎ দরজায় টোকার শব্দ হলো, থেমে গেল হেলার, দ্রুত এক পলক তাকাল দরজার দিকে, উঠে দাঁড়াল চট করে। ‘রান্নাঘরে চলে যাও, তুমি,’ ফিসফিস করে বলল কলিনকে।

‘না, আমি চলে যাচ্ছি,’ জবাব দিল ফর্বস। ‘পরে দেখা হবে, হেলার।’

আবার টোকা পড়ল দরজায়, অস্থির।

‘আসছি!’ বিরক্তির সঙ্গে বলল হেলার। ‘এক মিনিট!’

দরজার দিকে পা বাড়াল সে।

রান্নাঘর হয়ে বাইরে চলে এল কলিন। বাইরে পা রাখবার আগমুহুর্তে ফ্রন্টরুম থেকে ভেসে আসা সমবেত কণ্ঠস্বর কানে লাগল, কিন্তু একটা শব্দও বুঝতে পারল না ও। উঠানে এসে দালানের পেছন দেয়ালের অন্ধকার ছায়ায় দাড়িয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে হয়তো ওর প্রত্যাবর্তনের খবর ওয়ারেনের কানে পৌঁছে গেছে, ভাবল ও। রেডফিল্ড যদি খবরটা দিয়ে থাকে, তা হলে এটাও নিশ্চয়ই বলেছে যে ওকে ওয়াগোনারের দিকেই আসতে দেখা গেছে। ওকে ধরবার জন্য লোক পাঠিয়ে দিতে পারে ওয়ারেন।

চারপাশের অন্ধকারে নজর বোলাল কলিন, কোন নড়াচড়া ধরা পড়ল না চোখে। উঠোন পেরিয়ে পাশের বাড়ির আড়ালে আড়ালে ঘুরপথে প্রধান সড়কের দিকে এগোল ও। শহরের অপর প্রান্তে ডাক্তার মারভিনের বাড়ি। হেলারের বাড়ির সামনে রয়ে গেছে ওর ঘোড়াটা, অপ্রত্যাশিত কোন বিপদ না ঘটলে পরে এসে নেয়া যাবে। আপাতত পায়ে হেটে যাওয়াই ভাল, অযথা উৎকণ্ঠায় ভুগতে হবে না।

পাঁচ মিনিট পর ফীড স্টোর আর স্যাডল শপের মাঝখানের গলিপথ থেকে বেরিয়ে রাস্তা অতিক্রম করল কলিন ফর্বস। হোটেলের বারান্দায় কয়েকজন লোক জটলা করছে, রিভার বেড স্যালুনের সামনে আরেক দল। ওদের চোখে ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করল কলিন। কিন্তু অন্ধকারে ওকে আলাদা করে চেনা যাবার

কথা নয়। আরও দুমিনিট পর ডাক্তার মারভিনের বাড়ির বারান্দায় পৌঁছল কলিন, টোকা দিল দরজায়।

তিন

মাঝ বয়সী, ছোটখাট মানুষ ডাক্তার মারভিন, গোলগাল চেহায়ায় গোলাপী ভাব। চশমার পুর কাচের ওপাশ থেকে চোখ দুটো কুঁচকে আগন্তকের দিকে তাকাল সে, পরমুহূর্তে চিনতে পেরে চোঁচিয়ে উঠল, ‘আরে, কলিন ফর্বস! এসো, ভেতরে এসো। কয়েকদিন হলো তোমার অপেক্ষাই করছি।’

হাত বাড়িয়ে দিল ডাক্তার, করমর্দন করল কলিন, ‘ডাক্তারের আন্তরিকতা ওকে মুগ্ধ করল। বসবার ঘরে ঢুকতেই চোখ পড়ল এক মহিলা আর বছর পাঁচেক বয়সের একটা বাচ্চা মেয়ের উপর। একটা টেবিলের উপর বসে রয়েছে বাচ্চাটি, এক গামলা পানিতে ওর হাত ডোবানো। লম্বা ছিপছিপে গড়নের মহিলাটিকে দেখলে বিশ্বাস হবে না সে-ই বাচ্চাটির মা, একেবারে অল্প বয়স। মাথাভর্তি কালো চুলের মাঝখানে সঁথি কেটে চমৎকার একটা খোঁপা বেঁধেছে মাথার পেছনে; ওর গায়ে ব্লাউজ আর জ্যাকেট, পরনে বিশেষ ধরনের রাইডিং স্কার্ট, পায়ে জুতো; গভীর কালো দুটো চোখ, কমণীয় চেহারা। কেন যেন মেয়েটিকে খুব পরিচিত ঠেকছে কলিনের। হঠাৎ মনে পড়ে গেল ওর নাম, বেলিন্ডা কার্লাইল।

মাথা থেকে টুপি নামাল কলিন, ‘হ্যালো, বেলিন্ডা!’

‘হ্যালো, কলিন,’ ভারি গলায় বলল বেলিন্ডা, একটুও অবাক হয়নি, বরং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করছে কলিনকে। টেবিলের উপর বসা বাচ্চা মেয়েটির দিকে তাকাল বেলিন্ডা।

‘এখন কেমন লাগছে মা-মণি?’

‘ভাল, আশ্চর্য, ব্যাথা লাগছে না।’

‘টুপিটা তুলে রাখো, কলিন,’ বলল ডাক্তার মারভিন। ‘মেরিকে দেখেই তোমার সঙ্গে বসছি। হাত কেটে গেছে বেচারির, ঘা হয়ে গেছে তাতে।’

গামলার পানি থেকে মেয়েটির হাত তুলে ক্ষত পরীক্ষা করল ডাক্তার, ওর ঘাড়ের উপর দিয়ে সামনে ফুলে উঠেছে দেখার পর আর দেরি করিনি, এখানে নিয়ে এসেছি,’ বলল সে। ‘আরও খারাপের দিকে যাবে না তো!’

‘সে ভয় আর নেই,’ ওকে আশ্বস্ত করল ডাক্তার মারভিন। ‘আমি তোমাকে দুটো ট্যাবলেট দিচ্ছি, ওগুলো পানিতে গুলে নিয়ে কাল সকালে আর সন্ধ্যায় একবার করে দুবার আর পরশু সকালে একবার, মোট তিনবার ওষুধ-পানিতে ওর হাত ধুইয়ে আগের মলমটাই লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেবে। পরশু সকালেও যদি ফোলা না কমে কিংবা যদি কনুই বা কাঁধে ব্যাথার কথা বলে, ডেভিড স্পেস্টরকে

পাঠিয়ে দিয়ে, আমি আবার দেখে আসব ওকে, ঠিক আছে?’

ডাক্তারকে কী যেন জিজ্ঞেস করল ‘বেলিভা, জবাবে ডাক্তার কী বলল তাও বোঝা গেল না। দীর্ঘ সময় আলাপ করল ওরা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কলিন, ওদের দেখছে আর ভাবছে বেলিভার স্বামী কে হতে পারে। মেরি বেলিভারই সন্তান তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। আশপাশের কোন ব্যাঞ্চেই হয়তো এখন থাকছে ও। আট বছর আগে ওর পরিচিত বেলিভা ছিল এক অষ্টাদশী তরুণী, বাবা মায়ের সঙ্গে ওয়াগোনারে এসেছিল, শহরের স্টেজ লাইনে চাকরি করত ওর বাবা। শহরে আসবার কয়েক দিনের মধ্যেই সব ক’টি যুবকের প্রেমনিবেদন পর্বটি শেষ হয়েছিল, সবাই মিলে বেলিভার চোখে পড়বার কত কসরতই না করেছে ওরা। কিন্তু তারপর এমন একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হলো কলিনকে, ওয়াগোনার থেকে পালানো ছাড়া উপায় রইল না।

মেরির হাতে ব্যান্ডেজ করে দিতে লাগল ডাক্তার মারভিন। ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ হলে বলল, ‘বাহ মেরি, লক্ষ্মী মেয়ে আমার, একটুও ভয় পাওনি তুমি। কিন্তু মনে রেখো এখন থেকে আরও লক্ষ্মী হয়ে থাকতে হবে তোমাকে, আর কখনও রান্নাঘরে ছুরি নিয়ে দুষ্টমি কোরো না যেন, কী মনে থাকবে? আর কটা দিন যেতে দাও, তারপর দেখবে আম্মুই তোমাকে ছুরি চালানো শিখিয়ে দিচ্ছে। ঠিক আছে?’

মেরিকে কোট পরিয়ে দিল মারভিন, তারপর কোলে তুলে নিল ওকে, বেলিভার সঙ্গে দরজার দিকে এগোল, কলিন দাঁড়িয়ে রয়েছে ওখানে। ওর দিকে তাকাল বেলিভা, কপালের চামড়া কুণ্ঠিত হলো তার।

‘তোমার মেয়েটি কিন্তু বেশ মিষ্টি, বেলিভা,’ বলল কলিন।

‘অথচ ওকে সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি, সারাক্ষণ দুষ্টমিতে মেতে থাকে, একটুও কথা শোনে না।’

‘মায়ের মতই, না?’

হেসে ফেলল বেলিভা, একটু যেন লাল হলো চেহারা। ‘ঠিক। কবে ফিরেছ তুমি, কলিন?’

‘এই তো আজই।’

‘তা হলে তো জানো না—’

‘বাবা আর এডির কথা? হ্যাঁ, জানি,’ বলল কলিন। ‘সেজন্যেই তো ফিরে এলাম। মাত্র তো ফিরে এসেছি, কী করব ঠিক করতে পারছি না।’

কী যেন বলতে চাইল বেলিভা, হেলারের মত ওকে সতর্ক করতে চাইল হয়তো, আন্দাজ করল কলিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নীরব থাকবারই সিদ্ধান্ত নিল। ঘুরে দাঁড়াল সে, মেরিকে কোলে তুলে নিয়ে নিচু গলায় ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলল, তারপর বেরিয়ে গেল বাইরে।

দরজা আটকে দিল ডাক্তার মারভিন, চোখজোড়া কুঁচকে আছে তার।

‘বলে গেল আমি যেন তোমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করি,’ হঠাৎ বলল ডাক্তার মারভিন। ‘বেলিভা আগেই জানত বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে তুমি ঠিক ফিরে আসবে, সত্যি বলতে কি আমিও তাই ভেবেছিলাম। প্রতিশোধ নেয়াই তোমার উদ্দেশ্য?’

‘হতে পারে,’ স্বীকার গেল কলিন।
‘সেক্ষেত্রে তোমাকে বোকাই বলতে হবে।’
‘সবাই দেখছি বোকা ভাবছে আমাকে।’
‘তবেই বোঝো।’

অস্বস্তির সঙ্গে হাত নাড়ল কলিন ফর্বস। ‘ডাক্তার, তোমার বাবাকে যদি ফাঁদে ফেলে হত্যা করা হত, তুমি কী করত?’

‘শেরিফের আদেশ অগ্রাহ্য করেছিল ওরা।’
‘কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন ছিল।’

‘ভিত্তিহীন কিনা জানছ কীভাবে? আমি যদূর শুনেছি, ওরা ইচ্ছাকৃতভাবেই ক্লেব্যাংকসের ওপর চরানো ওয়ারেনের গরুর পাল স্ট্যামপিড করেছিল।’

‘ঠিক জানো?’

‘না, কিন্তু তোমার বাবা অস্বীকার করেনি।’

‘বাবা নির্দোষ প্রমাণ করতে পারলে?’

‘পারবে কি?’

‘জানি না। মৃত্যুর আগে তোমাকে কিছু বলে যায়নি বাবা?’

‘কিছু না, কলিন। মুহূর্তের জন্যেও জ্ঞান ফেরেনি ওর, তিনটা গুলি বিধেছিল বুকে, বেঁচে ছিল কীভাবে সেটাই আশ্চর্য!’

‘আমাদের রাইডাররা সব কোথায়?’

‘অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে সবাই। তাদের কাউকেই বেসিনে পাবে না এখন, একজনকেও না।’

আচমকা দড়াম করে খুলে গেল সামনের দরজা। পাই করে ঘুরল কলিন, চোখের পলকে হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল, নিমেষে বেরিয়ে এল পিস্তলটা, পরমুহূর্তে নিচু করে নিল, চোখ-মুখ গরম হয়ে উঠল।

‘মেরির পুতুলটা ফেলে যাইনি তো?’ জানতে চাইল বেলিভা।

অস্বাভাবিক চড়া শোনালা ওর কণ্ঠস্বর, ফ্যাকাসে লাগছে ওকে; মেরির পুতুল খুঁজতে ফিরে আসেনি বেলিভা বুঝে ফেলল কলিন।

‘কই, নাহ্!’ জবাব দিল ডাক্তার মারভিন।

‘একটু খুঁজে দেখো না!’ বলল বেলিভা, তারপর গলা নামিয়ে ফিসফিস করে জানাল, ‘বাইরে তিনজন লোককে দেখলাম আমি, কলিন, এদিকে নজরে রাখছে। সামনে যখন লোক রয়েছে পেছনেও থাকতে পারে।’

পিস্তল হোলস্টারে ঢোকাল কলিন। ‘ধন্যবাদ, বেলিভা।’

‘এখন কী করবে?’

‘জানি না।’

‘তুমি চাইলে শেরিফকে খবর দিতে পারি।’

‘মনে হয় না তাতে লাভ হবে।’

‘তা হলে আমার সঙ্গে চলো, ওরা কিছু বুঝতে পারবে না।’

‘না, ওরা সত্যি সত্যি আমার খোঁজে এসে থাকলে এভাবে ঠেকানো যাবে না। অন্য কোন উপায় খুঁজতে হবে।’

‘তুমি বরং এখানে থেকে যাও,’ বলল ডাক্তার মারভিন। ‘জোর করে আমার বাড়িতে ঢোকার সাহস হবে না কারও।’

‘ঠিক আছে,’ বলল কলিন, ‘আজকের রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেব। আবার ধন্যবাদ, বেলিভা।’

কিন্তু এখানে থাকছে না ও। বাইরের লোকগুলো বেলিভার ফিরে আসা নিয়ে সন্দিহান হয়ে উঠবার আগেই ওকে বিদায় করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে—তাই বলতে হলো কথাটা। ওর কথায় বেলিভা আশ্বস্ত হয়েছে বলে মনে হলো। আবার চড়া গলায় কথা বলল সে, ‘অযথা কষ্ট দিলাম, ডাক্তার, ধন্যবাদ। পুতুলটা বোধহয় ওয়্যাগনেই আছে।’

এতক্ষণ চুপ করে ছিল মেরি, আর সইতে পারল না সে। ‘ও আম্মু, ওটা তো ওয়্যাগনেই আছে, বললাম না তোমাকে?’

ঠোট কামড়াল বেলিভা। ‘আহ, চুপ করো, মেরি,’ বলল ও। তারপর বেরিয়ে গিয়ে টেনে দিল দরজা।

দরজায় তালা মেরে কলিনের মুখোমুখি দাঁড়াল ডাক্তার মারভিন। ‘আমি মিথ্যে বলিনি, কলিন, জোর দেখিয়ে এ-বাড়িতে ঢুকে পড়বে ওয়ারেন, এখনও সেদিন আসেনি। দাঁড়াও না, কালই ওকে একগাদা কথা শোনাচ্ছি আমি।’ ইচ্ছে হলে তুমি নিশ্চিন্তে থেকে যেতে পারো, কোন ভয় নেই।’

থেকে যাবে? বুঝতে পারছে না কলিন। কিন্তু এভাবে কোণঠাসা হওয়া পছন্দ নয় ওর। এখান থেকে ওকে তো বেরুতে হবেই। দেরি করলে বরং আরও কঠিন হবে শত্রু বেষ্টিনী, জাল গুটিয়ে আনবে ওরা।

‘এ-বাড়ির কোন জানালা খোলা আছে?’ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল কলিন।

‘পশ্চিমের একটা জানালা খুলে রেখেছি, বাতাস ঢোকান জন্যে, বিকেলে ছেড়ে দেয়া হয়েছে ওই কামরার রোমীকে। বন্ধ করতে হবে ওটা?’

‘ঠিক আছে, আমিই বন্ধ করে আসছি,’ বলল কলিন। ‘তুমি বরং পেছন দরজা আটকানো কিনা দেখো।’

মাথা দুলিয়ে অন্দরের দিকে গেল ডাক্তার মারভিন। কলিন পা বাড়াল হসপিটাল উইংয়ের দিকে।

‘কামরাটা মাঝামাঝি,’ চোঁচিয়ে জানাল ডাক্তার।

‘আচ্ছা,’ জবাব দিল কলিন, ‘ধন্যবাদ।’

নির্দিষ্ট কামরার সামনে পৌঁছে দরজা ঠেলে ভিতরের জমাট অন্ধকারে পা রাখল কলিন। খোলা জানালার আবছা চৌকো কাঠামো দেখা যাচ্ছে। পিস্তল বের করে জানালার দিকে এগোল ও। তিনজন লোকের কথা বলেছে বেলিভা, বাড়ির সামনে রয়েছে ওরা, পেছনেও পাহারা থাকা সম্ভব, তবে বাড়ির পাশে হয়তো থাকবে না কেউ।

জানালার পাশে ঘাপটি মেরে বসে তীক্ষ্ণ চোখে অন্ধকারে ছায়াগুলোর দিকে তাকাল কলিন, কোন ছায়ামূর্তি নজরে এল না। জানালার চৌকাঠ ডিঙিয়ে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ল ও। এখুনি খেঁকিয়ে উঠবে একটা পিস্তল, আশঙ্কা করল; কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে অনড় পড়ে রইল কলিন।

একটা মিনিট পেরিয়ে গেল। আরেক মিনিট। আরও এক মিনিট। জানালার কাছে এসে আবার ফিরে যাচ্ছে ডাক্তার মারভিন, টের পেল কলিন। ঘাড় ফিরিয়ে উঠানের দিকে তাকাল ও, অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে ইতিমধ্যে, কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। সত্যিই কি ছিল তিনজন? কার কাছে খবর পেল ওরা। ওর এখানে আসবার কথা কে জানত?

হেলার।

হেলারের বাড়ির সামনে ঘোড়া রেখে এসেছে ও, অপরিচিত ব্যাণ্ডের ঘোড়া। এক বা একাধিক লোক অ্যাটর্নির সঙ্গে ওর আলাপে বাধা দিয়েছিল, ওরাই হয়তো এখন হাজির হয়েছে। হেলারই বোধ হয় বলে দিয়েছে যে এখানে আসবে ও।

রাস্তার দিক থেকে রাগী গমগমে কণ্ঠস্বর ভেসে এল হঠাৎ। ‘প্যাটেন! কনারস! মেইন! কোথায় সব? এখানে এসো, জলদি!’

বুকে হেঁটে বাড়ির সামনের দিকে এগোল কলিন, দেয়ালের অন্ধকার ছায়া থেকে সরল না। কণ্ঠস্বরের মালিক কে হতে পারে আঁচ করতে পারছে ও। রবার্ট ওয়ারেন। হেলার বলছিল চেষ্টা নিয়ে নির্দেশ দেওয়া ওয়ারেনের স্বভাব। ঠিক তাই করেছে রাস্তার লোকটি।

বাড়ির সামনে দেয়ালের কোণে, পৌছে মাটির সঙ্গে মিশে গেল কলিন, ওয়ারেনকে দেখা যাচ্ছে এখন—লম্বা, চওড়া কাঁধালা সুঠামদেহী একলোক। অন্য দুজন লোক অন্ধকার ছেড়ে বেরিয়ে এসে যোগ দিয়েছে ওর সঙ্গে, এবার আরও একজন হাজির হলো।

‘আর কে আছে তোমাদের সঙ্গে?’ কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ওয়ারেন।

‘আর কেউ না, রবার্ট।’

‘এখানে কী করছ তোমরা?’

‘টেরেস মিচেল আমাদের বন্ধু ছিল, ওকে আমাদের ভাল জাগত।’

‘আমারও,’ একই রকম চড়া গলায় বলল ওয়ারেন। ‘কিন্তু সে বোকার মত গায়ে পড়ে ফর্বসের সঙ্গে লাগতে গিয়ে মরেছে, ওর জন্যে বুনো বর্বরের মত অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ফর্বসকে হত্যা করতে হবে, এমন কোন কথা আছে? ওকে যদি মারতেই হয়, পুরুষমানুষের মত সামান্যসামান্য মোকাবিলা করো, এক এক করে। বেসিনে আইন বলে একটা কথা আছে, ভুলে যেয়ো না সেটা।’

বিড়বিড় করে কী যেন বলল ওদের একজন, বুঝতে পারল না কলিন।

বিশাল কাঁধ ঝাঁকাল ওয়ারেন। ডাক্তার মারভিনের দরজার দিকে এগোল সে, টোকা দিল। দরজা খুলে যেতেই বলল, ‘শুভসন্ধ্যা, ডাক্তার। কলিন ফর্বস আছে নাকি এখানে?’

‘না।’

‘সত্যি?’

‘মিথ্যে বলা আমার স্বভাব নয়।’

এক মুহূর্ত চুপ রইল ওয়ারেন, তারপর বলল, ‘ঠিক আছে, ডাক্তার, খেপে যেয়ো না। তবে ও এখানে থাকলে বা আবার এলে বোলো আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই। অতীতের একটা ব্যাপার নিয়ে অযথা বিরোধ জিইয়ে রাখার কোন

মানে নেই, আমার হয়ে কথাটা বোলো ওকে, ঠিক আছে?’

‘যদি ও আসে, বলব,’ শান্ত কণ্ঠে বলল ডাক্তার মারভিন।

‘ধন্যবাদ, ডাক্তার।’

ঘুরে দাঁড়াল ওয়ারেন, নিজের রাইডারদের কাছে এসে বলল, ‘খেত্তেরি, এসব আমার একেবারে ভাল লাগছে না, তোমাদের ভাবসাবে মনে হচ্ছে ফর্বসকে হত্যা করার মতলবেই এখানে আসা আমাদের। কিন্তু মানুষ এমন কিছু ভাবুক আমি তা চাই না। অতীত অতীতই; আমি সেসব ভুলে গিয়ে ফর্বসের সঙ্গে মিটমাট করে ফেলতে চাই। অবশ্য ফর্বস যদি গায়ে পড়ে ঝামেলা বাধাতে চায়, সেটা পরের কথা, তবে সেটা তাকেই আগে শুরু করতে দাও।’

‘কিন্তু ফর্বস টেরেস মিচেলকে মেরেছে!’ প্রতিবাদ করল একজন।

‘ওর কথা আপাতত ভুলে যাও। শহরে এ-কথা ছড়িয়ে দাও, ইচ্ছে করলে ফর্বস ওর র‍্যাঞ্জে ফিরতে পারে, আমাদের দিক থেকে কোন গোলমাল হবে না।’

‘এটা তোমার মনের কথা নয়, রবার্ট।’

‘কে বলেছে?’ হাসল রবার্ট ওয়ারেন, সশব্দে। ‘অপেক্ষা করো, দেখো কী হয়।’

রাস্তা ধরে শহরের দিকে এগোল ওরা।

উঠে দাঁড়াল কলিন, অনুসরণ করল ওদের। উঁচু রাস্তা পেরোনোর পর কোণাকুণিভাবে হেলারের বাড়ির দিকে এগোল ও। যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই আছে ঘোড়াটা। কাছেপিঠে কাউকে দেখা গেল না। ওয়ারেনের লোকজন যদি নেতার কথা মেনে চলে তা হলে এখন ঘোড়ায় চেপে প্রধান রাস্তা ধরেই যেতে পারবে ও, বিপদ হবে না; এমনকী যেকোন একটা স্যালুনে ঢুকে গলাটাও ভিজিয়ে নেয়া যায়। স্যালুনে ঢুকবে কিনা একবার ভাবল কলিন, পরমুহূর্তে মত পাল্টাল।

জনমতের মূল্য বোঝে রবার্ট ওয়ারেন, বেসিনবাসীদের চিন্তা-ভাবনা বুঝবার চেষ্টা করে। আজ সে ডাক্তার মারভিনের বাড়িতে এসেছে এমন একটা হত্যাকাণ্ডে বাধা দিতে যেটা লোকচোখে জঘন্য হয়ে ধরা দিত। কর্মচারীদের সে অতীতের কথা ভুলে যাবার পরামর্শ দিয়েছে, তার নাকি যেচে ঝামেলা করবার ইচ্ছে নেই। কিন্তু গোলমালের ব্যবস্থা করা কঠিন কিছু নয়। যে কোন লোককে ক্রমাগত উত্থাপ্ত করে তাকে লড়াইয়ে নামতে বাধ্য করা সহজ কাজ এবং এভাবে লড়াই বাধানোর দায়-দায়িত্বও তার ঘাড়ে চাপানো যায়।

তারা উঠেছে আকাশে। স্নান আলো বিলোচ্ছে আধখানা চাঁদ। ঘোড়ার কাছে এসে হিচিংপোস্ট থেকে লাগাম খুলে নিয়ে স্যাডলে চেপে বসল কলিন। তারপর শহরের বাইরের দিকে এগোল, শেষ দালানটা অতিক্রম করে ঢাল বেয়ে নদীর দিকে এগোল। নদী পেরিয়ে উত্তর পূবে চলল ও। ম্যাকমিলানের র‍্যাঞ্জ কিনেছে রবার্ট ওয়ারেন, ওখানেই যাচ্ছে কলিন। ওয়ারেন দেখা করতে চেয়েছে ওর সঙ্গে।

চার

পর্বতমালার প্রান্তে ছোঁয়া একটা প্রকাণ্ড মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে ওয়ারেন র‍্যাঞ্চ; জড়া জড়ি করে দাঁড়ানো কয়েকটা দালানকোঠা। উইলো বোম্বের মাঝে একেবেঁকে বয়ে যাওয়া একটা ক্রীকের ধারে ঘোড়া বাঁধল কলিন ফর্বস, তারপর পায়ে হেঁটে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল। আসবার পথে কোথাও অযথা সময় নষ্ট করেনি ও, তাই আশা করছে ওয়ারেনদের আগেই পৌঁছুতে পেরেছে।

এখন মাঝরাত হলেও র‍্যাঞ্চ হাউসের জানালায় আর বাংক হাউসে আলোর আভাস। ওয়ারেন রাইডারদের কেউ হয়তো এখনও জেগে, র‍্যাঞ্চ হাউসে যেই থাকুক এখনও বিছানায় যায়নি।

বারান্দায় উঠে এল কলিন, চুপচাপ দাঁড়িয়ে কান পাতল দরজায়, কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না। দরজায় টোকা দিল ও, একই সঙ্গে পিস্তলের দিকে এগিয়ে গেল হাত। ওয়ারেনের ছেলে বিল যদি দরজা খুলে দাঁড়ায় কী করতে হবে জানে না ও মিসেস ওয়ারেন দরজা খুললেই বা কী করবে? কী যেন নাম মেয়েটার? ও হ্যাঁ, হেলার বলেছিল, লিভা। ওর চেনা লিভা?

কিন্তু সাড়া দিল না কেউ।

আবার টোকা দিল কলিন, অপেক্ষা করল, হঠাৎ ক্লান্ত বোধ করল। ও শিরদাঁড়ার কাছে টনটন করছে, খিল ধরেছে যেন পায়ের পেশীতে। বিশ্রাম না নিলে আর হচ্ছে না, শরীর মন দুটোই একটু আরামের জন্য আইটাই করছে।

‘কে?’ দরজার ওপাশ থেকে মেয়েলি কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

বিড়বিড় করে অস্পষ্ট একটা জবাব দিল কলিন, আশা করল এতে কাজ হবে। হলোও। খুলে গেল দরজা। এবং অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল ও-পাশের মেয়েটি, বোঝা যাচ্ছে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেয়েছে, একটা হাত তুলে আনল সে মুখের কাছে। ‘তুমি...তুমি এখানে?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু তুমি? তোমাকে এখানে দেখব। কল্পনাও করিনি। হেলারের কাছে নাম শুনে সন্দেহ জেগেছিল, কিন্তু বিশ্বাস করিনি...অনেকদিন পর দেখা, তাই না? কেমন আছ তুমি?’

ভিতরে ঢুকে দরজা আটকে দিল কলিন ফর্বস, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কামরার ওধারে একটা পিঠ উঁচু চেয়ার, উল্টোদিকে ফেরানো, ওটার পেছনে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে। দুটো লণ্ঠন জ্বলছে কামরায়, পিয়ানো আর টেবিলের উপর।

‘কলিন ফর্বস?’ ফিসফিস করে বলল লিভা ওয়ারেন, ‘তুমি-’

‘হ্যাঁ, ড্যানিয়েল ফর্বস আমার বাবা, আমি আবার ফিরে এসেছি।’

ভাল করে লিভার দিকে তাকাল কলিন। তেমন বদলায়নি মেয়েটা, চেহারা

সামান্য মলিনতা এসেছে কেবল; তেমন আছে মধুরঙা রেশমী চুল, নীল দুটো চোখ, মাখনের মত মসৃণ ত্বক। কোমরের কাছে চাপা সাটিনের পোশাক ওর পরনে, মেঝে ছুই ছুই করছে ওটার কুল। ওকে দেখে মনে হয় না ও শোবার আয়োজন করছিল। কোন পুরুষকে আকৃষ্ট করতে কিংবা অন্য মেয়ের মনে ঈর্ষা জাগাতেই এ-ধরনের পোশাক পরা হয়। এ বোধ হয় নিজেকে খুশি করতেই পরেছে, ভাবল কলিন। হেলারের কথা সত্যি হলে দামী পোশাক-আশাক দেখানোর সুযোগ মেলেনা ওর।

লিভার সঙ্গে পরিচয়ের কথা ভাবল কলিন।

সে বছর সিভিকিটের কাজে ওয়াইওমিং থেকে ক্যানসাস সিটিতে গিয়েছিল ও। একদিন সন্ধ্যায় রেস্টুরায় সাপার সারছে, হঠাৎ মেয়েলি কণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল, চমকে উঠল ও, চট করে বাইরে বেরিয়ে এল। তিনজন যুগ্ম ধরনের লোক এক তরুণীকে টেনে হিঁচড়ে কাছেই দাঁড় করানো একটা বাকবোর্ডে তুলতে চাইছে। ব্যাপার কী চট করে বুঝে নিল কলিন। সময় নষ্ট না করে দ্রুত ছুটে গেল ও। সবচেয়ে কাছের লোকটার কলার জাপটে ধরল ওর হাত, হ্যাঁচকা টান মারল, এলোপাতাড়ি পা ফেলে বাকবোর্ডের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা। সঙ্গীকে আক্রান্ত হতে দেখে মেয়েটিকে ছেড়ে ওকে মোকাবিলা করতে একসঙ্গে তেড়ে এল অন্য দু'জন। দেরি করল না কলিন, ওর দু'হাত বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গেল দুই গুঞ্জর চোয়াল বরাবর। প্রচণ্ড আঘাতে চমকে উঠল ওরা। সুযোগটা লুফে নিল কলিন। চট করে সামনে বেড়ে দু'হাতে দু'জনের চুল মুঠি করে ধরে মাথা দুটো ঠুকে দিল পরস্পর। নির্দিধায় জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল ওরা। এবার মেয়েটার দিকে দৃষ্টি দিল কলিন। এক পাশে দাঁড়িয়ে আতঙ্কে খরখর কাঁপছে বেচারি। চেহারা দেখে বোঝা যায় সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে, পরনে দামী পোশাক। ওর দিকে এগিয়ে গেল কলিন। 'ভয় নেই,' বলল ও, 'কোথায় যাচ্ছিলে, চলো পৌছে দিই।'

'বা-বাসায়!' অনেক কষ্টে মুখ খুলল মেয়েটি, 'এক বন্ধুর বাসায় গিয়েছিলাম,' গলা কাঁপছে, 'স্যালুনের সামনে আসতেই আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা...এমন কিছু ঘটবে...ভাবিনি...আমি...আমি... মানে...'

'ভুলে যাও,' বলল কলিন, 'চলো, তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছি।'

'চলো।'

তিন গুঞ্জাকে শেরিফের হাতে সোপর্দ করবার ব্যবস্থা করে তারপর এগোল ওরা।

'আমার নাম লিভা ওয়াইল্ড,' পরিচয় দিল মেয়েটা, 'জন ওয়াইল্ড আমার বাবা, শহরের সবাই এক ডাকে চেনে ওকে।'

নিজের নাম বলল কলিন। 'তা হলে তো তোমার ওপর হামলা হবার কথা নয়, বোধ হয় চিনতে পারেনি।'

এই ঘটনার পর আর মাত্র একবার দেখা হয়েছে ওদের। তারপর আবার ওয়াইওমিংয়ে ফিরে গেছে কলিন। এতদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় ওর কথা এক রকম ভুলেই গিয়েছিল।

বর্তমানে ফিরে এল কলিন ফর্বস। লিভার দিকে তাকাল। কিন্তু ও-এখানে

এল কীভাবে?

‘এখানে এসেছ কেন?’ জানতে চাইল লিভা।

মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল কলিন, বলল, ‘উত্তেজিত হয়ে না, রবার্ট ওয়ারেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম আমি। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ভাবতেও পারিনি, তুমি ওর সঙ্গে জড়ালে কী করে?’

জানাল লিভা। বাবার কারণেই আজ ওর এ-অবস্থা। বছর খানেক আগে ক্যানসাস সিটিতে গেলে বাবার সঙ্গে পরিচয় হয় রবার্ট ওয়ারেনের। ওয়ারেনের কেতাদুরন্ত চালে মুগ্ধ হয়ে মেয়েকে ওর হাতে তুলে দিয়েছে জন ওয়াইল্ড। বিয়ের পর ক্যানসাস সিটি ছেড়ে এখানে চলে আসতে হয়েছে ওকে।

‘ক্যানসাস সিটির তুলনায় আমাদের বেসিন তোমার কাছে মৃত্যুপুরীর মত লাগার কথা।’

মদু হাসল লিভা। ‘স্বাভাবিক...কী আছে এখানে আমাকে মুগ্ধ করবার মত?’

‘ঠিক কোন জিনিসটার অভাব বোধ করছ তুমি?’ জানতে চাইল কলিন।

‘আনন্দ। কত মজাই না ছিল ওখানে। আর এখানে—কথা বলব, একটা বন্ধু পর্যন্ত নেই—ছেলে বা মেয়ে—কেউ না।’

‘তুমি এখানে আছ জানলে আরও আগেই ফিরে আসতাম আমি।’

লিভা খুশি হয়েছে বলে মনে হলো, হাসল ও, বিস্ময়ের ছাপ বিদায় নিয়েছে চেহারা থেকে।

‘কফি আছে?’ জিজ্ঞেস করল কলিন।

‘আছে, কিন্তু ঠাণ্ডা।’

‘তাই দাও।’

‘একটু দাঁড়াও,’ বলল লিভা। ‘এখনি আনছি।’

রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল লিভা। একটু পরেই দু’কাপ কফি নিয়ে ফিরে এল। এক কাপ কলিনকে দিল।

কফিতে চুমুক দিল ওরা।

‘ক্যানসাস সিটিতে যদি ফিরতে পারতাম,’ লিভার কণ্ঠে হতাশা, ‘আর কিছু চাইতাম না। এখানে আমার দম আটকে আসছে!’

‘গেলেই পারো?’

‘টাকা? রবার্ট একসঙ্গে বেশি টাকা দেয় না আমাকে।’

‘কত টাকা লাগবে?’

‘দেবে তুমি? কমপক্ষে পাঁচশো ডলার!’

গভীরভাবে মাথা দোলাল কলিন ফর্বস। হেলারের কাছ থেকে পাঁচশো ডলার আদায় করা কঠিন হবে না। টাকাটা নিয়ে এক টিলে দুই পাখি মারা যায়। লিভাকে এই নিরানন্দ একঘেয়ে জীবন থেকে উদ্ধার করে ক্যানসাস সিটিতে ওর আপন পৃথিবীতে ফিরে যেতে সাহায্য করে একই সঙ্গে রবার্ট ওয়ারেনকে আঘাত করতে পারে। লিভাকে পালাতে সাহায্য করে খবরটা ওয়ারেনের কানে পৌঁছে দিলেই হবে। ওয়ারেনের ঘরে সুখী নয় লিভা, বরং বলা যায় বিপদেই আছে। মেয়েটিকে বিপদ থেকে বাঁচানোর দোষের কিছু নেই। অতীতে একবার ওর

বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সে। ওকে এখানে দেখে এবারও নিশ্চয়ই সাহায্য আশা করবে মেয়েটা। ক্যানসাস সিটিতে ফিরতে চায় লিভা, অথচ এক অর্থে ওকে আটকে রেখেছে ওয়ারেন...কিন্তু লিভা তার বিবাহিত স্ত্রী...উঁহু, বিয়ে করলেও ওকে স্ত্রীর পূর্ণ মর্যাদা দেয়নি সে, লিভার কথাতেই তা বোঝা যায়...তবে...চট করে চিন্তাটা দূর করে দিতে চাইল কলিন। বাঁকা পথে লড়াই করবার সময় এখনও আসেনি।

‘আমাকে যেভাবে পারো, পাঁচশো ডলার যোগাড় করে দাও, কলিন,’
আবেদন ঝরল লিভার কণ্ঠে, ‘উদ্ধার করো এ-নরক থেকে!’

‘ঠিক আছে,’ বলল কলিন। ‘ভেবো না, একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।’

হঠাৎ বাইরে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল, ক্রমশ বাড়ছে।
তিনসঙ্গীসহ ফিরে আসছে রবার্ট ওয়ারেন।

ঘোড়ার খুরের শব্দ লিভাও শুনেছে। ঝট করে দরজার দিকে তাকাল সে।

‘পালাও, কলিন!’ রুদ্ধশ্বাসে বলল।

পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল কলিন। ‘না, লিভা।’

‘কিন্তু ওরা এসে-’

‘একসঙ্গে ঢুকে পড়বে সবাই?’

‘রবার্ট, আর বিল। কিন্তু-’

‘ওদের সঙ্গে দেখা করতেই তো আমার এখানে আসা!’

কলিনের হোলস্টারে রাখা পিস্তলের দিকে তাকাল লিভা, একটু যেন শিউরে উঠল।

‘আলাপ করতে, লিভা, হত্যা নয়।’

‘কিন্তু ওরা-’

ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছে কলিন, তবু হাসতে চেষ্টা করল।

‘এসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না,’ বলল ও, ‘তুমি ঘরে চলে যাও।
আমি রইলাম এখানে।’

‘না!’

উঠোনে পৌঁছে গেল ওয়ারেনরা। এক এক করে স্যাডল থেকে নামছে। চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে কলিন, দেরি নেই, এখনি দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকবে রবার্ট ওয়ারেন আর তার ছেলে।

‘লিভা,’ বলল কলিন, ‘ঘরে যাও।’

‘না। আমাকে দেখলে গোলাগুলি করবে না ওরা।’

‘কিন্তু তুমি ওদের সতর্ক করোনি বলে প্রশ্ন উঠবে। আমার কাজ আমি বুঝি, লিভা, তুমি ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো। আমি রবার্টের সঙ্গে একটু আলাপ করে ফিরে যাব, ব্যস।’

‘কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই-’

‘না। কই, গেলে? তাড়াতাড়ি করো!’

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘুরে দাঁড়াল লিভা। বারান্দায় পায়ের আওয়াজ পেল কলিন।
উল্টোদিকে ফেরানো পিঠ উঁচু চেয়ারটার দিকে এগিয়ে গেল ও, বসে পড়ল।

লিভার ঘরের দরজা বন্ধ হলো, একই সঙ্গে খুলে গেল বারান্দার দরজা। কামরার ভিতর পায়ের আওয়াজ। দরজা বন্ধ হবার শব্দ।

‘বাতি জ্বলছে,’ গজগজ করে উঠল রবার্ট। ‘কিন্তু লিভা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। বাতি নেভায়নি কেন বুঝলাম না। যে কোন মুহূর্তে বিপদ হতে পারে!’

‘ওর মাথায় ঘিলু বলে কোন পদার্থ আছে নাকি?’ জবাব দিল আরেকটা কণ্ঠস্বর।

‘চুপ, বিল!’ ধমকের সুরে বলল ওয়ারেন।

‘কীভাবে যে তোমায় বোকা বানিয়ে রেখেছে সে।’ আবার বলল বিল, ‘পরে টের পাবে।’

‘ধেঁওর, বললাম না, চুপ করো!’ গর্জে উঠল রবার্ট ওয়ারেন।

কামরার আরও ভিতরে এল ওরা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল কলিন, মুখোমুখি হলো ওদের, আগেই পিস্তল তুলে নিয়েছে হাতে। ওয়ারেনকে কাঁভার করল ও, সামান্য নোয়াল ব্যারেলটা।

‘তুমি নাকি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও?’ বলল ও, ‘আমি এসেছি।’

‘যেন নিজের বাড়ি, কাকে বলে ঢুকেছ তুমি?’ চিৎকার করে বলল ওয়ারেন।

‘তুমি রেগে যাবে ভাবিনি,’ বলল কলিন, ‘দুঃখিত।’

লাল টকটকে চেহারা ওয়ারেনের, ঠোঁটজোড়া ঈষৎ মোটা, ঘন ভুরু নীচে প্রায় ঢাকা পড়েছে চোখ দুটো, চৌকো চোয়াল, একগুঁয়ে একটা ভাব চেহারায়। হাঁপাচ্ছে রবার্ট ওয়ারেন। নিজের ঘরে হঠাৎ অন্য লোকের উপস্থিতিতে কিছুটা হতবাক।

ওর ঠিক পাশে বিল, একটু সামনে ঝুঁকে আছে, আড়ষ্ট। বাপের ক্ষুদ্র সংস্করণ যেন, রবার্ট ওয়ারেনের চেয়ে একটু লম্বা, কিন্তু অতটা ভারি নয় শরীর, শুকনো চেহারা, কিন্তু বাপের মতই একগুঁয়ে ভাব। হেলার বলেছিল ছেলেটি নাকি সুদর্শন, হাসলে হয়তো ভালই লাগবে। হেলার অবশ্য বিলকে বিপজ্জনক মনে করেনি, কিন্তু কলিনের বিশ্বাস, বিল রবার্ট ওয়ারেনের মতই বেপরোয়া লোক।

‘তোমার নাম জানতে চাওয়ার দরকার আছে আর?’ জিজ্ঞেস করল রবার্ট ওয়ারেন।

‘আমার ধারণা ওটা জানতে বাকি নেই তোমার।’

‘তোমার বাবার প্রতি আমার কোন ঘৃণা ছিল না, ফর্বস। ওর সাথে নানা ব্যাপারে আমার অমিল ছিল বটে, অনেক ব্যাপারে ওর বিরোধিতা করেছি, লড়াই করেছি, কিন্তু কখনও ঘৃণা করিনি।’

‘কিন্তু বাবাকে তুমি হত্যা করেছ।’

‘না, আমি হত্যা করিনি। তোমার বাবা যেদিন আহত হয়, আমিও ছিলাম প্যসিতে, ওর গায়ে কার গুলি লেগেছে জানতে পারিনি আমরা আজও।’

‘হামলাটার কথা একটু শোনাও।’

‘ওটা হামলা ছিল না,’ চট করে বলল ওয়ারেন। ‘ফর্বস র‍্যাঞ্চের শেরিফের প্যসি গিয়েছিল, তোমার বাবা শেরিফের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেছে, প্যসিকে র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চলে যেতে হুকুম দিয়েছে। শেরিফ ওর নির্দেশ অমান্য করায় গুলি ছুঁড়তে

দ্বিধা করেনি।’

‘তা হলে বাবার র‍্যাঞ্জে প্যাসি যাবার কারণটাই বলো,’ বলল কলিন।

মাথা দোলাল ওয়ারেন, বলল, ‘ফর্বস, আর সবার বেলায় যেমন ঘটে, তোমার বাবার সঙ্গেও আমার নানা বিষয়ে মতের অমিল ছিল। আমি আমার কথায় অনড় থেকেছি, তোমার বাবা তারটায়। অসংখ্যবার আমাদের দুজনের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়েছে, কিন্তু স্ট্যামপিড না ঘটলে ব্যাপারটা কিছুতেই এতদূর গড়াত না। গভীর ক্যানিয়নে একসঙ্গে পনেরশো গরুর একটা পাল পিছলে পড়ার পর কী অবস্থা হয়েছিল যদি দেখতে! ক্লেব্যাংকসের ওপর থেকে এ করুণ দৃশ্যটাই দেখতে হয়েছে আমাকে!’

‘কিন্তু সেজন্যে আমার বাবাকে দায়ী করছ কেন?’

‘গরুর পাল পাহারা দেয়ার জন্যে আমার দুজন লোক ছিল। দুজনই তোমার বাবা আর ভাইকে দেখেছে। আরও তিনজন লোক ছিল ওদের সঙ্গে।’

‘ওরা সত্যি বলেছে তার কোন প্রমাণ আছে?’

‘ওরা মিথ্যে বলেনি। কিন্তু ব্যাপারটা আরও জটিল। তোমার বাবা আর ভাই ফিরে আসার সময় ডেনিস স্মিথ দেখেছে ওদের, স্ট্যামপিডের ঘটনাস্থলের কয়েক মাইলের মধ্যে ডেভিড স্পেস্টারও দেখেছে তোমার বাবাকে।’

‘তবু আমি বিশ্বাস করি না,’ বলল কলিন।

‘কিন্তু এটাই সত্যি। সময় পেলে স্মিথের সঙ্গে আলাপ করো, জিজ্ঞেস করে দেখো ডেভিড স্পেস্টারকে। বেলিভা শ্বেবারের র‍্যাঞ্জে পাওয়া যাবে ওকে। শেরিফের কাছে দেয়া ওদের জবানবন্দী জেনে নাও।’

‘ঠিক আছে, তাই নেব।’

‘বেশ। তা, এবার পিস্তলটা হোলস্টারে রাখলে হয় না? কয়েকটা ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই আমি। পিস্তলের মুখে কথা বলতে আমার অস্বস্তি লাগে।’

‘ওর কোন দরকার আছে এখানে?’ বিলের দিকে ইশারা করল কলিন ফর্বস।

‘বিল,’ বলল ওয়ারেন, ‘তুমি আমাদের আলাপে বাগড়া দিতে এসো না। বেসিনে আর রক্তপাত চাই না আমি।’

‘বাগড়া দেয়ার ইচ্ছে আমারও নেই,’ তিক্ত কণ্ঠে বলল বিল। ‘তবে একটা কথা মনে রাখতে বলি, লাশ ছাড়া ফর্বসদের বিশ্বাস করা ঠিক হবে না!’

ফায়ারপ্রেসের দিকে এগিয়ে গেল সে, ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। বাপ বেটার মাঝখানে পড়ে গেল কলিন।

এখানে বামেলা করবার ঝুঁকি নিতে চাইবে না রবার্ট ওয়ারেন, নিজেকে আশ্বস্ত করতে চাইল ও। লোকজন ভাল চোখে দেখবে না সেটা। আমাকে মারতে হলে অন্য কোথাও কাজটা সারবে সে, যাতে সবাই জানে লড়াই শুরু করবার জন্যে আমিই দায়ী। হত্যার সময় বাইরের লোকের সাক্ষীরও দরকার হবে তার। কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিস্তলটা খাপে ঢোকাল কলিন।

‘শুরু করো, ওয়ারেন,’ বলল ও, ‘বলো, কী বলবে।’

‘তুমি বেসিনে ফিরে এলে কেন?’

‘বাবা আর ভাই মারা গেছে খবর পেলে তুমি কী করতে?’

পকেট থেকে সিগার বের করল রবার্ট ওয়ারেন, দাঁত দিয়ে গোড়া কেটে ঠোটে ঝোলাল, আগুন জ্বেলে টান দিয়ে মাথা দোলাল। ‘হ্যাঁ, আমিও হয়তো তোমার মতই করতাম। আচ্ছা, গুনলাম ওয়াইওমিংয়ে নাকি বেশ ভাল একটা চাকরি করছ তুমি।’

‘হ্যাঁ, করতাম।’

‘এখন কি ফিরে যাবে আবার ওই কাজে?’

‘না, এখানে থেকে ফর্বস র‍্যাঞ্চ চালাব।’

ভুরু কঁচকাল ওয়ারেন। ‘কিন্তু আমি কিনতে চাই যে র‍্যাঞ্চটা। কথাটা হয়তো তোমার পছন্দ হচ্ছে না, পরোক্ষে হলেও ড্যানিয়েলের মৃত্যুর জন্যে আমি কিছুটা দায়ী, এখন আবার র‍্যাঞ্চ কেনার কথা বলছি—সন্দেহজনক, না? আসলে অনেক দিন থেকেই জায়গা খুঁজছি আমি, তোমাদের র‍্যাঞ্চটা আমার পছন্দ, যত দাম চাও দেব।’

‘র‍্যাঞ্চ আমি বিক্রি করব না।’

‘কী বলছ? ওয়াইওমিংয়ের চাকরিটা সত্যিই ছেড়ে দেবে?’

‘ছেড়ে দিয়েই এসেছি।’

‘ভাল করে ভেবে দেখলে হত না?’

‘ভেবেই বলছি।’

‘কাজটা ঠিক হচ্ছে না।’

‘আমার ধারণা অন্য রকম।’

‘সেটা ভুল,’ বলল ওয়ারেন, তীক্ষ্ণ শোনালা তার কণ্ঠস্বর। এতক্ষণ বেশ অমায়িক ছিল লোকটার আচরণ, কিন্তু এখন বদলে যাচ্ছে তার হাবভাব, দৃষ্টি কঠিন।

‘আমার বিশ্বাস,’ আবার বলল ওয়ারেন, ‘তুমি ভুল করছ, ফর্বস, এবং তোমাকে তা শোধরাতে হবে। আমার র‍্যাঞ্চ ছেড়ে যাবার আগেই তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমার কাছে তোমাদের র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে ওয়াইওমিংয়ের পুরোনো চাকরিতে ফিরে যাবে তুমি।’

সোজা হয়ে দাঁড়াল বিল ওয়ারেন, হাসছে, দুহাত ঘষতে ঘষতে মাথা দোলাল সে।

কলিনের শিড়দাঁড়ার কাছটায় শিরশির করে উঠল। এখনও সশস্ত্র ও। শক্তির পাল্লা সমান। পিস্তলে ওর হাত চালু, কিন্তু ওয়ারেন আর বিলের মাঝখানে বিস্তর ফারাক, দুজনকে এক সাথে কাভার করা যাবে না। ব্যাপারটা ড্রয়ের দিকে গড়ালে ঠিক মরতে হবে।

‘কী করতে হবে, শোনো, ফর্বস,’ খেই ধরল রবার্ট ওয়ারেন, ‘আজ, এখনি একটা কাগজে সই দেবে তুমি, তোমার র‍্যাঞ্চ আমার কাছে বিক্রি করছ লেখা থাকবে তাতে; তারপর কাল সকালে শহরে গিয়ে লেনদেন চুকিয়ে ফেলব আমরা। এবং পরশু তল্লিতল্লা গুটিয়ে ওয়াইওমিংয়ের পথ ধরবে তুমি। পরিকার?’

‘ভেবে দেখতে দাও,’ বলল কলিন, সময় পেতে চাইছে।

‘ভাবনার কিছু নেই,’ প্রায় খেঁকিয়ে উঠল ওয়ারেন, ‘আমি তো বিকল্প কিছু দেখছি না! যা বলছি তাই করতে হবে তোমাকে!’

জিভ দিয়ে ঠোট ভেজাল কলিন ফর্বস। ওয়ারেন চমৎকার বুদ্ধি বের করেছে। ওয়ারেনের কথায় রাজি হয়ে কাগজে সই দিলে ওকে সে আটকে রাখবে সারারাত, সকাল হলে ওয়াগোনারে নিয়ে যাবে, সবার সামনে ওর হাতে দলিলে সই করিয়ে বিক্রিটাকে বৈধ রূপ দেবে, তারপর বেসিন থেকে চির বিদায় জানানো হবে ওকে। লোক জানবে স্বেচ্ছায় সম্পত্তি বিক্রি করে চলে গেছে কলিন ফর্বস। এরপর উপত্যকায় আরও বেড়ে যাবে ওয়ারেনের প্রতিপত্তি। ধেন্ডের, নিকুচি করি! ভাবল ফর্বস, সই না দিলে কী করতে পারবে ওরা? নিরুপায় না হলে কিছুতেই লড়াই বাধাতে চাইবে না ওয়ারেন, এবং তার আগে সম্ভাব্য সব কৌশলই কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে সে।

‘আমি কোন কাগজে সই করছি না,’ দৃঢ় কণ্ঠে বলল কলিন।

‘নইলে পস্তাবে!’

‘কীভাবে?’

বিলের উদ্দেশ্যে চিবুক নাচাল রবার্ট ওয়ারেন। ‘বিল, লুইস প্যাটেন আর চাক কনারসকে ডেকে আনো...না, দরজা থেকেই ডাকো ওদের। পিস্তলের বাঁটে হাত রেখে একটা চোখ ফর্বসের ওপর রেখো।’

‘এতক্ষণে আসল কথায় এসেছ!’ বলল বিল।

দরজার দিকে এগোল সে, কবাটি খুলে চেষ্টা করে প্যাটেন আর কনারসকে ডাকল, কিন্তু কলিনের উপর থেকে নজর সরাল না।

পিস্তল বের করবার চেষ্টা করল না কলিন। এখান থেকে আস্ত শরীরে বেরোতে পারবে ভেবে ভুল করেছে, বুঝতে পারছে। রবার্ট ওয়ারেন সম্পর্কে ওর অনুমান ঠিক হয়নি। বেসিনে নিজ থেকে বড় ধরনের গোলমাল করতে চাইবে না ওয়ারেন, ঠিক, কিন্তু নিজের ঘরে ছোটখাট হাঙ্গামায় ক্ষতি কী? এখানে সে সম্রাট। এখানে যাই ঘটুক কেউ জানবে না।

‘এবার গানবেল্টের বাক্স খুলে ফেলো,’ বলল ওয়ারেন, ‘ওটা আর কোন কাজে আসছে না তোমার।’

হাসল কলিন।

‘বাপের মতই গোঁয়ার এবং নির্বোধ তুমি!’

অপেক্ষা করল কলিন। বারান্দায় পায়ের শব্দ। কামরায় ফিরে এল বিল ওয়ারেন, সঙ্গে আরও দুজন। একজন লম্বা, ঢ্যাঙা মত, চোখ মুখ কোঁচকানো, যেন ভেঙুচি কাটছে সারাক্ষণ। অন্যজন খর্বাকৃতি, স্থলকায়, লালচে একজোড়া গোঁফ ঠোঁটের উপর।

‘দেখো, কে এসেছে,’ বলল বিল, ‘এর নাম ফর্বস, ওই মেরেছে আমাদের টেরেন্স মিচেলকে।’

নিমেষে পিস্তল বের করে আনল গুঁফো।

‘দাঁড়াও,’ বলল রবার্ট ওয়ারেন। ‘এই শেষ সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে, ফর্বস,

আমার কথা শোনো, তোমার ভাল হবে।’

লম্বা করে দম নিলো কলিন। ‘না।’

‘এরা দুজনই মিচেলের বন্ধু, মিচেলকে ওরা পছন্দ করত।’

‘সে-ই আগে পিস্তল বের করেছিল,’ বলল কলিন।

‘জানি,’ জবাব দিল ওয়ারেন, ‘রেডফিল্ড শেরিফের কাছে তোমার পক্ষে সাক্ষী দিয়েছে, তাতে কিছু যায় আসে না। যত যাই হোক, তুমিই মিচেলের হত্যাকারী। কাল সূর্য ওঠার আগেই আপসোস হবে তোমার কেন তার সঙ্গে দেখা হতে গেল ভেবে। প্যাটেন, কনারস, আস্তাবলে নিয়ে যাও ওকে, তবে আমি না আসা পর্যন্ত গায়ে হাত তুলো না, আমি লিভাকে দেখেই আসছি। কই, ফর্বস, গানবেল্ট খুলতে বললাম না?’

বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশ পালন করল কলিন, উপায় নেই। প্যাটেন আর কনারস এগিয়ে এসে ওর দু’পাশে দাঁড়াল, জাপটে ধরল কজি, তারপর টেনে হিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে নিয়ে চলল আস্তাবলের দিকে। দাঁত মুখ খিঁচে ব্যথা সহ্য করল কলিন।

পাঁচ

আস্তাবলের ছাদের বীম থেকে বুলছে তিনটে জ্বলন্ত লণ্ঠন।

মেঝেয় চিত হয়ে শোয়া কলিন ফর্বস, মাথায় প্রচণ্ড এক আঘাতে ছিটকে পড়েছে, ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বিল ওয়ারেন, লুইস প্যাটেন আর চাক কনারস, রবার্ট ওয়ারেনের জন্য অপেক্ষা করছে। ঢ্যাঙা লোকটার নাম প্যাটেন, গুফোর নাম কনারস।

‘ব্যাটা উদয় হলো কোন্ জাহান্নাম থেকে?’ জানতে চাইল কনারস।

‘ঘরে ঢুকে দেখি ঘর আলো করে বসে আছে,’ জবাব দিল বিল।

‘চুরির মতলব নাকি?’

‘হতেও পারে।’

‘তা হলে শালাকে খতম করে দিলেই হয়?’

‘ওকে দিয়ে র‍্যাঞ্চ বিক্রির দলিলে সই করাবে বাবা।’

‘ওসব দলিল-ফলিল রাখো। বুড়োর কাছ থেকে পরে কিনে নিলেই হবে।’

‘কিন্তু এভাবেই বাবার ইচ্ছে,’ বলল বিল, ‘কেউ সন্দেহ করবে না।’

রবার্ট ওয়ারেন ঢুকলে তার দিকে তাকাল বিল। ‘লিঙা ঠিক আছে?’

‘অঘোরে ঘুমাচ্ছে,’ বলল ওয়ারেন। সামনে এসে কলিনের দিকে তাকাল সে।

সই দেবে?’

‘কখনও না!’

পিছিয়ে গেল ওয়ারেন, বলল, ‘প্যাটেন, কনারস, শোনো, টেরেন্স মিচেলকে

হত্যা করেছে ও, তোমরা মনের বাল মিটিয়ে ধোলাই দিতে পারো এবার ওকে, তবে দেখো, হাতদুটো যেন আস্ত থাকে, সকালে একটা দলিলে সহি দিতে হবে ওকে।’

সবুট লাথি হাঁকাল কনারস, পাঁজরে আঘাত অনুভব করল কলিন। আবার লাথি মারতে গেল সে, চট করে জুতোসুদ্ধ কনারসের পা জাপটে ধরল কলিন, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, ধরে থাকা পা একটু উচু করে সজোরে ঠেলে দিল সামনে। ছিটকে পেছনে চলে গেল কনারস, বেসামাল, আতঁনাদ বেরিয়ে এল তার গলা চিরে। প্যাটেনের মোকাবিলা করতে পাই করে ঘুরল এবার কলিন, পরমুহূর্তে একটা রাম ঘুসি খেলো চোয়ালে, তারপর পেটে, ভাঁজ হয়ে গেল ও। সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল কলিন, প্যাটেনকে নিয়ে মেঝে স্পর্শ করল।

পরক্ষণে গড়ান দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ও, বাউলি কেটে কনারসের ছুঁড়ে দেওয়া ঘুসি এড়াল, পাল্টা ঘুসি হাঁকাল তার মুখ লক্ষ্য করে, আবার। ওদিকে আবার উঠে পড়ল প্যাটেন, এগিয়ে এল কলিনের দিকে এবং মারপিটে অংশ নেবে ঠিক করল বিল ওয়ারেন।

একসঙ্গে কলিনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা তিনজন। ঘাড়ের পেছনে কোপ মারল যেন কেউ, দুই হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল ওর, আছড়ে পড়ল মাটিতে, কিন্তু অজান্তেই আবার উঠে দাঁড়াল। তাল হারিয়ে যাচ্ছে বারবার, অসম্ভব ভারি লাগছে হাতদুটো, তোলা যাচ্ছে না। তারপর এক সময় লুটিয়ে পড়ল আবার কলিন, উঠবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। এবার ওকে লাথি মারতে শুরু করল ওরা, লাগাতার; সেই সঙ্গে চলল অকথ্য গালিগালাজ। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল কলিনের। নিঃশ্বাস আটকে আসতে চাইছে, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে চোখের সামনে, কিন্তু তারপরও চেতনা হারাল না ও।

আবার ওয়ারেনের চিৎকার শোনা গেল। ‘বাস, যথেষ্ট হয়েছে! এবার থামো!’ কলিনের উদ্দেশ্যে আবার কথা বলল ওয়ারেন। ‘ফর্বস? শুনতে পাচ্ছে, ফর্বস?’

জবাব দিতে চাইল কলিন, কিন্তু কোন শব্দ বেরোল না ওর মুখ দিয়ে।

‘সই করবে, ফর্বস?’

মাথা নাড়ার চেষ্টা করল কলিন।

মুখ খিঁচি শুরু করল ওয়ারেন, একটু থেমে আবার বলল, ‘অ্যাই, ওকে বেঁধে ফেলো! সকাল পর্যন্ত থাকুক ওভাবে। প্যাটেন, তুমি ওকে পাহারা দেবে, সকালে জ্যাস্ত তুলে দেবে আমার হাতে, বুঝেছ?’

ওকে ওরা বেঁধে ফেলল, তারপর প্যাটেন ছাড়া অন্যরা বেরিয়ে গেল আস্তাবল থেকে। এতক্ষণ বাতাসে ওড়া ধুলো খিঁচিয়ে এল। আচমকা দপ করে নিভে গেল একটা লণ্ঠন। মাথা ঘুরছে কলিনের, বমি আসছে, চোখ বন্ধ করে অস্বস্তিভাব দূর করতে চাইল ও। প্রচণ্ড মারে পুরো শরীর থরথর করে কাঁপছে এখন, জ্বর আসবে বলে মনে হচ্ছে। সকালে আরও ভয়ঙ্কর নির্যাতনের মোকাবিলা করতে হবে, সহ্য করতে পারবে কী? হয়তো না।

‘প্যাটেন?’ কর্কশ কণ্ঠে ফিসফিস করে ডাকল ও। ‘প্যাটেন?’

‘চোপ রাও!’ বলল প্যাটেন, ‘আমি যদি উঠি, লাথি মেরে তোমার খোঁতা মুখ

ভোঁতা করে দেব! কেন জানতে চাও? তোমার নাম ফর্বস, সেজন্যে নয়, মিচেলকে খুন করেছ বলে। মিচেলের মত মানুষ হয় না!’

নীরব রইল কলিন।

‘হাসিখুশি মানুষ ছিল ও,’ বলে চলল প্যাটেন, ‘মিচেল থাকতে এক মুহূর্তের জন্যেও কেউ গোমড়া মুখে থাকেনি র‍্যাঞ্চ হাউসে, হাসির লহর বয়ে গেছে। খুব সুন্দর গীটার বাজাতে পারত ও, গানও জানত, আবার কাজের কোন খুঁত ছিল না ওর। নিজের কাজ কখনও ফেলে রাখত না। আর কাউকে যদি মারতে তুমি, আমরা এতটা দুঃখ পেতাম না, মিচেলের কথা কী বলব—’

একনাগাড়ে বকবক করে চলল প্যাটেন, ছ’ফুট দূরে একটা কাঠের বাস্তের উপর উবু হয়ে বসে রয়েছে। গালভর্তি তামাক, মুখের একপাশ ফুলে আছে তাই। পিক ফেলতে মাঝে মাঝে কথা থামাতে বাধ্য হচ্ছে সে। কিন্তু প্যাটেনের কথায় কান নেই কলিনের, চিন্তার ঝড় চলছে মাথায়। সকালে যদি ওয়ারেন ওর হাতে সই করিয়ে নিতে পারে, সাজিয়ে গুজিয়ে শহরে নিয়ে যাবে ওকে, আনুষ্ঠানিকভাবে বিক্রির ঝামেলা মিটিয়ে ফেলবে প্রথমে, তারপর কোন এক মিচেল অনুরাগী পিস্তল প্র্যাকটিস করবে ওর উপর। মোট কথা জিতবার কোন সম্ভাবনা নেই।

অনেক ভেবেও সমাধানের কোন পথ দেখল না কলিন। হঠাৎ একটা চাপা শব্দে চমকে উঠল ও। খেয়াল হলো এখন আর বকবক করছে না প্যাটেন। ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল কলিন।

প্যাটেনের আসনের কাছ থেকে সরে এল লিভা ওয়ারেন, ওর ডান হাতে এক টুকরো লাকড়ি, বাম হাতটা গলার কাছে তুলে রেখেছে। আস্তাবলের মেঝেয় মুখ খুবড়ে পড়ে আছে প্যাটেন, নিখর।

‘বেশি জোরে মেরে দিইনি তো!’ ফিসফিসিয়ে বলল লিভা। নাইট গাউনের উপর একটা লম্বা গাঢ় রঙের রোব চাপিয়েছে সে, ঘাড়ের উপর লুটিয়ে আছে দুটো বেণী। হাত থেকে লাকড়ির টুকরো ফেলে দিল লিভা।

‘জলদি পালাও!’ বলল সে, ‘ভোর হতে দেরি নেই! ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি!’

‘আমার ঘোড়াটা ক্রীকের ধারে রেখে এসেছি,’ বলল কলিন, ‘হাত পায়ের বাঁধনটা খুলে দিতে পারো?’

মাথা দোলাল লিভা, পা টিপে টিপে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল, একটা হারনেস নাইফ হাতে ফিরে এল আবার, কলিনের বাঁধন কেটে দিল দ্রুত। হাতটা কাপছে ওর, লক্ষ্য করল কলিন, ছুরিটা পড়ে গেছে মেঝেয়, প্যাটেনের দিকে তাকিয়ে আছে এখন।

উঠে বসল কলিন, তারপর হাঁটু ভেঙে দাঁড়াল; এক সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল শরীরের প্রতিটি পেশী। দাঁতে দাঁত চেপে সোজা হয়ে দাঁড়াল ও, ঘুরে উঠল মাথাটা, লিভা না ধরলে পড়েই যেত, ওকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল লিভা, তারপর বলল, ‘জলদি, কলিন, সকাল হয়ে এল বলে,’ ওকে সঙ্গে নিয়ে দরজার দিকে এগোল।

প্রচণ্ড অবসাদে ভেঙে পড়তে চাইছে কলিনের শরীর। চোখজোড়া একবার

বন্ধ করে আবার খুলল ও, উঠোনের ওপাশে ক্রীকের দিকে তাকাল। অন্ধকারে গাছপালার গাঢ় ছায়া ছাড়া কিছু বোঝা যায় না। দূরত্বটুকু পার হতে পারবে কিনা বুঝতে পারল না কলিন। হাঁটু কাঁপছে, ভারসাম্য বজায় রাখতে পারছে না। মাথা নাড়ল ও, বিড়বিড় করে উঠল, ‘লিভা বুঝছি না, আমি-’

‘কিন্তু কিছুতেই এখানে থাকা হবে না তোমার,’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল লিভা, ‘আমি তোমাকে ঘোড়ার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসছি।’

‘না, তুমি এখানে থাকো। আস্তাবলের মেঝে থেকে তোমার পায়ের ছাপ মুছে ফেলো।’

চট করে আস্তাবলে ঢুকে পড়ল লিভা। দরজার চৌকাঠে ভর দিয়ে দাঁড়াল কলিন, কিশিৎ স্বস্তি বোধ করল। একটু পরিষ্কার হয়ে এসেছে মাথাটা। ও পালিয়েছে টের পাওয়ামাত্র ধাওয়া করতে শুরু করবে ওয়ারেন রাইডাররা। ট্রেইল করে ক্রীকের তীরে ঘোড়া বেঁধে রাখবার জায়গা পর্যন্ত যেতে পারবে অনায়াসে, ওখান থেকে ওকে অনুসরণ করা আরও সহজ হবে। তবে ও শহরেই যাচ্ছে, এমন একটা ধারণা ওদের মনে জন্মাতে পারলে হয়তো ওরা ওকে অনুসরণ বাদ দিয়ে দ্রুত ওয়োগোনারে পৌঁছানোর জন্য সোজা রাস্তা ধরবে, অন্তত সে সম্ভাবনা আছে। অস্থির স্বভাবের লোক রবার্ট ওয়ারেন, ঝোঁকের মাথায় কাজ করে, সেখানেই ভরসা।

আবার বাইরে এল লিভা। ‘আমাকে কেউ সন্দেহ করবে না,’ বলল ফিসফিস করে।

‘কিন্তু কেউ একজন এসেছিল ঠিকই বুঝবে,’ বলল কলিন, ‘প্যাটেনের কপালে ইয়া বড় একটা আলু বানিয়ে দিয়েছ!’

‘ববের নতুন লোকগুলোর সঙ্গে ওর সম্পর্ক ভাল নয়, মনে করবে কাজটা ওদের কারও, আমার কথা মাথায় আসবে না।’

‘তা হলে জলদি ঘরে ফিরে যাও!’

‘আর তুমি?’

‘ঠিক নেই।’

‘বেসিনে থেকো না যেন, কলিন।’

হাসল কলিন। ‘আমার জন্যে অনেক করেছে তুমি, লিভা। ধন্যবাদ। ক্যানসাস সিটিতে যদি সত্যিই যেতে চাও, জানিয়ো, তোমাকে সাহায্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি।’

‘নিশ্চয়ই চাই। এই নরকবাস আর সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু টাকা পাব কোথায়?’

‘ভেবো না, একটা ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে।’

বাংক হাউসের দিকে তাকাল কলিন। অন্ধকারে ডুবে আছে, নীরব কোরালে কয়েকটা ঘোড়া দেখা যাচ্ছে, এদিকে তাকিয়ে আছে, যেন বুঝতে পেরেছে কিছু একটা হচ্ছে এখানে। আবার লিভার দিকে ফিরল ও। ‘আবারও ধন্যবাদ, লিভা’ বলে হাঁটতে শুরু করল।

মাতালের মত টলছে ও, এপাশ ওপাশ দুলছে, বেসামাল অবস্থা। আস্তাবলের কোণে এসে দড়াম করে পড়ল ও, উঠে দাঁড়াল, এলোপাতাড়ি পা ফেলে এগোল

আবার। ঘোড়ার কাছে পৌছবার আগে আরও দুবার পড়ল। তারপর কখন কীভাবে স্যাডলে উঠে বসেছে জানে না, ব্যথার তীব্র হামলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে চাইছে সারা শরীর, এখনি ফুলে উঠবে যেন, ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। রাস্তার দিকে মোড় নিল ও, ওয়্যাগোনারের দিকে মাইলখানেক এগিয়ে বাঁক নিয়ে উঁচু ঘাসের ভিতর দিয়ে ক্রীকের দিকে এগোল ফের, ফিরতি পথ ধরল, পানির ভিতর হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ঘোড়াটা।

কলিন যখন ওয়ারেন র‍্যাঞ্চার পাশ দিয়ে যাচ্ছে, ভোরের আলোর আভাস পূব আকাশে। এতক্ষণে বাবুর্চির উঠে পড়বার কথা, কিন্তু তাকে দেখতে পেল না ও, আর বড়জোর আধ ঘণ্টা, তারপরই জেগে উঠবে সবাই, সাথে সাথে জানবে কলিন উপাও। শুরু হবে মানুষ শিকার অভিযান।

ওর ভাগ্য যদি ভাল হয়, ওয়ারেন রাইডাররা ট্রেইল করে প্রথমে রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে তারপর সোজা শহরের পথ ধরবে। ও ফাঁকি দিয়েছে বুঝতে বুঝতে বিকেল হয়ে যাবে ওদের। পালানোর জন্যে যথেষ্ট সময় মিলবে। কিন্তু পালানোর কথা ভাবছে না ও—আপাতত।

ক্রীক বরাবর এগিয়ে চলল কলিন। এখনও বনবন ঘুরছে মাথাটা। যতবার সামনে পা ফেলছে ঘোড়া, সাথে সাথে ছলকে উঠছে মাথার রক্ত। কোন দিকে যাচ্ছে জানে না ও। একটা পরিকল্পনা খাড়া করা প্রয়োজন, জানে, কিন্তু পারছে না। সূর্য উঠছে আস্তে আস্তে। বেশ কিছু সময় এগোনের পর কলিন বুঝতে পারল ওয়ারেন র‍্যাঞ্চ থেকে অনেক উঁচুতে এসে পড়েছে ও, পাহাড়ের দিকে উঠে যাচ্ছে ঘোড়াটা। দূরে দেখা যাচ্ছে গাছে ছাওয়া পাহাড়চূড়া।

দুপুর নাগাদ ঘোড়া থামাল কলিন। ডান পাশে একটু দূরে পাহাড়ের মাঝখানে একটা র‍্যাঞ্চ। হেবার র‍্যাঞ্চ, যদি এখনও আগের মালিকানা বহাল থাকে। হঠাৎ রবার্ট ওয়ারেনের কথা মনে পড়ে গেল ওর। স্ট্যামপিড প্রসঙ্গে কথা বলবার সময় সে বলেছিল: ‘...সময় পেলে ডেনিস স্মিথের সঙ্গে আলাপ করো, জিজ্ঞেস করে দেখো ডেভিড স্পেস্টরকে; বেলিভা হেবারের র‍্যাঞ্চে পাওয়া যাবে ওকে। শেরিফের কাছে দেয়া ওদের জবানবন্দী জেঁনে নাও।’ ডাক্তার মারভিনের মুখেও ডেভিড স্পেস্টরের নাম উচ্চারিত হয়েছে, মেরির হাত ভাল না হলে ডেভিড স্পেস্টরকে দিয়ে খবর পাঠাতে বলেছিল সে বেলিন্ডাকে।

অনেক কষ্টে তথ্যগুলো সমন্বিত করবার চেষ্টা করল কলিন ফর্বস। বেলিভা, যাকে বেলিভা কার্লাইল নামে চিনত ও, সম্ভবত হেনরী হেবারকে বিয়ে করেছে এবং এখন হেবার র‍্যাঞ্চেই আছে। কিন্তু হেনরী হেবারের বদলে র‍্যাঞ্চটা বেলিভা হেবারের বলল কেন ওয়ারেন? হেনরীর কী হয়েছে?

প্রশ্নটা পরের জন্য তুলে রাখল কলিন। ডেভিড স্পেস্টর আছে হেবার র‍্যাঞ্চে, হয়তো স্ট্যামপিড সম্পর্কে অনেক কিছু তার জানা আছে। কোণাকুণিভাবে রাস্তার দিকে এগোল ও। হেবার র‍্যাঞ্চার পথ ধরল।

উঠোনে পৌছতে পৌছতে স্যাডলের উপর নুয়ে পড়ল কলিন, রাশ টেনে ঘোড়া থামাল, এপাশ ওপাশ দুলছে। কেউ একজন বেরিয়ে এল বারান্দায়। আস্তাবলের দরজায় এসে দাঁড়াল, তিনজন, দুজন লোক আর বার-তের বছর

বয়সী এক কিশোর।

সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করল কলিন, হাত বাড়িয়ে মাথার টপি স্পর্শ করল। ‘হ্যালো, বেলিভা,’ বলল ও, নামল স্যাডল থেকে। পা দুটো মাটি স্পর্শ করামাত্র হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, সটান চিত হয়ে পড়ে গেল ও। চিৎকার করে কী যেন বলে উঠল বেলিভা, ছুটে এসে ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল।

বিব্রত বোধ করল কলিন, বিড়বিড় করে বলল, ‘বেলিভা, আসলে আমি-’

‘পরে বোলো এসব,’ বলল বেলিভা। ‘ডেভিড, ওকে ঘরে নিয়ে এসো।’

টাককা খাবার আর কয়েক কাপ কড়া কফি পেটে পড়তেই অনেকটা চাঙা বোধ করল কলিন ফর্বস। রান্নাঘরের টেবিলে বসে আছে ও, সারাদিনে এই প্রথম স্থির বোধ করছে। যদিও পেশীগুলো এখনও অসাড়, দপদপ করছে মাথার ভিতর, মুখের একপাশ ফুলে আছে, কাঁধ নাড়লেই খোঁচা লাগছে পাঁজরে, চিনচিন করছে, একটা হাড় বোধ হয় ভেঙে গেছে। তারপরও আরাম লাগছে ওর।

উঠোন থেকে ফিরে এল ডেভিড স্পেস্টার, বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে গেছে এখন, চাপদাড়ি পেকে শাদা, চোখ দুটো কোটরে বসে গেছে, কৌচকানো চেহারা, মাথায় টাক।

‘বিকেলের আগেই এসে যাবে ওরা,’ বলল সে, ওয়ারেনের কথা বোঝাতে চাইল। ‘তোমার ঘোড়ার সামনের ডানপায়ের নাল খসে গেছে, ট্রেইল করা সহজ হবে। আমি হোসেকে বলেছি ওটাকে নিয়ে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে দক্ষিণে যেতে, ওখান থেকে স্টোনি রিভারের কাছে যাবে ও, ঘোড়াটা ছেড়ে দিয়ে ওয়্যাপোনারে চলে যাবে; কাল পরশু ওখানে যাচ্ছি আমি, আমার সঙ্গে ফিরে আসবে।’

‘ধন্যবাদ, ডেভিড,’ বলল কলিন।

‘এসব তোমার জন্যে করিনি আমি,’ বলল ডেভিড, কুঁচকে উঠল ওর চোখমুখ। বেলিভা বলল, ‘তাই। তা ছাড়া ওয়ারেনের সঙ্গে গোলমাল করার সাধ্য আমাদের নেই।’

ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকাল বেলিভা, চুলোর আগুনের আঁচে লাল হয়ে উঠেছে চেহারা। ওর পরনে লেভাই’স প্যান্ট, গায়ে শার্ট, হাতা গোটানো, বাদামী হাতদুটো দেখা যাচ্ছে; গভীর ওর চোখজোড়া, খাড়া নাক, কপট কাঠিন্য দুঠোটে।

‘হেনরি হলে একথাই বলত, ডেভ,’ বলল বেলিভা।

‘হয়তো,’ সায় দিল ডেভিড স্পেস্টার।

‘ডেভিড,’ বলল কলিন, ‘আমি কয়েকটা কথা জানতে চাই।’

‘কী ব্যাপারে?’

‘স্ট্যামপিড।’

‘ওই সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।’

‘কিন্তু ওয়ারেন তো বলল জানো।’

‘মিথ্যে বলেছে।’

‘শেরিফের কাছে নাকি তুমি জবানবন্দী দিয়েছ?’

এক পা থেকে অপর পায়ে শরীরের ভর বদল করল ডেভিড স্পেস্টার।

‘দিয়েছি। কিন্তু স্ট্যামপিড সম্পর্কে কিছুই বলিনি।’

‘তা হলে কী বলেছ?’

‘বলেছি স্ট্যামপিডের রাতে ক্লেব্যাংকসের দিক থেকে তোমার বাবা, এডি এবং আরও তিনজনকে আসতে দেখেছিলাম আমি, তখন মাঝরাত হবে-বাস।’

‘সত্যিই দেখেছিলে?’

‘আমি মিথ্যে বলিনি, ফর্বস।’

‘ওরা অন্য কোথাও থেকে আসেনি কীভাবে জানো?’

মাথা নাড়ল স্পেস্টর। ‘সম্ভব নয়। এখান থেকে ক্লেব্যাংকসের দূরত্ব কয়েক মাইলের বেশি না। তোমার বাবা, এডি আর তাদের তিন সঙ্গীকে যেখানে দেখি, জায়গাটা ক্লেব্যাংকসে যাবার পথেই পড়ে। শহর থেকে আসছিলাম আমি।’

‘ওরাই ওয়ারেনের গুরু স্ট্যামপিড করেছে বলতে চাও?’

‘অন্য কিছু হতে পারে না।’

এগিয়ে এল বেলিভা। ‘তোমার কী মনে হয়, কলিন?’

‘আমি বিশ্বাস করি না।’

‘কেন?’

‘স্ট্যামপিড করে লড়াই করার মানুষ বাবা নয়। বাবা অস্ত্র হাতে ওয়ারেনকে হত্যা করতে ছুটে গেছে বললে অবিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এই কথা মরে গেলেও বিশ্বাস করতে পারব না। ব্যাপারটা বাবার চরিত্রের সঙ্গে একদম খাপ খায় না।’

‘তোমার বাবা অস্বীকার করেনি, শুনেছে তো?’

‘শুনেছি। তবু ইচ্ছাকৃতভাবে ক্লেব্যাংকসের ওপর থেকে পনের শ’ গুরু স্ট্যামপিড করে মেরেছে বাবা, বিশ্বাস হয় না।’

‘মানুষ বদলায়, কলিন।’

‘তাই বলে এত?’

‘আট বছর দূরে ছিলে তুমি, আট বছর অনেক লম্বা সময়।’

দরজার দিকে ঘুরল ডেভিড স্পেস্টর। ‘আমার আর দরকার আছে, বেলিভা?’

‘না। ওয়ারেনরা আসে কি না খেয়াল রেখো,’ বলল বেলিভা। ‘ওরা এলে কী করতে হবে জানো তো? কলিন এসেছিল, কিন্তু চলে গেছে।’

‘ওয়ারেনকে শত্রু বানাতে চাই না আমি,’ অস্বস্তির সঙ্গে বলল স্পেস্টর। ‘র‍্যাঙ্কটা মাটিতে মিশিয়ে দেবে সে, দেশছাড়া করবে আমাদের!’

‘এটা আমাদের জায়গা,’ বলল বেলিভা, ‘আমাদের উৎখাত করার সাধ্য কারও নেই। মিস্টার ওয়ারেন আসছে দেখলে আমাকে জানিয়ো, যা বলার আমি বলব।’

বেলিভার কর্ণে ভর্ৎসনার সুর থাকলেও ডেভিড স্পেস্টর লক্ষ্য করেছে বলে মনে হলো না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

‘আরেকটু কফি দেব?’ জিজ্ঞেস করল বেলিভা।

মাথা দোলল কলিন। ‘মেরি কোথায়, দেখছি না যে?’

‘আস্তাবলে ওর একটা খেলাঘর আছে, এলেনার সঙ্গে ওখানে খেলছে।’

এলেনা হলো হোসের মা, ওর বাবা হয়ান মেরিনো এখানে চাকরি করত। তুমি হেনরীর কথা ভাবছ, না?’

কাপে কফি চালল বেলিন্ডা।

‘ই্যা,’ বলল কলিন। ‘হেনরীর কথা বলো।’

‘আজ থেকে তিনবছর আগে স্যাডল থেকে পড়ে মারা গেছে, ও মারা যাবার পর আমি হয়তো র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে দিতে পারতাম—এখনও পারি—কয়েক মাস আগে ওয়ারেন কেনার প্রস্তাবও দিয়েছে—কিন্তু শহরের চেয়ে এ জায়গাই আমার বেশি পছন্দ।’

‘হেনরীর কথা শুনে দুঃখ পেলাম,’ বলল কলিন।

হেনরীকে স্পষ্ট মনে আছে ওর। দীর্ঘদেহী সুদর্শন হেনরী ছিল ধীর স্থির, মৃদু ভাষী, বয়সে বেলিন্ডার চেয়ে দশ বছরের বড়।

‘ওর মৃত্যুর পর খুব কষ্ট গেছে আমাদের,’ বলল বেলিন্ডা, ‘পুরুষের মত ঘোড়া হাঁকানো আর ল্যাসো ছোঁড়া শিখতে হয়েছে আমাকে। এখনও খুব ভাল রকম আয়ত্ত করতে পারিনি, তবে ট্রেনার হিসেবে ডেভের জুড়ি নেই, ধৈর্যের সঙ্গে শেখানোর চেষ্টা করছে ও। কিন্তু আসল সমস্যা মেরিকে নিয়ে, ওকে একেবারেই সময় দিতে পারি না। আমার চেয়ে এলেনার সাথেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে ওর সম্পর্ক।’

‘আবার বিয়ে করলে না কেন?’

বিষণ্ন হাসি হাসল বেলিন্ডা। ‘এ-নিয়ে আমিও ভেবেছি, তবে খুব একটা গুরুত্ব দিইনি।’

বেলিন্ডার দিকে তাকাল কলিন। র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে শহরে চলে গেলে সহজেই ভাল একটা চাকরি যোগাড় করতে পারত মেয়েটা, ভাবল ও, করেনি, কেন? র‍্যাঞ্চিং মেয়েদের কাজ নয়। একাজে প্রয়োজনীয় শারীরিক ক্ষমতা খুব কম মেয়েরই থাকে।

হঠাৎ চুলোর কাছ থেকে সরে কলিনের দিকে এগিয়ে এল বেলিন্ডা।

‘আবার বেসিনে কেন ফিরলে, কলিন? তোমার বাবা সবাইকে বলে বেড়াত ওয়াইওমিংয়ে নাকি দারুণ একটা চাকরি করছ তুমি, কোন এক সিভিকিটের র‍্যাঞ্চ চালাও, তুমিই নাকি ওদের এক নম্বর লোক।’

‘ভাল লোকের অভাব নেই ওদের।’

‘কিন্তু তুমি ফিরলে কেন?’

‘শহরের কেউ একজন চিঠি লিখেছিল আমাকে, বাবা আর ভাইয়ের খবর দিয়ে বেসিন থেকে দূরে থাকতে বলেছে আমাকে। এ অবস্থায় আমার কী করণীয় ছিল বলে মনে করো?’

‘তার মানে প্রতিশোধ নিতে এসেছ। গোলমালটা জিইয়ে রাখতে চাও।’

বেলিন্ডার কণ্ঠে রাগের আভাস, ঠোঁটের হাসি মুছে গেছে।

‘ওয়ারেনের গরু স্ট্যামপিডের জন্যে বাবা আর এডি দায়ী—একথা আমি মানি না,’ গোঁয়ারের মত বলল কলিন।

‘কোন ভরসায় ওয়ারেনের সঙ্গে লাগতে চাইছ, বলবে?’

‘আমি কি তাই বলেছি? আমি কেবল এখানে কী ঘটেছে জানার চেষ্টা করছি।’
‘আচ্ছা, ধরো, জানা গেল তোমার বাবা আর এডিই স্ট্যামপিডের জন্যে দায়ী,
তা হলে?’

‘বলেছি তো, ওরা নির্দোষ!’

‘যদি দোষী হয়?’

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল কলিন। এভাবে চিন্তা করেনি ও। এখনও ভাবতে পারছে না। বেলিভার কথায় অস্বস্তিতে ছেয়ে গেল মন। একটু আগে মানুষ বদলে যাবার কথা বলছিল বেলিভা, বাবা আর এডি হয়তো সত্যি বদলে গিয়েছিল। আচ্ছা, যদি জানা যায় যে ওয়ারেনের গুরু বাবাই স্ট্যামপিড করেছে, তখন কী করবে ও? ভুরুজোড়া কঁচকে উঠল কলিনের।

দরজায় উঁকি দিল ডেভিড স্পেস্টর। ‘ওরা আসছে!’ জানাল সে।

‘মিস্টার ওয়ারেন আছে ওদের সাথে?’ জানতে চাইল বেলিভা।

‘বোঝা যাচ্ছে না।’

‘এলেনাকে বলে দাও, মেরিকে নিয়ে আস্তাবলেই থাকতে,’ বলল বেলিভা,
‘তুমিও যাও।’

উঠে দাঁড়াল কলিন, পা বাড়াল দরজার দিকে।

‘না, তুমি ভেতরেই থাকো,’ বলল বেলিভা, ‘আমি বিদায় করার ব্যবস্থা করছি ওদের।’

‘আমার জন্যে এত না করলেও পারতে,’ অস্বস্তির সঙ্গে বলল কলিন।

‘এখানে রক্ষাণের চেষ্টা না করলেও পারতাম,’ প্যান্ট-এ হাত মুছল বেলিভা। ‘কিন্তু অনেক সময় না করে উপায় থাকে না।’

দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে, বারান্দায় এসে অপেক্ষা করতে লাগল।

ছয়

সব মিলিয়ে জনা সাতেক ঘোড়সওয়ার হাজির হয়েছে উঠোনে, ওয়ারেন, লুইস প্যাটেন বা চাক কনারস নেই দলে, তবে বিল ওয়ারেন আছে, সে-ই নেতৃত্ব দিচ্ছে সম্ভবত। বারান্দার কাছে এসে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল সে, মাথা থেকে টুপি নামাল।

‘সুপ্রভাত, বেলিভা। চমৎকার লাগছে কিন্তু তোমাকে! মেরি কোথায়?’

‘এলেনার সঙ্গে,’ বলল বেলিভা।

‘মেরিনো আর ডেভিড স্পেস্টর?’

‘আছে কোথাও!’

‘আর কলিন ফর্বস?’

‘দেখতেই পাছ পাহাড়ের দিকে গেছে ওর ট্র্যাক,’ বলল বেলিভা।

ঘোড়সওয়ারদের একজনের উদ্দেশ্যে ইঙ্গিত করল বিল। 'জো, তুমি যাও, ট্রাক পরীক্ষা করে এসো।' একটু থামল সে, তারপর বেলিভার কাছে জানতে চাইল, 'এখানে এসেছিল কখন?'

'দুপুরের পর।'

'কোন হাঙ্গামা বাধায়নি তো?'

'নিজেকে কীভাবে রক্ষা করতে হয় আমি জানি, বিল।'

'কোথায় যাবে বলেছে?'

'না।'

'কিছু জানতে চায়নি?'

'চেয়েছে। স্ট্যামপিড সম্পর্কে কিছু জানি কিনা জিজ্ঞেস করেছে। বলেছি আমি জানি না। আসলেও জানি না।'

উত্তরে গিয়েছিল জো, ফিরে এল সে। 'বড়জোর দু'ঘণ্টা আগে রওনা হয়েছে।'

'ঠিক আছে, ধাওয়া করো,' নির্দেশ দিল বিল। 'আমি একটু পরে আসছি, তোমাদের ঠিক ধরে ফেলব।'

ঘোড়া হাঁকিয়ে উত্তরে চলল ঘোড়সওয়াররা, মুচকি মুচকি হাসছে কয়েকজন, বিল ওয়ারেন কেন রয়ে যাচ্ছে জানে।

হাসছে বিলও। 'কফি খেতে ডাকবে ভেবেছিলাম,' বেলিভার উদ্দেশে বলল সে।

'কোরালের বেড়ায় ঘোড়া বেঁধে এসো,' বলল বেলিভা, 'আমি কফি গরম করে নিই।'

ভিতরে এসে ভুরু কঁচকাল বেলিভা। 'তুমি ওঘরে চলে যাও, কলিন,' শোবার ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে বলল ও। 'যত যাই হোক বেরোবে না।'

'লুকিয়ে থাকা আমার দারুণ অপছন্দ,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল কলিন।

রাগে আড়ষ্ট হয়ে গেল বেলিভা। 'আমি কি তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি? শোবার ঘরে বাইরের লোককে ঢোকানো, বিল ওয়ারেনের কাছে মিথ্যে বলা—এসবও আমার অপছন্দ, ইচ্ছে না থাকলেও করতে হচ্ছে, উপায় নেই। এবার যাও, ওঘরে ঢুকে চুপ করে বসে থাকো।'

শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াল কলিন। দরজা খুলে ঢুকবার আগে আবার ঘাড় ফিরিয়ে বেলিভার দিকে তাকাল। 'আমি দুঃখিত, বেলিভা।'

চুলায় আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে বেলিভা, জবাব দিল না। বারান্দায় পায়ের আওয়াজ পেল কলিন, বিল আসছে। শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল ও, কিন্তু পুরোপুরি আটকাল না দরজা, সামান্য ফাঁক করে রাখল।

দরজার ওপাশে বিলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'কফির লোভে থামতেই হত, বেলিভা, পুরো বেসিনে তোমার কফির কোন জুড়ি নেই, ইচ্ছে করে প্রত্যেকদিন একবার এসে খেয়ে যাই।'

'ওদের নাগাল পেতে চাইলে তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে তোমাকে,' বলল বেলিভা।

‘বাদ দাও। ফর্বসকে আমরা ধরতে না পারলে সে নিজেই এসে ধরা দেবে।’

‘ওকে ধরা জরুরি নয় তা হলে?’

‘বাবার ধারণা সেরকমই। বাবা দ্রুত সবকিছু মিটমাট করতে চায়। অবশ্য আমিও চাই। ফর্বস ব্যাঞ্চ তোমার পছন্দ হবে, বেলিভা।’

‘এখানেই আমার ভাল লাগে,’ বলল বেলিভা।

নীরবে কাটল একমুহূর্ত, পাশের কামরায় কী ঘটছে দেখতে পাচ্ছে না কলিন। ও এতক্ষণ যেখানে বসেছিল বোধ হয় সেখানেই বসেছে বিল, অনুমান করল। ওকে কফি দিয়ে আবার চুলোর কাছে গেছে বেলিভা।

ঘাড় ফিরিয়ে শোবার ঘরে নজর বোলাল কলিন। একটা বিশাল খাট; ঘরে তৈরি ছোট্ট বিছানা, সম্ভবত মেরির; একটা বিরাট চেস্ট-অভ-ড্রয়ারস, বিছানার পাশে একটা টেবিল আর চেয়ার, টেবিলের উপর একটা ল্যাম্প-কামরায় আসবাবপত্র বলতে এই; অবশ্য চেস্ট-অভ-ড্রয়ারসের পাশে একটা প্রমাণ সাইজের আয়নাও রয়েছে। জানালার পর্দাগুলো মেঝে স্পর্শ করেছে। পরিষ্কার পরিছন্ন ঘর। বিছানাটা যেন ডাকছে ওকে, শুয়ে একটু বিশ্রাম নেবে কিনা ভাবল কলিন। বিছানায় ঘুমোয়নি কতদিন? দশ? পনের?

পাশের কামরা থেকে বেলিভার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। ‘বিল! থামো! কী হচ্ছে এসব। আমি-’

‘আহা! অমন কোরো না!’ বলল বিল, ‘কেন বোঝো না আমি তোমায় কতটা-’

চড় কষানোর প্রচণ্ড শব্দ পেল কলিন, হুটোপুটির আওয়াজ, তারপর রাগী কণ্ঠস্বর ভেসে এল বিলের। ‘ধুশ্ শালা! তোমাকে উচিত শিক্ষা দেব আমি, বেলিভা! আমি-’

না দেখলেও পাশের কামরায় কী ঘটছে আঁচ করতে পারল কলিন। আর দেরি করা ঠিক হবে না, এক ঝটকায় দরজা খুলে বিল আর বেলিভার দিকে দৌড়ে গেল ও। টেবিলের কাছে ওরা, বিলের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছে বেলিভা। ওকে দেখেই বেলিভাকে ঠেলে সরিয়ে দিল বিল, চট করে হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে।

বেসামাল ছিল বিল, ট্রিগারে টিপ দিতে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে ফেলল। মেঝেয় বিধল গুলিটা। মাথা নিচু করে ছুটে গেল কলিন। দ্বিতীয়বার গুলি করবার ফুরসত পেল না বিল। সজোরে ঘুসি হাকাল কলিন ওর মুখ লক্ষ্য করে, পরের ঘুসিটা লাগল তার মুখের একপাশে।

টলমল পায়ে পিছিয়ে গেল বিল, চিত হয়ে প্রথমে টেবিলের উপর পড়ল, তারপর গড়িয়ে মেঝেতে। উঠে দাঁড়ানোর কোন চেষ্টা করল না, পড়ে রইল স্থির, উদ্ভ্রান্তের দৃষ্টি দুই চোখে।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে নিজেকে সামলে নিল বেলিভা, হাতের পিঠে মুখ মুছল, তারপর এগিয়ে এল সামনে, মোটেও ভীত মনে হচ্ছে না ওকে। বিলের পাশে মুহূর্তের জন্য হাঁটু গেড়ে বসে আবার উঠে দাঁড়াল।

‘ওঘর থেকে বের হতে কে বলেছে তোমাকে?’ কৈফিয়ত দাবী করল ও।
‘বিলের মত লোকদের কীভাবে সামলাতে হয় জানি না ভেবেছ? এখন আমি কী
করব বলো দেখি?’

‘চ্যাঙদোলা করে বাইরে ছুঁড়ে দাও হারামীটাকে,’ বলল কলিন।

‘এবং তারপর ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ওয়ারেনকে জানিয়ে আসি আমি
তোমাকে আমার শোবার ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলাম, না? ব্যাপারটা জটিল করে
ফেলেছ তুমি।’

উর্ধ্বশ্বাসে আস্তাবল থেকে ছুটে এল ডেভিড স্পেস্টার, হাতে উদ্যত পিস্তল।
বিল আর কলিন হয়ে বেলিভার দিকে গেল তার দৃষ্টি।

‘ওর ঘোড়া নিয়ে এসো,’ বলল কলিন।

মাটিতে পা ঠুকল বেলিভা। ‘এটা আমার বাড়ি, নির্দেশটা আমার মুখ থেকে
বেরোলে মানানসই হত না? মিস্টার ফর্বসকেও একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করে
দাও।’

বিল ওয়ারেনের পিস্তলটা তুলে নিয়ে গুলি বের করে টেবিলের উপর রাখল
কলিন। দ্বিধাগ্রস্ত ও। বেলিভা বিল ওয়ারেনের প্রতি দুর্বল নয় তো? একটু আগে
বিলের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছিল অথচ পরমুহূর্তে ভোল পাল্টে ফেলল, উল্টে খেপে
উঠল ওর উপর!

উঠোনে ফিরে গেছে ডেভিড স্পেস্টার। পিটপিট করে তাকাল বিল, গুঙিয়ে
উঠল, উঠে বসল সাবধানে, হাত তুলে ফুলে ওঠা মুখ স্পর্শ করল।

‘আজকের কথা আমার মনে থাকবে, ফর্বস,’ ভারি গলায় বলল সে।

‘তাই রেখো,’ বলল কলিন।

‘তোমার কথাও আমি ভুলব না!’ কটমট করে বেলিভার দিকে তাকাল বিল।
‘উত্তরে গেছে ফর্বস, না? উত্তরে মানে সোজা শোবার ঘরে!’

রাগে লাল হয়ে উঠল বেলিভার চেহারা, জবাব দিতে গিয়েও বিরত রইল, চট
করে এগিয়ে গেল জানালার কাছে, তাকিয়ে রইল উঠোনের দিকে।

টেবিলের সঙ্গে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল বিল, সঙ্গে সঙ্গে চোখ গেল পিস্তলের
দিকে, হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ওটা।

‘ওটার বিষদাঁত আমি তুলে নিয়েছি,’ বলল কলিন। ‘এখান থেকে বিদেয়
হওয়ার আগে লোড করার চেষ্টা করো না।’

পিস্তলটা হোলস্টারে ঢোকাল বিল। আবার যখন আমাদের দেখা হবে, এটা
লোডেড থাকবে, মনে রেখো।’

লম্বায় কলিনের সমানই হবে বিল, তবে ওজন অন্তত পঞ্চাশ পাউন্ড বেশি;
চওড়া কাঁধ ওর, শক্তিশালী লম্বা দুটো হাত। মুখের বামপাশটা ফুলে আছে ওর,
কালসিটে দাগ পড়ে গেছে বাম চোখে। এই মুহূর্তে দুর্বল বোধ করছে ছেলেটা,
সন্দেহ নেই, কিন্তু চেহারায় ছাপ পড়তে দেয়নি।

মহুর পদক্ষেপে দরজার দিকে এগোল বিল, বেরিয়ে যাবার আগে একবার
থেমে বলল, ‘কাল সকালে আবার আমি আসতে পারি, বেলিভা।’

‘অহেতুক কষ্ট করতে যেয়ো না,’ জবাব দিল বেলিভা।

সামনে পা বাড়াল কলিন। 'দাঁড়াও। আমিও যাচ্ছি তোমার সাথে।' চরকির মত ঘুরে ওর মুখোমুখি হলো বেলিন্ডা, কিন্তু ওর দিকে তাকাল না কলিন, বিলের দিকে তাকিয়ে রইল।

'আমার পিঠে গুলি করার জন্যে?' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল বিল।

'দেখতেই পাচ্ছ আমি নিরস্ত্র,' বলল কলিন, 'তোমার পিস্তলেও গুলি নেই।' বিলের চোখ কৃষ্ণিত হলো, ভাবছে। 'ঠিক আছে, ফর্বস। তোমার সঙ্গে যাব আমি—কয়েক মাইল।'

একপা এগিয়ে এল বেলিন্ডা। 'তুমি যাবে না—'

'আমাদের জন্যে ভেবো না,' বলল কলিন, 'ও, হ্যাঁ, খাবার আর বিশ্রামের সুযোগ দিয়েছ বলে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

বিল ওয়ারেনের পেছন পেছন বেরিয়ে এল কলিন। ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাচ্ছে ডেভিড স্পেস্টার, একসঙ্গে সেদিকে এগোল ওরা। আড়চোখে বারবার কলিনের দিকে তাকাচ্ছে বিল।

'তোমার মতলবটা কী, ফর্বস? কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'স্মিথ র‍্যাঞ্জে।'

'কেন?'

'স্ট্যামপিড সম্পর্কে কিছু জানে কিনা দেখতে।'

'ও কী বলবে আমার কাছে শুনে নাও।'

'কী?'

'তোমার বাবাই ওই ঘটনার হোতা।'

'বিশ্বাস করি না!'

কাঁধ ঝাঁকাল বিল ওয়ারেন। 'বিশ্বাস অবিশ্বাস তোমার মর্জি, ফর্বস। কিন্তু যাকে জিজ্ঞেস করবে একই কথা বলবে সবাই—এটাই সত্যি।'

দক্ষিণ পুবে এগিয়ে চলল ওরা। ঘোড়া চালাতে কষ্ট হচ্ছে কলিনের। এখনও দপদপ করছে মাথা, খোঁচা লাগছে পাজরে।

বেলিন্ডার র‍্যাঞ্জের কয়েক মাইল দূরে আসবার পর ঘোড়া থামাল কলিন, পাইপে তামাক ভরে জ্বালল। কাগজ তামাক বের করে সিগারেট বানাল বিল।

'তোমার সাথে এভাবে যাওয়া পাগলামি ঠেকছে আমার কাছে,' অস্বস্তির সঙ্গে বলল বিল। 'ইচ্ছে করলে পিস্তলের এক বাড়িতে তোমাকে বেহুশ করে ফেলে রেখে যেতে পারতাম, কিন্তু করিনি, কেন জানো?'

'কারণ তার আগে আমার সঙ্গে লড়াই করতে হত তোমায়,' জবাব দিল কলিন, 'পিস্তল দিয়েও সুবিধে করতে পারতে না।'

'চেষ্টা করতে তো ক্ষতি ছিল না।'

'বাদ দাও, তারচেয়ে কয়েকটা কাজের কথা বলা যাক।'

'কী কথা?'

'ফর্বস র‍্যাঞ্জ, ওটা আমি কোনদিনই বিক্রি করব না, বিল।'

'মরা মানুষের ইচ্ছে অনিচ্ছের দাম নেই।'

'কিন্তু আমি এখনও বেঁচে।'

‘তবে মরবে।’

‘তার আগে র‍্যাঞ্চটা যাতে তোমরা না পেতে পারো তার ব্যবস্থা করব।’

‘কীভাবে?’

‘বুলেট দিয়ে। আমরা বেলিভার র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমার সাথে পিস্তল ছিল না, পাব ভাবিওনি, কিন্তু ঘোড়াটা ধার করা হলেও এটা আমার নিজের স্যাডল, স্যাডলব্যাগে অতিরিক্ত একটা পিস্তল আছে। অবশ্য তুমি পিস্তলে গুলি ভরার আগে ওটা বের করা সম্ভব নাও হতে পারে। ঝুঁকি নিতে চাও, বিল, এখুনি ফয়সালা করবে?’

মুহূর্তের জন্য অনড় রইল বিল ওয়ারেন, গোলাপী হলো তার চেহারা, ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। সহসা পিস্তল বের করে আনল সে, দ্রুত ‘ভাঁজ’ করল ওটা, বেল্ট থেকে বুলেট তুলে লোড করতে শুরু করল।

চট করে একপাশে বেকে সামনে ঝুঁকে স্যাডলব্যাগে হাত ঢালাল কলিন। অতিরিক্ত পিস্তলটা জায়গামত না থাকলে ওর আয়ু আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু না, আছে। তুলে নিল ও পিস্তলটা, তাক করল বিল ওয়ারেনের দিকে।

গুলি ভরবার জন্য পিস্তল ‘ভাঁজ’ করেছিল বিল, কয়েকটা গুলি ভরেওছে, এখন ওটা সোজা করলেই হয়, কিন্তু পারছে না সে, হাত কাঁপতে শুরু করেছে, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে কপালে।

গলা চিরে তীক্ষ্ণ আতর্নাদ বেরিয়ে এল তার। ‘আমাকে কোন সুযোগ দাওনি তুমি। তুমি-’

‘পিস্তল সোজা করে নাও,’ বলল কলিন। ‘আমি অপেক্ষা করছি।’

জিভ দিয়ে ঠোট ভেজাল বিল ওয়ারেন, কাঁপা কাঁপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিল। সঠিক সময় বেছে নেয়ার চেষ্টা করছে-সে, পরিষ্কার বুঝতে পারল কলিন।

‘আমি অপেক্ষা করছি,’ হাসল কলিন, ‘আর বেশি সময় দিতে পারব না।’

কী যেন বলতে চাইল বিল ওয়ারেন, পারল না, কেঁপে উঠল তার পুরো শরীর, হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল, হাঁটুতে একবার বাড়ি খেয়ে মাটি স্পর্শ করল। মাথা নামিয়ে ওটার দিকে তাকাল সে, পরমুহূর্তে হ্যাঁচকা টান লাগাল লাগামে, সাঁই করে ঘুরল ঘোড়াটা, ঝড়ের বেগে ছুটল সামনে, স্যাডলের উপর ঝুঁকে পড়ল বিল।

বিল দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল কলিন। এই ঘটনার কথা কোনদিন মুছবে না বিলের স্মৃতি থেকে, এই অপমান ছোকরার পাওনা ছিল। বড় বড় বুলি কপচাচ্ছিল, বেলিভার ওখানে পিস্তল ছুঁড়তে গিয়েছিল সে, অথচ তখন নিরস্ত্র ছিল কলিন। এ ধরনের লোকগুলোকে তাদের আসল চেহারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া দরকার।

স্যাডল থেকে নামল কলিন, মাটি থেকে বিলের ফেলে যাওয়া কোল্টসটা তুলে নিল, তারপর আবার ঘোড়া ছোটাল। শেষ বিকেলে স্থির র‍্যাঞ্চে পৌঁছুল ও। কিন্তু কাউকে পাওয়া গেল না ওখানে। স্থিথের অপেক্ষায় বসে থাকা ঠিক হবে না, ভাবল কলিন। কারণ বিল ওয়ারেন জানে, এখানে আসছে ও, র‍্যাঞ্চ থেকে দলবল নিয়ে আবার ফিরে আসতে পারে।

স্টোনি রিভার যেখানে পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে, স্মিথ র‍্যাঞ্চ থেকে জায়গাটা এক ঘণ্টার পথ, সেদিকে এগোল কলিন। স্মিথের সঙ্গে দেখা করা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। শেরিফের সঙ্গে আলাপ করতে হবে ওকে, হেলারের সঙ্গেও আবার দেখা করা দরকার। কিন্তু তারপর? বেসিনে ওর আসল অবস্থান কী? এই মুহূর্তে রবার্ট ওয়ারেন খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে। এই নির্জন প্রান্তরে বাগে পেল দফারফা করে ছাড়বে। কিন্তু শহরে কেমন হতে পারে তার আচরণ? অন্যরকম অবশ্যই। দেখাই যাক না।

সাত

মাকরাতের দিকে ওয়্যাগোনারে পৌঁছল কলিন ফর্বস। অন্ধকারে ডুবে আছে হেলারের বাড়ি, সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে অ্যাটর্নি। বড় রাস্তায় হিচ রেইলে আট-দশটা ঘোড়া দেখতে পেল কলিন। তিনটে স্যালুনের দুটো এখনও সরগরম, বাতি জ্বলছে হোটেলে, শেরিফের অফিসে।

হঠাৎ কারও নজরে পড়বে না এমন একটা জায়গা বেছে ঘোড়া বেঁধে রাখল ও, তারপর স্যালুনগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে শেরিফের অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল। ঠিক সময়েই এসেছে, অফিস বন্ধ করে ঘরে ফিরবার তোড়জোড় করছে শেরিফ আরচার। ফাইল ইত্যাদি সাজিয়ে রাখছে যথাস্থানে।

‘এক মিনিট সময় পাওয়া যাবে?’ চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল কলিন।

চোখ কুঁচকে মাথা তুলে তাকাল আরচার, শাদামাঠা চেহারা, তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই, মাকবয়সী, জুলফির কাছে পাক ধরেছে চুলে; রোদে পোড়া তামাটে একটা ছাপ চোখে মুখে, হালকা নীলের ছোঁয়া চোখের তারায়; দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাকে ঠিক ঝজু বলা যাবে না। কলিনকে প্রথমে চিনতে পারল না সে, আরও কুঁচকে উঠল তার চোখজোড়া।

‘আমার নাম ফর্বস,’ ভিতরে ঢুকে দরজা আটকাতে আটকাতে বলল কলিন।

‘ফর্বস!’ বার কয় চোখ পিটপিট করল শেরিফ। ‘কলিন! ওখানে তোমার চেহারা ভাল করে দেখতে পাইনি। আমি—’

থেমে গেল শেরিফ। কীভাবে ওকে গ্রহণ করা উচিত স্থির করতে পারছে না সে, বুঝতে পারল কলিন। হঠাৎ যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে লোকটা।

‘গতকাল বেসিনে আসার পথে ছোট্ট একটা ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম আমি,’ বলল কলিন, ‘তাই ভাবলাম তোমার যদি কোন প্রশ্ন থাকে—’

মাথা দোলাল আরচার। ‘রেডফিল্ড সব বলেছে আমাদের, তবু তুমি আসায় খুশি হলাম। সত্যি বিশ্রী একটা ব্যাপার হয়ে গেল।’

‘ও-ই আগে পিস্তল বের করে,’ বলল কলিন।

‘চার্লস বলেছে। ব্যাপারটা একটু দুর্বোধ্যই বটে। লোক হিসেবে খারাপ ছিল না মিচেল, ওয়ারেন রাইডারদের মধ্যে ওর বেশ কদর ছিল।’

‘সেটা আমি টের পেয়েছি,’ শুকনো কণ্ঠে বলল ফর্বস।

‘এর ফলে ঝামেলা আরও বাড়তে পারে,’ সতর্ক করল শেরিফ, ‘সেখানেই ভয়। বিকেলে ওয়ারেনের সঙ্গে এ-ব্যাপারে কথা হয়েছে আমার। ও বলেছে মিচেলের বন্ধুদের বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, যদিও কোন নিশ্চয়তা দিতে পারেনি।’

‘ওয়ারেন তার কথা রাখবে?’

‘রাখবে না কেন?’

‘আমার মনে হয় না।’

‘কেন?’

‘মিচেলের বদলা নেবার জন্যে ওরা আমাকে মারতে পারলেই বরং তার সুবিধে, ফর্বস র‍্যাঞ্চে দখল করতে কষ্ট হবে না।’

ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ল শেরিফ আরচার। ‘কলিন, ঝামেলা করার মতলবে যদি বেসিনে এসে থাকো তোমার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া কিছু করার নেই আমার। আমার পরামর্শ শোনো, দয়া করে অযথা গোলমাল করতে যেয়ো না। যদি ভেবে থাকো ওয়ারেন বা ওর কোন লোক তোমার বাবা আর ভাইয়ের মৃত্যুর জন্যে দায়ী, ভুল করছ। সেদিন শেরিফের পাসি গিয়েছিল ফর্বস র‍্যাঞ্চে, আমি নিজে নেতৃত্বে ছিলাম। রবার্ট ওয়ারেনের লোক ছাড়াও আরও অনেকে ছিল সেদিন পাসিতে।’

এ-ধরনের তথ্যই খুঁজছে কলিন। শেরিফের ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল ও।

‘সেদিন ঠিক কী ঘটেছিল খুলে বলো তো আমাকে।’

‘বলার মত তেমন কিছু নেই। তোমার বাবার র‍্যাঞ্চে যেদিন গেলাম, বিষ্যুদ্বার ছিল, রাত, স্ট্যামপিডের দু’রাত পর। সন্ধ্যার দিকে এখান থেকে রওনা হই, জনতা আমাদের আগেই পৌঁছে গিয়েছিল, র‍্যাঞ্চে পৌঁছানোর পর তোমার বাবাকে বেরিয়ে আসতে বললাম আমি, এল না, বরং ঘরের ভেতর থেকে আমাকে হুকুম করল দূর হয়ে যেতে। আমরা ওর নির্দেশ আত্মহা করলাম, ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ওরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করল আমাদের দিকে। পাঁচটা গুলি চালাতে বাধ্য হলো প্যাসি। সম্ভবত মিনিট বিশেক স্থায়ী হয় সংঘর্ষ। তারপর তোমাদের রাইডাররা যখন আত্মসমর্পণ করল, এডিসহ তিনজন মারা গেছে, মারাত্মকভাবে আহত তোমার বাবা, প্যাসিরও চারজন সদস্য আহত হয় লড়াইতে।’

‘ওয়ারেন রাইডার বাদে আর কারা ছিল পাসিতে?’

‘ডেনিস স্মিথ, লেম ম্যুসেলমান, ডার্ক পিট, রবার্ট কায়—এরা গিয়েছিল শহর থেকে, জ্যাক ফ্লেনারিও ছিল, ছিল আরও কয়েকজন। ওরা সবাই তোমার বাবাকে নির্দেশ দিতে শুনেছে। এসব আমি বানিয়ে বলছি না, কলিন, প্রত্যেকটা শব্দ নির্মম সত্য। আসল কথায় আসি এবার, তোমার বাবার সঙ্গে রবার্ট ওয়ারেনের বৈরিতা ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে তার মৃত্যুর জন্যে কিছুতেই ওয়ারেনকে দায়ী করা যাবে না। ফিউড চালানোর জন্যে যদি ফিরে এসে থাকো, ভুলে যাও।’

এক পা থেকে অন্য পায়ে শরীরের ভর বদল করল কলিন ফর্বস।

‘ওয়ারেন এখন ফর্বস র‍্যাঞ্চ কিনতে চাইছে, এটার কী ব্যাখ্যা দেবে তুমি?’

‘বাস্তববাদী লোক সে, কলিন, তাই ভবিষ্যতের কথা ভেবে ছেলের জন্যে একটা জায়গা কিনতে চাইছে। তুমি যখন ওয়াশিংটনে চমৎকার একটা চাকরি করছ স্বভাবতই র‍্যাঞ্চটা বিক্রি করে দেবে, ওয়ারেন যদি কিনতে চায় দোষ কী? বেসিনে কেনার মত আর কোন র‍্যাঞ্চ তো নেই।’

‘কিন্তু র‍্যাঞ্চটা যদি নিজে চালাতে চাই আমি?’

‘তা হলে ওয়ারেন নিশ্চয়ই বাধা দেবে না।’

নির্বোধ, ভাবল কলিন, কাল রাতে ওয়ারেনের আস্তাবলে হাজির থাকলে টের পেতে!

‘একটা কথা বলি,’ খেই ধরল আরচার, ‘তোমার বাবার সঙ্গে বিরোধ ছিল তাই ওয়ারেন তোমারও শত্রু, এ-ধারণা মুছে ফেলো মন থেকে। প্রত্যেকটা মানুষের একটা আলাদা পরিচয় থাকা দরকার, কলিন, অন্যের ছায়ায় বড় হওয়া যায় না।’

‘স্ট্যামপিড প্রসঙ্গে ফিরে আসি,’ বলল কলিন, ‘বাবাই ওই ঘটনার জন্যে দায়ী জানলে কীভাবে?’

‘অকাটা প্রমাণ পেয়েছি মাত্র সেদিন-হ্যারল্ড লেভিটের জীবনবন্দী-তবে আগেই এগোনোর মত যথেষ্ট তথ্য পেয়ে যাই আমি। সেরাতে যারা ওয়ারেনের গুরু পাহারায় ছিল তোমার বাবা জোর করে ওদের তড়িয়ে দেয়, ওদের একজন ড্যানিয়েলদের স্ট্যামপিড শুরু করতে দেখেছে, তারপর ভোররাতের দিকে ফর্বস ক্রুদের ওদের যেতে দেখেছে বলে জানিয়েছে ডেনিস স্মিথ এবং শেষরাতে ওদের ফিরতে দেখেছে ডেভিড স্পেস্টার। আমরা ফর্বস র‍্যাঞ্চে গিয়ে জিজ্ঞেসও করেছিলাম তোমার বাবাকে, একটা কথাও অস্বীকার করেনি, উল্টো আমাদের হুকুম দিয়েছে র‍্যাঞ্চ ত্যাগ করতে।’

‘হ্যারল্ড লেভিটের কথা বললে না? ওর কথা আমার মনে আছে। আমাদের র‍্যাঞ্চে কাজ করত।’

‘স্ট্যামপিডের রাতে সেও ছিল তোমার বাবার সঙ্গে। কথা বলবে তার সাথে? হাজতেই আছে। গোলমাল থামার পর ওয়ারেন ফর্বস রাইডারদের মধ্যে যারা স্ট্যামপিডে অংশ নিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নেয়, তোমার বাবার নির্দেশে ওরা কাজটা করতে বাধ্য হয়েছে, এই যুক্তিতে বোধ হয়। বেসিন ছেড়ে চলে যাবে, এই শর্তে ছেড়ে দেয়া হয় ওদের, চলেও গিয়েছিল, কিন্তু হ্যারল্ড আবার ফিরে এসেছে। কেন, আমি তা বুঝি। ওর একটা মেয়ে আছে এখানে, স্বামীর সঙ্গে বেচারির বনিবনা নেই, মেয়েটার জন্যে সে চিন্তিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। ওয়ারেনের কয়েকজন রাইডারের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসেছিল, আমি বাধা না দিলে ব্যাপারটা গোলাগুলি পর্যন্ত গড়াতে পারত। কথা বলবে ওর সাথে?’

মাথা দুলিয়ে সাই দিল কলিন।

শেরিফের অফিসের পেছনেই জেলখানা। পকেট থেকে চাবি বের করে

বাইরের কাঠের দরজাটা খুলল আরচার, কিন্তু আটকানো রইল ভিতরের লোহার গরাদের দরজা। চড়া গলায় ডাকল সে, ‘হ্যারল্ড, জেগে আছ?’

‘এই নরকে মানুষ ঘুমাতে পারে? নিশ্চয়ই জেগে আছি!’

‘এদিকে এসো,’ বলল আরচার।

দরজার কাছে এগিয়ে এল হ্যারল্ড, ছিপছিপে গড়ন ওর, সামান্য কুঁজো। মুখ তুলে প্রথমে আরচার তারপর কলিনের দিকে তাকাল সে, চোখজোড়া বিস্ফারিত হলো তার।

‘হাউডি, কলিন! দারুণ শরীর বানিয়েছ দেখছি এই ক’বছরে!’

‘ও কিছু না,’ বলল কলিন। ‘তোমার কী অবস্থা, হ্যারল্ড?’

‘খারাপ, জলদি আমাকে এই গর্ত থেকে বের করার ব্যবস্থা করো,’ বলল হ্যারল্ড।

‘চেষ্টা করব,’ আশ্বাস দিল কলিন, ‘এখন একটা কাজ করো, স্ট্যামপিড সম্পর্কে বলো আমাকে।’

কাঁধ ঝাঁকাল হ্যারল্ড। ‘ওটা একটা স্ট্যামপিডই ছিল, আর কী বলব?’

‘শুরু করেছিল কে?’

‘আমরা। আমি, তোমার বাবা, এডি, টেরি জেলারম্যান, টমাস টম্পসন আর শেরিডান।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কলিন। ‘ঠিক করে বলো, হ্যারল্ড, তোমরা দলবেঁধে ওয়ারেনের র‍্যাঞ্জে গিয়ে ওর গরু ছত্রভঙ্গ করে হত্যা করেছ?’

‘ঠিক তাই, কলিন।’

‘স্ট্যামপিডের উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়েছিলে?’

‘সত্য গোপন করে লাভ নেই, হ্যাঁ।’

‘কত বড় ছিল পালটা?’

‘অনেক বড়, পরে শুনেছি পনের শ’য়ের মত গরু ছিল, আমারও তাই ধারণা।’

ভুরু কঁচকাল হ্যারল্ড লেভিট, হাতের পিঠে মুখ মুছল। ‘জ্যোৎস্না রাত ছিল। ওয়ারেনের দুই রাইডার পাহারায় ছিল ওখানে, প্রথমে ওদের তাড়িয়ে দিলাম আমরা, তারপর এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে আর চিৎকার করে তেড়ে গেলাম গরুর পালের দিকে, মশাল ছিল আমাদের কাছে, আগুনের নাচ দেখে রীতিমত ভড়কে যায় জানোয়ারগুলো, অনেক সময় এমনিতে অস্থির হয়ে থাকে গরুবাছুর, সামান্য কারণেই ছুটোছুটি শুরু করে, এবারও তাই হলো, যেদিকে চাইছিলাম সেদিকেই ছুটতে লাগল ওরা, বেড়া ভেঙে ক্লেব্যাংকসের ওপর থেকে ঝুপঝাপ নীচে পড়তে শুরু করল, জানো তো, ক্যানিয়নের দেয়াল ওখানে কী রকম খাড়া, পতনের আওয়াজ পাইনি আমরা, পরে শুনেছি একটানা দশদিন নাকি পাওয়া গেছে পচা গন্ধ—’

চুপ করে গেল সে, কাঁধ ঝাঁকাল, পকেট থেকে পাইপ বের করে জ্বালল।

ঘুরে দাঁড়াল কলিন, দুহাত মুঠি পাকাল। রীতিমত অসুস্থ বোধ করছে। বিশ্বাস করতে মন চায় না, কিন্তু অবিশ্বাসই বা করে কীভাবে? হ্যারল্ড কেন মিথ্যে

বলতে যাবে? তা ছাড়া ওর বক্তব্য সাক্ষীদের জবানবন্দীর সাথে মিলে যায়।
হ্যারল্ড নিজেই ছিল স্ট্যামপিডে!

ড্যানিয়েল ফর্বস ওয়ারেনের গুরু স্ট্যামপিড করেছে—এটাই সত্যি!

এখন কী করবে ও? বাবা অপরাধী ছিল মেনে নেবে? তাছাড়া...।

‘যথেষ্ট হয়েছে, হ্যারল্ড,’ বলল আরচার, জেলের দরজা আটকানোর উপক্রম করল।

‘আমাকে ছেড়ে দাও,’ বলল হ্যারল্ড।

‘সকালে দেখা যাবে।’

দরজা বন্ধ করে তালা আটকাল আরচার, তারপর ডেস্কের কাছে এসে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। ‘তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি, কলিন,’ নিচু গলায় বলল সে। ‘প্রথম শোনবার পর আমিও বিশ্বাস করতে পারিনি। তোমার বাবা সংস্পষ্টবাদী মানুষ ছিল, কখনও বেআইনী কিছু করতে দেখিনি। ওয়ারেনকে ও পছন্দ করত না, সেটা সবাই জানত, কিন্তু সেজন্যে সে ওয়ারেনের কোন অনিষ্ট করেনি—মানে স্ট্যামপিডের আগ পর্যন্ত। ইচ্ছা সে এভাবে বদলে গেল কেন খোঁদা জানেন।’

‘সব শুনে মনে হচ্ছে স্ট্যামপিডের ব্যাপারটা,’ বলল কলিন, ‘বাবা গোপন করার চেষ্টা করেনি অপরাধ, এবং যদি অপরাধ হয়ে থাকে, অস্বীকার করেনি।’

‘ঠিক।’

‘কিন্তু আর কিছুই মেলাতে পারছি না।’

‘না মিললেও এসব সত্যি।’

অস্পষ্টভাবে মাথা দোলাল কলিন। দরজার দিকে পা বাড়াল ও, কিন্তু শেরিফের ডাকে থামতে হলো।

‘কেন্থায় যাচ্ছ?’ জানতে চাইল আরচার, ‘ইচ্ছে করলে আজ রাতে আমাদের সঙ্গে থেকে যেতে পারো।’

‘আজ নয়। ধন্যবাদ, জেফরি।’

‘ওয়ারেনের ব্যাপারে কী করবে ভাবছ?’

‘ওর সঙ্গে আলোচনা করব,’ বলল কলিন, ‘যদি সম্ভব হয় কাল।’

‘আমাকে তার ব্যৱস্থা করতে দাও। তুমি তা হলে আবার ওয়াশিংটনে ফিরে যাবে?’

‘জানি না।’

‘গেলে, ধরে নিচ্ছি যাবে, র‍্যাঞ্চ বিক্রি করার জন্যে একজন লোকই পাবে বেসিনে যার নগদ টাকা দেয়ার ক্ষমতা আছে—রবার্ট ওয়ারেন। এসব ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থা স্বীকার করে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, কলিন।’

‘ঠিক বলেছ,’ বিড়বিড় করে বলল কলিন, ‘কাল আবার কথা বলব তোমার সঙ্গে।’

বেরিয়ে এসে মুহূর্তের জন্য বারান্দায় দাঁড়াল ও, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। অনেক আশায় বুক বেঁধে এখানে এসেছিল, কিন্তু এখন কেমন যেন ফাঁকা লাগছে সব। ইচ্ছে করলে ফর্বস র‍্যাঞ্চে গিয়ে উঠতে

পারে ও, রবার্ট ওয়ারেনকে উপেক্ষা করে ওখানে বসবাস করা যায়; জিইয়ে রাখা যায় লড়াইটা। কিন্তু কী লাভ? ওয়ারেন যদি হার স্বীকার করে বেসিন ছেড়ে চলেও যায়, কী লাভ হবে ওর?

ঘোড়ার কাছে এসে স্যাডলে চেপে বসল কলিন, রাস্তার শেষ মাথায় দাঁড়ানো লিভারি আস্তাবলের দিকে এগোল। জিন লাগাম খসিয়ে কোরালে ঢোকাল ঘোড়াটা, আস্তাবলের দরজার কাছে ব্যাকে তুলে রাখল স্যাডল। তারপর ফিরতি পথে হোটেলে এসে ঢুকল ও। ডেস্কের ওপাশে চেয়ারে হেলান দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে বুড়ো ডেস্ক ক্লার্ক। ওকে জাগাল না কলিন, হুক থেকে একটা চাবি নিয়ে হল ধরে হাটতে হাটতে নির্দিষ্ট কামরার সামনে এসে দাঁড়াল, তালা খুলে ভিতরে পা রাখল। বিছানাটা দেখে পছন্দ হয়ে গেল। পোশাক খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও, কিন্তু ক্লান্তিতে অনেকক্ষণ ঘুম এল না।

নীরবে জেগে উঠল ওয়োগোনার, কোলাহলহীন। অ্যান্টশেলার অ্যান্ড কায মারকেন্টাইল কোম্পানী মানে জেনারেল স্টোরের রবার্ট কায দোকান খুলল সবার আগে। ঘর ঝাঁট দেওয়া শেষ করে বারান্দায় এসে দাঁড়াল ও, সকালের মিঠে রোদের উষ্ণ পরশ উপভোগ করল। রাস্তার উল্টোদিক থেকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাল রিভার বেড স্যালুনের মালিক ভিক্টর কানিং। ব্যাংক ভবন পেছনে ফেলে রালফ বেলামী, শহরের নাপিত, এগিয়ে গেল তার দোকানের দিকে। দোকান খুলবার তোড়জোড় করছে জিন কেলনার, অর্থাৎ কফি তৈরি। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রেস্টুরার নিয়মিত দশবারজন খন্দের এসে পড়বে, দৈনন্দিন কাজ গুরুতর আগে কিছুক্ষণ খোশগল্প করবে আর চুমুক দেবে কফির কাপে।

আজ বেশ সকালে একজন খন্দের এসেছে রালফ বেলামীর দোকানে, অপরিচিত; তাতে সে অবাক হয়নি। নানা জায়গা থেকে আগত ড্রামার, গুরু ব্যবসায়ী, ভবঘুরে কাউন্সিলর প্রায়ই এখানে পা ফেলে, ওদের কাউকেই সে চেনে না; এবং ওরা জানতে চাক বা না চাক চলতি ঘটনা সম্পর্কে তাদের সে ওয়াকিবহাল করবেই। আজকের খরিদারকেও ভবঘুরে কাউন্সিলর ধরে নিয়েছে বেলামী, বেকার এবং চাকরির ধাক্কায় আছে।

‘রবার্ট ওয়ারেনের সঙ্গে দেখা করেছে?’ জিজ্ঞেস করল সে।

‘কেন?’ জানতে চাইল কলিন।

‘নতুন লোক নিতে পারে সে। একজন লোক কমে গেছে তার। মিচেল গুলি খেয়ে মরেছে।’

‘তাই?’

‘হ্যাঁ। ফর্বস নামে এক লোকের পাল্লায় পড়েছিল। ফর্বসকে মারার জন্যে পিস্তল বের করেছিল সে, কিন্তু ক্ষিপ্ততায় ফর্বসের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারেনি। এর আগের আরও ঘটনা আছে। এই ফোর্বস আবার বুড়ো ড্যানিয়েল ফর্বসের ছেলে, মাসখানেক আগে এক প্যাসির সঙ্গে লড়াইতে মারা গেছে ভদ্রলোক। ওর আর এক ছেলে এডিও মারা গেছে সেদিন। ওয়ারেনের গরুর পাল স্ট্যামপিড করার অপরাধে ড্যানিয়েল ফর্বসকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল প্যাসি। আচ্ছা, মানুষ

কেন হঠাৎ কালো পথে পা বাড়ায় বলতে পারো?’

‘জানি না,’ বলল কলিন।

‘ড্যানিয়েল ফর্বসের কথাই ধরো। চমৎকার মানুষ ছিল, এত ভাল, চিন্তা করতে পারবে না, কোনরকম জটিলতা ছিল না ওর মধ্যে। ওয়ারেনকে সে পছন্দ করত না, কিন্তু শত্রুতাবশত সে এমন কিছু করবে কল্পনাও করেনি কেউ। পনেরশো গরুর পাল স্ট্যামপিড করে ক্রেব্যাংকসের ওপর থেকে নীচে ফেলেছে ড্যানিয়েল ফর্বস। তুমি জানো না, ক্যানিয়নের দেয়াল ওই জায়গায় খাড়া দুশো ফুট নেমে গেছে, এত ওপর থেকে পড়ে গরুগুলোর কী অবস্থা হয়েছিল ভাবতে পারো! আমাদের জিজ্ঞেস করলে বলব এরচেয়ে বড় ক্ষতি আর হতে পারে না।’

‘আমি জিজ্ঞেস করিনি,’ বলল কলিন।

হতভম্ব দৃষ্টিতে কলিনের দিকে তাকাল রালফ বেলামী, থমকে গেল তার হাতের ক্ষুর, কিন্তু কথা থামাল না সে। ‘কলিন ফর্বস কী করতে যাচ্ছে তা নিয়ে গতকাল সন্ধ্যায় আলোচনা করছিলাম আমরা,’ আবার বলল বেলামী, ‘ওয়াইওমিংয়ে এতদিন চাকরি করত সে, ভাল চাকরি, ওখানে ফিরে গেলেই তার জন্যে ভাল, কিন্তু সে যদি এখানে থেকে র‍্যাঞ্চিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই সঙ্গে রবার্ট ওয়ারেনের সঙ্গে তার বাবার এতদিনের বিরোধ জিইয়ে রাখতে চায়, সন্দেহ নেই শেষমেশ ঠিক একটা রেঞ্জ-ওঅর বেধে যাবে বেসিনে। একটা গানফাইটে জড়িয়ে পড়ে একজনকে হত্যা করার পর এখান থেকে চলে গিয়েছিল ছেলেটা, আট বছর পর ফিরে আসামাত্র আবার একজনকে হত্যা করেছে। অনেকেই ভাল চোখে দেখছে না ব্যাপারটা।’

নড়েচড়ে বসল কলিন। ‘শেভের দিকে মন দাও তো!’

‘নিশ্চয়ই,’ বলল রালফ বেলামী।

বকবক করেই চলল সে, অবশেষে মনে মনে কলিন যা ভাবছিল সেই প্রসঙ্গেই ফিরে এল: কেন ভুল পথে পা বাড়ায় মানুষ? কেন হঠাৎ এমন কিছু করে যা তার চরিত্রের সাথে একেবারেই মিলে না?

জবাব নেই।

কিন্তু জবাব ওকে পেতেই হবে।

নাপিতের দোকান থেকে বেরিয়ে রেস্টুরাঁয় এল কলিন ফর্বস। রাতে ভাল ঘুম হয়নি, চুল দাড়ি কাটবার পর সতেজ বোধ করবার কথা, কিন্তু বেলামীর বকবকানি মাথা ধরিয়ে দিয়েছে। বেলামীর কথায় আসলে জনমতেরই প্রতিফলন ঘটেছে, হঠাৎ উপলব্ধি করল কলিন। বেসিনে রেঞ্জ-ওঅর বাধলে বা রবার্ট ওয়ারেনের সঙ্গে ওর বিরোধ প্রলম্বিত হলে বেসিনবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তার মানে সবাই এখন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, ও কী সিদ্ধান্ত নেবে সেকথা ভেবে উদ্বিগ্ন তারা।

রেস্টুরাঁয় যারা ছিল দেখামাত্র চিনে ফেলল কলিনকে। করমর্দন করবার জন্য এগিয়ে এল রবার্ট কায়, ড্যানিয়েল ফর্বস সম্পর্কে ভাল ভাল কথা বলল, কিন্তু তার মৃত্যু প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল সুকৌশলে। লিভারি আস্তাবলের মালিক টনি হাইড ওয়াইওমিংয়ের চাকরি সম্পর্কে এটা ওটা জিজ্ঞেস করল ওকে। এ ছাড়া আরও

দুজন নাগরিক কুশল বিনিময় করল ওর সঙ্গে। সপ্রতিভ দেখাল তাদের, কিন্তু তারপরও কলিন বুঝতে পারল তলে তলে এরা প্রত্যেকে উৎকণ্ঠিত, মুখে কিছু না বললেও সবাই যেন জানতে চাইছে: রেস্টুরাঁ থেকে বের হয়ে কী করতে যাচ্ছে ও?

জেফরি আরচার এসে যোগ দিল ওর সাথে। ‘শহরেই থাকছ সারাদিন?’ জানতে চাইল।

‘থাকতে পারি,’ বলল কলিন। ‘বাবার কাজ-কর্ম সম্পর্কে কার কাছে ধারণা পাওয়া যেতে পারে?’

‘অ্যারন হেলারকে আদালত তোমাদের সম্পত্তির ব্যবস্থা করার জন্যে ট্রাস্টি নিয়োগ করেছে।’

‘তা হলে তো ওর সঙ্গে আলোচনা করতে হয়।’

‘কেয়ারটেকার হিসেবে র‍্যাঞ্চ আছে ডার্ক পিট।’

‘পরে দেখা করব ওর সাথে।’

‘ওয়ারেন আজ শহরে এলে-’

‘ওর সাথে কথা বলব।’

‘ওকে খবর দিচ্ছি তা হলে আমি,’ বলল আরচার।

নাশতা শেষ করল কলিন। আবার হোটেলে ফিরে এল, বারান্দায় একটা চেয়ার বেছে বসল, তারপর অলস ভঙ্গিতে পাইপ টানতে লাগল। ওয়ারেনের আস্তাবলে শ্রুত হওয়ার আড়ষ্টতা কাটেনি এখনও, তবে ব্যথা অনেক কমেছে, দপদপ করছে না আর মাথার ভিতর।

পাইপ নিভিয়ে বারান্দার রেলিংয়ে পা তুলে দিল কলিন, সকালের সূর্যের তীব্র রশ্মির হামলা থেকে চোখ বাঁচাতে চোখ বুজল। চারদিক অবিশ্বাস্য রকম শান্ত, নীরব; এ নীরবতা যেন ঝড়ের পূর্বাভাস। হোটেলের বারান্দায় এভাবে প্রকাশ্যে বসে থাকলেও আপাতত বিপদের আশঙ্কা করছে না কলিন। অ্যারন হেলারকে ওয়ারেনের কাছে র‍্যাঞ্চ বিক্রির ব্যবস্থা করতে বলে দিলে আর কোনদিনই কোন বিপদ হবে না, নিশ্চিন্তে ওয়াইওমিংয়ের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়তে পারবে ও। কিন্তু যদি এখানে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়, তা হলে?

ওয়াইওমিংয়ে ফিরে যাওয়াই অনেক সহজ। যোগ্যতার বলে সিভিকিটের একটা দামী পদ দখল করতে পেরেছে ও, এমন একটা চাকরি চাইলেই মেলে না, কিন্তু...

বেলা গড়িয়ে চলল। রাত্তায় বেরিয়ে এল অ্যারন হেলার, অফিসের দিকে এগিয়ে গেল, তালা খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে, হোটেলের বারান্দায় বসা কলিনকে লক্ষ করল না। ডেভিড স্পেস্টরের সঙ্গে শহরে এল বেলিভা হোবার, ‘ওকে দেখতে পেয়ে ঘোড়া থামাল। উঠে মাথা থেকে টুপি নামাল কলিন।’

‘সুপ্রভাত বেলিভা। চমৎকার লাগছে কিন্তু তোমাকে!’

অধৈর্যের সঙ্গে মাথা নাড়ল বেলিভা। ‘তুমি আর বিল র‍্যাঞ্চ থেকে বেরোনোর পর কী হয়েছে?’

‘কই, কিছু না। খানিকক্ষণ একসঙ্গে এগোই আমরা, তারপর আলাদা হয়ে

বিল চলে যায় ওদের ব্যাঞ্ছের উদ্দেশ্যে, 'আর আমি সোজা এদিকে।'

'কীসের আশায় বসে আছ এখানে?'

'রবার্ট ওয়ারেনের সঙ্গে দেখা করতে।'

'গোলমাল মিটিয়ে ওয়াইওমিংয়ে ফিরে যাচ্ছ? বেশ, শুনে খুশি হলাম, কলিন। এটাই বুদ্ধিমানের কাজ।'

হাসল কলিন, তারপর হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল কথাটা, 'বেলিভা, তুমি যাবে আমার সাথে ওয়াইওমিংয়ে?'

আরক্ত হলো বেলিভা। 'এখানেই ভাল আছি আমি, কলিন, এবং ব্যস্ত। তোমার সঙ্গে আবার দেখা হওয়ায় অবশ্য খুশিই হয়েছে।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে সরে গেল বেলিভা, স্পেস্ট্রের সঙ্গে যোগ দিল, রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল ওরা।

আবার বসল কলিন, ভাবছে, হঠাৎ বেলিভাকে ওয়াইওমিংয়ে যাবার কথা বলতে গেল কেন? ভাবতে ভাবতে কথাটা পছন্দ হয়ে গেল। আজ না হলেও শিগগিরই বিয়ে করতে হবে ওকে, সবাই করে, বেলিভার মত মেয়েকে স্ত্রী হিসাবে পাওয়া সত্যি সৌভাগ্যের ব্যাপার।

আরেকটা দল শহরে পৌঁছল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কলিন। 'রবার্ট ওয়ারেন, বিল, লুইস প্যাটেন এবং চাক কনারসসহ মোট আটজন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল। হোটেলের কাছাকাছি এল ওরা, কলিনের দিকে একবারও না তাকিয়ে চলে গেল সামনে। নিশ্চয়ই ওকে দেখেছে ওরা। অজান্তে শিউরে উঠল কলিন। প্রকাশ্যে ওয়ারেনের চেহারা যত মসৃণই হোক না কেন ওর আসল রূপ দেখেছে ও, ভুলবার নয়।

খানিকটা সামনে গিয়ে একে একে স্যাডল থেকে নামল ওয়ারেন রাইডাররা, হিচ রেইলে ঘোড়া বাঁধল। বোর্ডওকে ওদের সঙ্গে যোগ দিল শেরিফ জেফরি আরচার, ওকে ঘিরে দাঁড়াল তারা। কয়েক মিনিট পর আরচার আর ওয়ারেন একসঙ্গে পা বাড়াল হোটেলের উদ্দেশ্যে।

বারান্দার চেয়ারে হেলান দিয়ে অপেক্ষায় রইল কলিন ফর্বস।

আট

সহজ পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে দু'জন, ওয়ারেনের সঙ্গে তাল মেলাতে জোরে পা চালাতে বাধ্য হচ্ছে আরচার। ওদিকে সিলভার বুলেট স্যালুনে অদৃশ্য হলো ওয়ারেনের তিন রাইডার, কনারস আর বিল এগোল অ্যান্টশেলার অ্যান্ড কায-এর দিকে, বারান্দায় থামল ওরা, চেয়ে রইল হোটেলের দিকে। ফীড স্টোরে গেল প্যাটেন, একটা জায়গা বেছে দাঁড়াল, রেস্টুরার এক কোণে অবস্থান নিল ওয়ারেনের অপর এক রাইডার।

হয়তো ওদের কোন উদ্দেশ্য নেই, তবু সতর্ক থাকা ভাল ভেবে বাম হাতে টুপি ঠেলে পেছনে সরানোর ভান করে ডান হাতে হোলস্টারের পিস্তল আলগা করে নিল কলিন। অফিস থেকে বেরিয়ে এল হেলার, রেষ্টুরার দিকে এগিয়ে গেল। এবারও দেখা করা হলো না, ভাবল কলিন, অবশ্য পরে করলেও চলবে, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ওয়ারেন আর আরচার হোটেলের বারান্দায় উঠে এল, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল কলিন। চেহারা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে মাথা দোলাল ওদের উদ্দেশ্যে।

‘কলিন,’ বলল শেরিফ, ‘এসো, পরিচয় করিয়ে দিই, রবার্ট ওয়ারেন-মিস্টার ওয়ারেন, কলিন ফর্বস।’

‘সুপ্রভাত, ফর্বস,’ বলল ওয়ারেন।

সপ্রতিভ দেখাচ্ছে ওয়ারেনকে, কেন কে জানে মুচকি হাসছে সে।

‘হ্যালো, ওয়ারেন,’ বলল কলিন।

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল আরচার। ‘মিস্টার ওয়ারেন, আমি আগেই ওর সঙ্গে ওর বাবার মৃত্যুর ব্যাপারে আলোচনা করেছি। ওকে বলেছি এখানে তোমার কোন দোষ নেই। প্রতিশোধ নিতে এখানে এসেছে কলিন, আমি তা বিশ্বাস করি না, তেমন ছেলেই ও নয়। টেরেস মিচেলের সঙ্গে ওর লড়াইটা অনভিপ্রেত, কিন্তু দুর্ঘটনাকে স্রেফ দুর্ঘটনা হিসেবেই দেখা উচিত-ওসব ভুলে গেলেই সবার মঙ্গল। আজ, এখানে কলিন ফর্বস আর তোমার রাইডারদের মধ্যে যে কোন ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা দূর করতে চাই আমি, এই লোকালয়ে কিছুতেই একটা ফিউড শুরু হওয়ার ঝুঁকি নিতে পারব না আমরা।’

‘আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত,’ বলল ওয়ারেন, ‘আমার ছেলেরা মিচেলকে খুব পছন্দ করত; তবু ওদের সঙ্গে আমি কথা বলব, যথাসাধ্য চেষ্টা করব ওদের লাইনে রাখার।’

ওয়ারেনের আশ্রাবলের ঘটনা এখানে বলবার সুযোগ নেই, বুঝতে পারল কলিন। শহরে মহৎ, বিবেকসম্পন্ন সুনাগরিকের ভূমিকায় নিখুঁত অভিনয় চালিয়ে যাবে ওয়ারেন, বোঝানোর চেষ্টা করবে বেসিনে নিরবিচ্ছিন্ন শান্তিই তার কাম্য। আপাতত ওর এই মুখোশ খুলে দেওয়ার উপায় নেই। চেষ্টা করতে ক্ষতি কী? লোকটাকে একটু উস্কে দিলে কেমন হয়!

‘ফর্বস র‍্যাঞ্চার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি আমি,’ শান্ত কণ্ঠে বলল কলিন, ‘নিজেই ওটা চালানোর চেষ্টা করব।’

‘ভেবেছিলাম বিক্রির কথা বলবে,’ বলল ওয়ারেন, ‘আমার কেনার ইচ্ছে ছিল। তুমি ওয়াইওমিংয়ে একটা ভাল চাকরি করো বলে শুনেছিলাম...’

‘কিন্তু সবারই নিজের একটুকরো জমির স্বপ্ন থাকে।’

‘জমির মালিক হওয়া ঝামেলার ব্যাপার।’

‘তোমার জমি বেচবে নাকি, ওয়ারেন?’

চোখ দুটো পিটপিট করে উঠল ওয়ারেনের।

‘নিশ্চয়ই না! আমার বয়স হয়েছে, তা ছাড়া গোটা একটা সংসারের দায়িত্ব আমার কাঁধে!’

‘আমারও একদিন সংসার হবে,’ বলে হাসল কলিন, ‘এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিইনি যদিও, তবু যত ভাবছি ততই মন বলছে এখানে স্থায়ী হয়ে যাওয়াই ভাল।’ পরস্পর চেপে বসল ওয়ারেনের ঠোঁটজোড়া, এক মুহূর্ত, তারপরই সহজ হয়ে গেল আবার।

‘তা হলে শূন্য থেকে সব কিছু শুরু করতে হবে তোমার,’ বলল ওয়ারেন, ‘আমার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে আগে, আদালত অবশ্যই আমার দাবীর পক্ষে রায় দেবে। যদূর জানি দেনা শোধ করতে গেলে একটা ফুটো পয়সাও আর থাকবে না তোমার হাতে।’

‘সেক্ষেত্রে আমাদের সিভিকেট থেকে প্রয়োজনীয় আন্ডার রাইটিংয়ের ব্যবস্থা করব,’ টেনে বলল কলিন, ‘ওয়া র‍্যাঞ্চ কিনতেও রাজি হতে পারে, সম্ভাবনাটা খতিয়ে দেখতে হবে, অবশ্য তাড়াহুড়োর কিছু নেই, কী বলো?’

ভুরু কৌচকাল ওয়ারেন, কিন্তু চেহারা স্বাভাবিক করে নিতে ভুলে গেল এবার।

‘এ-প্রসঙ্গে পরে কথা হবে, ফর্বস।’

‘আট-দশদিন পর, ঠিক আছে?’ অলস ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কলিন। ‘এখানেই পারে আমাদের।’

ছিটকে যেন দূরে সরে গেল রবার্ট ওয়ারেন, দাঁড়িয়ে পড়ল সে, ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে বলল, ‘এসো, শেরিফ, একসঙ্গে বসে ড্রিংক করা যাক। চলো!’

আমন্ত্রণ নয়, নির্দেশ।

কলিনের দিকে তাকাল আরচার, যেন সতর্ক করে দিতে চাইল, তারপর ঘুরে অনুসরণ করল ওয়ারেনকে।

আবার চেয়ারে গা এলিয়ে দিল কলিন, লক্ষ্য করল স্থান বদল করেছে বিল ওয়ারেন, প্যাটেন, কনারস আর অপর লোকটা, নতুন জায়গা থেকেও ওর উপর নজর রাখা সম্ভব। অ্যারন হেলার অফিসের দিকে যাচ্ছে দেখে উঠে দাঁড়াল কলিন, এগোল সেদিকে। কনারসকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ওকে দেখে গৌঁফে তা দিয়ে চাপা গলায় বলল ওয়ারেন রাইডার, ‘হয় কি আট ঘণ্টা, ফর্বস, এর বেশি সময় পাচ্ছ না তুমি, মৌজ করে নাও।’

না শুনবার ভান করে এগিয়ে চলল কলিন, ভাবছে; হয় থেকে আট ঘণ্টা, আট ঘণ্টা পর সন্ধ্যা নামবে, তখন কেউ ওকে গুলি করলে ব্যাপারটাকে মিচেলের অজ্ঞাত কোন বন্ধুর ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার ফল বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে অন্যায়সে। আজ রাতে কোথায় লুকাবে ও?

হেলারের অফিসে পৌঁছে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল কলিন।

চেয়ারে আরাম করে বই পড়ছিল হেলার, পুরু চশমার উপর দিয়ে তাকাল, কলিনকে দেখে খুলে রাখল চশমাটা।

‘এসো, কলিন, তোমাকে দেখে খুশি হলাম,’ বলল সে। ‘ওয়ারেন কিন্তু এখন শহরে, জানো?’

‘হ্যাঁ, এইমাত্র আলাপ হলো।’

‘কেমন লাগল, ভাল?’

‘ওপরে ওপরে তো ভাল মানুষ, আমাকে র‍্যাপ্ত কেনার প্রস্তাব দিয়েছিল।
আমি প্রত্যাখ্যান করেছি।’

‘ভাল।’

‘মানে?’

‘বিক্রি করতে চাইলে,’ বলল হেলার, ‘এতে দরকষাকষির সুবিধে হয়।’

‘আর বিক্রি করতে না চাইলে?’

‘আসলে সময় পেতে চাইছ তুমি।’

‘আমাকে কী করতে বলো?’

সুস্থ হাসি হাসল হেলার। ‘আমার বলায় কিছু আসে যায় না, তুমি ভালই
জানো সেটা। বোকার মত যদি রবার্ট ওয়ারেনের সঙ্গে লড়াই বাধানোর সিদ্ধান্ত
নিতে চাও, নেবে, আমার কী করার আছে!’

‘সেদিন এখান থেকে ডাক্তার মারভিনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম
আমি,’ বলল কলিন, ‘সতর্ক ছিলাম যাতে কেউ না দেখে, অথচ ঠিকই ওখানে
আমার জন্যে ওত পেতে ছিল ওরা, মানে ওয়ারেন রাইডাররা। ওয়ারেন অবশ্য
পরে এসে ওদের নিরস্ত করেছিল, আমাকে হত্যা করলে জনমত বিরুদ্ধে চলে
যাবে, বুঝতে পেরেছিল সে। ওয়ারেন ইতিমধ্যে সবার মনে এই বিশ্বাস ঢুকিয়ে
দিয়েছে যে, ওর সব রাইডার মিটেলকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত, ওদের সামলে রাখা
কঠিন হবে, সোজা কথায়, আমাকে ওরা মারবেই, শুধু সুযোগের অপেক্ষা। কিন্তু
কথা সেটা নয়; আমার প্রশ্ন: আমি মারভিনের কাছে যাচ্ছি ওরা জানল কীভাবে?’

‘আমি বলেছি কিনা?’

‘বলোনি?’

‘নাহ্। ওরা তো আগে থেকেই জানত তুমি শহরে আসছ, মনে হয় আন্দাজ
করে নিয়েছে ডাক্তারের ওখানে একসময় যাবেই, মারভিনের বাড়ির দিকে নজর
রাখছিল নিশ্চয়ই।’

তা হতে পারে, কিংবা হয়তো ডাক্তার মারভিনের বাড়িতে যেতে দেখেছে
ওরা।

‘ব্যাংকে বাবার কত টাকা আছে?’

‘হাজার পাঁচেকের বেশি না।’

‘ওর দেনার পরিমাণ কত?’

‘অনাদায়ী ঋণ নেই, তবে ওর সম্পত্তির বিরুদ্ধে পঁচিশ হাজার ডলারের
একটা দাবী আছে—ওয়ারেন ওর গরুর আনুমানিক মূল্য হিসেবে এই টাকাটা দাবী
করেছে।’

‘ফর্বস র‍্যাপ্তে এখন কতগুলো গরু আছে?’

‘ইদানীং গোণা হয়নি, তবে ডার্ক পিট আছে ওখানে, ওর ধারণা বার থেকে
পনের শ’য়ের মত হতে পারে।’

‘মাত্র!’

‘মাস দু’য়েক আগে প্রায় একহাজার গরুর একটা পাল স্প্রিংগারভিলে চালান

দিয়েছিল ড্যানিয়েল ফর্বস ।’

‘সেই টাকা গেল কোথায়?’

‘জানি না। র‍্যাঞ্জেই আছে হয়তো, কিংবা আমাদের অজানা কোন ঋণ শোধে ব্যয় করেছে। আমি এখন ওর কাগজপত্র পরীক্ষা করছি, দেখি কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা।’

‘আমি ফর্বস র‍্যাঞ্জে চালাতে চাইছি বলেছিলে ওয়ারেনকে?’

‘হ্যাঁ।’

‘কী বলল?’

‘তোমার সঙ্গে নাকি কথা বলবে। র‍্যাঞ্জে চালাতে চাইলে আগে ওর পাওনা কড়ায়গুণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হবে।’

‘এবং পঁচিশ হাজার ডলার শোধ করতে গেলে ফতুর হয়ে যাব আমি।’

‘ওয়ারেনের ধারণাও তাই।’

ঘাড় ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কলিন। আবার জায়গা বদল করেছে বিল ওয়ারেন আর লুইস প্যাটেন।

‘হেলার,’ বলল ও, ‘কী এমন ঘটেছিল এখানে যার কারণে পুরো এক পাল গরু স্ট্যাম্পড করে মারতে বাধ্য হলো আমার বাবা? শত্রুতা থাকলে কেন সামনাসামনি মোকাবিলা করল না?’

‘ওয়ারেনকে কখনও একা পাওয়া সম্ভব নয়, সেজন্যে হয়তো; ওর প্রায় সব লোকই গানস্টিংগার।’

‘না, এটা কোন কারণ হলো না। ম্যাকমিলানের সঙ্গে বাবার একবার গোলমাল বেধেছিল মনে আছে? তোমার মনে নাও থাকতে পারে। অনেক আগের ঘটনা। আমার বয়স তখন ষোল। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি ক্রীক শুকিয়ে ফাটা-ফাটা হয়ে গেছে। ক্রীক ধরে পাহাড়ের গেলাম আমরা, দেখা গেল, ডিনামাইট ফাটিয়ে ক্রীকের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে ম্যাকমিলান। ওখান থেকে সোজা ম্যাকমিলান র‍্যাঞ্জে গেলাম আমরা, পথে শীতের জন্যে জমানো ম্যাকমিলানের বেশ কয়েকটা খড়ের গাদা চোখে পড়ল, ওগুলোয় আগুন ধরিয়ে দিতে চাইলাম আমি, কিন্তু বাবা কিছুতেই মত দিল না। র‍্যাঞ্জে পৌঁছে পিস্তল হাতে ম্যাকমিলানের মুখোমুখি হলো বাবা, সেদিন চোখের সামনে আজরাইলকে প্রত্যক্ষ করেছিল ম্যাকমিলান, ওকে ক্রীকের মুখ খোলার জন্যে এক সপ্তাহ সময় দেয়া হয়েছিল, দেরি করেনি সে।’

‘কিন্তু ম্যাকমিলান আর ওয়ারেন এক নয়। হার মানার লোক নয় ওয়ারেন।’

‘কিন্তু তবু বাবা কেন ওর গরু হত্যা করল তা দুর্বোধ্য রয়ে যায়। বাবার সঙ্গে ওয়ারেনের ঝগড়ার আসল কারণটা কী?’

‘জানি না, কলিন, তবে এটা বলতে পারি, প্রায় সব ব্যাপারেই ওরা দ্বিমত পোষণ করত, কিন্তু এতে তোমার প্রশ্নের জবাব মিলবে না; অবশ্য স্পষ্ট করে এটুকু বলা যায়, শহরের বাইরে উঁচু এলাকায় ড্রাই ক্রীকে তিনটি নবাগত পরিবার বসতি করেছিল, ওদের উৎখাত করতে চাইছিল ওয়ারেন, হোমস্টিডারদের জন্যে বেসিনকে একরকম নিষিদ্ধ করার ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু তোমার বাবা ওদের

জ্বালাতন করতে নিষেধ করে দিল, সংঘর্ষের ঠিক আগের ঘটনা এটা, অবশ্য আগেই বলেছি সবতাতেই ওদের এমন পরস্পরের বিরোধিতা করতে দেখা গেছে; সব মিলিয়ে গোটা ব্যাপারটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: ওয়ারেন, চাইছিল এখানে সবকিছু তার ইচ্ছেয় চলবে, বেসিনের সবচেয়ে শক্তিশালী লোক হতে চেয়েছে সে, কিন্তু যখনই কোন ব্যাপারে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেছে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তোমার বাবা...আমার ব্যক্তিগত ধারণা কি শুনবে?’

‘বলো?’

‘আমার বিশ্বাস ওদের দুজনের ছোট ছোট বিরোধগুলোই শেষ পর্যন্ত একসঙ্গে পাহাড়ের রূপ নিয়েছে, সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে ওয়ারেনের, তোমার বাবার মনের অবস্থাও একই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল।’

‘তুচ্ছ ব্যাপারগুলোই ওয়ারেনের গুরু হত্যা প্ররোচিত করেছে বাবাকে?’

‘শেষ পর্যন্ত একজন তো ভেঙে পড়তই, তোমার বাবা...’

‘কিন্তু ড্যানিয়েল ফর্বস ভেঙে পড়ার মানুষ নয়!’

‘নিজের বাবা তাই বলছ এ-কথা। পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি অনেক পরিষ্কার। এভাবে দেখো ব্যাপারটা: বেসিনে ওয়ারেনের বিরুদ্ধে একজনকে দাঁড়াতেই হত, তোমার বাবা সেই ভূমিকা গ্রহণ করেছে, চরম আঘাত হেনেছে এক সময়; এখন যদি ওয়ারেন তোমার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পাবার ভরসায় না থাকত রীতিমত টাকা পয়সার ব্যাপারে টানাটানি পড়ে যেত তার।’

‘অথচ আগে বললে আমাদের র‍্যাঞ্চ কেনার ক্ষমতা আছে তার?’

তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট একটা দাবী থাকায় র‍্যাঞ্চটা পানির দরে কিনে নিতে পারত সে; তা ছাড়া, ঋণের ব্যবস্থা করা ওর জন্যে সমস্যা হত না। তোমার কাছে পাওনা টাকা যে কোন লোকসানের বিরুদ্ধে বীমার কাজ করত।’

‘এখন আমার কী করা উচিত?’

‘বলেছি তো। একটা লোকই সব ঝামেলার মূল। রবার্ট ওয়ারেন।’

‘ওকে ঘৃণা করো তুমি, তাই না? কেন?’

‘নিজেদের যারা শ্রেষ্ঠ মনে করে আমি তাদের অপছন্দ করি!’

নিজের ক্রোধের তীব্রতায় নিজেই হতবাক হয়ে গেল অ্যাটর্নি। কলিনের দৃষ্টির সামনে বিবর্ত মনে হলো তাকে। হাতের বইটা একপাশে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল সে, তারপর পায়চারি শুরু করল। বেশ কিছুক্ষণ পায়চারির পর থেমে আবার কলিনের মুখোমুখি হলো।

‘ওয়ারেনের এখন সুসময়,’ তিন্ত কণ্ঠে বলল হেলার, ‘ওর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর মত কেউ নেই এ-তল্লাটে। ম্যুসেলমান, স্মিথ, ডেভিস, চার্লস-কার্লসই সাহস নেই ওর বিরোধিতা করার। তুমিও ওর সঙ্গে পেরে উঠবে না-সুযোগই পাবে না।’

‘যদি না ওকে খুন করি,’ শান্ত কণ্ঠে বলল কলিন, ‘তাই না, হেলার?’

চমকে তাকাল অ্যারন হেলার। ‘কেন নয়? তোমার বাবার মৃত্যুর জন্যে কে দায়ী?’

পকেটে হাত ঢোকাল কলিন ফর্বস। আরেকবার জানালা দিয়ে বাইরে

তাকাল, তারপর বলল, 'সেটাই করতে হবে হয়তো, হেলার, তবে এখন নয়। আরও ভাল করে ব্যাপারটা বুঝতে চাই আমি। এখন আমার হয়ে একটা কাজ করতে হবে তোমাকে।'

'কী?'

'জেমস জি. হ্যাগারটি, প্রেসিডেন্ট, ওয়াইওমিং অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ল্যান্ড অ্যান্ড ক্যাটল কোম্পানী, এমপায়ার বিল্ডিং, শিকাগো'—এই ঠিকানায় একটা চিঠি লিখতে হবে, 'প্রিয় জিম' দিয়ে শুরু করবে, শেষে আমার নাম থাকবে, লিখবে: আমাদের র‍্যাঞ্চটা যে অবস্থায় আছে ঠিক এই অবস্থায় নগদ পঁচিশ হাজার ডলারে কিনে নিতে পারে ওরা এবং আমি আগের বেতনেই এখানে থেকে এটার দেখাশোনা করতে রাজি আছি; এ-প্রসঙ্গে ওদের একথা মনে করিয়ে দেবে যে, নিউ মেক্সিকোতে ওদের ব্যবসা সম্প্রসারণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এটাকে বিবেচনা করা যেতে পারে। জায়গাটা অনেক সম্ভায় পাবে ওরা। লিখো, র‍্যাঞ্চ এখন তিন হাজারের মত গরু আছে। আরও বলবে, ওরা র‍্যাঞ্চ কিনবে ধরে নিয়ে এখানে কোম্পানীর পক্ষে আমি কাজ শুরু করে দিয়েছি। তবে চিঠিটা আবার ডাকে দিয়ো না, রবার্ট ওয়ারেনকে শুধু ওটার একটা কপি দেখাবে, ব্যস।'

'ওয়ারেন ওটা পড়ার পর কতক্ষণ তোমার আয়ু থাকবে?'

'আয়ুর কথা কে বলতে পারে?' হাসতে হাসতে বলল কলিন। 'চিঠিটা দেখানোর উদ্দেশ্য ওয়ারেনকে বোঝানো ওর দাবী মেটানোর সামর্থ্য আমার আছে, ফর্বস র‍্যাঞ্চ চালানো সম্ভব—এবং বিক্রি যদি করতেই হয়, সে ছাড়াও খন্দের আছে। প্রতিক্রিয়া কী হয় দেখা যাক না!'

'প্রতিক্রিয়া কী হবে বলেছি।'

'তবু নিজের চোখে দেখতে চাই,' বলল কলিন, 'চিঠিটা লিখে ওয়ারেনকে দেখাও।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল কলিন, বাইরে পা রাখল। অ্যারন হেলারের বক্তব্যে সম্মত নয় ও। অজ্ঞাত কোন কারণে ওয়ারেনকে ঘৃণা করে অ্যাটর্নি। ওকে এখানে এনে ওয়ারেনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার মতলবেই ওয়াইওমিংয়ে ওর ঠিকানায় চিঠি লিখেছে সে।

আক্রোশে জ্বলছে হেলার, তার পক্ষে পরিস্থিতির নিরপেক্ষ মূল্যায়ন কি সম্ভব?

আবার হোটেলে ফিরে এল কলিন। ওয়ারেন রাইডাররা এখনও আছে রাস্তায়। চেয়ার টেনে বসে পড়ল ও, হেলান দিল, কনারসের হুমকির কথা মনে পড়ে গেল ওর।

রাত পর্যন্ত সময় আছে, ভাবল, সময়টা কাজে লাগানো যাক।

ওয়ারেনের সঙ্গে স্যালুনে গিয়েছিল জেফরি আরচার, ওখান থেকে বেরিয়ে অফিসের দিকে যাচ্ছে এখন। অ্যান্টশেলার অ্যান্ড কায থেকে বেরিয়ে এল বেলিন্ডা, অন্য একটা দোকানে গেল। নিজের অবস্থান ছেড়ে সিলভার বুলেট স্যালুনে ঢুকল প্যাটেন, কিন্তু কনারস বা বিল নড়ল না।

টুপি টেনে মুখের উপর আনল কলিন, চোখ বন্ধ করল। পুরো ব্যাপারটা পর্যালোচনা করতে চায়, হঠাৎ হ্যারল্ড লেভিটের কথা মনে পড়ে গেল, টুপি সরিয়ে

উঠে বসল ও। বহু বছর ওদের র‍্যাঞ্জে কাজ করেছে হ্যারল্ড। বাবা ওকে বিশ্বাস করত, নির্ভর করত ওর উপর। হ্যারল্ড স্ট্যামপিডে অংশ নিয়ে থাকলে এর পেছনের কারণটা নিশ্চয়ই তার জানা থাকবে। গতকালই জিজ্ঞেস করল না কেন?

উঠে দাঁড়াল কলিন, সোজা শেরিফের অফিসে গিয়ে ঢুকল। ডেস্ক থেকে পা নামিয়ে বসল আরচার, বিষণ্ণ চেহারা।

‘হ্যারল্ড লেভিটের সঙ্গে কথা বলব,’ বলল কলিন।

‘কেন?’

‘স্ট্যামপিড প্রসঙ্গে আলাপ করব।’

‘কাল রাতে একবার করলে না?’

‘আবার করব,’ বলল কলিন, ‘আপত্তির কোন কারণ আছে নাকি?’

‘খুব ভাল একটা কারণ আছে,’ বলল আরচার। ‘হ্যারল্ড লেভিট চলে গেছে। সকালের আগেই বেসিন ছেড়ে চলে যাবে কথা দেয়ায় ওকে শেষ রাতে ছেড়ে দিয়েছি আমি। ওয়ারেনের লোকেরা যেভাবে তোমার ওপর নজর রাখছে—এটাই যথেষ্ট, লেভিটকে আটকে রেখে আর ঝামেলা বাড়াতে চাই না।’

‘কোন দিকে গেল ও?’

‘আমি কী করে জানব? পশ্চিমে বোধ হয়। তুমি র‍্যাঞ্জে উঠতে যাচ্ছ—নিশ্চয়ই মন থেকে বলোনি কথাটা?’

‘অবশ্যই বলেছি।’

‘র‍্যাঞ্জে চালাবে, পয়সা কোথায়?’

‘একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।’

‘কেউ টেরেস মিচেলের बदলা নিতে চাইলে কী করবে?’

‘সেটা তখনই ঠিক করা যাবে।’

‘এসব আমার ভাল ঠেকছে না, কলিন, তালিকাটা অনেক লম্বা, ওয়ারেনের অর্ধেকের বেশি লোক—’

হাত নেড়ে বিরজি প্রকাশ করল কলিন। ‘বাদ দাও তো, শেরিফ। আসল ঘটনা তুমি জানো।’ রেঞ্জে টেরেস মিচেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, রেডফিল্ড ছিল ওর সঙ্গে, রেডফিল্ডের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, কিন্তু মিচেলের সঙ্গে ধরতে গেলে কথাই হয়নি, তারপর ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খানিকটা দূরে এসে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখি পিস্তল বের করছে মিচেল, একটু হলেই পেছন থেকে গুলি করত সে আমাকে, আমি যা করেছি, পরিষ্কার, আত্মরক্ষার খাতিরেই মিচেলকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছি।’

‘হয়তো তাই। আর কেউ হলে অবশ্য—’

‘কিন্তু টেরেস মিচেলই মারা গেছে, তো সেজন্যে কী করতে হবে, লেজ তুলে পালাব?’

‘আগেও একবার তাই করেছিলে, সেই লোকটারও প্রচুর বন্ধু-বান্ধব ছিল।’

‘তখন আমার বয়স অনেক কম ছিল, পালানোটাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছিলাম। কিন্তু সারাজীবন কারও পক্ষে পালিয়ে বেড়ানো সম্ভব নয়, শেরিফ।’

মোট কথা এবার আমি থাকছি। রবার্ট ওয়ারেনকে বলে দিয়েও লোকদের যেন সামলে রাখে।

‘বলেছি। ও চেষ্টা করবে বলেছে। ওয়ারেন সব রকম সহযোগিতা করতেই রাজি আছে, কিন্তু ওর রাইডাররা যদি বেকে বসে? আমি তোমাকে সতর্ক করছি, কলিন—’

‘বাদ দাও,’ বিড়বিড় করল কলিন, দ্রুত বেরিয়ে এল।

দুই কদম সামনে এগিয়ে গতি কমাল।

স্টেজ স্টেশন থেকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে বিল। রিভার বেড স্যালুনের কোণে কনারস, নাপিতের দোকানের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে আরেকজন—পাহারা দিচ্ছে।

নয়

বিকেলের দিকে দুজন সঙ্গী নিয়ে বিদায় নিল রবার্ট ওয়ারেন, শহরেই রইল বাকি সবাই—বিল ওয়ারেন, লুইস প্যাটেন, চাক কনারস আর কুৎসিত চেহারার খর্বাকৃতি এক লোক, কলিনের অপরিচিত। একটু পর পর সিলভার বুলেট স্যালুন, রিভার বেড কিংবা কার্লটন অ্যান্ড ওয়েবারে যাচ্ছে ওরা, গলা ভেজানোর জন্যে, তবে অধিকাংশ সময় রাস্তাতেই থাকছে, হোটেলের বারান্দায় অপেক্ষারত কলিনের উপর কড়া নজর রাখছে।

কয়েকবার অফিস থেকে বেরিয়ে এসে লুইস প্যাটেন আর বিল ওয়ারেনের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করল শেরিফ জেফরি আরচার, বাকি দু’জনকে সে খুব একটা গ্রাহ্য করে বলে মনে হলো না। যখনই বাইরে আসছে অস্বস্তির সঙ্গে হোটেলের পোর্চের দিকে তাকাচ্ছে আরচার, লক্ষ্য করল কলিন।

শহরবাসীরাও যেন অস্বাভাবিক কিছু আলামত টের পেয়ে গেছে। দোকানের দরজা থেকে বারবার উঁকি দিচ্ছে নাপিত রাল্ফ বেলামী, রবার্ট কায়, ডিস্ট্র কানিং, জ্যাক ফ্লেনারি আর স্যাম উইলসন একাধিকবার রাস্তায় এল, ওকে জরিপ করল, শেষমেশ দ্বিধা ঝেড়ে রাস্তা পেরিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে এগিয়ে এল রবার্ট কায়।

‘কোন সাহায্য লাগবে, কলিন?’

‘নাহ্,’ জবাব দিল কলিন।

‘যেসব কথা শুনছি সুবিধের মনে হচ্ছে না,’ বলল কায়।

মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল কলিন। ‘ভেবো না, বব। দেখতেই পাচ্ছ, এখনও কিছুই হয়নি।’

আরও পরে, শেষ বিকেলের দিকে আবার বেলিন্ডা এল। ‘কলিন,’ বলল সে, ‘রাতে মায়ের কাছে থাকছি আমি। তুমি আমাদের সঙ্গে সাপার করবে? খুব খুশি

হব। এক্ষুণি এসো না?’

‘ধন্যবাদ, বেলিভা, এখন নয়, পরে কোন একসময় হবে।’

‘ওই লোকগুলো যদি—’

‘কথা বলতে কারও আটকায় না, বেলিভা, খামোকা গুজবে কান দিতে যেয়ো না। লোকে যেমন ভাবে পরিস্থিতি আসলে কখনোই তত খারাপ হয় না।’

‘এটা কথার কথা!’

‘বাজি? ঠিক আছে, শোনো, কালই সন্ধ্যায় সাপার করতে তোমার র‍্যাঞ্জে আসছি আমি, দুপুরে কম করে খাব, তো বুঝতেই পারছ, রান্সুসে ক্ষুধা থাকবে পেটে...’

ঠোট কামড়াল বেলিভা। ‘আমার কোন কথাই তুমি শুনবে না, তাই না? নড়বে না এখান থেকে! শেষ পর্যন্ত ওরা কী করে দেখতে গ্যাট হয়ে বসে থাকবে?’

‘আমি আসলে বিশ্রাম নিচ্ছি, আর কিছু না, এখানে এভাবে বসে থাকতে বেশ ভাল লাগছে।’

‘একটা কথা ক্রি জানো, কলিন? মাঝে মাঝে পুরুষদের ওপর আমার যেন্না ধরে যায়, স্বস্তি পাই একা আছি ভেবে!’

কথা শেষ করে চরকির মত ঘুরল বেলিভা, সোজা শেরিফের অফিসের দিকে চলে গেল। এক মুহূর্ত পর বেরিয়ে এল জেফরি আরচার, দ্রুত পদক্ষেপে হোটেলের দিকে এগিয়ে এল, বসে পড়ল কলিনের পাশে।

‘বেলিভা পাঠিয়েছে, না?’ জানতে চাইল কলিন।

‘এমনিতেই আসতে হত,’ জবাব দিল আরচার, ‘শবযাত্রা ব্যাপারটি আমার নিদারুণ অপছন্দ। রাত নামার পর কী করবে, ভেবেছ?’

‘ঘোড়ায় চেপে ঘুরতে বের হতে পারি।’

‘জেলের পাশে অফিসের পেছনে একটা ঘোড়া বাঁধা আছে, আমার ঘোড়া ওটা, দ্রুত ছুটতে পারে। অন্ধকার পর্যন্ত অপেক্ষা করে একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ওদিকে যেতে পারি না আমরা?’

‘ধন্যবাদ, শেরিফ।’

অস্পষ্ট কর্ত্তে কী যেন বলল শেরিফ। হেলান দিয়ে বসে পায়ের উপর পা তুলে দিল। ‘সত্যি বলতে কি মিচেলকে নিয়ে ওরা এত বাড়াবাড়ি করেছে কেন আমার মাথায় ঢুকছে না, লোকটাকে কখনোই আমার কাছে বিরাট কিছু মনে হয়নি।’

‘মনে না হওয়াটাই হয়তো যুক্তিসঙ্গত,’ বলল কলিন, ‘মিচেলকে ওরা উসিলা হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে হয়তো, এইদিক থেকে চিন্তা করেছে ব্যাপারটা?’

রাগী চেহারায় রাস্তার দিকে তাকাল শেরিফ, কিছু বলল না।

সূর্য ডুবে গেছে, কিন্তু অন্ধকার নামেনি এখনও, অবশ্য ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছে দিনের অবশিষ্ট আলো। পর্বতমালার দিক থেকে বইছে মৃদু হাওয়া। জেনকিনস থেকে ইঙ্গিত পেয়ে রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়ানো চার ওয়ারেন রাইডার আস্তে

আস্তে সিলভার বুলেট স্যাণ্ডুনের সামনে এসে সমবেত হলো, খানিক পর পর হোটেলের দিকে তাকাচ্ছে ওরা।

‘প্যাটেন, কনারস আর বিল ওয়ালেন-এই তিনটাকে চিনি,’ বলল কলিন, ‘কিন্তু চার নম্বরটা কে?’

‘এরিক মেইন,’ বলল জেফরি আরচার, ‘লোকে বলে চালু পিস্তলবাজ, অবশ্য খুব ভাল করে চিনি না ওকে।’

‘বিল সম্পর্কে তোমার মতামত কী?’

‘ওর সব বাহাদুরী মুখে! কিন্তু প্যাটেন সত্যিই বিপজ্জনক লোক, কনারসও।’

দল ভেঙে আলাদা হয়ে গেল চারজন। রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করল কনারস, তার উল্টোদিকে চলল মেইন। স্যাণ্ডুনে ঢুকে পড়ল প্যাটেন এবং দরজা ঘেঁষে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল বিল ওয়ালেন।

অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে এল, আকাশের রঙ এখন গাঢ় নীল, আর কিছুক্ষণ পরই তারা উঠবে। হাত দিয়ে পিস্তল স্পর্শ করল কলিন, হোলস্টারে আলগা করে নিল ওটা। রাস্তার এ-মাথা ও-মাথায় নজর বোলাল, মেইন বা কনারসের চিহ্ন নেই, কোথায় গেছে কে জানে! প্যাটেনই বা কোথায়? স্যাণ্ডুনে ঢুকেছিল, পেছন দরজা গলে বেরিয়ে যায়নি তো! স্যাণ্ডুনের সামনের দরজা আগলে রেখেছে বিল ওয়ালেন, আবছা অবয়ব দেখা যাচ্ছে এখন।

হঠাৎ নড়ে উঠল আরচার। ‘সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কলিন। চলো, এবার অফিসের দিকে এগোই। ওখানে-’

আচমকা প্রচণ্ড গুলির শব্দে কেঁপে উঠল চারদিক, পর পর তিনটে গুলি হলো, তারপর তীক্ষ্ণ আতঁচিকার। এক-ঝটকায় উঠে দাঁড়াল জেফরি আরচার।

‘এর মানে কী?’ প্রক্যাশ্যে কৌতূহল প্রকাশ করল সে। ‘এসো, কলিন। আমার পেছনে থেকো, অফিসের পাশ দিয়ে যাবার সময় কেটে পড়বে।’

রাস্তা ধরে এগোল শেরিফ, কলিন অনুসরণ করল ওকে, হোটেলের কোণে পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল, পরমুহূর্তে হোটেল আর স্যাডল-শপের মাঝের সংকীর্ণ গলিতে ঢুকে পড়ল ও। হোটেল ভবনের মাঝামাঝি এসে ওর কামরার জানালা খুঁজে পেল, খোলাই আছে, ঝটপট ভিতরে ঢুকে পড়ল ও, লবির উদ্দেশ্যে এগোল দ্রুত, ওখান থেকে সামনের দরজার দিকে।

দরজার মুখে ঝাড়া তিরিশ সেকেন্ড অনড় দাঁড়িয়ে রইল কলিন, হাঁপাচ্ছে, ধুকপুক করছে বুক, একটু জিরিয়ে নিল ও। একটু আগের গুলির শব্দ কী অর্থ বহন করে আঁচ করতে পেরেছে। একই পিস্তল থেকে ছোঁড়া হয়েছে গুলি তিনটে, খুব সম্ভব কনারসের, হোটেলের বারান্দা থেকে শেরিফকে সরিয়ে নেয়ার কৌশল।

রাস্তার দিকে তাকাল কলিন। স্যাণ্ডুনের সামনে থেকে উধাও হয়েছে বিল ওয়ালেন। বোধ হয় ওকে ধরবার আশায় ঘুরপথে হোটেলের পেছন দিকে গেছে। স্যাণ্ডুনের খোলা দরজায় দুজন লোককে দেখা যাচ্ছে, গুলির শব্দ অনুসরণ করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ব্যাপার কী বুঝবার চেষ্টা করছে। আর কাউকে দেখা গেল না আশপাশে।

বারান্দায় বেরিয়ে এল কলিন, সহজ পদক্ষেপে রাস্তা পেরুল, স্যালুনের পেছন হয়ে শহরের অপর প্রান্তে যাবে। পাঁচ কি ছয় কদম এগিয়েছে, হঠাৎ দেখল স্যালুনের দূরবর্তী কোণ থেকে বেঁটে অথচ বলিষ্ঠদেহী এক লোক বেরিয়ে আসছে। পলকে তাকে চিনে ফেলল কলিন। গুলি ছুঁড়েই ফিরে এসেছে চাক কনারস।

থমকে দাঁড়াল কলিন। নিমেষে উঠে এল কনারসের হাত, গর্জে উঠল তার অস্ত্র, কলিনের মাথার উপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেটটা। কলিনের হাতও ঝলসে উঠল পরক্ষণে, পর পর দুবার গুলি করল ও। পেছনে একটা, ঝাঁকি খেলো কনারস, আধ পাক ঘুরল, তারপর মুখ খুবড়ে পড়ে গেল ধলায়।

পেছন থেকে গুলির শব্দ ভেসে এল, বেশ দূরে। আন্দাজে সেদিকে একবার গুলি ছুঁড়ল কলিন, এক দৌড়ে স্যালুনের সবচেয়ে কাছের কোণের দিকে এগিয়ে গেল। পরমুহুর্তে বিল ওয়ারেনের চিৎকার শুনতে পেল।

‘ওদিকে গেছে! স্যালুনের পেছনে!’

হোটেলের সামনে আছে বিল, ভাবল কলিন।

স্যালুন আর রেস্টুরাঁর মাঝখান দিয়ে ছুটল কলিন, হাঁপ ধরে গেছে, স্যালুনের পেছনে এসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দম নিল, পিস্তল উঁচিয়ে রেখেছে। রেস্টুরাঁর পেছনের অন্ধকার ছায়ার দিকে তাকাল ও। ওখানে আছে কেউ একজন, একটা বাক্সের স্তূপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। কে হতে পারে? প্যাটেন? সে-ই কি লুকিয়েছে ওখানে?

হঠাৎ একটা ফিসফিস কর্তৃক কানে এল কলিনের।

‘কলিন? কলিন ফর্বস?’

জবাব দিল না কলিন, অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু বেশিক্ষণ এখানে থাকা যাবে না। বিল ওয়ারেন চিৎকার করে তার লোকদের এদিকে আসতে নির্দেশ দিয়েছে, এখনি এসে পড়বে সে, আসবে এরিক মেইনও, একটু আগে সে-ই বোধ হয় গুলি ছুঁড়েছে।

আবার সেই ফিসফিস কর্তৃক।

‘কলিন ফর্বস। গুলি করো না যেন।’ ‘আমি হ্যারল্ড।’

‘হ্যারল্ড,’ পুনরাবৃত্তি করল কলিন, ‘হ্যারল্ড লেভিট?’

বাক্সের স্তূপের ওপাশ থেকে বেরিয়ে আসা ঢ্যাঙা, কুঁজো লোকটাকে চেনা মুশকিল।

‘হ্যারল্ড,’ বলল কলিন, ‘শহরে কী করছ তুমি? আরচার বলল তুমি নাকি চলে গেছ?’

‘গিয়েছিলাম,’ স্বীকার গেল হ্যারল্ড, ‘কিন্তু আবার ফিরে এসেছি। তোমার সাথে দেখা করা জরুরি। তোমার অপেক্ষাই করছিলাম আমি। চলো, এবার কেটে পড়া যাক। আমাদের কারও জন্যেই ওয়াগোনার নিরাপদ নয়। নদীর কিনারে দুটো ঘোড়া রেখে এসেছি।’

স্যালুনের দেয়াল থেকে সরে এল কলিন, পাশে এসে দাঁড়াল হ্যারল্ড। তারপর একসাথে ছুটতে শুরু করল ওরা। প্রধান রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে এসে গতি কমাল। পেছনে তাকাল কলিন।

‘তুমি কোথায় গায়েব হয়েছে প্রথমে বুঝতে পারবে না ওরা,’ বলল হ্যারল্ড।
‘কিন্তু আমি আর দৌড়তে পারছি না, বুড়িয়ে গেছি তো!’
‘যদূর মনে পড়ে,’ বলল কলিন, ‘এটা তোমার মুদ্রাদোষ। আগে সারাক্ষণ বলতে, বুড়িয়ে গেছি তো, আর দুজনের সমান খাটুনি খাটতে। বাজি রাখতে পারি, দরকার হলে সারারাত দৌড়াবে তুমি।’

‘তার অবশ্য দরকার হবে না,’ বলল হ্যারল্ড। ‘এবার কিছুক্ষণ কোথাও বসে কথা বলব আমরা। ওদিকে রাস্তায় দারুণ দেখিয়েছ কিন্তু তুমি, শুটিংয়ের কথা বলছি।’

‘দেখেছ?’

‘হ্যাঁ, রেস্টরার কোণেই তো ছিলাম। সন্ধ্যা নামামাত্র শহরে ঢুকে পড়ি আমি, তোমাকে কোথায় পাওয়া যাবে জানা ছিল না, কিন্তু দেখলাম হোটেলের বারান্দাতেই বসে আছ। হঠাৎ দেখলাম রাস্তার দুদিকে হাঁটা ধরেছে কনারস আর মেইন। তার পরই গুলির আওয়াজ হলো। হোটেলের কোণ ঘুরে তুমি উধাও হলে, বিল ওয়ারেন তোমাকে অনুসরণ করল, কিন্তু দেরি করে ফেলল সে। বিল ছেলোটো কথাবার্তায় এত বেপরোয়া, কাজে লবডঙ্কা, নিজের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত থাকে।’

‘চারজন ছিল ওরা,’ বলল কলিন, ‘প্যাটেনকে স্যালুনে ঢুকতে দেখেছি, পেছনের দরজা গলে বেরিয়ে এসেছিল কিনা কে বলবে!’

‘আমার কপাল ভাল বলতে হয়,’ বলল হ্যারল্ড, ‘ওর চোখে ধরা পড়িনি!’

শহর সীমান্তে নদীর কাছে এসে পড়ল ওরা। থামল। আবার পেছনে তাকাল কলিন।

‘এবার সত্যিকার অর্থে পিছু ধাওয়া শুরু হবে,’ আস্তে করে বলল ও, ‘এতক্ষণ মিচেলের উসিলা দেখাচ্ছিল, এবার কনারস যোগ হলো।’

‘যে করেই হোক তোমাকে খতম করার চেষ্টা করবে ওরা,’ বলল হ্যারল্ড।

‘কেন?’

‘তুমি ড্যানিয়েল ফর্বসের ছেলে তাই।’

‘কী বোঝাতে চাইছ, হ্যারল্ড?’

‘আগে এসো, কোথাও বসা যাক, তারপর বলা যাবে,’ বলল হ্যারল্ড। ‘বললাম না, বয়স হয়েছে, বেশি ছোটোছুটি শরীরে সয় না।’

চাপা হাসি হাসল কলিন।

নদীর দিকে এগোল ওরা। হ্যারল্ডের রেখে যাওয়া ষোড়া দুটো যথাস্থানেই পাওয়া গেল, ওগুলোর কাছাকাছি উপড়ে পড়া একটা গাছের গুঁড়িতে বসে পড়ল দুজন। পিস্তল লোড করে নিল কলিন, হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল, তারপর পাইপে তামাক ভরে জ্বালল, অপেক্ষায় রইল। গালের ভিতর তামাকের পিণ্ডটাকে বাগে আনবার চেষ্টা করছে হ্যারল্ড।

‘এদিকে কেউ আসছে দেখলেই পগার পার হয়ে যাব আমরা,’ বলল হ্যারল্ড, ‘ওই ষোড়াটা মেয়ে-জামাইকে না বলে তোমার জন্যে নিয়ে এসেছি, স্যাডলব্যাগে কিছু খাবার দিয়ে দিয়েছে মেয়েটা।’

‘ওগুলো সম্ভবত কাজেই লাগবে,’ শুকনো কণ্ঠে বলল কলিন।

আমারও তাই ধারণা,' সায় দিল হ্যারল্ড, 'কয়েকটা দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে তোমাকে-ওদের সঙ্গে যে ক'দিন যোগাযোগ করা না যাচ্ছে।'

‘ওরা? ওরা কারা?’

‘টেরি জেলারম্যান, টমাস টম্পসন, আরথার শেরিডান আর হভো স্টার্ন।’

‘কাল তিনজনের নাম বলেছিলে।’

‘হ্যাঁ, স্ট্যামপিডের দিন টেরি, টমাস ও আরথার আমাদের সঙ্গে ছিল, হভো মিস করেছে ব্যাপারটা, কিন্তু র‍্যাঞ্চ হাউসের লড়াইতে ও ছিল। টমাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব নাও হতে পারে, তোমাকে খবর দিতে ওয়াইওমিংয়ের পথে রয়েছে ও। কয়েকদিন পালিয়ে থাকার পর ওয়াগোনারে এসেছিলাম আমি, লুকিয়ে থাকারই কথা ছিল, কিন্তু কী ভেবে একদিন শহরে ঢুঁ মারলাম এবং জড়িয়ে পড়লাম বামেলায়। টমাস যদি তোমার নাগাল না পায় সেই কথা ভেবে ওয়াগোনারে এসে অপেক্ষা করছিলাম।’

মাথা চুলকাল কলিন। ‘বুঝলাম না।’

‘প্রথম থেকে শুনতে চাও?’

‘অবশ্যই।’

‘অনেক পেছনে যেতে হবে তা হলে, ওয়ারেন ম্যাকমিলান র‍্যাঞ্চ কিনে বেসিনে হাজির হওয়ার পরই ব্যাপারটা শুরু, অনেক কিছু ঘটেছে এরপর, সব বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে, অত কথার দরকারও নেই, সব কিছুর সারাংশ হচ্ছে: ওয়ারেনের খায়েশ ছিল বেসিনের সবাই তার কথায় নাচবে; সমবায়ের ভিত্তিতে গরু বাজারে চালান দেয়ার কথাবার্তা হচ্ছিল, সেখানেও মাতবরি ফলানোর চেষ্টা করেছে সে, হোমস্টিডারদের উৎখাত করার চেষ্টা করেছে, বেসিনের ক্রীকগুলোকে শুকিয়ে যেতে দেয়া যাবে না-এরকম একটা পুরোনো চুক্তির উসিলায় তিনটে ক্রীকে বাঁধ দিতে চেয়েছে-এমনি আরও অনেক আছে-প্রত্যেকবার ওর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তোমার বাবা, রুখে দিয়েছে ওকে। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও ব্যাপারটা লড়াইয়ের দিকে মোড় নেয়নি, তবে লড়াই যখন শুরু হলো, বেসিন থেকে বহুদূরে তার সূচনা, মোক্ষম আঘাত হানল ওয়ারেন। কিন্তু সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হলো আমরা ওর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই যোগাড় করতে পারিনি। এমনকী স্প্রিংগারভিল ড্রাইভের ঘটনাটাও ওয়াগোনারের কেউ জানে না। কেউ না।’

সামনে ঝুঁকল কলিন ফর্বস। ‘স্প্রিংগারভিল ড্রাইভ? কী ঘটেছিল স্প্রিংগারভিল ড্রাইভে?’

‘মাস আড়াই আগের কথা, প্রায় এক হাজারের মত একটা গরুর পাল স্প্রিংগারভিলে চালান দিয়েছিলাম আমরা। সাতজন কাউহ্যান্ড, একজন-কুক মোট আটজনের ট্রেইল ক্রু। ড্রাইভের নেতৃত্বে ছিল আরনেস্ট হল। স্প্রিংগারভিলের পথটা এমন কিছু দুর্গম নয়, গরু সামলানোর জন্যে সাতজন কাউহ্যান্ডই যথেষ্ট, চলার পথে পানির অভাব নেই, দুটো শহর পার হতে হয়, আগেও কয়েকবার নির্বিঘ্নে গরু নিয়ে গেছি আমরা। সাতদিন, বড়জোর আটদিন লাগে সব মিলিয়ে। দু’সপ্তাহর মধ্যে ফিরে আসা উচিত ছিল ওদের, কিন্তু ফিরল না। আরও কয়েকটা

দিন অপেক্ষা করার পর ব্যাপার কী জানার জন্যে আমি আর তোমার বাবা স্প্রীংগারভিলে রওনা দিলাম।

‘স্প্রীংগারভিলে পৌছানোর পর জানতে পারলাম গরু বিক্রি করে যথারীতি টাকা নিয়ে ফিরে গেছে আমাদের লোকেরা। লম্বা, ছিপছিপে একলোক নিজেকে আরনেস্ট হ'ল পরিচয় দিয়ে টাকা গ্রহণ করেছে, লোকটার চোখজোড়া নীল। কিন্তু তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে আমাদের আরনেস্ট হ'ল মোটাসোটা খাটো মানুষ এবং ওর চোখ সবুজ। গরুর পাল ব্যাকট্রাক করা শুরু করলাম আমরা। জানা গেল আমাদের আরনেস্ট রসদপত্রের জন্যে লুডলোতে যাত্রাবিরতি করেছিল, স্প্রীংগারভিলের নিকটতম শহর ওটা, মাত্র দু'দিনের পথ। লুডলো থেকে স্প্রীংগারভিল পর্যন্ত পুরো এলাকা চষে বেড়লাম আমরা এবং লুডলোর মাইল বার দূরে একটা রক্ষ জায়গায় পেলাম কবরগুলো।’

পাথরের মত বসে রইল কলিন।

‘মোট পাঁচটা,’ বলল হ্যারল্ড, ‘বাকি তিনটেও হয়তো ছিল কোথাও, আমরা পাইনি। গুলি করে হত্যা করা হয়েছে ওই পাঁচজনকে, আমাদের লোক সবাই, আরনেস্টও ছিল; রূপ উইলিস, ফ্রেড সিবার্ট আর ম্যাট ওল্ডফিল্ডের কোন খোঁজ পাইনি, ওরা মারা গেছে ধরে নিয়েছি আমরা। আবার এমনও হতে পারে ভয় দেখিয়ে ওদের তাড়িয়ে দিয়েছে ওরা, কিংবা নিজেরাই বিকিয়ে গেছে; পালাতে পারলে ভবিষ্যতে ওদের মুখ খোলার সম্ভাবনা আছে, এ-দিক থেকে চিন্তা করলে ওদের হত্যা করাই স্বাভাবিক।’

‘তারমানে লুডলো আর স্প্রীংগারভিলের মাঝামাঝি কেউ আমাদের গরু ছিনিয়ে নিয়েছে এবং ওগুলো বিক্রির টাকা হ'জম করেছে, এই তো?’

‘হ্যাঁ। কাজটা কার প্রথমে আমরা বুঝতে পারিনি। তোমার বাবা এটাকে কোন আউট-ল দলের অপকর্ম বলে ধরে নিল, আমিও তাই ভেবেছিলাম। কবরগুলো পাওয়ার পর শেরিফের সঙ্গে কথা বলতে আবার স্প্রীংগারভিলে ফিরে গেলাম আমরা, সোজা স্যালুনে গিয়ে ঢুকলাম প্রথমে, গলা না ভিজিয়ে আর পারছিলাম না। অনেকক্ষণ মদ খেলাম আমরা দুজনেই। স্যালুনের বারটেন্ডার তোমার বাবাকে চিনে ফেলল-স্টোনি রিভার বেসিনের পুরোনো বাসিন্দা আমরা জানত-সে জানতে চাইল ওয়ারেনের রাইডার ক্লাইভ কাসলারকে আমরা চিনি কি না। ড্যানিয়েল বলল, না। বারটেন্ডার তখন জানাল কাসলার লোকটা লম্বা, ছিপছিপে, এবং তার চোখজোড়া নীল। সপ্তাহ দুই আগে স্প্রীংগারভিলে এসেছিল সে। এসব তথ্য এক করলে কী অর্থ বেরিয়ে আসে আন্দাজ করতে পারো, কলিন? ক্লাইভ কাসলার ওয়ারেনের লোক, লম্বা, ছিপছিপে, নীল চোখ তার। আরনেস্ট হলের নাম ভাঁড়িয়ে আমাদের গরুর টাকা ছিনতাইকারীও লম্বা, ছিপছিপে এবং তার চোখও নীল। এতে হয়তো কিছুই স্পষ্ট হয় না-আবার অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়, না?’

‘কীভাবে প্রমাণ পেলে তোমরা?’

‘শেরিফের কাছে আর যাইনি। পরদিন ক্যাটলপেনে গেলাম, লোকজনের সঙ্গে কথা বললাম। ওদের অনেকেই আমাদের গরুর পাল আর ট্রেইল ক্রুর

চেহারা মনে করতে পারল। ওদের কাছে কয়েকজনের চেহারার বর্ণনা পাওয়া গেল, কনারস, প্যাটেন আর পিটার রাইটকে চিনতে কষ্ট হলো না—সব কয়টা ওয়ারেন রাইডার। দু'রাত পর আবার বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম আমরা। সেই পাঁচটা কবরের কাছে ক্যাম্প করলাম রাতে, অন্ধকার রাত, ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসে অনেক আলোচনা করলাম।

ক্ষীণ হয়ে আসছে হ্যারল্ডের কণ্ঠস্বর। ঢোক গিলল সে, তারপর আবার খেই ধরল, 'সব তথ্য যোগ করলাম আমরা, দেখলাম আদালতকে বিশ্বাস করানোর মত কোন প্রমাণই নেই আমাদের হাতে। গরুর পাল ক্রেতার হাতে তুলে দেওয়ার সময় কয়েকজন ওয়ারেন রাইডার স্প্রিংগারভিলে ছিল, এটা প্রমাণ করা গেলেও ওরাই ট্রেইলে হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী কেউ বিশ্বাস করত না, বরং লোকে বলত পেনস কর্মীদের অস্ত্রের মুখে মিথ্যে সাক্ষী দিতে বাধ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ মামলা করার কোন উপায়ই ছিল না আমাদের। মনে আছে উইলিস, সিবার্ট আর ওল্ডফিল্ডের খোঁজ করার কথা বলেছিলাম আমি, কিন্তু তোমার বাবার তখন ধৈর্য নেই, ও বলল, "প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছি আমি, হ্যারল্ড, কতটা কল্পনাও করতে পারবে না তুমি। টাকাটা আমার খুব দরকার ছিল, ওটা না হলে দারুণ মুশকিলে পড়ে যাব। গরু কেনার তালে আছে ওয়ারেন, জায়গাও কিনবে, চার্লসসহ কয়েকজন র‍্যাক্সার তাদের স্টক বিক্রি করতে এক পায়ে খাড়া, ওয়ারেন সফল হলে বেসিনে ওর অবস্থান আরও দৃঢ় হয়ে যাবে। নগদ টাকা ছাড়া ওকে ঠেকানো যাবে না।"

"তা হলে চলো টাকাটা কেড়ে নিই," বললাম আমি।

"কী ভাবে?" জানতে চাইল তোমার বাবা।

"আমি জবাব দিতে পারিনি। তোমার বাবাও তখন কোন উপায় খুঁজে পায়নি। কিন্তু র‍্যাক্সে পৌছার আগেই কর্তব্য স্থির করে ফেললাম আমরা। তোমার বাবা বলল, "ওয়ারেনের অস্ত্রই ওকে ঘায়েল করব আমরা, হ্যারল্ড চালান দেয়ার জন্যে ক্রেব্যাংকসে একপাল গরু জড়ো করেছে ওয়ারেন, আমার চেয়ে এই মুহূর্তে ওর টাকার প্রয়োজন অনেক বেশি, কয়েকদিনের মধ্যেই একটা মোটা অঙ্কের দেনা শোধ করতে হবে ওকে। আমাকে যেমন কপর্দকহীন করেছে সে, ঠিক তেমনি তার জীবনও দুর্বিষহ করে তুলবে," কিন্তু কী করবে সেই মুহূর্তে বলেনি ড্যানিয়েল। আরনেস্ট হলদের স্মৃতি রোমন্থন শুরু করেছে, আগে বলিনি, আসলে সারাক্ষণই ওদের কথা বলছিল সে, গরু খোয়া যাওয়ায় যতটা না তারচেয়ে ওদের অকাল মৃত্যুই বড় হয়ে বেজেছে ওর বুকে। ওকে প্রায়—কী বলব—পাগল করে তুলেছিল ব্যাপারটা—ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে পারছিল না কিছু, অনেকগুলো বছর ছেলেগুলো ওর হয়ে কাজ করেছে তো!"

কলিনের পাইপ নিভে গেছে। আবার জ্বালিয়ে নিল রাতের হাওয়া আলোড়ন তুলছে গাছের পাতায়, ঝিরঝির।

নড়েচড়ে বসল হ্যারল্ড। ঠোঁটের কোণ দিয়ে পিক ফেলল, বিড়বিড় করে কী যেন বলে আবার শুরু করল, "র‍্যাক্সে ফেরার তিনদিন পর ক্রেব্যাংকসের ওপর ওয়ারেনের গরু স্ট্যামপিড করলাম আমরা, তারপর আবার ফিরে এলাম এখানে।

জানতাম এ ঘটনার দায় আমাদেরই বহন করতে হবে, তোমার বাবাও তা বুঝে নিয়েছিল। ওয়ারেন রাইডাররা পিছু ধাওয়া করবে—জানা ছিল—মোটামুটি তৈরি ছিলাম আমরা লড়াইয়ের জন্যে, কিন্তু শেরিফ আর শহরের লোকজন ওদের সঙ্গে যোগ দেবে চিন্তাও করতে পারিনি, আমার মাথাও ঠিক মত কাজ করছিল না বোধ হয়।’

‘র‍্যাপ্পের লড়াইয়ের কথা শোনাও,’ বলল কলিন।

‘লড়াই বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু হয়নি। গোলাগুলি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারায় এডি, একটি পর আহত হয় তোমার বাবা, এর পরপরই আমরা বাকি সবাই আত্মসমর্পণ করি। কারণ ততক্ষণে আমার মাথা কাজ করতে শুরু করেছে, আমি ভেবে দেখলাম, শেরিফ থাকায় ঝটপট আমাদের ফাঁসিতে ঝোলাতে পারবে না ওরা, একটি সময় পেলে আসল ঘটনা সবাইকে জানানোর সুযোগ হবে। তারপর যেই বেসিন ছেড়ে যাবার শর্তে আমাদের ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলো, দেরি না করে লুফে নিলাম সুযোগটা।

‘ওয়াগোনার থেকে বিদায় নিলাম আমরা, মোট পাঁচজন, আমি, টেরি জেলারম্যান, টমাস, আরথার আর হভো। শহরের ছ’মাইল দূরে গিয়ে ওয়াইওমিংয়ের পথ ধরল টমাস, তোমার কাছে গিয়ে আসল ঘটনা খুলে বলবে; অন্যদের স্প্রিংগারভিলে নিয়ে গেলাম আমি, কাজে লাগিয়ে দিলাম, এখনও ব্যস্ত আছে ওরা; তারপর ফিরে এসে তোমার অপেক্ষায় রইলাম, কিছু না জেনে তুমি হঠাৎ হাজির হও যদি, তাই; টমাস তোমার দেখা পাবেই তার ভরসা কী? কাল রাতে তুমি জেলে এলেও ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও শেরিফের সামনে মুখ খুলতে পারিনি, সে আমাকে না ছাড়লে আবার তোমাকে খবর দিয়ে আনাতাম অবশ্য, ওকে না শুনিয়ে বলার চেষ্টা করতাম।’

‘স্প্রিংগারভিলে কী করছে ওরা?’

‘নিখোঁজ সেই তিনজনের খোঁজ করছে; ওদের হত্যা করা হয়ে থাকলে, লাশ। ওদের অবশ্য খুঁজে পাওয়ার আশা কম; ভবঘুরে ছিল, ঘুরতে ঘুরতে এসে চাকরিতে ঢুকেছিল, আবার এমনও হতে পারে—ওহ, ধেং! এখন আমরা কী করব, কলিন?’

উঠে দাঁড়াল কলিন। ‘জানি না, হ্যারল্ড। কিছু জানি না।’

‘স্প্রিংগারভিল থেকে ওদের নিয়ে ফিরতে কয়েকদিন লেগে যাবে আমার।’

‘ওরা আবার বেসিনে আসবে?’

‘কেউ ঠেকাতে পারবে না! তোমার বাবাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসত ওরা, বছরের পর বছর একসঙ্গে কাজ করেছে। আবার লড়াইয়ের সুযোগ পাবার আশাতেই সেদিন আত্মসমর্পণে রাজি হয়েছিল ওরা।’

ক্ষুব্ধ শোনাৎ হ্যারল্ডের কণ্ঠস্বর। সোজা হয়ে দাঁড়াল কলিন, বুঝতে পারছে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ওহ, এখন আর ও একা নয়! পাশে দাঁড়ানোর মত চারজন কঠিন দুর্ধর্ষ লোক পাওয়া গেছে, ওয়াইওমিং থেকে টমাস ফিরে এলে পাঁচজন হবে ওর সঙ্গী।

‘হ্যারল্ড,’ বলল ও, ‘ঘোড়ায় চাপো। যত তাড়াতাড়ি পারো ওদের নিয়ে

এসো।’

‘এ-কথাই শুনতে চাইছিলাম,’ বলল হ্যারল্ড। ‘আগামী চার-পাঁচদিন কোথায় লুকাবে? ফিরে এসে কোথায় যোগাযোগ করব?’

‘লুকাব কোথায় জানি না। তবে যোগাযোগ করার মত একটা জায়গার নাম বলতে পারি।’

‘বলো।’

‘ফর্বস র‍্যাঞ্চ। আজ থেকে পাঁচদিন পর।’

‘যদি ফিরে আসতে পারি।’

‘তা হলে ছ’দিন।’

‘পাঁচ দিনেই ফিরে আসার চেষ্টা করব। কিন্তু, কলিন, একা ওয়ারেনের সঙ্গে লাগতে যেয়ো না, কেমন? গা ঢাকা দিয়ে থেকো!’

মাথা দৌলল কলিন। হাত মেলল হ্যারল্ডের সঙ্গে, ঘোড়া পর্যন্ত এগিয়ে দিল ওকে, ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ও। তারপর গাছপালার আড়ালে অপেক্ষা করল কিছু সময়। পুরো ব্যাপারটা আবার উল্টেপাল্টে দেখল মনে মনে। হ্যারল্ডের কাছে সব শোনবার পর বারবার বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে মনটা, কই, বাবা তো আসলে অন্যায় কিছু করেনি!

রবার্ট ওয়ারেন অপরাজেয় এক অশুভ শক্তি হয়ে দেখা দিয়েছে এখানে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করে কীভাবে জিতবে ও? ওই লোকটার যুখোশ খুলে দিতে পারবে?

পাঁচ দিন সময় পাচ্ছে ও, উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

পাঁচ দিন-যদি ওয়ারেনের নাগালের বাইরে থাকা যায়!

দশ

ঘণ্টাখানেক স্টোনি রিভার-এর কাছে নিবিড় গাছপালার ভিতর ঘুরে বেড়াল কলিন ফর্বস, মনে মনে বেসিনের মানচিত্র উল্টে পাল্টে দেখছে আর ভাবছে আগামী চার-পাঁচ দিনে পরিস্থিতি কোন্ দিকে গড়াতে পারে। নিশ্চিত করে কিছুই বলবার উপায় নেই। ওকে ধরবার ব্যাপারটাকে ওয়ারেন কতখানি গুরুত্ব দেবে কে জানে। সব ক’জন লোক নিয়ে মাঠে নামতে পারে সে, হয়তো আঠার মত লোকে থাকবে ওর পেছনে; কিংবা হতে পারে বেশির ভাগ লোককে দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত রেখে শহরে আর র‍্যাঞ্চে দু-একজনকে পাহারায় বসিয়ে রাখবে, দেখলেই খপ্প করে ধরে ফেলবে ওকে। কোনটা ঘটে অচিরেই জানা যাবে, তবে কোন ক্ষেত্রেই তেমন লাভ হবে না ওর।

এটা অবশ্য ওর সমস্যার একটা দিক। আসল সমস্যা স্প্রিংগারভিল হত্যাকাণ্ডের দায় ওয়ারেনের ঘাড়ের চাপানো। ও এখন শেরিফের কাছে খুলে বললেও তাকে সে স্পর্শ করতে পারবে না, এমন কী কবরগুলো দেখিয়ে আনলেও

না। ট্রেইলে খুন-খারাবি আর রাসলিং নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, ওসবের জন্য অনায়াসে অজ্ঞাত আউট-ল দলকে দায়ী করা যায়। ওয়ারেন রাইডারদের জড়িত থাকবার অভিযোগ টিকবে না ধোপে।

ওয়ারেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবার আগে অকাট্য প্রমাণ যোগাড় করা দরকার। উইলিস, সিবার্ট আর ওল্ডফিল্ড এখনও বেঁচে থাকলেও ওদের খুঁজে বের করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

তা হলে?

ওয়ারেনের যে কোন একজন রাইডারকে নিংড়ে তথ্য বের করবে নাকি?

সাত সদস্যের একটা ট্রেইল জুকে পরাস্ত করতে কমপক্ষে দশ-বারজন গানহ্যান্ড প্রয়োজন, এদের ভিতর চাপের মুখে নতিস্বীকার করবার মত কেউ একজন না থেকেই যায় না। হামলায় ছিল এমন তিনজনের নাম জানা গেছে: কনারস, প্যাটেন এবং ক্লাইভ কাসলার। চাক কনারস সম্ভবত মারা গেছে, কিংবা মৃত্যুপ্রহর গুণছে। প্যাটেন কঠিন মানুষ, সে হয়তো মুখ খুলবে না। আর ক্লাইভ কাসলার সম্পর্কে কিছু জানা নেই ওর, সন্দেহ নেই গুরুত্বপূর্ণ লোক সে, নইলে আরনেস্ট হলের নাম ভাড়িয়ে গরু বিক্রির টাকা নেয়ার দায়িত্ব তার উপর বর্তাত না, হামলার নেতৃত্বও বোধ হয় সে-ই ছিল।

গাছপালার কিনারায় চলে এল কলিন ফর্বস, ওয়োগোনারের দিকে তাকাল। ওরা পালিয়ে এসেছে দু'ঘণ্টা হলো, এতক্ষণে শহরে ওদের খোঁজাখুঁজিতে ভাটা পড়বার কথা। অবশ্য এখনও সতর্ক অবস্থায় থাকবে ওরা, কিন্তু ওকে শহরে আশা করবে না। হেলারের সঙ্গে আবার দেখা করা দরকার, এটাই সবচেয়ে নিরাপদ সময়—ভাবল কলিন।

পাইপ নিভিয়ে পকেটে ঢোকাল ও, হাঁটতে শুরু করল শহরের দিকে। টোঁটের কোণে বাঁকা হাসি, এভাবে চললে নদী আর শহরের মধ্যে শিগগিরই একটা নতুন ট্রেইল জন্ম নেবে, ভাবল ও। প্রথম বাড়িটা পাশ কাটাচ্ছে, হঠাৎ একটা কুকুর হাজির হলো, গন্ধ গুল্ল, তারপর লেজ নাড়তে শুরু করল মহা আনন্দে। মৃদু হাসল কলিন। কুকুরগুলো পর্যন্ত চিনে ফেলেছে!

হেলারের বাড়ির পর্দা টানানো জানালায় আলোর আভাস, বারান্দায় উঠে এল কলিন, কান পাতল দরজায়, কোন শব্দ নেই, টোকা দিয়ে অপেক্ষায় রইল।

দরজা খুলে ওকে দেখেই চমকে উঠে ঢোক গিলল হেলার। 'তুমি এখানে কী করছ? আমি তো ভেবেছি এতক্ষণে—হায়, খোদা!'

এক পা পিছিয়ে গেল সে। ভিতরে ঢুকে দরজা আটকাল কলিন, 'হাসল। 'এখনও আমাকে খুঁজছে ওরা? এখানেই?'

'আমি কী করে জানব?' বিরক্তির সাথে বলল হেলার। 'কী জন্যে এসেছ?'

'পাঁচশো ডলার আর একটা ছোট্ট তথ্য।'

'পাঁচশো ডলার, কেন?'

'একটা জিনিস কিনতে হবে। ব্যাংকে বাবার হিসেবে পাঁচশো ডলার হবে না?'

মাথা দোলাল হেলার। 'কিন্তু সম্পত্তির বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত তো টাকা

তোলা যাবে না।’

‘তা হলে ধার দাও, রসীদ লিখে দেব।’

‘হঠাৎ পাঁচশো ডলারের দরকার পড়ল কেন?’

‘বললাম তো একটা জিনিস কিনতে হবে, ব্যস। পাব?’

‘আমার কাছে তো অত টাকা নেই, দেখি জ্যাক ফ্লেনারির কাছ থেকে আনা যায় কি না।’

‘সেটাই করো।’

‘ঠিক আছে।’

‘আজই দরকার।’

‘তুমি বললে এখনি যাই।’

‘না, তার আগে একটা কথা বলো, চাক কনারস এখন কী অবস্থায়?’

‘পটল তুলেছে।’

এমন কিছুই শুনবে জানা ছিল, তবু চমকে উঠল কলিন। আরেকটা লাশ যোগ হলো ওর নামের সাথে, আরেকটা! মাথা থেকে টুপি খুলে চুলে আঙুল চালানোর ফাঁকে মুহূর্তের জন্য ঢালের মত ওটা ধরে রাখল মুখের সামনে, অভিব্যক্তি গোপন করল।

‘ঘণ্টা খানেক আগে শেরিফের সঙ্গে আলাপ হলো,’ বলল হেলার। ‘ওর কাছেই শুনলাম রাস্তায় কয়েকবার ফাঁকা গুলি করে সে নাকি শেরিফকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, যাতে বিনা বাধায় খতম করা যায় তোমাকে; আরচারের মতে আত্মরক্ষার জন্যই তুমি কনারসকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছ। স্যালুনের দরজায় দুজন লোক দাঁড়ানো ছিল, ওরা সাক্ষী দিয়েছে, কনারসই আগে গুলি ছুড়েছে; যাই হোক তারপরও তোমাকে খুঁজছে আরচার, গ্রেপ্তার করে আটকে রাখবে, তোমার নিরাপত্তার খাতিরেই নাকি এটা করা দরকার।’

‘নিরাপত্তার নিকুচি করি আমি!’

‘বেসিনে আরও সম্ভ্রাস চায় না আরচার।’

‘তা হলে ওকে বলো ওয়ারেন রাইডারদের বেঁধে রাখতে।’

‘ওদের লাইনে রাখার ব্যাপারে ওয়ারেনের ওপর ভরসা করছে ও।’

‘সে বরং আমার বিরুদ্ধেই লেলিয়ে দেবে তাদের। আচ্ছা, ক্লাইভ কাসলারকে কতখানি জানো তুমি?’

‘ওয়ারেনের লোক, ওর টপহ্যান্ড বলতে পারো, যদিও নিজের হাতেই কাজ চালাতে পছন্দ করে ওয়ারেন।’

‘কী ধরনের মানুষ ও, মানে কাসলার?’

‘ধূর্ত, স্বল্পভাষী, ঠাণ্ডামাথার খুনী; তিরিশের মত হবে বয়স, লম্বা, ছিপছিপে। চালু পিস্তলবাজ। লোকটা অবশ্য দেখতে শুনতে ভাল। বেলিভার প্রতি কিছুটা দুর্বল, অবশ্য শ্রোবারের মৃত্যুর পর অন্য কোন পুরুষের দিকে তাকায়নি বেলিভা, বিল ওকে রাজি করানোর কম চেষ্টা করেনি, সুবিধে করতে পারেনি।’

পুরো কামরায় একটা চক্কর দিল কলিন, তারপর হেলারের মুখোমুখি দাঁড়াল। ‘ওয়ারেন বিকেলে যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?’

‘হ্যাঁ, অল্পক্ষণের জন্যে।’

‘আমি যে একটা চিঠি লিখতে বলেছিলাম, দেখিয়েছিলে ওটা?’

‘হ্যাঁ।’

‘কী বলল?’

‘মুখখিন্তি করল রীতিমত! ও বেঁচে থাকতে নাকি কোন হতচ্ছাড়া
সিন্ডিকেটকে বেসিনের ধারে কাছে আসতে দেবে না!’

হাসল কলিন। ‘আবার কবে তার সঙ্গে দেখা হতে পারে?’

‘কাল, রোজই তো শহরে আসে।’

‘দেখা হলে আমার হয়ে একটা খবর দেবে ওকে, ঠিক আছে? আর একটা
কথা জানতে চাইবে।’

‘কী?’

‘খবরটা হলো: আমরা পাঁচটা কবরের খোঁজ পেয়েছি; আর জানতে চাই অন্য
তিনজনের কবর কোথায়?’

‘পাঁচটা কবর?’ ভুরু কৌচকাল হেলার, ‘পাঁচটা কবর মানে?’

কলিন জবাব দিল না।

আবার প্রশ্ন করল হেলার, ‘তোমার বাবার গরু নিয়ে যারা স্প্রীংগারভিলে
গেছে তাদের কথা বলছ নাকি?’

‘হ্যাঁ, হেলার। তুমি বলেছিলে বাবার কাগজপত্র ঘেঁটে গরু বিক্রির টাকার
হদিস পাওনি, পাবে কী করে! ওই টাকা বাবার হাতে এলে তো! টাকাটা কোথায়
গেছে জানি না, আমাদের কাউহ্যান্ডরা কীভাবে মারা গেল তাও এখনও জানতে
পারিনি, তবে আসল খবর বের করতে বেশি সময় লাগবে না। যাই হোক,
আপাতত ওয়ারেনকে কিঞ্চিৎ উতলা করে তোলার ইচ্ছে আমার।’

‘যাতে তোমাকে হত্যা করার একটা অজুহাত পায় সে।’

‘অজুহাত তো তার আছেই!’

হেলারের কোটরাগত চোখে চিন্তার ছায়া। এক মুহূর্ত পর নীরব থাকবার পর
সে আবার বলল, ‘একটা কথা তুমি কেন বুঝতে পারছ না, কলিন? ওয়ারেনকে
হামলা করার, ওকে নিশিচু করার অধিকার তোমার আছে না! তা হলে কেন
অযথা বোঝামি করছ? অনর্থক সময় ক্ষেপণ করলে যে কোন মুহূর্তে ওদের কেউ
তোমাতে হত্যা করে বসতে পারে। প্রমাণের আশায় বসে থাকলে প্রতিশোধ নেয়া
তোমার হবে না কোনদিন।’

‘ওয়ারেনকে তুমি ঘৃণা করো কেন বলবে?’ ইঠাৎ জানতে চাইল কলিন।

‘আগেই বলেছি, যারা অন্যকে পদানত করতে চায়, তাদের আমি ঘৃণা করি।’

‘আর কোন কারণ নেই?’

‘না।’

নিঃশব্দে শিস দেওয়ার ভঙ্গি করল কলিন। সন্দেহ নেই, কিছু একটা গোপন
করছে হেলার। যখনই দেখা হচ্ছে ওয়ারেনের বিরুদ্ধে ওকে উক্ষে দেওয়ার চেষ্টা
করছে সে, হত্যাকাণ্ডে প্ররোচনা দিচ্ছে, কেন? কী উদ্দেশ্যে অ্যাটর্নির?

‘পাঁচশো ডলার চাইল, আমাকে তো তা হলে এখনি বেরোতে হয়,’ বলল

হেলার, 'অপেক্ষা করবে এখানে?'

'না, আমিও আসছি তোমার সঙ্গে,' বলল কলিন।

একসঙ্গে বেরিয়ে এল ওরা, হাঁটতে হাঁটতে সিলভার বুলেট স্যালুনের পেছনে এল।

'আমি এখানে দাঁড়াই,' বলল কলিন, 'তোমার দেরি হবে?'

'না, এই যাব আর আসব।'

একা এগিয়ে গেল হেলার। উপর দিকে তাকাল কলিন। তারা জ্বলা আকাশ। জোর বাতাস বইছে যদিও, শীত করছে না। স্যালুনের পেছনে এক কোণে অন্ধকার ছায়ায় অপেক্ষায় রইল ও, পিস্তলটা পরীক্ষা করে নিল, তারপর হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল আলগোছে। সেরাতে হেলারের ওখান থেকে মারভিনের কাছে যায় ও, খবরটা ওয়ারেন রাইডাররা যদি তার কাছেই পেয়ে থাকে, আজও সেরকম কিছু ঘটতে পারে। সাবধানীর মার নেই।

কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু ঘটল না। পাঁচ মিনিটের মাথায় ফিরে এল অ্যারন হেলার, এক তোড়া ব্যাংক নোট দিল কলিনের হাতে, টাকাগুলো পকেটে রাখল কলিন।

'টাকা দিয়ে কী করবে জানলে ভাল হত,' বিড়বিড় করে বলল অ্যাটর্নি।

'একটা জিনিস কিনব।'

'এবার কোথায় যাবে?'

'উত্তরে।'

'তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হচ্ছে?'

'জানি না। সপ্তাহ খানেক পর, কিংবা আগামীকাল, ঠিক নেই। আগাম বলার উপায় নেই।'

'ওয়ারেনকে ঘায়েল করতে পারলে—'

'ওকে ঠিকই ঘায়েল করব,' বলল কলিন, 'তবে আমার নিজের কায়দায়, হেলার। যা হোক, টাকাটার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

অন্ধকারে পা চালাল কলিন, হেলারের দৃষ্টিসীমার বাইরে এসে কোণাকৃণিভাবে নদীর দিকে এগোল। ইতিমধ্যে চাঁদ উঠেছে আকাশে, চারদিকে স্নান জ্যোৎস্না। নদীর কিনারে গাছপালার কাছাকাছি পৌঁছুতেই হঠাৎ একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল ওর চোখে। থমকে দাঁড়াল কলিন। ফাঁকায় বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি। চাঁদের আলো ঝিলিক মারছে তার উদ্যত পিস্তলের ব্যারেল।

মাথার উপর হাত তুলল কলিন। লোকটাকে এখানে দেখে দারুণ অবাক ও, মনে হচ্ছে কেউ একটা ঘুসি বসিয়ে দিয়েছে পেটে।

'সাবধান, কলিন,' বলল ছায়ামূর্তি, গলা শুনে শেরিফ জেফরি আরচারকে চিনতে পারল কলিন। 'বাধ্য না হলে তোমাকে গুলি করতে চাই না।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কলিন।

'জেফরি,' প্রায় অনুনয়ের মত শোনাৎ ওর কণ্ঠ, 'তুমি—'

'তোমাকে গ্রেপ্তার করছি আমি,' বলল আরচার, 'ওয়ারেনের সঙ্গে একটা আপোষরফায় না আসা পর্যন্ত তোমাকে জেলে ভরে রাখব, বেসিনে আরও

হত্যাকাণ্ড ঘটুক, আমি চাই না। আজ রাতে যা ঘটল, এরপর ওয়ারেনের লোকদের সামলে রাখা কঠিন হবে, কথাটা ভাল করে জানো তুমি।’

‘তা হলে ওদের ধরছ না কেন?’ বলল কলিন, ‘আজকের লড়াইটা কী আমি শুরু করেছি?’

‘তোমাকে গ্রেপ্তার করাটাই সোজা। দশবারজনকে একসঙ্গে আটকে রাখা আমার সাধের বাইরে। দুঃখিত, কলিন, আমি নাচার।’

‘আমি এ-কথা মানতে পারলাম না,’ শান্ত কণ্ঠে বলল কলিন, ‘গাছপালার মাঝে আমার ঘোড়া বেঁধে রেখেছি, ছেড়ে দাও, ভাগি।’

‘হ্যারল্ড ওর মেয়ে-জামাইয়ের ঘোড়াটা এনে দিয়েছে, ঠিক না? আবার ফিরে এসেছে সে? এখন কোথায়?’

‘আবার চলেও গেছে। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। বাবার একটা খবর জানিয়ে গেল।’

আরচার আর কিছু বলল না। মাথা দোলাল। ‘আমার ঘোড়াটা তখন নাওনি, তাই ভাবছিলাম ঘোড়া আবার পেলে কোথায়, তাই এখানে টু মারতে এসেছিলাম। নদীর কিনারার গাছপালা আগেও আরও অনেকে পালানোর সময় আড়াল হিসেবে ব্যবহার করেছে; বোঝো তো, শেরিফকে এসব দিকে খেয়াল রাখতে হয়। তোমার পিস্তলটা যে দিতে হয়, কলিন।’

‘ওয়ারেনের সঙ্গে কী রকম সমঝোতার কথা ভাবছ তুমি?’

‘ঠিক বলতে পারছি না। ওয়ারেন লোকটার বিচারবুদ্ধি আছে, একটা উপায় নিশ্চয়ই বের করবে সে। তুমি বেশিনে থেকে যাবার কথা ভাবছ না তো?’

‘থাকতেও পারি।’

‘তা হলে যে কোন মুহূর্তে তোমার প্রাণের ওপর হামলা হতে পারে, কিন্তু অন্যভাবে ব্যাপারটার সুরাহা করতে চাই আমি।’

কলিনকে কাভার করে সামনে এল আরচার, হাত বাড়িয়ে ওর হোলস্টার থেকে একটানে পিস্তলটা বের করে নিল, ঢোকাল নিজের পকেটে, তারপর পিছিয়ে গেল আবার। ‘তুমি গোলমাল না করায় খুশি হলাম,’ অস্পষ্ট স্বরে বলল সে। ‘তোমার বাবাকে আমি পছন্দ করতাম, এডিকেও ভাল লাগত। এখন তোমাদের দু’পক্ষের মাঝখানে পড়ে গিয়ে স্বস্তি পাচ্ছি না, উভয়সঙ্কট অবস্থা। অফিসে যাবার আগে আমার ঘরে কিছুক্ষণ বসব আমরা, কথাবার্তা বলব, ম্যাড কফি বানিয়ে রেখেছে নিশ্চয়ই, ওর কথা মনে পড়ে?’

মাথা দোলাল কলিন, যদিও শেরিফের স্ত্রীর কথা স্পষ্ট মনে নেই। একসঙ্গে শহরের উদ্দেশে পা বাড়াল ওরা।

‘বিকলে সেধে ঘোড়া দিতে চাইছিলে,’ ধীর কণ্ঠে বলল কলিন, ‘অথচ এখন পাকড়াও করে নিয়ে যাচ্ছ, কেন?’

‘তখন ভেবেছিলাম ঘোড়াটা পেলে চলে যাবে, বোকামি করেছিলাম, আসলে তুমি যেতে না, ঠিক?’

‘ঠিক,’ বলল কলিন, ‘মজার কথা কি জানো—’

কথা শেষ না করেই শেরিফের দিকে ঘুরল ও, চোখের পলকে সজোরে ঘুসি

হাঁকাল তার চোয়ালে, একই সঙ্গে এগিয়ে গেল ওর বাম হাত।

টলে উঠল আরচার, বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস শুরু করল। হোলস্টার হাতড়াল, কিন্তু পিস্তল বের করতে পারল না সে। তার আগেই পরপর আরও দুবার আঘাত হানল কলিন, চোয়ালে। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল শেরিফ।

আরচারের পিস্তল নিয়ে বেলেটে গুঁজল কলিন, তার কোটের পকেট থেকে নিজেরটা বের করে পিছিয়ে এল। গোঙাচ্ছে আরচার, উঠে বসবার চেষ্টা করল সে, পারল না, আবার চেষ্টা করল, এবার বসতে পারল, ফোলা গালে হাত বোলাচ্ছে।

‘তুমি আমাকে মারলে, কলিন। আজ থেকে যদি বাঁচি কাউকে, যদি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করি!...কাউকে বিশ্বাস নেই...’

উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল আরচার।

‘শান্ত হও, জেফরি,’ বলল কলিন, ‘অস্থির হয়ে না।’

দু’হাতে মুখ ঢেকে নীরবে বসে রইল শেরিফ।

‘যাও, মরো গে,’ অবশেষে ভারি গলায় বলল সে।

‘দুঃখিত, জেফরি,’ বলল কলিন, ‘আমার ইচ্ছে অবশ্য অন্য রকম।’

দ্রুত ঘোড়ার দিকে পা বাড়াল ও।

এগার

পুব বরাবর এগোল কলিন ফর্বস, শহর থেকে খানিকটা দূরে এসে ঘোড়া ঘুরিয়ে নদীর সমান্তরালে চলে যাওয়া রাস্তা ধরে চলল, একটানা কয়েক মাইল এভাবে গেছে পথটা। নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে ঠিক তার আগে একটা শাখা পথ বেরিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে উত্তরের পাহাড়সারির দিকে, ওটা ধরে ওয়ারেন স্মিথ আর গ্রেবার-র্যাঞ্চে যাওয়া যায়।

রাত, তবু সামনে প্রায় আধ মাইল পর্যন্ত পরিষ্কার দৃষ্টি চলে, বিপদ এলে আগেই টের পাওয়া যাবে। এত রাতে শহরমুখী কারু সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ, তারপরও সতর্ক থাকা ভাল। জেফরি আরচারের কাছে ভাল শিক্ষা পাওয়া গেছে: অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস বড় খারাপ জিনিস।

শেরিফকে মারধোর করে অস্বস্তি বোধ করছে কলিন। কিন্তু কী করা, উপায় ছিল না। আরচার লোকটা নিপাট ভদ্রলোক, সাহসী। অন্য কারও বেলায় যা স্বাভাবিক ছিল, ওয়ারেনের পক্ষাবলম্বন করেনি সে, নিজের স্বাধীনতা বজায় রেখেছে, আইনকে তার স্বাভাবিক ধারায় চলতে দিয়েছে, ক্ষমতার অপব্যবহার করতে যায়নি। অবশ্য আজকের অঘটনের পর ওর সম্পর্কে অবিশ্বাস্য কোন অভিযোগও যদি সে বিশ্বাস করে বসে অবাক হবে না কলিন। নিজেই শেরিফকে ওয়ারেনের দিকে ঠেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে এসেছে।

পাইপে তামাক ভরবার জন্য ঘোড়া থামাল কলিন, পরমুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল হঠাৎ, ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল। একাধিক ঘোড়ার ছুতন্ত খুরের শব্দ, এগিয়ে আসছে। ঝটপট রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে এল কলিন, এখানে ওখানে শুয়ে বসা একপাল গরুর মাঝে ঢুকে পড়ল। আবার লাগাম টেনে দ্রুত স্যাডল থেকে নেমে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, লাগামটা ধরা রইল হাতে। রাস্তা থেকে একপাল গরুর মাঝে দাঁড়ানো জিন চাপানো ঘোড়াটা ওদের চোখে নাও পড়তে পারে, আশান্বিত মনে ভাবল কলিন।

আরও কাছাকাছি এল ঘোড়াগুলো। ধীরে সুস্থে এগোচ্ছে সওয়ারীরা, বুঝতে পারল কলিন। দৃষ্টিসীমায় এল অশ্বারোহীরা, দুজন, সহজ ওদের এগোনোর ভঙ্গি, চিনতে কষ্ট হলো না ওর। বেলিন্ডা হেবার এবং ডেভিড স্পেস্টার। ওর দিকে তাকাল না, চলে গেল আপন পথে।

উঠে দাঁড়াল কলিন, আবার স্যাডলে চাপল, হঠাৎ কী ভেবে দ্রুত এগোল ওই দু'জনের উদ্দেশ্যে। রাতে শহরে মায়ের কাছে থাকবে বলেছিল বেলিন্ডা, সাপারের নিমন্ত্রণ করেছিল ওকে, স্পেস্টাইই ওকে হোটেলের বারান্দা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। কলিন ওর আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেওয়ায় মত পাল্টে এখন র‍্যাঞ্জে ফিরে যাচ্ছে বোধ হয়।

ওর ঘোড়ার খুরের শব্দে একসঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল বেলিন্ডা আর স্পেস্টার, ঘোড়া থামাল সাথে সাথে। চোখের পলকে হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল স্পেস্টার। তাকে কী যেন বলল বেলিন্ডা, হাত সরিয়ে আনল সে। রাশ টেনে ঘোড়া থামিয়ে মাথা থেকে টুপি নামিয়ে অভিবাদন করল কলিন। চোখ কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে বেলিন্ডা, মনে হলো ওর, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারল না। টুপির কিনারার নীচে এক রকম অদৃশ্য ওর চোখজোড়া।

‘তুমি কোথেকে এলে?’ সোজাসিঁটা জানতে চাইল বেলিন্ডা।

‘রাস্তার ওপাশে ছিলাম।’

‘ওত পেতে?’

বেলিন্ডার কণ্ঠে অভিযোগ, বুঝেও না বুঝবার ভান করল কলিন।

‘না, তোমাদের ঘোড়ার আওয়াজ পেয়ে সরে গিয়েছিলাম, প্রথমে চিনে উঠতে পারিনি কি না।’

‘এতক্ষণে,’ বলল বেলিন্ডা, ‘ইচ্ছে করলে বেসিন ছেড়ে অনেক দূরে চলে যেতে পারতে, অথচ যাওনি, কেন?’

‘কারণ বেসিনেই থাকছি আমি,’ বলল কলিন, ‘আর কোন প্রশ্ন?’

হঠাৎ সামনে ঝুঁকে এল বেলিন্ডা। ‘আচ্ছা, বলতে পারো, আজ আরেকটা খুন করে কী লাভ হলো? তুমি না থাকলে কী ঘটত এটা? এভাবে একের পর এক খুন করে কোন ফায়দা লুঠতে চাও? এ কেমন মানুষ হয়েছ তুমি?’

বেলিন্ডার কথায় ক্ষুব্ধ হলো কলিন, কিন্তু রাগ প্রকাশ করল না।

‘আমার অপরাধটা কোথায়, বেলিন্ডা? ইচ্ছে করে কাউকে হত্যা করেছি আমি? আমি এখানকার লোক নই? আর সবার মত বেসিনে বসবাস করার অধিকার নেই আমার? আমি কেন ডেভিড স্পেস্টারের মত নিশ্চিন্তে ওয়াগোনোর

রাস্তায় হাঁটতে পারব না?’

‘এটা কোন যুক্তি হলো না।’

‘হলো না? ওয়াগোনারের আজকের ব্যাপারটার কথাই ধরো, দোষটা কি আমার ছিল?’

‘লোকে বলাবলি করছে পুরোনো বিরোধ জিইয়ে রাখাই তোমার বেসিনে আসার উদ্দেশ্য।’

‘তার প্রয়োজনও হতে পারে—’

‘কেন?’

‘অনেক কারণেই—’

‘ঠিক আছে,’ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল বেলিভা, ‘ধরে নিলাম প্রয়োজন’ হলো, তারপরও মানুষ হত্যাকে কি তোমার খুব ভাল কাজ বলে মনে হয়?’

‘চাক কনারসকে শখে মেরেছি ভাবছ নাকি?’

‘জানি না। হ্যাঁ অথবা না, দুটোই হতে পারে, কিন্তু আসল কথা লোকটা মারা গেছে। তুমি যতক্ষণ এখানে আছ খুনোখুনি চলবেই, ঠেকানো যাবে না।’

‘সেজন্যে লেজ তুলে পালাতে হবে আমায়?’

‘হ্যাঁ।’

‘ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবে দেখছ না তুমি, বেলিভা। আসলে মনে মনে চাইলেই সব অন্যায় অসুন্দর ভেসে যায় না, ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে লড়াই করতে হয়, তোমাকে তোমার বিশ্বাসের পক্ষে দাঁড়াতে হবে...আচ্ছা, তুমি আরনেস্ট হলকে চিনতে? আমাদের র‍্যাঞ্জে ছিল?’

‘হ্যাঁ। সে তো কাজ ছেড়ে চলে গেছে।’

‘না, মারা গেছে ও। স্প্রিংগারভিলে যাবার পথে হত্যা করা হয়েছে ওকে। ওর সঙ্গে আমাদের আরও সাতজন লোক প্রাণ দিয়েছে। নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে ওদের।’

‘আমি-আমি-এ কথা তো জানতাম না! কিন্তু তার সাথে ওয়ারেনের কী—’

‘ক্লাইভ কাসলারকে জিজ্ঞেস করে দেখো।’

‘ক্লাইভ?’

‘চেনো না?’

‘চিনি! আমি-কলিন, ঠিক কী বলতে চাইছ?’

মাথা নাড়ল কলিন। ‘ক্লাইভকে জিজ্ঞেস করো।’

‘যদি দেখা হয়—’

থেমে গেল বেলিভা, হঠাৎ ভয়ের ছায়া পড়ল চেহারায়, যেন বুঝে গেছে ভয়ঙ্কর কোন কথা শুনতে হবে।

‘বেলিভা,’ বলল কলিন, ‘আগামীকাল রাতে তোমাদের ওখানে সাপার খেতে যাব বলেছিলাম, তা বোধ হয় পারব না। অন্য একদিন আসলে হয় না?’

মাথা দোলাল বেলিভা, কিন্তু ও কী বলতে চায় বুঝতে পেরেছে কি না ধরতে পারল না কলিন।

‘বলো তো, কলিন,’ জানতে চাইল বেলিভা, ‘তোমার আসল ইচ্ছেটা কী?’

‘এই একটা কথাই জানতে চাইছে সবাই,’ বলল কলিন, ‘আমার জবাবও একটাই। জানি না। ও হ্যা, তোমার ঘোড়াটা লিভারি আস্তাবলে আছে।’

‘হুয়ান এরপর ওয়োগোনারে গেলে ছাড়িয়ে নেবে,’ বলল ডেভিড স্পেস্টার। ‘অসলারকে বলে রেখেছি হুয়ান গেলে যেন ঘোড়াটা ওকে দিয়ে দেয়। কালই ওয়োগোনারে যেতে পারে সে। তোমার ঘোড়াটা কোথায় ছেড়ে দিয়ে এসেছে জিজ্ঞেস করে জেনে রাখব।’

কথা বলবার আগে এতক্ষণ কান খাড়া করে ওদের কথা শুনছিল ডেভিড স্পেস্টার, কাসলারের প্রশঙ্গ উঠতেই বিড়বিড় করে কী যেন বলেছে সে, লক্ষ্য করেছে কলিন, কাসলারকে বোধ হয় পছন্দ করে না স্পেস্টার, ভাবল ও।

‘তোমাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হতাম,’ বলল বেলিভা, ‘কোন সমস্যাই সমাধানের অতীত নয়, এই ব্যাপারটার সুরাহা করার কাজে কোনভাবে যদি তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম!’

‘সুযোগ আসতেও পারে,’ বলল কলিন। ‘যাক গে, একদিন তোমার বাড়ি আসব আমি, বেলিভা, তখন কথা হবে।’

সামনে ঝুঁকে বেলিভার হাতে মৃদু চাপ দিল কলিন, তারপর ডেভিড স্পেস্টারের উদ্দেশে হাত নেড়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে ছুটল।

কিছুক্ষণ পশ্চিমে এগিয়ে রাস্তা ছেড়ে একটা অনুচ্চ টিলার আড়ালে এসে ঘোড়া থামাল ও, আবার পাইপ বের করে তামাক ভরা গুরু করল। বেলিভার প্রতি প্রশ্ন কলিন, সম্ভ্রষ্ট বৃদ্ধো ডেভিড স্পেস্টারের প্রতি। ডেভিড স্পেস্টারের মনটা আসলে, ভাবল ও, কোমল, সেটা আড়াল করতেই চেহারার অমন রক্ষ করে রাখে। বেলিভাও নরম মনের মেয়ে, হানাহানি রক্তপাত চায় না। তবে সম্ভবত এবার নতুন করে ভাবতে শিখবে ও।

কিন্তু...ইঠাৎ মনে পড়ল কথাটা। হেলার বেলিভার প্রতি কাসলারের দুর্বলতার কথা বলেছিল। কতখানি দুর্বল সে?—ভাবল কলিন, বেলিভাই বা কোন চোখে দেখে তাকে? ধেং, বেলিভার মত মেয়ে খুনে ডাকাত কাসলারকে কিছুতেই ভালবাসতে পারে না!

পাইপটা পরিষ্কার করতে হবে, তেতো লাগছে তামাকের ধোঁয়া, কেমন একটা দুর্গন্ধ!

পাইপ থেকে ছাই ঝাড়ল কলিন। বার কয়েক থুতু ফেলল। তারপর আবার রাস্তার দিকে এগোল। বেলিভার প্রশ্নের উত্তরে সত্যি কথা বলেনি ও। হ্যারল্ড ওর সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে আসবার আগে একটা কাজ করতে যাচ্ছে কলিন। ঝুঁকিবহুল কাজ, কিন্তু পুরো সংস্থাটা টিকে থাকাও তো অনিশ্চিত!

রাস্তায় এসে উত্তরে বাঁক নিল কলিন। বেলিভা আর ডেভিড স্পেস্টার যেদিকে গেছে সেদিকে এগোল। বেলিভারা বড়জোর মিনিট বিশেকের পথ এগিয়ে আছে, তাই তাড়াহুড়ো করল না কলিন, ওদের অতিক্রম করতে চায় না। রাস্তাটা যেখানে বীভার ক্রীক অতিক্রম করেছে সেখানে পৌঁছে পানিতে নেমে গেল কলিন, অগভীর ক্রীকের বালুময় তলদেশ ধরে এগোল। লিভা ওয়ারেনের কথা ভাবছে মনে মনে, ক্যানসাস সিটির জাঁকজমক আর কোলাহল থেকে বঞ্চিত মেয়েটা, পাঁচশো ডলার

পেলে আবার ফিরে যাবার কথা বলেছিল, ওয়ারেনের কবল থেকে বাঁচতে চায় সে।

হেলারকে ধন্যবাদ। পাঁচশো ডলার পাওয়া গেছে তার কল্যাণে।

বাকা হাসি ফুটে উঠল কলিনের ঠোটে। লিন্ডাকে ক্যানসাস সিটিতে যেতে সাহায্য করে ওয়ারেনের আঁতে ঘা দেবে ও।

জিম হ্যাগারটি, সিভিকের প্রেসিডেন্ট, একবার প্রসঙ্গক্রমে বলেছিল: 'লড়াইয়ের কৌশল মাত্র একটা, যতক্ষণ সম্ভব লড়াই থেকে দূরে থাকবে, কিন্তু লড়াই যদি করতেই হয়, হাতের কাছে যা পাবে, যত তুচ্ছ হোক, অশোভন হোক, তাই দিয়ে আঘাত করবে' প্রতিপক্ষকে, প্রথম সুযোগেই তাকে দিশেহারা করে দিতে হবে, সামলে ওঠার সুযোগ যেন না পায়, পরাস্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্রমাগত আঘাত হেনে যাও; লড়াই মানেই লড়াই, এখানে ভদ্রতার স্থান নেই; প্রয়োজনে হীন কৌশল গ্রহণেও পিছপা হবে না, লড়াই শেষ হওয়ার পর ভদ্রতা দেখানোর প্রচুর সুযোগ মিলবে।'

জিম হ্যাগারটির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করবার সুযোগ নেই। লড়াই মানেই নোংরামি। তুমি যদি প্রতিপক্ষকে টলাতে না পারো, সে তোমাকে ছাড়বে না, পরাজয় মেনে নিতে হবে তোমাকে। এই মুহূর্তে নিরস্ত্র অবস্থা ওর, তারপরও ওয়ারেনকে বেসামাল করে দেওয়ার একটা চেষ্টা চালানো যায়!

স্প্রিংগারভিল ট্রাইলে ফর্বস র‍্যাঞ্চ রাইডারদের পরিণতি ওর জানা, হেলারের কাছে খবরটা পেয়ে চমকে উঠবে ওয়ারেন; বেলিন্ডা আরনেস্ট হল সম্পর্কে ক্লাইভ কাসলারকে প্রশ্ন করলে আরেকটা ধাক্কা খাবে ওরা; তারপর ও যদি ক্যানসাস সিটিতে যেতে লিন্ডা ওয়ারেনকে সাহায্য করে, প্রচণ্ড আঘাত লাগবে ওয়ারেনের মর্যাদায়। সন্দেহ নেই তাল হারিয়ে ফেলবে সে।

আবার যখন ঘোড়া থামাল কলিন, মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। বেসিন আসবার পর প্রথম রাত কাটানোর জায়গাটিতে, ওয়ারেন র‍্যাঞ্চের কাছে, ক্রীকের ধারে গাছপালার আড়ালে এসে পড়েছে ও। স্যাডল থেকে নেমে ঘোড়া বাঁধল কলিন। তারপর র‍্যাঞ্চের দালানগুলোর দিকে তাকাল। আলো নেই কোথাও। সবাই ঘুমাচ্ছে বোধ হয়। ঘুমাক যত ইচ্ছে। একাকী এই মুহূর্তে হামলে পড়বার পরিকল্পনা নেই ওর, অতটা বোকা ও নয়।

স্যাডলের পেছন থেকে প্রথমে বিছানা নামাল কলিন, তারপর খসাল স্যাডলটা। মাটিতে চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। পাতার ফাঁকে তারা দেখা যাচ্ছে, জুলজুল করছে। পাহাড়ের ওপাশে আর্তনাদ করে উঠল একটা কয়োটে, জবাব দিল আরেকটা। ঝিরঝির বাতাস বইছে। চোখ বুজল কলিন, কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেয়া যাক। রাতে কেউ বিরক্ত করবে না আশা করা যায়। সকালেও কারও এখানে আসবার সম্ভাবনা নেই। কেন আসবে? ওয়ারেন র‍্যাঞ্চের নাকের ডগায় ক্যাম্প করেছে ফর্বস, ভাবতেও পারবে না ওরা।

পাশ ফিরে গুলো কলিন, সকালের কথা ভাবছে। সূর্য উঠবার পর ওয়ারেনের রাইডাররা বেরিয়ে পড়বে, শহরের দিকে যাবে একদল, দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে কেউ। এবং ওর খোঁজে যাবে একটা দল। এই সুযোগে হয়তো লিন্ডার

সঙ্গে দেখা করতে পারবে ও। নইলে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সুযোগের সন্ধান। তার আগেই ওদের চোখে ধরা পড়ে গেলে কেটে পড়বে।

আবার চিত হয়ে শুলো কলিন, একটু পরেই তলিয়ে গেল ঘুম।

ভোর হওয়ার আগেই ঘুম ভাঙল, উঠে পড়ল ও। হারল্ডের মেয়ের কাছ থেকে পাওয়া সেই বাক্স থেকে ঠাণ্ডা খাবার দিয়ে নাশতা সারল। তারপর দ্রুত পালানোর সুবিধের কথা ভেবে ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপিয়ে রাখল।

এবার অপেক্ষার পাল।

ওয়ারেন র‍্যাঞ্চ জেগে উঠল ধীরে ধীরে। উঠোন থেকে সমবেত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। বাংক হাউস, র‍্যাঞ্চ হাউস আর কোরালে যাওয়া আসা করছে রাইডাররা। খাবারের ঘণ্টা বাজবার বেশ আগেই ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাল কয়েকজন। বাকিরা নাশতা শেষ হওয়ামাত্র ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলো। কয়েক মুহূর্ত পর ওয়ারেনের নেতৃত্বে এগারজনের একটা দল শহরের পথ ধরল। বিলও আছে ওই দলে, চ্যাণ্ডা কার্ঠামো দেখে লুইস প্যাটেনকে চিনতে পারল কলিন। কিন্তু ওদের প্রতি তেমন আমল দিল না ও।

এখনও দুটো জিন চাপানো ঘোড়া দেখা যাচ্ছে কোরালে। তার মানে কমপক্ষে দু'জন রাইডার রয়ে গেছে, বেশিও হতে পারে। এরাও হয়তো একটু পর বেরিয়ে যাবে। দেখা যাক।

আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। একটা লোককে বাংক হাউসের দিকে যেতে দেখল কলিন। কয়েক মিনিট পর কোরালের দিকে গেল আরেকজন, দুহাতে দুটো বাক্সে, ঘোড়ার খাবার নিয়ে যাচ্ছে বোধ হয়। কোরালে ঢুকে ফীডিং-ট্রাফে বাক্সেট খালি করল সে, তারপর বেরিয়ে এসে বাংক হাউসের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ডাকল, 'ডেস্ক, অ্যাই ডেস্ক!' জবাব পেল কি না বুঝতে পারল না কলিন। কোণাগুণিভাবে আস্তাবলের দিকে পা বাড়াল লোকটা।

আরও আধ ঘণ্টা কাটল। এর মধ্যে খড় নিয়ে আগের লোকটাই আরও একবার কোরালে গেছে। একটা লোক, ঝোলানো কাঁধ তার, পরনে অ্যাপ্রন, তার মানে বাবুর্চি, বাড়ির একপাশের একটা দরজা গলে বাইরে এল, কাপড় শুকাতো দিয়ে আবার ঢুকে পড়ল ভিতরে।

নিভে যাওয়া পাইপে টান দিল কলিন ফর্বস, দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরে রেখেছে ওটা।

বিরক্তির সঙ্গে জিন চাপানো ঘোড়া দুটোর দিকে তাকাল কলিন। ঘোড়ায় চেপে ওই দু'জনের বেরিয়ে যাবার কথা, অথচ কোন আলামতই নেই, দেখে শুনে ওদের বাইরে যাবার ইচ্ছে আছে বলেও মনে হচ্ছে না। এখনও তিনজন লোক আছে র‍্যাঞ্চে, আরও বেশিও হতে পারে; বাবুর্চি, বাংক হাউসে একজন—এখনও বেরোয়নি সে, করছেটা কী?—আরেকজন সকাল থেকে নানা কাজে ব্যস্ত, বার্নের পুঁব পাশে মুরগীকে খাবার দিচ্ছে এখন! মুরগীগুলোকে খাইয়ে তারপর বোরোবে? খোদাই জানেন!

হামাগুড়ি দিয়ে কয়েক গজ পিছিয়ে এল কলিন, উঠে দাঁড়াল, আড়মোড়া ভেঙে হাত পায়ের খিল ছাড়ানোর চেষ্টা করল। পিস্তল বের করে পরখ করল ও।

এভাবে চলতে থাকলে সারা সপ্তাহতেও লিভার সঙ্গে দেখা করা যাবে না। র‍্যাঞ্জে মোট তিনজন আছে, আবার ভাবল কলিন। বাংক হাউসে একজন-বিশ্রাম নিচ্ছে, নয়তো কোন কাজে ব্যস্ত, উঠানে এটা ওটা করছে একজন; আর বাবুর্চি নিশ্চয়ই কিচেনে। তিনজন। বেশি হতে পারে। সম্ভাবনা কম।

উঠোনটা পরিষ্কার নজরে আসে এমন জায়গায় এসে দাঁড়াল কলিন। মুরগীকে খাইয়ে এবার বার্নে যাচ্ছে লোকটা। আস্তাবলে ঢুকল সে। সময় গুণে চলল কলিন। পাঁচ মিনিট। দশ। আর বেরিয়ে এল না লোকটা।

এখান থেকে র‍্যাঞ্জে হাউসের দূরত্ব বড়জোর পঞ্চাশ গজ। পঞ্চাশ কদম। আধ মিনিটেরও কম সময়ে এই দূরত্বটুকু পোরোনো যায়, তারপর আর ছ'সাত পা এগোলেই ওই দরজাটা, ওটা গলে মেসহল আর কিচেনে ঢুকে পড়া যাবে অনায়াসে। বাবুর্চি অসতর্ক অবস্থায় থাকবে, তাকে সামলানো সমস্যা হবে না।

সমস্যা একটাই, র‍্যাঞ্জে হাউসে পৌঁছানোর আগেই বাংক হাউস বা বার্ন থেকে যদি ওদের কেউ বাইরে তাকায়! মাত্র আধ মিনিট সময় দরকার। নাও তাকাতে পারে। পরিস্থিতি মোটামুটি অনুকূল। লম্বা একটা দম নিল কলিন, ফাঁকায় বেরিয়ে এল, তারপর দ্রুত পদক্ষেপে র‍্যাঞ্জে হাউসের দিকে এগোল।

কারও চিৎকার বা পিস্তলের আওয়াজ পাওয়া গেল না। র‍্যাঞ্জে হাউসে পৌঁছে দেয়াল ঘেষে এগোল কলিন, দরজাটার কাছে এসে পড়ল। আধ খোলা দরজা, কবাটে ধাক্কা দিয়ে আরেকটু ফাঁক করল ও, তারপর পা রাখল খালি মেসহলে। রান্নাঘরে গুনগুন করে জনপ্রিয় গানের সুর ভাঁজছে কেউ একজন। লিভা? রান্নাঘরের দরজায় এসে উঁকি দিল কলিন, বাবুর্চি আলু কাটছে আর গান গাইছে। ওর কোমরে পিস্তল দেখল না কলিন, আপনমনে কাজ করছে।

বাবুর্চিকে বিরক্ত না করে ভবনের মূল অংশের দিকে পা বাড়াল কলিন। একটা নাতিপ্রশস্ত ডাইনিং রুম হয়ে পার্লারে এল ও, কেউ নেই, জানালায় পর্দা টানানো। লিভা কোথায়? এখনও ঘুমে? লিভার শোবার ঘর চেনা, সেদিকে এগোল কলিন। দরজা খুলে ভিতরে তাকাল।

বিছানাতেই পাওয়া গেল লিভাকে, জেগেই আছে, উবু হয়ে শুয়ে পত্রিকা পড়ছে।

‘হ্যালো, লিভা,’ আস্তে করে বলল কলিন।

চমকে সোজা হয়ে বসল লিভা।

‘ভূমি!’ ঢোক গিলে বলল সে।

‘হ্যাঁ। আবার এলাম।’

ঠোটে হাসি ঝুলিয়ে চৌকাঠের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল কলিন। দাড়ি কামিয়েছে সেই গতকাল সকালে, গাল ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে ধুলো মলিন পোশাক, কেমন দেখাচ্ছে খোদা মালুম। অবশ্য পুরুষের এ-চেহারা লিভার অপরিচিত নয়। কাউবয়রা প্রতিদিন শেভ করে, এমন ঘটনা বিরল।

‘তোমাকে এখানে পেলে ঠিক খুন করে ফেলবে!’ ফ্যাসফেসে গলায় বলল লিভা। নিজেকে সামলে নিয়েছে সে ইতিমধ্যে, আঙুল দিয়ে প্লাকগোছা চুল প্যাঁচাচ্ছে। ‘কি বললাম শুনেছ?’ জানতে চাইল এবার।

‘নিশ্চয়ই,’ বলল কলিন, ‘কিন্তু তার আগেই আমরা পালানো।’

‘আমরা?’ বিস্ফারিত চোখে তাকাল লিভা।

‘কেন নয়?’ বলল কলিন, ‘পাঁচশো ডলার যোগাড় করার কথা বলেছিলে না? টাকা নিয়েই তো এসেছি।’

পকেট থেকে টাকার বাড়িলটা বের করল কলিন, ছুঁড়ে ফেলল বিছানায়।

হাত বাড়তে গিয়েও থমকে গেল লিভা, এক ঝটকায় সরিয়ে নিল হাতটা।

‘আমি-কোথায় পেল এত টাকা?’

‘ভয়ের কিছু নেই,’ বলল কলিন, ‘চুরি করিনি। তোমার ইচ্ছে পূরণ হতে যাচ্ছে এবার, কী বলো? ক্যানসাস সিটিতে ফিরে যাওয়া এখন আর সমস্যা নয়।’

বিম মেরে বসে রইল লিভা, আঙুলের বিয়ের আঙটিটা ঘোরাতে লাগল আনমনে।

‘সেদিন আসলে কথার কথা বলেছিলাম, কিন্তু এখন-’ হাত দুটো এক করে কোলের উপর রাখল লিভা, ‘এখন পালানো ছাড়া গতি নেই আমার। নইলে ওরা-’

‘কী করবে, লিভা?’

‘থাক, এই প্রসঙ্গে কথা বলতে চাই না। কীভাবে যাব, বলো?’

‘র‍্যাঞ্জে এখন মোট কজন আছে?’

‘বাবুর্চিকে ধরলে তিনজন।’

‘তোমাকে আটকানোর চেষ্টা করবে ওরা?’

‘হ্যাঁ, করবে। কারণ আমার ঘর ছেড়ে বের হওয়া নিষেধ।’

লিভা হঠাৎ পালানোর জন্য খেপে উঠেছে কেন বুঝবার চেষ্টা করল কলিন। কিন্তু এখন জিজ্ঞেস করবার সময় নেই। দরজা খুলবার অস্পষ্ট শব্দ পেয়েছে ও। চরকির মত ঘুরল কলিন। লম্বা, চওড়া কাঁধালা এক তরুণ, বাংক হাউসে ঢুকেছিল যে, পার্লামেন্টে পা রাখছে।

শোবার ঘরে ঢুকবার আগে টুপি খুলে ফেলল লোকটা। ‘মিসেস ওয়ারেন,’ তার কণ্ঠে উদ্বেগ, ‘একটা কথা ছিল।’

চোখের আড়ালে যাবার ফুরসতই পেল না কলিন। দাঁড়িয়ে রইল লোকটা কখন ওকে দেখবে তার অপেক্ষায়। সতর্ক।

শোবার ঘরের দরজার দিকে ঘুরল লোকটা, বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো তার চোখ, টুপি ফেলে পাগলের মত পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল।

সে পিস্তল তুলে আনতেই ড্র করল কলিন, টিপে দিল ট্রিগার। ওর কাঁধের পাশ দিয়ে সাঁই করে গিয়ে দেয়ালে বিধল প্রতিপক্ষের বুলেট। ঝট করে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল কলিন, ফের গুলি করবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু দীর্ঘদেহী গানম্যান যেন বাতাসে বুলছে এখন, অনড়, ছাদের সঙ্গে অদৃশ্য সুতোয় যেন বেঁধে দিয়েছে কেউ। এক মুহূর্ত। পায়ের পাতার ওপরই আধপাক ঘুরল সে, তারপর আচমকা যেন ছিঁড়ে গেল অদৃশ্য সুতো, দড়াম করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল।

আতনাদ করে ছুটে এল লিভা। ‘টমি! টমি!’ মৃত গানম্যানের পাশে বসে পড়ল, কান্নার মত শব্দ বেরিয়ে আসছে তার গলা চিরে।

রান্নাঘর থেকে রাইফেল বাগিয়ে ঝাড়ের বেগে তেড়ে এল বাবুর্চি। সাথে সাথে তাকে কাভার করল কলিন।

‘ফেলে দাও ওটা,’ রাইফেলের দিকে ইঙ্গিত করে বলল কলিন। ‘এক চুল নড়বে না! মাথার ওপর তোলো দুই হাত!’

বারান্দায় পায়ের আওয়াজ। একটা ছায়া সরে গেল দরজা থেকে। ঝাট করে তাকাল কলিন। কেউ নেই। অন্য লোকটা বোধ হয়, আন্দাজ করল ও। দ্রুত দরজার দিকে পা বাড়াল। কিন্তু দোরগোড়ায় পৌঁছানোর আগেই ওয়াকোনারের দিক থেকে তীক্ষ্ণ চিংকার ভেসে এল। মানে পরিষ্কার। তৃতীয় লোকটা সাহায্যের আশায় দ্রুত কেটে পড়েছে। বাইরে তাকাল কলিন। অপসূয়মান একটা ঘোড়ার স্যাডলে ঝুঁকে থাকা সওয়ারীর কাঠামো দেখতে পেল।

আবার বাবুর্চির দিকে চোখ ফেরাল কলিন ফর্বস। মাথার উপর হাত তুলেই দাঁড়িয়ে আছে, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে কপালে, ভীত। লিভার দিকে তাকাল কলিন। নিহত কাউন্সিলের পাশেই বসা সে।

পেটের ভিতর পাক দিয়ে উঠল কলিনের, মনে হলো বমি করে দেবে। দ্রুত কয়েক বার নিঃশ্বাস নিল ও। একটু ভাল লাগল তাতে। আবার একটা খুন করল ও, হত্যা করতে বাধ্য হলো।

এখন আর ওর পক্ষে সরে দাঁড়ানো সম্ভব হবে না।

বার

স্থাপুর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে বাবুর্চি, তার কাছে এসে মাটি থেকে রাইফেল তুলে নিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল কলিন।

‘কী নাম?’ জানতে চাইল ও।

‘জর্জ উইলসন।’

‘বেশ। জর্জ, যাও, ওই ওদিকে ক্রীসকের ধারে গাছপালার মাঝে আমার ঘোড়া রেখে এসেছি, চট করে নিয়ে এসো। সাবধান, কোন কুমতলব যেন মাথায় না খেলে, আমার নিশানা সাধারণত ভুল হয় না।’

‘এখুনি আনছি, মিস্টার ফর্বস,’ বলল বাবুর্চি।

দ্রুত বেরিয়ে গেল সে।

নিহত গানম্যানের নিখর দেহের পাশে এখনও বসে লিভা, এবার ওর কাছে এল কলিন। কাঁধ ধরে লিভাকে টেনে তুলল। কাঁপছে মেয়েটা থরথর করে, নিজেকে সামলে রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

‘আমি দুঃখিত, লিভা,’ আন্তরিক কণ্ঠে বলল কলিন, ‘ইচ্ছে থাকলেও অনেক সময় এইসব এড়ানো সম্ভব হয় না। কে ও? বিশেষ কেউ?’

‘না, তবে এখানকার অনেকের চেয়ে ভাল ছিল। একমাত্র ওর কাছেই

নিরাপদ বোধ করতাম।’

‘অন্যদের ভয় পেতে, কেন?’

‘আসলে এতদিন কাউকেই ভয় লাগত না—কিন্তু সেদিন থেকে—’

‘সেদিন থেকে মানে?’

মাথা নেড়ে পিছিয়ে গেল লিভা। ‘এ-প্রসঙ্গে আমি কিছু বলতে চাই না। এখান থেকে কীভাবে পালাবে সেটা বলো তুমি।’

‘সোজা ওয়াগেনারের পশ্চিমে স্টেজ লাইনে চলে যাব আমরা।’

‘পারবে না।’

‘পানির মত সহজ,’ বলল কলিন। ‘প্রথমে ইউনিটাহ্ পাসের দিকে যাব, তাঁরপর অন্ধকার হলেই দক্ষিণে বাঁক নিয়ে স্প্রিংগারভিলের রাস্তা ধরব, কেউ পিছু ধাওয়া করলেও ভাববে পাসের দিকেই যাচ্ছি আমরা, সারারাত সেদিকেই চলতে থাকবে তারা।’

‘যদি ধরা পড়ে যাই?’

‘পড়ব না।’

‘রবার্ট ওয়ারেনকে তুমি চেনো না, কলিন। কেন সে এত সতর্ক জানো না। কোনমতেই আমাদের পিছু ছাড়বে না সে।’

‘ওয়ারেন এত সতর্ক কেন?’

‘আতঙ্কে।’

‘কিসের?’

জবাব দিল না লিভা, সঙ্গে নিতে টুকটাক জিনিস গোছাতে ঘরে চলে গেল। বারান্দায় এসে দাঁড়াল কলিন ফর্বস, অস্থির বোধ করছে। কী বলতে চাইল লিভা? রবার্ট ওয়ারেন আতঙ্কিত? কেন? স্প্রিংগারভিল হত্যাকাণ্ড জানাজানি হবার ভয়?

প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল লিভা।

‘তৈরি?’ জানতে চাইল কলিন।

‘এ-জন্যে তোমাকে না আবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়,’ মৃদু গলায় বলল লিভা। ‘রবার্ট তোমাকে সহজে ছাড়বে না।’

‘এমনিতেও আমাকে ছাড়বে না সে,’ বলল কলিন।

কলিনেরটাসহ দুটো ঘোড়ার লাগাম ধরে অপেক্ষা করছে বাবুর্চি। লিভার কাছ থেকে ব্যাগটা নিল কলিন, বেশ ভার, ব্যাগটা লিভার ঘোড়ার স্যাডলের পেছনে বাঁধল, রেকাবের ঝুল ঠিক করে দিল। এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছে বাবুর্চি, ভীত দৃষ্টিতে দেখছে ওকে। লিভা ঘোড়ায় উঠে বসলে কলিনও স্যাডলে চাপল, ফিরে তাকাল বাবুর্চির দিকে। ‘জর্জ,’ বলল ও, ‘ওয়ারেন আসার পর কিছুই গোপন কোনো না ওর কাছে। সব বলবে। তবে তার আগেই কেটে পড়া তোমার জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।’

উপর-নীচ মাথা দোলাল বাবুর্চি, কথা ফুটল না মুখে।

উত্তর-পশ্চিমে রওনা হলো ওরা। বেসিনের পশ্চিম সীমান্তে, প্রায় একদিনের দূরত্বে স্প্রিংগারভিল রোডের একটা শাখা ইউনিটাহ্ পাসে এসে যোগ হয়েছে।

ট্রেইল অনুসরণ করলেও ওদের গন্তব্য আঁচ করতে পারবে না ওয়ারেন। তবে ওদের ট্র্যাক সোজা ইউনিটাহ্ পাস রোডের দিকে গেছে দেখবার পর নিশ্চিত্তে ধরে নেবে ওখানেই যাচ্ছে ওরা। ফলে অন্ধকার হওয়ার পর, আশা করা যায়, ট্রেইল না দেখে আন্দাজেই সেদিকে এগিয়ে যাবে সে।

মাঝে মাঝে ঘোড়া দুটোকে বিশ্রাম দিতে যাত্রাবিরতি করতে হচ্ছে। কাল সকালে প্রথম কার্জ হলো লিভাকে বিদায় করা।

‘একটা ঘোড়া অচল হলেই দারুণ বিপদে পড়ে যাব আমরা,’ লিভাকে বলল কলিন। ‘আমাদের ধরতে উর্ধ্বশ্বাসে ধেয়ে আসবে ওয়ারেন রাইডাররা। ওদের এক আধটা ঘোড়া অচল হয়ে পড়লেও ক্ষতি নেই, কিন্তু আমাদের দুটো ঘোড়ার একটা অচল হলে দুজনকে একটা ঘোড়ায় চাপতে হবে। তারপর কী হবে বুঝতেই পারো।’

‘কিন্তু আমাদের দ্রুত এগোতে হয় যদি?’

‘ওরা খুব কাছাকাছি এসে পড়লে তা করতে হবে বৈকি। ধরা পড়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই, লিভা।’

‘কাল সকালে তুমিও চলো না আমার সঙ্গে?’

‘না, ধন্যবাদ। এখানে আমার অনেক কাজ।’

‘কী রকম?’

‘কবর খোঁড়া।’

‘কবর!’ তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকাল লিভা।

‘হ্যাঁ, কবর। স্প্রিংগারভিল ট্রেইলে কয়েকটা কবরের খোঁজ পাওয়া গেছে, ওগুলো খুঁড়তে হবে। আচ্ছা, তুমি জানো, মাস দুয়েক আগে ওয়ারেনের কিছু রাইডার বাইরে কোথাও গিয়েছিল কি না?’

মুখ ফিরিয়ে নিল লিভা। ‘বলতে পারব না!’

‘ক্লাইভ কাসলারকে চেনো তুমি?’

‘চিনি!’

‘ওয়ারেন র‍্যাঞ্জেই আছে এখনও?’

‘সকালে সবার সাথে সে-ও তো শহরে গেছে।’

‘কী রকম লোকটা?’

‘কিছু লোক আছে যাদের দেখলেই গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়, সেরকম। লোকটার চোখজোড়া নীল, বরফ শীতল দৃষ্টি। ওদের হাতে ধরা পড়ার সময় ক্লাইভ থাকলে-’

‘আমাদের টিকিটিরও নাগাল পাচ্ছে না ওরা,’ বলল কলিন। ‘চলো এগোনো যাক।’

দুপুরের দিকে পেছনে, অনেক দূরে একটা ধুলোর মেঘ দেখতে পেল কলিন। ঘণ্টাখানেক বাদে দূরত্ব কমে এল ওটার, মেঘের আড়ালে প্রায় ডজন খানেক ঘোড়সওয়ারের উপস্থিতি বুঝতে পারল কলিন।

‘সন্ধ্যার আগেই এখানে পৌঁছে যাবে ওরা,’ মনে মনে হিসাব কষে বলল কলিন। ‘অবশ্য আর আধঘণ্টা পর আমাদের ট্র্যাক চোখে পড়বে না, অন্ধকার হয়ে

যাবে ততক্ষণে। রাতে ওরা হয়তো যাত্রাবিরতি করবে কিংবা না থেমে পাসের দিকেও চলে যেতে পারে। আমার বিশ্বাস দ্বিতীয়টাই করবে।’

কলিন যেমন ভেবেছিল সেভাবেই এগোচ্ছে ঘটনাপ্রবাহ। প্রতিপক্ষের চেয়ে পুরো একদিনের পথ এগিয়ে আছে ও। তবে এ-অবস্থা অপরিবর্তনীয় থাকবে না। কাল বা পরশুই হয়তো প্রাণ বাঁচাতে গুলিবৃষ্টির মধ্যে প্রাণপণে ঘোড়া ছোটাতে হবে ওকে। গোধূলি বেলায় দক্ষিণে বাক নিল কলিন, একটা শুকনো ঝর্নার পাথুরে তলদেশে নেমে এল। কাল দিনের আলোয় ওয়ারেন রাইডাররা ব্যাক ট্র্যাক করে এই পর্যন্ত এসে বুঝতে পারবে কোন্ দিকে গেছে ওরা। কিন্তু ভাগ্য সহায় হলে ততক্ষণে ক্যানসাস সিটির পথে বেরিয়ে পড়তে পারবে লিভা। প্রতিপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে লাপাত্তা হয়ে যাবে কলিন।

মাঝরাত নাগাদ, বেসিনের দক্ষিণ পূব সীমান্তে পাহাড়ী এলাকায় যাত্রা বিরতি করল কলিন। জিন খসিয়ে ঘোড়াগুলোকে বিশ্রামের সুযোগ দিল। ঝুঁকি আছে, তবু আগুন জ্বালল কলিন, কফি বানাতে আর হ্যারন্ডের দেওয়া খাবার গরম করবে। এদিকে আগেই বিছিয়ে দেওয়া চাদরে শুয়ে পড়ল লিভা, ওর কাজ দেখতে লাগল। খানিক পর তৃপ্তির সঙ্গে কফির কাপে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে কলিনের কাছ থেকে খাবার নিয়ে খেল।

খাবার খাওয়া শেষ হলে আগুন নিভিয়ে দিল কলিন। লিভার পাশেই চাদর বিছাল, তারপর শুয়ে হাই তুলল সশব্দে।

‘অসুবিধে হচ্ছে না তো?’ লিভাকে জিজ্ঞেস করল ও, ‘তা হলে বলো, ঘাস বিছিয়ে গদি বানিয়ে দিই।’

‘এক রাতের জন্যে আর কষ্ট কি?’ বলল লিভা! ‘কলিন, আমার সঙ্গে তুমি ক্যানসাস সিটিতে যাবে না?’

‘বলেছি তো এখানে কাজ আছে।’

‘কিন্তু সে সুযোগ তো আর পাবে না। আমি তো কোন উপায় দেখি না।’

‘উপায় একটা সব সময়ই থাকে।’

‘না, কলিন, তুমি জানো না কার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছ। স্প্রিংগারভিল ট্রেইলে যারা মারা গেছে তাদেরও কোন সুযোগ দেয়া হয়নি।’

‘ব্যাপারটা তুমি জানো?’

‘জানি।’

‘কবে থেকে?’

‘দুদিন আগে শুনেছি। পার্লামেন্টে ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ বিল আর কাসলারকে নিয়ে ঘরে এল রবার্ট। আমি যে ঘরে আছি টের পায়নি। ওদের সব কথা শুনে ফেললাম আমি। রবার্টকে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিল, তার ভয় সেরাতে কেউ পালিয়ে যেতে পেরেছে কিনা; কিন্তু ক্লাইভ কাসলার জোর গলায় বলেছে একটা লোকও রক্ষা পায়নি—পুরো ঘটনা রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করেছে সে।’

‘তারপর তোমাকে দেখে ফেলল?’

‘হ্যাঁ। আমি এত ভয় পেয়েছিলাম তখন কী বলব, ওরা তা বুঝে ফেলে। তারপর একটা ভুল করে বসলাম, ঝগড়া করলাম রবার্ট ওয়ারেনের সাথে। মুহূর্তে

পিস্তুল বের করল ক্লাইভ কাসলার, মেরেই ফেলত বোধ হয়, বলছিল মেরে ফেলটলই চিরদিনের জন্যে আমার মুখ বন্ধ হবে। রবার্ট বলল আরেকটা উপায় আছে, সেটাই গ্রহণ করল সে, কলিন, আমরা একা হবার পর সেদিন খুব মারধোর করল আমাকে; আগেও মেরেছে, কিন্তু এর কাছে সেসব নসি, পরদিন সকালে শাসিয়ে দিল ঘর থেকে যদি বের হই আমার কপালে নাকি দুর্ভোগ আছে! ওর বলার ভঙ্গিটা যদি দেখতে! ভয়ঙ্কর!

লিভার মনের অবস্থা বুঝতে পারছে কলিন। আন্তরিক কণ্ঠে ওকে সাভুনা দেওয়ার চেষ্টা করল। 'ওসব ভুলে যাও, লিভা। কাল দুপুরের আগেই এসব পেছনে ফেলে বহুদূরে চলে যাচ্ছ, আর ভাবনা কী?'

'কী জানি,' অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল লিভা, 'কিন্তু স্বস্তি বোধ হয় কোনদিন পাব না আমি।' এই আমি আর সেই আমি হতে পারব না। একজন হত্যাকারীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল, কথাটা ভুলে থাকব কী করে! লোকটা বদরাগী আর নিষ্ঠুর জানতাম, কিন্তু তার আসল চেহারা এত ভয়াবহ ভাবতেও পারিনি।'

'স্ট্রীংগারভিল ট্রেইলে আসলে কী ঘটেছিল বলতে পারবে-যেভাবে শুনেছ?'

'ক্যাম্পফায়ারের কাছেই তোমাদের পাঁচজন রাইডারকে হত্যা করা হয়। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ওদের কাছে এগিয়ে যায় ওয়ারেনের লোকেরা, অতর্কিতে হামলা চালায়, আত্মরক্ষার কোন সুযোগই পায়নি ওরা। সেরাতে যারা গুরু পাহারায় ছিল ওদেরও হত্যা করা হয় খরগোশের মত তাড়া করে। রবার্ট ভয় করছিল কেউ হয়তো পালিয়েছে, কিন্তু ক্লাইভ কাসলার এক রকম নিশ্চিত, কেউ রেহাই পায়নি।'

'কাসলারের সঙ্গে কে কে ছিল?'

'মোট ছ'জন। বিল ওয়ারেন, চাক কনারস, লুইস প্যাটেন, এরিক মেইন, পিটার রাইট আর হেনরী রয়েস।'

'গুরু বিক্রির টাকাগুলো এখন কার কাছে?'

'তা জানি না। রবার্টের অফিস কামরায় একটা সেফ দেখেছি, কিন্তু ওটার ভেতরে কী আছে দেখার সুযোগ হয়নি কোনদিন।'

এতক্ষণ যা বললে ঠিক এ-কথাগুলোই যদি শেরিফকে বলতে পারতে?'

'পারতাম,' বলল লিভা, 'কিন্তু কী লাভ হত? আমার কথা বিশ্বাসই করত না শেরিফ। আমিই-রা প্রমাণ দিতাম কোথেকে? দু'মাস আগে যে সাতজন ওয়ারেন রাইডার দশ দিনের জন্যে বাইরে গিয়েছিল, সেটাই তো প্রমাণ করতে পারতাম না আমি।'

উঠে বসল কলিন, ভুরু কুঁচকে অন্ধকারের দিকে তাকাল। 'বাবার সমস্যাটাও ঠিক এ-রকম ছিল,' ধীরে ধীরে বলল ও, 'বাবাও কিছু প্রমাণ করতে পারেনি। আমারও একই সমস্যা।'

'তারচেয়ে চলো আমার সঙ্গে ক্যানসাস সিটিতে?'

'না, এখানে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে আমাকে।'

'কীভাবে? কেন বুঝতে পারছ না, তোমার টিকে থাকার কোন আশা নেই?'

'এখনও তো বহাল তবিয়েতেই আছি।'

এক মুহূর্ত ভাবল কলিন। ওর এই কাজটা কি ঠিক হয়েছে? কোন লাভ হবে ওর? লিভাকে অপহরণ করেছে ও-এবার এ-রকম অভিযোগ তুলবার সুযোগ পেয়ে যাবে ওয়ারেন, এই অজুহাতে ওকে গুলি করে মারতে পারবে, কেউ প্রশ্ন তুলবে না। লিভা স্টেজে চেপে বসবার পর ওরা যদি বলে কলিন ওকে হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলেছে, সেটা মিথ্যে প্রমাণ করবার জন্য লিভাকে কোথায় পাবে ও? লিভাকে সাহায্য করতে গিয়ে ওয়ারেনকে পরাজিত করবার সুযোগ কমিয়ে আনল না তো? হোক যা হবার। ওয়ারেনের দৃষ্টিতে লিভা অংশ নেয়নি। নরপশুটার হাত থেকে উদ্ধার পাবার অধিকার মেয়েটার আছে।

‘এমন নাছোড়বান্দা কেন তুমি?’ জানতে চাইল লিভা।

‘অনেক সময় ইচ্ছে না থাকলেও,’ বলল কলিন, ‘মানুষকে তার দায়িত্ব পালন করতে হয়।’

‘সেজন্যে খুন করতে হলেও?’

‘অনেক সময়।’

‘তা হলে আমি বোধ হয় কোনদিন তোমার মত মানুষ হতে পারব না। আমি আসলে বাঁচতে চাই, কলিন। জানি, আমার জীবনের তেমন মূল্য নেই, তবু।’

অস্থিরভাবে নড়েচড়ে বসল কলিন। ‘ক্যানসাস সিটিতে তোমার বন্ধু-বান্ধব নেই?’

‘ওখানে জন্মেছি, বড় হয়েছি। রবার্টের সঙ্গে কীভাবে বিয়ে হলো সেটা তো তোমাকে বলেছি। বাবার সামনে একেবারে নিখাদ ভদ্রলোকের মুখোশ পরে ছিল সে, অবশ্য এখানেও ভুলমানুষি চেহারা করে রাখে, কিন্তু ওর আসল রূপ তো আমার দেখা, তাই জীবনে যা করতে হবে ভাবিনি, স্বামীর কাছ থেকে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছি! কিন্তু উপায় কী?’

‘ক্যানসাস সিটিতে কী করবে ভাবছ?’

‘বাড়িতেই থাকব। পাটিতে যাব, নাচব-আর তোমার মত কারও অপেক্ষায় থাকব।’

‘পছন্দের কেউ নেই?’

‘কয়েকটা ছেলেকে আমার বেশ ভাল লাগত, ডিভোর্স পাওয়ার পর হয়তো ওদের একজনকে বিয়ে করতে পারি; ইচ্ছে করলে তুমি আসতে পারো আমার সঙ্গে।’

আকাশের দিকে তাকাল কলিন। জবাব দিল না।

ভোরের প্রথম আলোয় আবার রঙনা হলো ওরা, দুপুরের ঘণ্টাখানেক আগে স্প্রিংগারভিল রোডে পৌঁছল। সারা সকাল পিছু ধাওয়াকারীদের চিহ্ন চোখে পড়েনি। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর স্টেজ এল, কলিনের ইশারায় থামল ওটা। বিদায়ের আগে শেষ কথোপকথন হলো ওদের।

‘কিছুদিনের মধ্যে একবার ক্যানসাস সিটিতে যেতে পারি,’ বলল কলিন।

‘আমাদের ওখানে যাবে কিন্তু।’

হাসল লিভা, কষ্টার্জিত হাসি, ওর চোখে ক্লান্তি। দুহাতে চুলে খোঁপা বেঁধে নিল। তারপর দ্রুত এগোল স্টেজ কোঁচের দিকে।

একটু পরেই এগোতে শুরু করল স্টেজ। জানালা দিয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানাল লিভা।

আবার স্যাডলে চেপে বসল কলিন। কিছুক্ষণ আগে একটা গাছের ডাল কেটে নিয়েছিল, ওটা দিয়ে রাস্তার খুরের ছাপ মুছে ফেলল; যদিও জানে ঝানু ট্রাকারকে এভাবে ফাঁকি দেওয়া যায় না, তবে ওয়ারেন রাইডাররা ট্র্যাকিংয়ে দক্ষ নাও হতে পারে। স্টোনি রিভারের উদ্দেশ্যে এবার উত্তরে এগোল কলিন, লিভার ঘোড়াটার লাগাম ধরে রেখেছে। লিভার ঘোড়ার খুরের হালকা ছাপ দেখে অভিজ্ঞ ট্রাকার বুঝে যাবে ওটার স্যাডল খালি, তবুও খানিকক্ষণের জন্য চোখে ধুলো দেওয়া যাবে হয়তো।

ভর দুপুরে আরও একবার পেছনে ওয়ারেন রাইডারদের উপস্থিতি দেখল কলিন, কিন্তু নদী তীরের নিবিড় গাছপালা একটু পরেই ওকে আড়াল করল। ওয়্যাগোনারের উদ্দেশ্যে পুবে মোড় নিল ও, অন্ধকার নেমে আসবার পরেও থামল না, এগিয়ে চলল। সন্ধ্যায় চাঁদ উঠল। দূরে পর্বতমালার উদ্দেশ্যে উত্তরে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ও।

রাতে ক্যাম্প করতে থামল না কলিন। এতক্ষণ ভাগ্যের সহায়তা পেয়ে এসেছে, আরও দরকার, কিন্তু ভাগ্যের উপর পুরোপুরি ভরসা করে বসে থাকা ঠিক হবে না, সূর্যোদয়ের আগেই ওয়ারেনের ষণ্ডাগুলোর কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে। হ্যারল্ড ফিরে আসতে আরও তিনদিন। অর্থাৎ তিন তিনটে দিন সামনে পিছনে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এখান থেকে ওখানে ছুটে বেড়াতে হবে, যদি না ফেউ খসিয়ে কোথাও লুকানো যায়। ওদের খসানো কঠিন, তবু চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

ভোরের দিকে মেসকেলারসের পাদদেশে থামল কলিন। লিভা বোধ হয় এতক্ষণে স্প্রিংগারভিলে পৌঁছে গেছে, ক্যানসাস সিটির উদ্দেশ্যেও রওনা হয়ে যেতে পারে। লিভার কথা মনে পড়তেই মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে, একদিন হয়তো ক্যানসাস সিটিতে যাবে ও...

না।

অন্তস্তল থেকে জানে কলিন, যাবে না। আসন্ন সংঘাতের পরও যদি বেঁচে থাকে এখানেই রয়ে যাবে ও, কিংবা ফিরে যাবে ওয়াইওমিংয়ে। আসলে ওয়ারেনের চেয়ে বেশি কিছু লিভাকে দেবার নেই ওর। সীমান্তের জীবনে নাগরিক কোলাহলের অস্তিত্ব কোথায়?

ওরা দুজন দুই পটভূমির মানুষ।

সম্পূর্ণ আলাদা।

ভের

ঘন ঝোপে ভরা ক্যানিয়ন, খাড়া আর্কাশছোঁয়া দেয়াল, খালি পায়ে হয়তো এই দেয়াল বেয়ে ওঠা যাবে, কিন্তু ঘোড়ার পিঠে প্রশ্নই ওঠে না। ক্যানিয়ন মুখের মাইলখানেক ভিতরে দুপাশের দেয়াল পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেছে, কানা গলিতে পরিণত হয়েছে জায়গাটা। ফাঁদে পড়ে গেছে আবার কলিন, কঠিন ফাঁদ। গত কয়েক দিনে অন্তত তিনবার ওকে কোণঠাসা করেছে ওয়ারেন রাইডাররা, কিন্তু প্রতিবারই ফাঁকি দিয়ে কেটে পড়েছে। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে নিস্তার মিলবে না!

এদিকে আঁধার ঘনিয়ে আসছে দ্রুত। বেড়া তুলে বন্ধ করে দিয়েছে ওরা ক্যানিয়ন-মুখ। এখন আগুন জ্বালানোর জন্য কাঠ যোগাড় করে আনছে, সারারাত পাহারা দেবে। সকালে কলিন যদি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করে, ক্যানিয়নের খরায় শুকিয়ে খড় হয়ে যাওয়া ঘাসে আগুন লাগিয়ে দেবে ব্যাটারা, জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে বিনা দ্বিধায়!

ক্যানিয়ন-মুখ থেকে খানিকটা দূরে শত্রুর দৃষ্টির আড়ালে অপেক্ষা করছে কলিন। ঘোড়ার সামনের বাম পা পরীক্ষা করল ও, খুরের উপর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ফুলে ঢোল হয়ে কুণ্ঠসিত দেখাচ্ছে, পেশীতে টান পড়েছে বোধ হয়। ঘোড়াটা খুঁড়িয়ে চলছিল বলে এখানে ঢুকেছিল ও, প্যাসির চোখকে ফাঁকি দেবার আশায়, কিন্তু আশা পূরণ হয়নি।

বাইরে থাকলেও এ অবস্থায় খুব একটা লাভ হত না, ভাবল কলিন, ধাওয়া খেয়ে বেড়াতে হত, ধরা পড়বার আশঙ্কা থাকত ষোলো আনা।

হ্যারল্ডের দেওয়া এই ঘোড়াটা চমৎকার, সহিষ্ণু; পরপর পাঁচ দিন-নাকি ছয়?—শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে ওকে। একটানা পরিশ্রমে কাহিল হয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক, তবে ভাগ্য ভাল বলতে হবে পা-টা ভেঙে যায়নি!

‘ধোয়া দিয়ে বের করবে, সে সুযোগ দেব না শয়তানগুলোকে,’ আপনমনে বলল কলিন, ‘তার আগেই একটা উপায় বের করে ফেলব।’

হাঁটতে হাঁটতে ক্যানিয়ন-মুখের দিকে এগোল কলিন ফর্বস, সতর্ক, যেন শত্রুর চোখে পড়তে না হয়। শেষ বিশ গজ দূরত্ব গিরগিটির মত বুকে হেঁটে এগোল ও। মাটির সঙ্গে শরীর মিশিয়ে বাইরে তাকাল। চার জায়গায় কাঠ জড়ো করেছে ওয়ারেন রাইডাররা। লাকড়ির স্তূপের সামান্য দূরে ক্যাম্প। ছ’ থেকে আটজন লোককে দেখা যাচ্ছে। রাতের খাবার তৈরিতে ব্যস্ত দুজন। দিনের আলো নেই বললেই চলে, তবু কয়েকজনকে চিনতে পারল কলিন। ওয়ারেনের সঙ্গে আলাপে মগ্ন ডেনিস স্মিথ আর জেফরি আরচার। দাঁতে দাঁত চাপল কলিন। গত ক’দিন ধরে ধাওয়া করছে ওকে প্যাসিটা। ওর ধারণা ছিল সবাই ওয়ারেনের লোক অথচ এখন দেখা যাচ্ছে আরচারসহ আরও কয়েকজন শহরবাসী যোগ দিয়েছে।

এক অর্থে অবশ্য ভালই হয়েছে, কারণ শেষ পর্যন্ত ওয়ারেনের রাইডাররা খটখটে শুকনো ঘাসে ভরা ক্যানিয়নে কায়দামত পাওয়ার পর সকালের জন্য বসে থাকত না। শেরিফ উপস্থিত থাকায় ওকে বাঁচিয়ে রাখতে বাধ্য হবে ওরা।

ভালই হলো, ভাবল কলিন, কিছু সময় পাওয়া গেল হাতে। পালানোর জন্য সময়টা কীভাবে কাজে লাগানো যায়?

উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে যাবে, সেটা সম্ভব নয়—দৌড়াতে পারবে না ঘোড়াটা। অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার পর আগুনের পাশে যারা সতর্ক পাহারায় থাকবে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালানোর সুযোগও কম। দেয়াল টপকে ক্যানিয়নের ওপাশে যাওয়ার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু ঘোড়া ছাড়া পাহাড়ী রুক্ষ এলাকায় খুব বেশি সময় টিকে থাকতে পারবে না ও। খাবারের ভাঁড়ার শূন্য, ভ্রমাক নেই, গুলিও প্রায় শেষের পথে।

খোঁচা খোঁচা দাড়িভর্তি গাল চুলকাল কলিন। মরণ অথবা আত্মসমর্পণ—এ ছাড়া পথ নেই মনে হচ্ছে! চিৎকার করে শেরিফের কাছে আত্মসমর্পণের কথা বলে বেরিয়ে পড়বে নাকি? দৃশ্যটা কল্পনা করল ও: সোজা হয়ে মাথার উপর হাত তুলে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে, পরাস্ত। কিছুই হয়তো ঘটবে না। হেণ্ডার করে ওকে জেলে ভরে রাখা হবে সম্ভবত...কিংবা...অদৃশ্য কোন অবস্থান থেকে ছুটে আসা একটা বুলেট ওর প্রাণ কেড়ে নিতে পারে। হত্যাকারী পরে বলে দেবে ফর্বসের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব সে শুনতে পায়নি, ব্যস। ব্যাপারটা স্বভাবতই কেউ কেউ মেনে নিতে চাইবে না, সমালোচনার ঝড় উঠবে হয়তো, কিন্তু তাতে কলিন আবার প্রাণ ফিরে পাবে না!

গোল্লায় যাক আত্মসমর্পণ!

আবার পিছনে চলে এল কলিন, একটু ডানে সরল, তারপর ফের ত্রল করে এগোল সামনে। গোধূলি-ধূসর প্রকৃতি। ক্রমশ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে ছায়ারা, আর দশ পনের মিনিট পরেই নিকষ অন্ধকার নেমে আসবে। ঠিক সামনেই এক স্তূপ লাকড়ি দেখা যাচ্ছে। লাকড়ির বাঙিল হাতে এগিয়ে এল এক লোক, স্তূপটার উপর ওগুলো ফেলে আবার ফিরে গেল। চট করে অন্যান্য স্তূপ আর ক্যাম্পের দিকে তাকাল কলিন। এদিকে কারও দৃষ্টি নেই। ত্রল করে আরও সামনে এগোল ও, বেড়া গলে পৌঁছে গেল লাকড়ি স্তূপের কাছে, প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসল, সোজা হয়ে দাঁড়াল তারপর, সামনে ঝুঁকে লাকড়ি সাজানোর ভান করল, কেউ ওকে লক্ষ্য করেছে বলে মনে হলো না।

লাকড়ি হাতে আরেকজন এগিয়ে এল এবার। চট করে পেছন ফিরে দাঁড়াল কলিন। লোকটা কাছাকাছি আসামাত্র পিস্তল বের করে ঘুরে দাঁড়াল। প্রতিপক্ষের চোখেমুখে বিস্ময়ের ছাপ পরিষ্কার দেখতে পেল ও।

‘খুব আন্তে,’ বলল কলিন, ‘লাকড়িগুলো ফেলো, তারপর একসঙ্গে আবার কাঠ আনতে যাব আমরা।’

লোকটার হাত থেকে খসে পড়ল লাকড়ি। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল সে। চোয়াল ওঠানামা করল তার, কিন্তু কোন কথা বের হলো না।

‘কই, চলো,’ লোকটার দিকে এগোল কলিন, ‘নাকি আমার কথা কানে

যায়নি? আরও লাকড়ি আনতে যাচ্ছি আমরা।’

পিস্তলটা একটু নিচু করে শরীরের সঙ্গে চেপে রাখল ও, যাতে হঠাৎ করে কেউ বুঝতে না পারে। লাকড়ির অন্য তিনটা স্তূপের আশপাশে লোকজনের চলাচল টের পাওয়া যাচ্ছে, ক্যাম্পেও ব্যস্ততার আভাস। ক্যাম্পের এপাশে বেঁধে রাখা হয়েছে ঘোড়াগুলো।

‘আমার সঙ্গে এগোও,’ বলল কলিন, ‘স্বাভাবিক থাকবে, যদি বাঁচার ইচ্ছে থাকে!’

লোকটা কলিনের অপরিচিত, ওয়ারেনের রাইডার হতে পারে, কিংবা শহরবাসী কেউ। মাঝবয়সী লোক, ছোটখাট, দুর্বল স্বাস্থ্য, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

‘কোণাকৃণিভাবে ঘোড়াগুলোর দিকে এগোব আমরা,’ আবার বলল কলিন।

‘এভাবে পার পাবে না, মিস্টার!’

‘চেষ্টা করা যাক না!’

ঘোড়াগুলোর উদ্দেশ্যে এগোল ওরা।

গম্ভব্যে পৌঁছে থামল। সবচেয়ে কাছে ঘোড়াটাকে পরখ করল কলিন, জেব্রা ডান মাস্ট্যাং, পিঠে জিন বা লাগাম নেই। একটা দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে বাঁধা। কলিনের কাছে ছুরি আছে। সঙ্গের লোকটার দিকে তাকাল ও।

‘তুমি,’ বলল, ‘বরং আবার লাকড়ি আনতে চলে যাও, কিন্তু সাবধান, কোন রকম চালাকি করতে যেয়ো না। তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ জানতে পারলে ওয়ারেন তোমাকে আন্ত রাখবে না।’

‘দেখো, কিছু করব না আমি,’ বলল লোকটা, ‘কিন্তু তুমি কিছুতেই পালাতে পারবে না, কোন আশা নেই, ফর্বস, আপাতত এখান থেকে যদি যেতে পারোও আগামী কাল রাতের মধ্যেই ঠিক আবার পাকড়াও করা হবে তোমাকে।’

‘যাও তো, লাকড়ি আনো গৈ!’ ওর কথায় আমল না দিয়ে বলল কলিন।

ঘনায়মান অন্ধকারে হারিয়ে গেল লোকটা। পিস্তলটা হোলস্টারে রেখে বেল্ট থেকে ছুরি বের করল কলিন।

‘আই! হলো কী! আগুন জ্বালছ না কেন?’ ওয়ারেনের চিৎকার শোনা গেল। ‘সবাই চোখ কান খোলা রাখবে! আমার ভুল না হলে ফর্বস ব্যাটা পালানের চেষ্টা চালাবেই!’

শেরিফও কথা বলল এবার। ‘ফর্বস!’ চিৎকার করে উঠল সে, ‘তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে! শুনতে পাচ্ছ, ফর্বস?’

‘পরীক্ষার,’ বিড়বিড় করে বলল কলিন।

মাস্ট্যাংয়ের আরও কাছে এগিয়ে এল ও, ছুরির এক পোঁচে কেটে ফেলল দড়ির বাঁধন। পরমুহূর্তে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল, দু’হাটুতে ওটার পেট চেপে সামনে ঝুঁকে পড়ল, তারপর তুফান তুলে ছুটল সামনে। চোচামেচি শুরু হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে, তারপর বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি। চিৎকার করে নির্দেশ করল ওয়ারেন, শেরিফের ভারি গলার আওয়াজ ভেসে এল। বিদ্রূপের হাসি হাসল কলিন, বাড়িয়ে দিল ছুটবার গতি।

আকাশজোড়া মেঘ, একে একে অদৃশ্য হয়েছে সব তারা, চাঁদের আলো এখন ফ্যাকাসে। জোর বাতাস বইছে। বৃষ্টির পূর্বাভাস ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতে বিজলি চমকানো শুরু হলো, মেঘের গুরুগুরু গর্জন, তারপর হঠাৎ শুরু হলো ঝমঝম বৃষ্টি। এক মিনিটেই ভিজে চুপসে গেল কলিন। তবু মনে মনে খুশি হয়ে উঠল ও। এই বৃষ্টিটা কাজে আসবে, ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে ঘোড়ার ট্র্যাক। এক সপ্তাহ আগে যেখানে ছিল ঠিক সেই অবস্থায় ফিরে যাবে প্যাসি। আরচাররা বুঝতেই পারবে না বেসিনের ঠিক কোন্ জায়গায় খুঁজতে হবে ওকে। অবশ্য ইতিমধ্যে ওদের জেনে যাবার কথা, ওর সঙ্গে খাবার নেই, সুতরাং এলাকার সব কয়টা র‍্যাঞ্চারের উপর কড়া নজর রাখা হবে, যাতে রসদের খোঁজে গেলেই ওকে ধরে ফেলা যায়; কিন্তু ফর্বস র‍্যাঞ্চার ওকে খুঁজবার কথা ভাববে কি ওরা?

এই মুহূর্তে ওখানেই যাচ্ছে কলিন। অনেক আগেই র‍্যাঞ্চার যাবার কথা ছিল ওর। দুদিন আগে ওখানে হ্যারল্ডের সঙ্গে দেখা করবে বলেছিল। কোন অঘটন না ঘটলে হ্যারল্ডের সঙ্গে ফর্বস র‍্যাঞ্চারের অন্যান্য কাউন্সিলও থাকবে ওখানে।

ভোরের দিকে র‍্যাঞ্চার পৌঁছল কলিন ফর্বস, এখনও বৃষ্টি থামেনি। আন্তাবলের একপাশে ঘোড়া থামিয়ে র‍্যাঞ্চার হাউসের দিকে তাকাল ও। শীতে জমে যাবার দশা। র‍্যাঞ্চার পৌঁছেও স্বস্তি পাচ্ছে না। বৃষ্টির বরফ শীতল পানি যেন মাংস ভেদ করে হাড় স্পর্শ করছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল কলিন, একটা চাপড় দিল ওটার পাছায়, ভোরের আবহাওয়া স্বাক্ষরে হারিয়ে গেল ঘোড়াটা। পছন্দসই আশ্রয় না মেলা পর্যন্ত বৃষ্টির মধ্যে একটানা ছুটে থাকবে, পরে, বৃষ্টি থামলে ফিরে যাবে আপন ডেরায়। প্যাসি ওটার খোঁজ পেলেও ব্যাকট্র্যাকিংয়ের উপায় থাকবে না ওদের।

দু'হাত ডলতে ডলতে বার্নের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল কলিন, শরীরের আড়ষ্টতা কাটানোর চেষ্টা করল। হ্যারল্ড ফিরেছে কি না কে জানে! আদালতের পক্ষ থেকে ডার্ক পিটকে কেয়ারটেকার নিয়োগ করা হয়েছে এখানে, ওর আগমন সে সুনজরে নাও দেখতে পারে।

দু'হাতে আবার অনুভূতি ফিরে পেল কলিন, হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে পরখ করল, আলগোছে ঢুকিয়ে রাখল আবার। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল নীরব র‍্যাঞ্চার হাউসের দিকে। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। উঠোন ধরে হাঁটা ধরল ও, ঠিক এই সময় বার্নের দরজা থেকে হুমুকজারি করল একটা কণ্ঠস্বর।

‘মাথার ওপর হাত তোলা, মিস্টার!’

আদেশ পালন করে বার্নের দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল কলিন। রাইফেল বাগিয়ে এগিয়ে এল একটা লোক, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে।

‘কলিন! মনে হচ্ছিল তুমিই, কিন্তু ঠিক ঠাওর করা যাচ্ছিল না!’

দ্রুত এসে কলিনের সঙ্গে হাত মেলাল লোকটা, ছিপছিপে গড়ন তার, থ্যাংকস নাকটা চোখে পড়ে সবার আগে। ‘আমি জেলারম্যান,’ বলল সে। ‘টেরি জেলারম্যান। আমার কথা হয়তো এতদিন পর তোমার মনে নেই।’

‘কী বলো, মনে নেই মানে!’ বলল কলিন। ‘কী খবর, টেরি। ইয়ে, ঘরের ভেতর আগুন আছে? ঠাণ্ডায় যে জমে গেলাম!’

‘জ্বালিয়ে নিতে কতক্ষণ!’ বলল জেলারম্যান। ‘এসো।’

একসঙ্গে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল ওরা দুজন। দরজায় টোকা দিল জেলারম্যান, হ্যারল্ডকে ডাকল জোর গলায়।

দরজা খুলে গেল, ভিতরে বাতি জ্বালল কে যেন, ওকে এক রকম ঠেলে ভিতরে ঢোকাল জেলারম্যান। হ্যারল্ড, আরথার শেরিডান আর হন্ডো স্টার্নকে দেখতে পেল কলিন। চুলোয় আগুন জ্বলে কফি বানানোর জন্য পানি চাপানো হলো। শুকনো কাপড় বের করে দেওয়া হলো ওকে, আর গা মুছবার জন্য তোয়ালে। বার্নে নিজের অবস্থানে ফিরে গেল টেরি জেলারম্যান। জানালাগুলোর পর্দা ঠিক মত টানানো আছে কি না দেখে নিল হ্যারল্ড। গা মুছে পোশাক পাতে নিল কলিন, ওকে ঘিরে দাঁড়াল এবার সবাই।

‘আজই এসেছি আমরা,’ বলল হ্যারল্ড। ‘পথে ওয়াগোনারে থেমেছিলাম, একটা খবর শুনলাম, বিশ্বাস করব কি না বুঝছি না। এখানে তোমার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করব ঠিক করে রেখেছিলাম, তারপর কী করতাম জানি না।’

‘কফিটা শেষ হোক, তারপর আলাপ করা যাবে,’ বলল কলিন। ‘কতদিন যে কফি খাই না। পাঁচ দিনের কম না!’

‘তা হলে বেঁচে আছ কীভাবে?’ কায়দা করে বলল হন্ডো।

‘ঠেকা হলো আসল কথা,’ বলল কলিন।

পার্কারে পেটমেটা চুলোর কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল কলিন, পরিচিত কামরার চারপাশে নজর বোলাল। বাবার শোবার ঘরের দিকে চোখ গেল আপনাআপনি, মনে হলো এই বুঝি দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসবে বাবা, ভারি গলায় জিজ্ঞেস করবে: ‘সাত সকালে এত হৈ চৈ কীসের?’

‘ডার্ক পিটকে ওখানে বেঁধে রেখেছি,’ বলল হ্যারল্ড, ‘আমাদের এখানে দেখে বেজায় অসন্তুষ্ট সে। আমাদের নাকি এখানে আসার কোন অধিকার নেই! ও হ্যাঁ, ওয়াগোনারে একটা কথা সবাই বলাবলি করছে, আমার অবশ্য বিশ্বাস হয়নি।’

‘কী?’

‘তুমি নাকি মিসেস ওয়ারেনকে অপহরণ করার পর মেরে লাশ গুম করে ফেলেছ! হাহ্! মাত্র দুদিন আগে স্প্রিংগারভিলে নিজের চোখে দেখেছি ওকে, জ্যান্তই তো মনে হয়েছে!’

‘দুদিন আগে?’ পুনরাবৃত্তি করল কলিন, ‘ঠিক তো, হ্যারল্ড?’

‘বিলকুল।’

চেয়ারে গা এলিয়ে দিল কলিন, কুঁচকে উঠল ওর ভুরুজোড়া। স্প্রিংগারভিলে কী করছে লিভা? সপ্তাহখানেক আগে ওকে স্টেজে তুলে দিল, এতদিনে ক্যানসাস সিটিতে পৌঁছে যাবার কথা! মাথা নাড়ল ও, হতবুদ্ধি।

যা ইচ্ছে করুক গে সে, ওর কী? লিভা যদি ক্যানসাস সিটির বদলে স্প্রিংগারভিলে থাকবে স্থির করে থাকে, ওর কী করবার আছে?

‘যাদের কবর পাওয়া যায়নি, ওই তিনজনের কোন খবর মিলল?’ সোজা হয়ে বসে জানতে চাইল কলিন।

কাপে আবার কফি ঢেলে ওকে দিল হ্যারল্ড লেভিট।

‘নাহ! কোন চিহ্ন নেই। তবে একটা দারুণ খবর যোগাড় করেছি আমরা।’

‘কী?’

‘ওয়ারেন রাইডাররা যখন আমাদের গরু বিক্রি করছে, অ্যারন হেলার তখন স্প্রিংগারভিলে ছিল।’

উত্তপ্ত কফিতে জিভ পুড়ে যাবার দশা হলো কলিনের।

‘বলো কী?’

‘হ্যাঁ। ওখানকার জাজ, ফসেট, আমার পুরোনো বন্ধু। অনেক দিন হলো স্প্রিংগারভিলে বসবাস করছে, এখানকার অনেককেই চেনে, ওর কাছে জানতে চেয়েছিলাম এখান থেকে মাস দুয়েকের মধ্যে স্প্রিংগারভিলে কে কে গিয়েছিল, কয়েকজনের মধ্যে অ্যারন হেলারের নামও বলেছে সে। হোটেলের খোঁজ নিয়েছি, ক্লাইভ কাসলার যেদিন আমাদের গরু বিক্রির টাকা নেয়, সেদিনই হোটেলের ওঠে হেলার, বলা যায় না, দুটোর মধ্যে কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে—তবে—’

পিরিচে কফি ঢেলে ফুঁ দিয়ে জুরিয়ে নিয়ে চুমুক দিল কলিন। হেলার, ভাবল ও, মহা ধুরন্ধর লোক।

চুল্লীর আগুনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে কামরা। হেলারকে ঘিরে চিন্তার ধারা একীভূত করবার চেষ্টা করল কলিন। কিন্তু বারবার মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ক্লান্ত, অবসন্ন ও। চোখ বুজে ক্লান্তি দূর করতে চাইল। জানতেও পারল না হ্যারল্ড কখন ওর গায়ে চাদর টেনে দিয়েছে।

চোদ্দ

বেশ দেরিতে নাশতা সারল ওরা, এত বেলায় নাশতা ফর্বস র‍্যাঞ্চার ইতিহাসে নেই। ওরা যখন রান্নাঘরে নাশতার টেবিলে এসে বসল তার দু’ঘণ্টা আগেই সূর্য উঠে গেছে। এতক্ষণ একটানা ঘুমিয়েছে কলিন, ঘুম থেকে উঠবার পরও ক্লান্তি কাটেনি ওর, কিন্তু হ্যারল্ড লেভিটের কাছ থেকে সবকিছু বিস্তারিত জানবার জন্য উদ্গ্রীব।

কাজে লাগতে পারে তেমন তথ্য এখন পর্যন্ত মেলেনি। নিখোঁজ তিন রাইডারের সন্ধানে স্প্রিংগারভিল আর তার আশপাশ চষে বেড়িয়েছে ওরা।

‘খুব বেশি দূর এগোতে পারিনি আমরা,’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল হন্ডো। ‘তবু তোমার আসার অপেক্ষা করছিলাম।’

হন্ডো, মাঝ বয়সী, কঠিন চেহারা তার, অন্যদের মতই ফর্বস র‍্যাঞ্চার পুরোনো লোক। বেসিনের আদি বাসিন্দা এরা, এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা

জগৎ আছে, সংসার আছে, একটা লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করে, কিন্তু ওদেরকে এই ব্যাধির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই দেখে কলিন।

‘লিভা ওয়ারেনের কাছে শুনেছি আমাদের আটজন রাইডারের একজনও রেহাই পায়নি,’ ওদের জানাল ও, তারপর লিভাকে স্টেজ পর্যন্ত পৌঁছানোর কারণ ব্যাখ্যা করল।

‘তোমার কাজটা ড্যানিয়েলের সেই স্ট্যামপিডের মত,’ বলল হ্যারল্ড। ‘তোমার বাবা জানত ওয়ারেন আমাদের লোকদের হত্যা করেছে, কিন্তু তা প্রমাণ করার উপায় ছিল না, তাই একমাত্র বিকল্প পথটাই বেছে নিয়েছে ও, পাল্টা আঘাত হেনেছে। এবং আঘাতটা ওয়ারেনের আঁতেই লেগেছে।’

‘কিন্তু এভাবে তো কোন ফয়সালা হচ্ছে না,’ বলল কলিন, ‘স্প্রিংগারভিল হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ওয়ারেনকে জড়ানো যায় কীভাবে?’

কেউ জবাব দিল না। স্প্রিংগারভিলের হত্যাকাণ্ড আর গুরু ছিনতাইয়ের ঘটনা অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। স্প্রিংগারভিলের কাল্জ খুঁজে পাওয়া কবরগুলোর দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে; প্রমাণ করা যায়: স্প্রিংগারভিলে যারা গুরু বিক্রি করেছে তারা ফর্বস ব্যাঙ্ক রাইডার ছিল না; কিন্তু তারা যে ওয়ারেনের লোক সেটা কীভাবে বোঝাবে? ড্যানিয়েল ফর্বস যেভাবে রহস্যের মীমাংসা করেছে আদালত তা মানবে না।

প্রশ্নের ধরন বদলাল কলিন। ‘অ্যারন হেলারকে,’ বলল ও, ‘তো তোমরা সবাই চেনো, না? ওয়ারেনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে?’

‘হেলার ওয়ারেনের অ্যাটর্নি,’ বলল হ্যারল্ড লেভিট, ‘অবশ্য উপত্যকার সবাই আইনের ব্যাপারে ওর কাছেই সাহায্যের জন্যে যায়।’

‘ওর সঙ্গে বাবার সম্পর্ক কেমন ছিল?’

‘ভালই—তবে আমার বিশ্বাস তোমার বাবা ওকে ঠিক ভাল চোখে দেখত না—বিশ্বাসও করত না।’

‘কিন্তু হেলারের স্প্রিংগারভিলে যাওয়ার একশো একটা কারণ থাকতে পারে।’

‘ঠিক। কিন্তু ওখানে তার যাতায়াত খুবই কম।’

‘আচ্ছা, লোকটা বিয়ে শাদী করেনি?’

‘না। বছর কয়েক আগে একবার গুজব রটল পুবার কোন এক মেয়েকে নাকি বিয়ে করতে যাচ্ছে, ম্যাকমিলান ব্যাঙ্কটাও কেনার তোড়জোড় শুরু করেছিল সে তখন, ওকালতি ছেড়ে দিয়ে ব্যাঙ্কিং করবে। পরে অবশ্য তেমন কিছু ঘটেনি। তারপর ওয়ারেন এল, সে-ই কিনল ম্যাকমিলান ব্যাঙ্ক—এবং শুরু হলো আমাদের ঝামেলা!’

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজল কলিন। ভাবছে। হেলারে চিঠি সতর্ক করবার উসিলায় ওকে এখানে আসতে চ্যালেঞ্জ করেছে। এখানে আসবার পর ডাক্তার মারভিনের বাড়িতে ওকে হামলা করতে গেল ওয়ারেন রাইডাররা। কলিন মারভিনের ওখানে যাচ্ছে হেলার ছাড়া কেউ জানত না। কলিন ওখানে যেতে পারে অনুমান করে আগে থেকেই ওরা ওত পেতেছিল—হেলারের এই ব্যাখ্যা খুবই দুর্বল।

হেলারের আরেকটা আচরণ বেশ-রহস্যজনক। শুরু থেকেই ওকে ওয়ারেনের বিরুদ্ধে খেপিয়ে দিতে চাইছে সে, কেন? ওয়ারেনকে কেন ঘৃণা করে সে? সত্যিই কি ঘৃণা করে? ছিনতাই করা গুরু বিক্রি করবার সময় কেন স্ত্রীংগারভিলে গিয়েছিল সে? ঘটনাটা কাকতালীয়? হতে পারে। কিন্তু—

সোজা হয়ে বসল কলিন। ‘আমার ইচ্ছেটা কি শুনবে?’ বলল ও, ‘হেলারকে এখানে ধরে এনে দুটো কথা বলা। হয়তো নতুন কিছু জানা যেতে পারে।’

হেসে ফেলল হ্যারল্ড লেভিট। ‘নিশ্চয়ই। আমরা যে-কেউ দুজনই পিছলে ওয়াগোনারে ঢুকে ওকে দাওয়াত করে নিয়ে আসতে পারি। দাওয়াত নিতে সে আপত্তি তুলতে পারে, তখন জোরাঙ্গুরি করব, অসুবিধে কী!’

‘দরকার হলে পিঠে হাত বুলিয়ে দেব,’ বলল হভো।

‘আরেকটা কাজ করা যায়,’ বলল কলিন, ‘আমাদের গুরু ছিনতাইকারী যে কোন একজনকে তুলে আনতে পারি। সেদিন ক্লাইভ কাসলারের ছয় সঙ্গীর নাম লিন্ডা আমাকে বলেছে, এদের মধ্যে চাক কনারস মারা গেছে, বাকি আছে বিল ওয়ারেন, লুইস প্যাটেন, পিটার রাইট, এরিক মেইন, আর হেনরী রয়েস। কে সুবার আগে মুখ খুলতে পারে বলে তোমাদের ধারণা?’

‘বিল ওয়ারেন,’ বলল টেরি জেলারম্যান।

সায় দিল হ্যারল্ড। ‘কোন সন্দেহ নেই। ওকে কাবু করা কোন ব্যাপারই নয়।’

‘কিন্তু ধরবে কীভাবে?’

‘যে কোন দিন বেলিন্ডা গ্রেবারের ব্যাঞ্চ থেকে তুলে আনা যায়, আবার শহরে এলেন হডসন বা বেথ মেয়ারসের বাড়ি থেকেও পাকড়াও করা যেতে পারে। শহরে গেলেই স্যালুনে বসে কয়েক গ্রাস গলায় ঢেলে সোজা ওদের কোন একজনের বাড়ি হাজির হয় সে। তা, কলিন, আজই যাবে নাকি ওয়াগোনারে?’

মাথা দোলাল কলিন। এ ছাড়া আর কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না।

‘কীভাবে কী করতে হবে শোনো,’ বলল ও, ‘আমরা—’

উঠোনে-পাহারায় ছিল আরথার শেরিডান, দ্রুত এসে ঢুকল সে, থামতে বাধ্য হলো কলিন।

‘সাত আটজনের একটা দল,’ বলল শেরিডান, ‘এদিকে আসছে!’

‘ওয়ারেন?’

‘হতে পারে।’

উঠে দাঁড়াল কলিন। ‘পিট আছে না ওঘরে?’

‘আছে।’

‘ওর সঙ্গে দুটো কথা বলা যাক,’ বলল কলিন। ‘ওয়ারেনরাই যদি আসে ওদের বিদেয় করতে হবে, পিঠে পিস্তলের নল ঠেকানো থাকলে সম্ভবত সহায়তা করতে আপত্তি তুলবে না পিট। এসো।’

সব মিলিয়ে আটজন ঘোড়সওয়ার ঢুকল উঠোনে। চারজনকে চিনতে পারল কলিন—ওয়ারেন, লুইস প্যাটেন, এরিক মেইন এবং ক্লাইভ কাসলার—ওয়ারেনের পাশে লম্বা ছিপছিপে পাথরের মত কঠিন চেহারার লোকটা কাসলার না হয়ে যায়

না।

আধখোলা দরজার একটু বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডার্ক পিট, অবসন্ন দৃষ্টিতে ঘোড়সওয়ারদের দিকে তাকাচ্ছে, মেদ সর্বস্ব বিশাল শরীর তার, সারারাত নিঃশ্বাস কেটেছে, তারপর এখন আবার পিঠে ঠেকে রয়েছে কলিনের পিস্তল, আত্মারাম খাঁচাছাড়া অবস্থা!

‘সব ঠিক আছে?’ স্বভাবসুলভ চড়া গলায় জানতে চাইল ওয়ারেন।

উপর-নীচ ওঠানামা করল ডার্ক পিটের মাথা।

‘রাতে কেউ এসেছিল?’

‘নাহ।’

‘বার্ন-এ গিয়েছিলে সকালে?’

‘খামোকা কেন যাব?’

‘ক্লাইভ, জো, হেনরী-যাও, বার্ন-এ টু মেরে এসো!’ নির্দেশ দিল ওয়ারেন।
‘সম্ভাবনা কম, তবু এখানে এসে লুকিয়ে থাকতে পারে হারামীটা!’

কলিনের অনুমান ঠিক, লম্বা লোকটাই ক্লাইভ কাসলার, অন্য দু’জনকে নিয়ে বার্ন-এর দিকে গেল সে। স্যাডল থেকে নেমে হোলস্টারের পিস্তল বের করল, ঢুকে পড়ল ভিতরে। স্যাডলে নড়েচড়ে বসল ওয়ারেন। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে, চোখজোড়া ফোলা ফোলা, আরও গাঢ় হয়েছে কপালের দাগগুলো।

‘এখনও প্রচুর টাকা পাওয়ার সুযোগ আছে তোমার, পিট,’ ভারি গলায় বলল সে। ‘কাল রাতে প্যাসিকে ফাঁকি দিয়ে কেটে পড়েছে কলিন ফর্বস। কোন দিকে যে গেল! বৃষ্টিতে ট্রেইল মুছে সাফ। এদিকে এসে থাকতে পারে।’

‘এখানে আসতে যাবে কেন?’

‘যেখান থেকেই হোক খাবার যোগাড় করতে হবে তাকে,’ বলল ওয়ারেন।
‘নজর খোলা রেখো, পিট। যদি এখানে আসে, ঘায়েল করতে পারলে পাঁচশো পাবে। টাকার দরকার আছে না তোমার?’

‘তা আছে,’ নিঃপ্রাণ কণ্ঠে বলল ডার্ক পিট।

দুই সঙ্গীসহ বার্ন থেকে বেরিয়ে এল ক্লাইভ কাসলার, পিস্তল হোলস্টারে ঢোকাল। ‘কেউ নেই,’ জানাল সে। ‘আমার মতে শহরে নয়তো আরেকটা র‍্যাক্স আছে ওখানে পাওয়া যাবে শালাকে!’

‘আরেকটা র‍্যাক্স? কোন র‍্যাক্স?’ জিজ্ঞেস করল ওয়ারেন।

ক্রুর হাসি ফুটে উঠল কাসলারের ঠোঁটে। ‘আমার সম্ভেদ সত্যি নাও হতে পারে, নিজেই পরীক্ষা করে দেখতে চাই আমি, তার আগে এখান থেকে কফির পালাটা চুকিয়ে নিলে কেমন হয়?’

পিটের পেছনে ঘাপটি মেরে আছে কলিন, ওর পিস্তলের নল পিটের পিঠ স্পর্শ করেছে, রুদ্ধশ্বাসে ওয়ারেনের জবাবের অপেক্ষায় রইল ও।

‘সময় নেই হাতে,’ বলল ওয়ারেন, ‘আরও অনেক জায়গায় যেতে হবে! চলো। কথাটা মনে রেখো, পিট। পাঁচশো। অনেক টাকা।’

‘মনে থাকবে,’ দুর্বল গলায় বলল পিট।

একটু পর বিদেয় হলো ওয়ারেনরা, রেডফিল্ডের র‍্যাক্স ওদের গন্তব্য, আন্দাজ

করল কলিন।

পিস্তলটা খাণ্ডে ঢোকাল ও, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাভানা বের করে মুখ মুছল, তারপর বলল, 'চমৎকার দেখিয়েছ, পিট, কয়েকটা দিন আয়ু বাড়ল তোমার।'

কামরায় ফিরে এল পিট, থরথর করে কাঁপছে। 'আমার ওপর অযথা অত্যাচার করছ তোমরা,' বলল সে। 'আমি নিরপেক্ষ মানুষ, আদালতই আমাকে এখানে পাঠিয়েছে।'

'আবার বেঁধে ফেলো ওকে,' বলল কলিন।

জানালার কাছে এসে বাইরে তাকাল কলিন। কী বোঝাতে চাইল তখন কাসলার? নিজেই পরীক্ষা করে দেখতে চায় মানে কী? বেলিভার দিকে ইঙ্গিত করেনি তো? সম্ভব। সেরাতে ওয়ারেনের আস্তাবল থেকে পালানোর পর বেলিভার ব্যাঞ্চে গিয়েছিল ও, কথাটা নিশ্চয়ই আগে শুনেছে সে, বিলই বলেছে। একবার সাহায্যের জন্য বেলিভার কাছে গেছে, আবারও নিশ্চয়ই যাবে! মহা ধূর্ত লোক কাসলার।

বিকেলের দিকে ওয়্যাগোনারের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল ওরা: কলিন, হ্যারল্ড, টেরি জেলারম্যান এবং হভো। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিটকে পাহারা দিতে ব্যাঞ্চে থাকতে বাধ্য হলো আরথার শেরিডান।

দিনের আলোয় খোলা প্রান্তর দিয়ে এগোনো বিপজ্জনক, জানে কলিন, কিন্তু বিপদের মধ্যেই তো আছে ওরা, তা ছাড়া সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনি়ে আসবার আগেই পৌঁছুতে চায় ও। শহরের দক্ষিণে স্টোনি রিভারের দিকে কোণাকুণিভাবে এগোল ওরা, গোধূলির দিকে পৌঁছল ওখানে।

'শহরের পূর্ব দিকে একটা আস্তাবল আছে, ঘোড়াগুলো ওখানে লুকিয়ে রাখা যায়,' বলল হ্যারল্ড, 'অনেকদিন ধরে পরিত্যক্ত ওটা, খোদ মালিক ফ্রেড হাইলস, সে-ই কখনও ধারেকাছে যায় কিনা সন্দেহ।'

মাথা দোলাল কলিন। নদীর তীরে গাছপালার মাঝে ঘোড়া লুকোনোর চেয়ে ভাল হবে সেটা। এই জায়গায় আবার শেরিফের মুখোমুখি হতে চায় না ও।

'শহরে ঢুকে আগে আমি একবার রেকি করে আসব,' বলল হ্যারল্ড। 'তোমার জন্যে অপেক্ষা করার সময় এখানকার অন্ধ-সন্ধি চেনা হয়ে গেছে। এবার আর আগের মত ভুল করে ধরা পড়ব না।'

অন্ধকার আরও গাঢ় হলো। পূর্ব দিক থেকে শহরে ঢুকবে বলে ঘুরপথ এগোল ওরা। হ্যারল্ড পথ দেখিয়ে ফ্রেড হাইলসের পরিত্যক্ত আস্তাবলে নিয়ে এল ওদের, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

আধ ঘণ্টা কাটল।

অবশেষে গভীর চেহারা ফিরে এল হ্যারল্ড।

'ভাল দিনই বেছে নিয়েছি,' বলল সে, 'ওয়ারেন এখন শহরে। বিল, এরিক মেইন আর লুইস প্যাটেনকেও পলকের জন্যে দেখলাম, ওরা ছাড়াও ওয়ারেনের বেশ কয়েকজন রাইডার এখন এখানে। রাস্তায় টহল দিচ্ছে জেফরি আরচার।

চার্লস ম্যুসেলমান আর ডেনিস স্মিথকেও দেখেছি। মনে হচ্ছে বেসিনের অর্ধেকের বেশি লোক এখন ভিড় জমিয়েছে এখানে। এর মানে হেলারের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছানো সহজ হবে না। ওখানেই আগে যেতে চাও?’

ভাবল কলিন। হেলার আর বিলকে অপহরণ করা সম্ভব হলেও লাভ হবে শেষ পর্যন্ত? স্ত্রীংগারভিল হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে হেলারের হয়তো কোন সম্পর্ক নেই, যদি থাকেও, চতুর লোক সে, ওর কাছ থেকে আত্মঘাতী কোন বিবৃতি আদায় করা সহজ হবে না।

বিল ওয়ারেন হয়তো শেষ পর্যন্ত মুখ খুলবে, কিন্তু ওর স্বীকারোক্তি আদালতে প্রতিষ্ঠা করবে কীভাবে? ওর পক্ষের উকিলের সামান্য বুদ্ধি থাকলেই সে দাবী করে বসবে যে মৃত্যু ভয়ে মিথ্যে জবানবন্দী দিতে বাধ্য হয়েছিল বিল। কিন্তু আর কোন পথ কি আছে? অনন্তকাল ধরে ওদের পক্ষে আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব নয়। কিছুদিন প্যাসিকে ফাঁকি দেওয়া যাবে, কিন্তু শোভাউনের পালা আসবে যখন? আউট-লদের মত গ্রেপ্তারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠবে ওদের বিরুদ্ধে, নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করবার কোন উপায় থাকবে না—সোজা কথায় কোন সুযোগই দেওয়া হবে না।

সুতরাং এখন প্রাণ ছাড়া হারাবার মত আর কিছুই নেই।

‘আগে হেলারের ওখানেই যাবার চেষ্টা করব,’ মৃদু কণ্ঠে বলল কলিন।

‘তোমরা তিনজন ওকে সামলাতে পারবে?’ জিজ্ঞেস করল হ্যারল্ড, ‘তা হলে আমি বিলের দিকে নজর রাখতে যেতে পারতাম।’

‘ঠিক আছে, হ্যারল্ড, সেটাই করো, কিন্তু দেখো ধরা পড়ে যেয়ো না যেন! তা হলে আর রেহাই পেতে হবে না!’

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল ওরা, শহরের প্রধান সড়কের দিকে এগোল। স্টেজ স্টেশনের কাছে আসবার পর প্রথমে রাস্তা পার হলো কলিন, তারপর টেরি জেলারম্যান, সবশেষে হন্ডো; হ্যারল্ড রয়ে গেল পেছনে। স্টেজ স্টেশনের পেছন থেকে কোণাকুণিভাবে হেলারের বাড়ির দিকে এগোল তিনজন। অ্যাটর্নির বাড়ির জানালায় আলোর আভাস।

‘এবার? সোজা গিয়ে ধরে আনব ব্যাটাকে?’ জিজ্ঞেস করল হন্ডো।

‘না,’ বলল কলিন, ‘আগে কিছু কথা আছে ওর সঙ্গে।’

‘বাইরে কারও পাহারায় থাকার দরকার নেই?’

‘না। সবাই একসঙ্গে থাকব আমরা। সাক্ষী যত বেশি হয় আমার জন্যে তত ভাল। এসো।’

হেলারের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল ওরা, দরজায় টোকা দিল কলিন।

প্রায় সাথে সাথে দরজা খুলে ধরল হেলার, ওদের দেখে একসঙ্গে বিচিত্র ভাবের খেলা চলল তাঁর চেহারায়, একেবারে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল, যেন মৃত্যুদণ্ড শুনবার অপেক্ষা করছে কোন আসামী।

‘টেরি জেলারম্যান আর হন্ডো স্টার্ন,’ বলল কলিন। ‘ফর্বস র‍্যাঞ্চ রাইডার, চেনো বোধ হয়?’

‘হ্যাঁ,’ বলল হেলার। ‘কিন্তু আমি তো জানতাম—মানে শুনেছি ওরা বেসিন

ছেড়ে চলে গেছে।’

‘ঠিকই শুনেছিলে, কিন্তু আবার ফিরে এসেছে,’ বলল কলিন। ‘কিছুক্ষণের জন্যে ভেতরে আসতে পারি?’

জবাবের অপেক্ষা করল না কলিন, সামনে পা বাড়াল, ফলে পিছু হটতে বাধ্য হলো অ্যাটর্নি।

দরজা বন্ধ করে কবাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল হন্ডো। কলিন আর অ্যাটর্নির পিছু পিছু কামরার ভিতর দিকে এগোল জেলারম্যান। ওরা থামলে একপাশে সরে গেল সে, ফাইল কেবিনেটের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। নিজের টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল হেলার, পেশাদারি একটা ভাব চেহারায়।

‘লোকজন তোমার নামে কী সব বলাবলি করছে জানো নিশ্চয়ই?’ গুরু করল সে।

মাথা দোলাল কলিন।

‘কোথায় ও?’

‘লিভা?’

‘হ্যাঁ, লিভা ওয়ারেন। ওকে পালাতে সাহায্য করার মত নিরোট বোকামি করতে গেলে কেন?’

‘ওর জন্যে আমার খারাপ লাগছিল, হয়তো সেজন্যে।’

‘কোথায় ও?’

‘শেষ খবর, স্প্রিংগারভিলে দেখা গেছে ওকে। তবে এতদিনে বোধ হয় ক্যানসাস সিটির দিকে রওনা হয়ে গেছে।’

‘প্রমাণ করা গেলেই হয়, কলিন। কিংবা সময় থাকতেই যদি ওকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়—’

‘সময় থাকতে মানে? কী বলছ?’

‘নইলে ফাঁসির দড়ি থেকে গলা বাঁচাতে পারবে না। লোকে বলছে ওকে অপহরণ করে তারপর হত্যা করেছে তুমি।’

গাল চুলকালো কলিন। ‘মনে হয় এখনও স্প্রিংগারভিলেই আছে লিভা। ওখানে পরিচিত কেউ নেই তোমার, যাকে চিঠি লিখে খোঁজ নিতে পারো?’

‘পরিচিত কয়েকজনই আছে,’ বলল হেলার, ‘তবে কারও সঙ্গেই তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই। বছরখানেক ওদিকে যাওয়া হয় না।’

পাইপ বের করবার জন্য পকেটে হাত ঢোকাল কলিন। শেরিডানের কাছে ধার করা তামাক ভরল ওটায়। এই একটা মিথ্যে কথা কিছুই প্রমাণ করে না, ভাবল, কিন্তু মিথ্যে বলল কেন? দু’মাস আগেও স্প্রিংগারভিলে গিয়েছিল সে, অথচ এখন বলছে বছর খানেক যাওয়া হয় না, কেন?

পাইপ ধরাল কলিন। ‘হেলার,’ বলল ও, ‘সেদিন বলেছিলে ওয়ারেনের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, আমাদের গুরু বিক্রির পঁচিশ হাজার ডলার দিয়ে তা হলে সে কী করেছে?’ হারল্ডের কাছে শোনা ঘটনা বলে জানতে চাইল ও।

‘কোথাও লুকিয়ে রেখেছে হয়তো, এসব আমার জানার কথা নয়।’

‘তা হলে তো ওয়ারেনের অবস্থা খারাপ বলা যায় না?’

‘তা যায় না।’

‘দু’মাস আগে, বাবা যখন স্প্রীংগারভিলে গরু চালান দিল, ওয়ারেন গিয়েছিল নাকি ওখানে?’

‘না, আমি যদূর জানি, না। গেলে বোকামি করত।’

‘তার মানে কাসলারকে বিশ্বাস করে সে?’

‘কেন করবে না?’

‘পঁচিশ হাজার ডলার সামান্য ব্যাপার নয়। কাসলার টাকা নিয়ে সটকে পড়লে কী করার থাকত ওয়ারেনের? আমাদের লোকদের হত্যার দায় স্বীকার না করে কি আইনের সাহায্য নিতে পারত? এত টাকা নিয়ে পালিয়ে যাবার সুযোগ জীবনে হাজারবার মেলে না।’

‘বুদ্ধিটা বোধ হয় কাসলারের মাথায় খেলেনি।’

‘বটে। আসলে কী ঘটেছিল আমার কাছে শোনো। কাসলারকে ভারমুক্ত করার জন্যে ঠিক সেই সময় আরও একজন ছিল স্প্রীংগারভিলে। ওয়ারেনের বিশ্বাসভাজন একজন? কে হতে পারে?’

‘ওর ছেলে?’

‘বিল? আমার মনে হয় না। কাসলারকে সামলানোর সাধ্য ওর নেই। অন্য কেউ। কে হতে পারে? ভাবো, মাথা খাটাও।’

পাতলা চুলে হাত চালান হেলার, হন্ডো আর জেলারম্যানের দিকে তাকান সে, পেশাদারি ভাব খসে পড়েছে চেহারা থেকে। ‘ধেস্তের, কলিন,’ বলল সে, ‘সব কথা জানা কী আমার পক্ষে সম্ভব, চিন্তা করলে হয়তো বুঝতে পারব, কিন্তু—’

‘তা হলে এক কাজ করো। আজ আমরা কিছু তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালাব। কপাল ভাল হলে হয়তো এমন কাউকে পেয়ে যাব যে সব কিছু জানে, জেরা করতে র‍্যাঞ্জে নিয়ে যাব তাকে, আসবে আমাদের সঙ্গে? ওর জবানবন্দীর একজন নিরপেক্ষ সাক্ষী দরকার হবে।’

‘তার মানে আরও একজনকে অপহরণ করবে?’

‘কথাটা অবশ্য এভাবেও বলা যায়।’

‘তারপর ওকে র‍্যাঞ্জে নিয়ে যাবে—ফর্বস্ র‍্যাঞ্জে?’

‘ঠিক।’

মাথা নাড়ল অ্যাটার্নি। ‘কাল সকালে প্রথমই ওখানে হামলা চালাবে প্যাসি। সেরকমই সিদ্ধান্ত হয়েছে।’

‘তার আগেই সত্যি কথাটা জানতে পারব আশা করি।’

‘কিন্তু তাতে খুব একটা কাজ হবে না। কোন কিছু শোনার মুডে নেই এখন ওয়ারেন।’

‘গেরিফ শুনবে।’

‘তা শুনতে পারে। কিন্তু ওকে শোনাঝোর সুযোগ পাবে না। তারচেয়ে লোকটাকে এখানে নিয়ে এসো, আজই।’

‘শহর আমাদের জন্যে নিরাপদ নয়,’ বলল কলিন, ‘ভাবছি র‍্যাঞ্জেই সুযোগটা নেব। যারে আমাদের সঙ্গে?’

ভুরু কৌচকাল হেলার। 'ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই, সকালে ব্যাঞ্চে জরুরি একটা মিটিং আছে।'

'মিটিং পরে করলেও চলবে।'

'তা কী করে সম্ভব?'

'কিন্তু উপায় নেই, হেলার।'

সন্তুষ্ট চেহারা এদিক ওদিক তাকাল হেলার, এক পা পিছিয়ে গেল।

'এসব কী বলছ? নিশ্চয়ই—'

'এভাবে বলা যায় কথাটা,' বলল কলিন, 'আমাদের সঙ্গে আজ ফর্বস্ ব্যাঞ্চে যাচ্ছ তুমি, ইচ্ছেয় অথবা অনিচ্ছায়। যে কোন একটা বেছে নাও।'

আরেক পা পিছিয়ে গেল হেলার। হাঁপাচ্ছে। ঘনঘন নজর বোলাচ্ছে কামরার চারপাশে, অদৃশ্য কোন শক্তি বুঝি সাহায্য করতে আসবে ওকে। আচমকা পেছন দরজার দিকে দৌড় দিল সে।

দরজার কাছে পৌঁছানোর আগেই তাকে ধরে ফেলল টেরি জেলারম্যান, একটা ঝলকের মত ওঠানামা করল ওর পিস্তলটা। হাড়ের সঙ্গে ইস্পাতের সংঘর্ষের বিশী শব্দ শোনা গেল, মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল হেলার, বেহুঁশ।

'ব্যাটা আস্ত ইবলিস,' বলল জেলারম্যান, 'যেভাবেই হোক ও-ও আমাদের শত্রু।'

মাথা দোলাল কলিন। 'কাঁধে তুলে নাও ওকে, পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাব আমরা।'

পনের

দালানের পেছনে এসে ভ্রূঙ্কার ছায়ায় কাঁধের উপর থেকে হেলারের অচেতন দেহ নামিয়ে ওর উপর ঝুঁকে পড়ল কলিন।

'বেশি জোরে মেরে ফেললাম না তো।' বিবত কণ্ঠে বলল জেলারম্যান।

'না না, দেখো, এখুনি চোখ মেলে তাকাবে,' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল কলিন। 'হন্ডো, ওপাশে চলে যাও তুমি, রাস্তার দিকে কড়া নজর রাখো, ও হাঁটার মত সামলে উঠুক, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, বয়ে নিতে গেলে আবার সবার চোখে পড়ে যাব।'

ভূতের মত নিঃশব্দে চলে গেল হন্ডো স্টার্ন।

'আসলে এত জোরে মারতে চাইনি,' আবার বলল জেলারম্যান।

হাসল কলিন। 'ভুলে যাও, টেরি। শিগগিরই আপসোস করবে আরও জোরে মারোনি বলে।'

অপেক্ষা করতে লাগল কলিন। অবশেষে ককিয়ে উঠল হেলার, উঠে বসতে গিয়ে ব্যর্থ হলো প্রথমে, পরের চেষ্টায় উঠে বসতে পারল, বিড়বিড় করে বকতে

লাগল আপনমনে।

‘কী অবস্থা?’ জানতে চাইল কলিন।

‘কী অবস্থা মানে?’ ঢোক গিলল হেলার, ‘বাড়ি খেলাম কীসের সঙ্গে?’

‘গান ব্যারেল! তোমার কপাল ভাল, বুলেটের বাড়ি খাওনি।’

অবশেষে সংবিৎ ফিরে পেল হেলার, ক্রোধে পাথরের মত কঠিন হয়ে উঠল তার চেহারা। ‘কলিন, এ-অন্যায়, বর্বরতা! আমি তো কিছুই বুঝি না!’

‘বুঝবে,’ বলল কলিন। ‘তা হাঁটতে পারবে এবার?’

‘হাঁটতে-টাটতে পারব না!’

‘তাই নাকি? ফের মার খাবার সাধ?’

‘সাহস আছে?’

‘দেখতে চাও? ভয় করব কেন?’

লম্বা করে দম নিল অ্যাটর্নি, জেলারম্যানের দিকে তাকাল, হাতে পিস্তল নাচাচ্ছে সে।

‘আমাকে নিয়ে কী করবে, কলিন?’

‘একটু আগে যা বললাম, ব্যাঞ্চে নিয়ে যাচ্ছি তোমায়, ওখানে একজনকে জেরা করা হবে, ওর জবানবন্দীর সাক্ষী হবে তুমি।’

‘বাস?’

‘অন্য কিছু কি বলেছি?’ বলল কলিন, ‘তা, হেলার, স্বেচ্ছায় ঘোড়ায় চেপে যাবে না বয়ে নিয়ে যেতে হবে?’

‘নিজেই যাচ্ছি, বাবা!’ বলল হেলার, ‘হাঁটতে পারলে হয়!’

ওকে দাঁড়াতে সাহায্য করল কলিন, কোণ ঘুরে দেয়াল ঘেষে এগোল ওরা, হন্ডো ইশারায় থামাল।

‘রাস্তার উল্টোদিকের ওই গাছটার আড়ালে কে যেন লুকিয়ে আছে,’ ফিসফিস করে বলল সে। ‘হারল্ড নাকি অন্য কেউ বুঝি না।’

গাছটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল কলিন, নিকষ অন্ধকার, কাউকে দেখা গেল না। অস্থির বোধ করল ও। ঘোড়ার পিঠে চেপে বসবার আগেই ধরা পড়ে গেলে মূণাকল, বেশ দূরে রেখে এসেছে ওগুলো।

‘তোমরা! এখানে দাঁড়াও,’ বলল হন্ডো, ‘আমি দেখি ওর পরিচয় বের করা যায় কি না।’

কলিন ভেবেছিল অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঘুরপথে গাছটার দিকে যাবে হন্ডো, তেমন কিছু করল না সে, নাক বরাবর হাঁটা ধরল; বাড়ির সামনে গিয়ে কোণাকুণিভাবে রাস্তার উল্টোদিকে রওনা হলো। চারপাশে অন্ধকার, কিন্তু ওখানে যেই থাকুক হন্ডোকে ঠিক দেখতে পাবে। পিস্তল বের করে প্রস্তুত হলো কলিন।

‘টেরি,’ বলল ও। ‘হেলারের দিকে চোখ রাখো।’

দ্রুত সামনে এগোল ও, হন্ডো এভাবে ঝুঁকি নেয়ায় কিছুটা ক্ষুন্ন, ওকে বাধা দেওয়া উচিত ছিল, ভাবছে।

হঠাৎ কে যেন নড়ে উঠল সেই গাছটার নীচে, অন্ধকার ছেড়ে বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি, হন্ডোর দিকে এগিয়ে এল, এবার হ্যারল্ড লেভিটকে চিনতে

পারল কলিন, হাঁপ ছাড়ল ও।

হন্ডো আর হ্যারল্ড ফিরে আসবার অপেক্ষা করল কলিন। ওরা আসবার পর বলল, ‘এটা কী করলে, হন্ডো, হ্যারল্ডের জায়গায় শত্রুপক্ষের কেউ হত যদি?’

‘জানি না,’ বলল হন্ডো, ‘কিন্তু হ্যারল্ডের বেলায় লুকোচুরি খেলার চেয়ে এরকম ঝুঁকি নেয়া ঢের ভাল। অঙ্ককারে হ্যারল্ডের সঙ্গে লুকোচুরির মানে সেধে ঝামেলায় জড়ানো।’

‘খামোকা তেল দিয়ে না,’ বলল হ্যারল্ড, সপ্রতিভ কণ্ঠ।

হাতের পিঠে মুখ মুছল কলিন, ঘামে ভিজ়ে গেল হাত।

‘এলেন হডসনের বাসায় এখন বিল ওয়ারেন,’ জানাল হ্যারল্ড।

‘বাড়িটা কোথায়?’

‘বেশি দূরে না, চলো নিয়ে যাচ্ছি।’

‘আর কেউ নেই ওখানে?’

‘মায়ের কাছে থাকে মেয়েটা। মহিলা দর্জির কাজ করে, তুমি এখানে থাকতে মিসেস ফিশার একটা দোকান চালাত, মনে আছে? সেটাই এখন চালায় ওরা।’

হন্ডোর বাহুতে চাপড় দিল কলিন, ‘তুমি আর টেরি হেলারকে ঘোড়ার কাছে নিয়ে যাও, দুজনের মাঝখানে রাখবে ওকে, লিভারি আস্তাবল পেরিয়ে গিয়ে তারপর রাস্তা পার হবে। আমি আর হ্যারল্ড যাচ্ছি বিল ওয়ারেনকে ধরে আনতে। হেলার যদি ঝামেলা করে ব্যবস্থা নেবে, মায়া দেখাতে যেয়ো না।’

হেলার যাতে শুনতে পায় সেজন্য শেষের কথাগুলো একটু জোরেই বলল কলিন। দম দেওয়া পুতুলের মত হন্ডো আর জেলারম্যানের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল হেলার।

‘এখনও কোন ঝামেলা বাধেনি,’ বলল হ্যারল্ড।

মাথা দোলাল কলিন। কিন্তু এখনও আসল কাজ বাকি।

শহরের প্রায় শেষ সীমায় একটা ছোট বাড়ি, এখানেই মায়ের সঙ্গে থাকত এলেন হডসন। উঠানের বেড়ার সঙ্গে একটা ঘোড়া বাঁধা আছে দেখতে পেল কলিন, বিল ওয়ারেনের ঘোড়া। জানালায় পর্দা টানানো, ভিতরে আলো জ্বলছে বোঝা যায়।

‘সোজা গিয়ে দরজায় টোকা দেব আমি,’ বলল কলিন। ‘এলেন কিংবা ওর মা যদি দরজা খোলে, আমাকে চিনতে পারবে না, আমি বলব, বিলের কাছে একটা খবর পৌঁছে দিতে এসেছি—ওরা অবিশ্বাস করবে না; বিল দরজা খুলে বেরোলে সাথে সাথে ওর বুক পিস্তল ঠেকিয়ে বের করে নিয়ে আসব।’

‘শুনে তো মনে হচ্ছে পানির মত সহজ,’ বলল হ্যারল্ড।

দরজা পর্যন্ত একসঙ্গে এগোল ওরা। কবাটে টোকা দিয়ে অপেক্ষায় রইল কলিন, ডানহাত পিস্তলের বাঁটে। দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেছে হ্যারল্ড।

ভিতর থেকে চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, বিল। ‘আমি দেখছি, মিসেস হডসন।’

ঠিক এই সময় রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনল কলিন, এদিকেই আসছে।

ঝট করে কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে তাকাল, ঠিকই, কে যেন আসছে। অন্ধকারে একজন ঘোড়সওয়ারের অবয়ব দেখা গেল, ধীরে সুস্থে এগোচ্ছে এ-বাড়ির দিকে।

ধরা পড়া গেল কী? বিল আর নবাগত ঘোড়সওয়ারের মাঝখানে পড়ে যাচ্ছে। বিল দরজা খুলবার আগেই সটকে পড়া যায়, কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে যাবার আগেই ওই ঘোড়সওয়ার দেখে ফেলবে। কলিনের মাথায চিন্তার ঝড়। ও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ঘোড়সওয়ার নিজের পথে চলে গেলে চিন্তা নেই, কিন্তু এখানে হাজির হলেই মুসিবত। কিন্তু...নাহ, এখন আর পালানো সম্ভব নয়। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে খেলায় নেমেছে ওরা, বিল ওয়ারেনকে যেভাবেই হোক ধরে নিয়ে যেতে হবে।

‘হ্যারল্ড,’ ফিসফিসিয়ে বলল কলিন, ‘ওই কোণে চলে যাও তুমি। ঘোড়াঅলাকে কাভার করবে, পারলে দূর করো ব্যাটাকে।’

কথা মত কোণের দিকে গেল হ্যারল্ড, এখন দরজা খুললে ঘরের আলো ওই পর্যন্ত যাবে না। গেটের কাছে পৌঁছুল ঘোড়সওয়ার, ঠিক এই সময় ঘোরা শুরু করল দরজার হাতল। ঘাড় ফেরানোর সাহস হলো না কলিনের, পেছন থেকে ওকে না-ও চিনতে পারে আগন্তুক। কিন্তু বিল ওয়ারেন ঠিকই চিনবে, তার মানে ওকেই সামলাতে হবে।

পিস্তলটা শরীরের সঙ্গে চেপে ধরল কলিন। দরজা খুলে দাঁড়াল বিল ওয়ারেন, বিস্ময়ে বিকৃত হয়ে গেল তার চেহারা, রক্ত সঁরে গেছে। হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও হাল ছেড়ে দিল। ‘ফর্বস!’ প্রায় ককিয়ে উঠল সে, আর কোন কথা বের হলো না তার মুখ থেকে।

‘অ্যাই, বিল!’ গেইট থেকে ডাকল নবাগত ঘোড়সওয়ার। ‘তোমার বাবা যেতে বলেছে, এখুনি। তোমার সঙ্গে ওটা আবার কে?’

‘ওকে বিদেয় করো,’ অস্পষ্ট কণ্ঠে নির্দেশ দিল কলিন, ‘বলে দাও একটু পড়ে যাচ্ছ।’

ঠোটজোড়া নড়ে উঠল বিলের, কোন শব্দ বেরোল না। ঘর থেকে বেরিয়ে আসা লণ্ঠনের ম্লান আলোয় অসুস্থ দেখাচ্ছে, যেন পাণ্ডু রোগী। কপাল আর ঠোটে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

‘আরে, হলো কী, কী হচ্ছে?’ গেইট থেকে সন্দিহান কণ্ঠে জানতে চাইল আগন্তুক, ‘ব্যাপার কী, বিল?’

এখুনি পিস্তল বের করবে লোকটা, ভাবল কলিন। পেটের ভিতর গুড়গুড় করে উঠল, গলার কাছে মনে হচ্ছে কী যেন আটকে রয়েছে। ঘাম জমে উঠেছে কপালে। ‘হ্যারল্ড,’ বলল ও, ‘ওই ব্যাটাকে দূর করো।’

কোণের আবছা অন্ধকার ছেড়ে এল হ্যারল্ড লেভিট, হাতে উদ্যত পিস্তল। ‘ফিরে যাও, রয়েস! বিলকে নিয়ে একটু পরেই আসছি আমরা—’

নিমেষে উঠে এল হ্যারল্ডের পিস্তল, আগুন ওগরাল। গেইটের ওখান থেকে ছোঁড়া গুলির শব্দ শুনতে পেল কলিন। তীব্র কর্কশ কণ্ঠে আত্ননাদ করে উঠল রয়েস। আগেই ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়েছিল বোধ হয়, কারণ পরক্ষণে ছুঁতন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠল, মিলিয়ে গেল ক্রমশ।

ঘুরে তাকানোর ইচ্ছে বহু কষ্টে দমন করে রেখেছে কলিন। বিলকে কাভার করতে হচ্ছে, চোখ সরানোর উপায় নেই। বিলের পেছনে এলেন হডসন আর তার মায়ের উপস্থিতি টের পেয়েছিল কলিন, গোলাগুলি শুরু হবার আগ মুহূর্তে সরে গেছে। এখন হয়তো কোন এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে কিংবা পেছন দরজা গলে বেরিয়ে গেছে।

এবার এখান থেকে পালানো উচিত, ভাবল কলিন, সম্ভব হলে ওয়্যাগোনার ছেড়েই চলে যেতে হবে। দরজার কাছ থেকে সরে এল ও, ইশারা করল বিলকে, 'চলো,' বলল, 'আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছ তুমি।'

'আমি-কোথায়? এভাবে বাঁচতে পারবে না, ফর্বস!'

'চেষ্টা করতে দোষ কী,' বলল কলিন। 'এখন বলে ফেলো, এখানে মরতে চাও, নাকি বেঁচে থাকার একটা সুযোগ নেবে? জলদি!'

পিস্তল উঁচু করল ও, ট্রিগারে চেপে বসল তর্জনী। কলিনের চেহারা দেখে বিলের স্থির বিশ্বাস জন্মাল ঠিক ট্রিগার টেনে দেবে ও। বিনা বাক্যব্যয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল সে। ওর হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে পকেটে ঢোকাল কলিন, পাশে এসে দাঁড়াল হ্যারল্ড।

'হেনরী রইয়েস এসেছিল,' বলল সে, 'আমার গুলিটা লেগেছে যদিও, কিন্তু তেমন চোট পায়নি বোধ হয়, তা হলে স্যাডল থেকে পড়ে যেত। বেশি সময় নেই হাতে, একটু পরেই ফিরে আসবে ব্যাটা।'

'তার আগেই আমরা ভাগছি,' বলল কলিন। 'বিলের ঘোড়া থেকে দড়িটা নিয়ে এসো, ওর হাত দুটো পেছনে নিয়ে বাঁধো, তারপর ঠেলে তুলে দাও স্যাডলে। ওকে নিয়ে শহর থেকে প্রথমে পুবে যাব আমি, তারপর ঘুরে নদীর পশ্চিম কিনারে আসব। তুমি অন্যদের সঙ্গে করে ওখানে চলে এসো। আসার পথে যেখানটায় নদী পার হয়েছি ওখানেই একসঙ্গে জড়ো হব আমরা।'

'বিলের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল হ্যারল্ড।

'বাবা তোমাকে জ্যাক্স পুঁতে ফেলবে,' গজগজ করে বলল বিল। 'বাবাকে চেনো না। তোমার সঙ্গে ওর—'

'চলো, মিয়া,' বলল কলিন, পিস্তল দিয়ে খোঁচা দিল বিলের কিডনিতে।

মাক্সরাতির অনেক পরে দুই বন্দীসহ ফর্বস র‍্যাঞ্জে পৌঁছুল ওরা। একটা দল ওদের ধাওয়া করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ওরা শেষ পর্যন্ত কোথায় খসে পড়েছে জানে না কলিন। বেশ কয়েক ঘন্টা সময় পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে ওর। সকাল হলেই ওদের ট্রেইল পেয়ে যাবে ওয়ারেনরা, এখানে পৌঁছে যেতে দেরি হবে না। সম্ভবত দুপুরের আগেই এসে পড়বে অতিথিরা, অবশ্য ততক্ষণে এখান থেকে ওরা উধাও হয়ে যাবে।

আকাশে মেঘ জমছে। বাতাসে ঠাণ্ডা একটা ভাব। আবার ঝড় আসতে পারে, তবে তার দেরি আছে, বৃষ্টিতে আবার ট্রেইল মুছে যাবার আশা না করাই ভাল।

উঠোনে ওদের সঙ্গে মিলিত হলো শেরিডান। কলিনকে একপাশে নিয়ে এল সে। 'একটা কাজ করে ফেলেছি, ঠিক হয়নি বোধ হয়,' উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলল,

‘কিন্তু কী করব ওকে আটকে রাখা ছাড়া উপায় ছিল না, ভদ্রমহিলা ব্যাপারটা সুনজরে দেখছে না।’

‘ভদ্রমহিলা? কাকে আবার-?’

‘বেলিন্ডা হেবার।’

‘বেলিন্ডা, এখানে?’

‘হ্যাঁ, র‍্যাপ্স হাউসে। এখন ঘুমাচ্ছে অবশ্য, কিন্তু যতক্ষণ জেগেছিল এক মুহূর্তের জন্যেও থামেনি, গালাগালি করে ভূত ছাড়িয়েছে আমার। যতটা মনে হয় তত সোজা মানুষ না ও।’

‘এখানে এল কীভাবে?’

‘চার্লস-এর র‍্যাপ্স থেকে শহরে যাচ্ছিল, যাবার পথে ডার্ক পিটের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল-ডার্ক পিট এক সময় হেবারের ওখানে কাজ করত-বুঝতেই পারছ-ডার্ক পিটের চেহারা দেখে সন্দিহান হয়ে ওঠে সে, আমি টের পেয়ে ভাবলাম আটকে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। নইলে হয়তো ওয়্যাগোনারে গিয়ে যার তার কাছে বলে বসত।’

গলা খুলে হাসতে ইচ্ছে করছে কলিনের, তবু গম্ভীরভাবে মাথা দোলাল, বেচারী শেরিডান। কাজটা অবশ্য খারাপ করেনি।

বারান্দার দরজা খুলবার শব্দ পেল কলিন, স্নান আলায়ে বেলিন্ডার ছিপছিপে কাঠামো চোখে পড়ল। বারান্দার কিনারে এসে কোরালের দিকে তাকাল সে। ওখানে ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল খসাচ্ছে সবাই।

‘ফর্বস!’ চিৎকার করে ডাকল বেলিন্ডা, ‘ফর্বস, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি!’

‘আসছি!’ বলল কলিন।

আবার কোরালে ফিরে গেল ও, হ্যারল্ডকে খুঁজে বের করল। হেলার আর বিলকে ঘরে নিয়ে জেরা করবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বেলিন্ডা থাকায় এখন আর তা সম্ভব নয়।

‘বেলিন্ডা আবার কোথেকে উদয় হলো!’ গজগজ করে উঠল হ্যারল্ড।

‘চার্লস রেডফিল্ডের র‍্যাপ্স থেকে, শহরে যাবার পথে এখানে টুঁ মারতে এসেছিল। ওয়ারেন আর হেলারকে বরং বার্ন-এ নিয়ে যাও তোমরা, বাঁধন খুলে দিয়ো না যেন। বেলিন্ডার সঙ্গে কথা বলেই আসছি আমি।’

‘বিল ওয়ারেনকে ধোলাই শুরু করব?’

‘কেন নয়?’

‘ঠিক জানো হামলায় সময় সে ছিল।’

‘লিন্ডা বলেছে।’

‘সেরাতে টম ক্রসেন নামে একটা ছেলেও মারা গিয়েছিল-মাত্র সতের বছরের টগবগে তরুণ, এত ভাল ছেলে আর হয় না, খুব মন দিয়ে কাজ করত। কোন সময় “না” করত না। বুদ্ধিমান, ধীর-স্থির স্বভাবের ছিল ওঁ; ছেলেটাকে আমার খুব ভাল লাগত, সবাই পছন্দ করত ওকে-বেচারী-জীবন শুরু করার আগেই ওকে হত্যা করা হলো!’

হাত বাড়িয়ে হ্যারল্ডের কাঁধ স্পর্শ করল কলিন।
'সামলে। আমি নিরেট তথ্য চাই, যেটা প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগানো যাবে।
বদলা নেবার সময় এখনও আসেনি।'
'জানি।'
'কথাটা একটু খেয়াল রেখো।'
'ওয়্যারেন রাইডাররা আসার আগে কতটা সময় পাব আমরা?'
কাঁধ ঝাকাল কলিন।
'ঠিক আছে। যাও, তাড়াতাড়ি বেলিভার সঙ্গে কথা সেরে আসো।'
'আচ্ছা,' বলল কলিন।
ঘুরে ধীর পায়ে র‍্যাঙ্ক হাউসের দিকে এগিয়ে গেল কলিন, বেলিভার
ছায়ামূর্তির দিকে তাকিয়ে মৃদু উত্তেজনা বোধ করল।

ষোল

র‍্যাঙ্ক হাউসের পার্লার। রাগে আগুন হয়ে আছে বেলিভা, অবিরাম বকছে।
ঘরে আসবার দেড় মিনিট পার হবার আগেই কয়েক দফা দাবী পেশ করে
বসেছে বেলিভা: ওকে ছেড়ে দিতে হবে এবং তার আগে ব্যাখ্যা করতে হবে
আটকে রাখা হলো কেন; হাত পা বেঁধে দুজনকে বার্ন-এ নিয়ে যেতে দেখেছে সে,
তাদের পরিচয় জানাতে হবে।
পুরোনো কার্পেটের উপর পায়চারি করছে কলিন ফর্বস, শিগ্গিরই শান্ত হবে
বেলিভা, আশা করছে।
'কখন যাচ্ছি এখান থেকে?' এই নিয়ে তৃতীয় বারের মত জানতে চাইল
বেলিভা।
'তোমার যখন ইচ্ছে,' একই জবাব দিল কলিন, 'কিন্তু এই রাত বিরেতে
একা বেরোনো কি ঠিক হবে? সঙ্গে দেব, তেমন লোকও নেই আমার কাছে।'
'তোমার ধারণা এখানে নিরাপদে আছি আমি!' ঝাঁঝিয়ে উঠল বেলিভা,
'বেসিনের কেউ একমত হবে না তোমার সঙ্গে।'
কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করল কলিন। 'তোমার যা মর্জি,
বেলিভা, আমি কিছুই বলব না; ইচ্ছে হলে সকাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো
নয়তো এখনি রওনা হয়ে যেতে পারো, কেউ আটকাবে না।'
'বার্ন-এ কাদের আটকে রেখেছ?'
'দুজন লোককে, জেরা করার জন্যে।'
'কেন?'
'তু জেনে কী লাভ? বলেছি তো চাইলে এখনি চলে যেতে পারো তুমি।'
মেঝেতে পা ঠুকল বেলিভা। 'কারা ওরা বলো? ওরা তোমার প্রশ্নের জবাব না

দিলে কী করা হবে?’

‘দেবে,’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল কলিন, পায়চারি থামাল। ‘আচ্ছা, আমি তো তোমাকেও সাক্ষী হিসেবে সঙ্গে রাখতে পারি!’

কথাটা পছন্দ হলো কলিনের, আবার কিছু সময় পায়চারি করল, ভাবল।

‘বেলিন্ডা, তোমাকে এখন এমন একটা কথা বলব আমি যা এখনও বেসিনের কারও জানা নেই। মন দিয়ে শোনো। এটা তো জানো যে, মাস দুই আগে আমার বাবা প্রায় হাজার গরুর একটা পাল বিক্রির জন্যে স্প্রীংগারভিলে চালান দিয়েছিল, সেই ক্যাটলড্রাইভে আটজন কাউহ্যান্ড ছিল, ট্রেইলবস ছিল আর্নেস্ট হল। ওকে তুমি চিনতে।’

‘হ্যাঁ,’ সেটা আগেও বলেছি, ভুরু কুঁচকে বলল বেলিন্ডা, ‘বেশ পছন্দ করতাম লোকটাকে। কেন যে টাকা নিয়ে পালাল সেটা আজও এক রহস্য।’

‘আমি বলেছিলাম, পালায়নি,’ বলল কলিন। ‘আমাদের গরু স্প্রীংগারভিলে ঠিকই পৌঁছেছিল, কিন্তু তখন আমাদের কোন লোক ছিল না ওগুলোর সঙ্গে। পরে ওদের খোঁজে গিয়েছিল বাবা, স্প্রীংগারভিলের উত্তরে একদিনের দূরত্বে ট্রেইলের কাছে পাঁচটা কবর খুঁজে পায়, তিনটে কবরের খোঁজ পাওয়া যায়নি, বুঝতেই পারছি, ট্রেইল ক্রুর প্রত্যেককে হত্যা করা হয়েছিল।’

‘কিন্তু আমি শুনেছি—’

‘ভুল শুনেছ। আসল ঘটনা হলো: স্প্রীংগারভিলের উত্তরে একদিনের দূরত্বে ওয়ারেন রাইডাররা হামলা চালায় ওদের ওপর; গরু ছিনতাই করে ওরা এবং ট্রেইল ক্রুর সবাইকে হত্যা করে গরু নিয়ে স্প্রীংগারভিলে যায় এবং আর্নেস্ট হলের নাম ভাঁড়িয়ে গরু বিক্রির টাকা গ্রহণ করে কাসলার।’

টলে উঠল বেলিন্ডা, চেতনা হারাবে বলে মনে হলো।

‘বিশ্বাস করি না! ক্লাইভ কথকও—’

‘ক্লাইভের সঙ্গে তোমার প্রেম আছে নাকি?’

‘নাহ্। কিন্তু—’

‘কাসলারের সঙ্গে বিলও ছিল।’

‘না!’

‘আরও দুজনের নাম বলতে পারি আমি,’ বলল কলিন। ‘এখন না, সকালে প্যাসির সামনে বলব—যদি বার্নের দুই মেহমান আশানুরূপ সহযোগিতা করে।’

এলোমেলো পা ফেলে চামড়া মোড়া চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেল বেলিন্ডা, বসে পড়ল, রুমাল বের করে কিনারে লাগানো লেসে হাত বোলাল কয়েক মুহূর্ত, তারপর আবার রেখে দিল ওটা।

কথা থামাল না কলিন। ড্যানিয়েল ফর্বস কেন ওয়ারেনের গরু স্ট্যামপিড করল, কেন ও লিন্ডাকে পালাতে সাহায্য করতে গেল, হ্যারল্ড আর অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ হলো সব ব্যাখ্যা করল একে একে। বেলিন্ডা ওর কথা শুনেছে কি না বুঝতে পারল না। এক দৃষ্টে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটা।

‘বার্নের দুজন—ওরা কারা?’ অবশেষে জানতে চাইল সে।

‘বিল ওয়ারেন এবং অ্যারন হেলার।’

‘হেলার? ওর সাথে এসবের সম্পর্ক কী?’

‘আমার সন্দেহ স্প্রীংগারভিলে কাসলারের কাছ থেকে সে-ই আমাদের গুরু বিক্রির টাকা নিয়েছিল-এখনও নিশ্চিত হতে পারিনি।’

টোকা পড়ল দরজায়।

হভো। বেলিভার দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করতে লাগল সে।

‘বলে ফেলো,’ বলল কলিন, ‘ওর সামনে বলতে অসুবিধে নেই।’

‘বিলের মুখে খই ফুটছে,’ জানাল হভো।

‘হেলার?’

‘ওর পালা এখনও শুরু হয়নি।’

‘আমি আগে আসি, তারপর শুরু করো।’

মাথা দুলিয়ে বেরিয়ে গেল হভো।

‘থাকতে চাও সকাল অবধি?’ বেলিভাকে জিজ্ঞেস করল কলিন।

‘আমিও বার্নে যাব তোমার সঙ্গে।’

‘এসব হয়তো তোমার ভাল লাগবে না। নোংরা ব্যাপার, বেলিভা, কিন্তু কী করব, আর কোন উপায় নেই আমার। তুমি বরং এখানেই অপেক্ষা-’

‘না, আমি যাব।’

দরজার দিকে এগোল কলিন। ওর সঙ্গে বেরিয়ে এল বেলিভা।

দমকা হাওয়া বইছে। পতপত করছে বেলিভার স্কার্ট, উড়িয়ে নিতে চাইছে কলিনের হ্যাট। হ্যাটটা ধরে রেখে ঘাড় কাত করে আকাশের দিকে তাকাল কলিন। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, কিন্তু ঝড় আসতে এখনও ঢের দেরি। কোন সুবিধে হবে না আমাদের-ভাবল কলিন। অসময়ে শুরু হবে ঝড়ের তাণ্ডব।

বেলিভাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল কলিন। বার্নের দরজা খুলে প্রথমে বেলিভাকে ঢুকতে দিয়ে তারপর নিজে ঢুকল। আস্তাবলের ভিতরের অবস্থা দেখামাত্র সেইদিন রাতের ওয়ারেনের আস্তাবলের কথা মনে পড়ে গেল। এখানেও সেই একই রকম ছাদের কড়িকাঠে তিনটে লঠন বুলছে। একটা থামের সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে হেলারকে। মেঝেতে শোয়া বিল ওয়ারেন, ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে হভো, শেরিডান এবং হ্যারল্ড লেভিট, ফুলে ঢোল বিলের চোখ মুখ, রক্ত আর ধুলোয় কাদাকাদ।

নিঃশ্বাস নিতেও যেন ভুলে গেল বেলিভা, ঠেলে আসা চিংকারটা প্রাণপণ চেষ্টায় চেপে রাখল সে। হভো আর শেরিডান ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। মন্ত্রমুগ্ধের মত বিলের দিকে তাকিয়ে আছে অ্যারন হেলার। বিলের উপর ঝুঁকে রয়েছে হ্যারল্ড লেভিট, অনড়।

‘আবার শোনাও!’ গর্জন করে উঠল সে।

‘হেলার নিয়েছে টাকাটা,’ দুর্বল কণ্ঠে বলল বিল, ‘আমার সামনে ক্লাইভের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেও।’

‘আর কে দেখেছে?’

‘কেউ না।’

‘টাকাটা হাত বদল হয়েছে কোন্ জায়গায়?’

‘স্প্রীংগারভিল কোর্ট হাউসের পেছনের গলিতে।’

পিছিয়ে এল হ্যারল্ড লেভিট, সোজা হয়ে দাঁড়াল।

‘শুনলে তো কলিন?’

মাথা দোলাল কলিন। ‘টেরি জেলারম্যান কোথায়?’

‘বাইরে, রাস্তায় নজর রাখছে। পালা করে পাহারা দিচ্ছি আমরা, একটু পরেই ওর পালা শেষ হবে।’

‘আমাদের প্রিয় উইলিয়াম আর কী জানাল?’

‘সব। হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণকারী কাসলারের সব কটা সঙ্গীর নাম বলেছে। অন্ধকারে লুকিয়ে কীভাবে ক্যাম্পফায়ারের দিকে গেছে ওরা, প্রত্যেককেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল একজন করে হত্যা করার। পিস্তল স্থির করে অপেক্ষা করছিল, সঙ্কেত পাওয়ামাত্র একসঙ্গে গুলি ছুঁড়েছে, আগুনের কাছে ফাঁকায় ছিল আমাদের ছেলেরা, সহজ নিশানা, বাঁচার সুযোগই পায়নি, নৈশ গ্রহরীরা একটা সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি; মাত্র দু-তিনজন ছিল ওরা, তাড়া করে ওদেরও খতম করে শয়তানের বাচ্চারা।’

‘পরিকল্পনাটা কার?’

‘এই প্রসঙ্গে এখনও আসিনি।’

সামনে এগোল কলিন। বিলের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল, তারপর জানতে চাইল, ‘পরিকল্পনাটা কার ছিল, বিল? কার মাথা থেকে বেরিয়েছিল বুদ্ধিটা?’

‘জানি না, সত্যি!’ খেতলানো ঠোঁটের ফাঁকে বিড়বিড় করে উঠল বিল।

‘কোথায় যাচ্ছি না জেনেই সেদিন বেরিয়ে পড়েছিলাম আমি!’

‘হেলারকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো,’ বলল হন্ডো।

উঠে দাঁড়াল কলিন, ঘুরে হেলারের মুখোমুখি হলো। ‘জানো তুমি?’

‘নিশ্চয়ই না!’ বলল হেলার। ‘তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ, কলিন। ওয়ারেন সম্পর্কে আমার মনোভাব তুমি জানো!’

‘সে তো তোমার মুখে শোনা।’

‘আমি কি মিথ্যে বলেছি? আমি—’

‘রাখো!’

‘কোন জিনিসটা গোপন করেছি, বলো?’

‘বছর খানেকের মধ্যে নাকি স্প্রীংগারভিলে যাওনি তুমি? অথচ কাসলার আমাদের গুরু বিক্রি করার সময় ওখানেই ছিলে তুমি।’

‘কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। যাই হোক, আমি কী করে জানব যে, সেদিনই তোমাদের গুরু স্প্রীংগারভিলে গেছে? অন্য কাজে ওখানে গিয়েছিলাম আমি, অ্যামিটি ক্রীক পার্নি বিরোধ সংক্রান্ত একটা মামলার নিষ্পত্তির ব্যাপার ছিল।’

‘কোর্ট হাউসের পেছনের গলিতে কাসলারের সঙ্গে দেখা হয়নি বলতে চাও?’

‘নিশ্চয়ই! বিল মিথ্যে কথা বলেছে। ওরা বাপ-বেটা দুজনেই আমাদের ঘৃণা

করে!’

‘মেরামত শুরু করার আগে বিলও আবোলতাবোল বকছিল,’ বলল হ্যারল্ড লেভিট।

ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গীদের দিকে তাকাল কলিন। দৃশ্যটা দেখবার মত, ভাবল, একপাশে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মত হাত কচলাচ্ছে বেলিভা, স্বেচ্ছায় এখানে এসেছে সে, ওর কিছু করার নেই।

‘হেলারকে নিংড়ে কথা বের করার ইচ্ছা কার?’ জিজ্ঞেস করল কলিন।

‘আমার,’ বলল হভো।

‘আমারও,’ বলল শেরিডান। ‘টস্ করা যাক তা হলে,’ পকেট থেকে একটা রূপোর মুদ্রা বের করল সে। ‘বলো, হভো, কোন্ দিক?’

‘আমিও আছি,’ বলে উঠল হ্যারল্ড, ‘শুরু করার আগেই তো বিল ছোকরা টেসে গেছে, হাতের সুখ মেটেনি আমার!’

ওদের কথাবার্তার বহর দেখে ফ্যাকাসে হয়ে গেল হেলারের চেহারা, কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, ‘দাঁড়াও, কলিন, এক মিনিট!’

‘আবার কী?’

‘বিলের মত আমার সহ্য ক্ষমতা নেই, কি জানতে চাও, বলো, সব বলছি!’

‘সত্যি জানতে চাই আমি, হেলার।’

‘তারপর কী করবে?’

‘শেরিফ এবং আদালতের সামনে তোমাকে দাঁড় করানো হবে।’

ঝুলে পড়ল হেলারের মাথা, চেহারা আড়াল হলো।

‘আমি-আমি তোমার সঙ্গে একটা আপোষরফায় আসতে চাই।’

‘কী রকম?’

‘তুমি যদি আমাকে ছেড়ে দাও তা হলে ওয়ারেনের বিরুদ্ধে আদালতে তোমার পক্ষে সাক্ষী দেব আমি।’

জুতোর ডগার দিকে তাকাল কলিন ফর্বস। নাটকীয় পরিবর্তন! ভেবে দেখবার জন্য সময় দরকার। গা বাঁচাতে হেলার ওয়ারেনকে ফাঁসিয়ে দিতে চাইছে, সন্দেহ নেই ওতপ্রোতভাবে এসবে জড়িত সে। যদি তাই হয়, তা হলে ওয়ারেনের শ্রেফ প্রতিনিধি হিসাবে স্প্রীংগারভিলে যায়নি হেলার, কাসলারের কাছ থেকে টাকা নেয়াটাই তার একমাত্র কাজ ছিল না। হামলার পরিকল্পনাটাও সম্ভবত তার মাথা থেকে বেরিয়েছিল এবং খুব সম্ভব তার নির্দেশানুযায়ীই সব কিছু করেছে রবার্ট ওয়ারেন। নাটের গুরু?

‘বলে যাও,’ সহজ কণ্ঠে বলল কলিন, ‘ওয়ারেনের বিপক্ষে কী সাক্ষী দেবে? কী বলার আছে তোমার?’

‘আমি বলব কাসলারের কাছ থেকে টাকা নেয়ার জন্যে ওয়ারেনই আমাকে স্প্রীংগারভিলে পাঠিয়েছিল, ওই টাকা যে তোমাদের গুরু’ বিক্রি করে পাওয়া, সেটা পরে জানতে পারি আমি!’

‘টাকাটা নিয়ে তারপর কী করেছ?’

‘কেন ওয়ারেনকে দিয়েছি!’

আস্তাবালের বালিতে গোড়ালি দাবাল কলিন, আবার জুতোর ডগার দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'উঁহঁ হেলার, এত অল্পে হবে না। তুমি আদালতে দাঁড়িয়ে উল্টো সুরে কথা বলবে না তার নিশ্চয়তা কি। আমি প্রমাণ চাই, নিরেট কিছু।'

'সেটা কোথায় পাব?'

'আমি কী জানি। ভেবে দেখো। চিন্তা ভাবনা করে একটা কিছু বের করো, নইলে তোমারও বিলের দশা হবে। আধ ঘণ্টা সময় দিলাম তোমাকে।'

'মাত্র আধ ঘণ্টা!'

'হ্যাঁ, মাত্র আধ-ঘণ্টা। আধ ঘণ্টা পর আবার আসব আমি, ভাল কিছু শুনতে চাই তখন, নইলে—' কথাটা ইচ্ছে করেই অসমাপ্ত রাখল কলিন।

হ্যারল্ড লেভিটের উদ্দেশ্যে মাথা দোলাল ও। 'বেলিভাকে নিয়ে যাচ্ছি আমি কফি তৈরি হচ্ছে। তোমরা এখানে ঠিক করো আধ ঘণ্টা পর আমাকে সম্ভ্রষ্ট করতে না পারলে ওর দায়িত্ব কে নেবে। তবে যা ওয়াদা করেছি, ওকে ঠিক আধ ঘণ্টা সময়ই দেব আমরা, তারপর—' কাঁধ ঝাঁকাল ও, বেলিভার হাত ধরে বেরিয়ে এল আস্তাবল থেকে।

পূব আকাশে ভোরের ধূসর আলো, হালকা হয়ে আসছে অন্ধকার, র্যাপ্স হাউসে ফিরবার পথে লক্ষ্য করল কলিন, অবাক হলো, এত তাড়াতাড়ি সকাল হবে ভাবেনি।

কাঁপছে বেলিভা, বারান্দার সিঁড়িতে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। 'বিলকে নিয়ে কী করেছে ওরা?'

'মেরেছে।'

'ওকে কোন সুযোগ না দিয়েই?'

'স্প্রীংগারভিলে আমাদের লোকদের হত্যা করার সময় ওরাও তাদের কোন সুযোগ দেয়নি। তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম, এসবে ভব্যতার অস্তিত্ব খোঁজা অবাস্তব।'

'তুমি যা জানতে চাইছ, যদি না বলে, হেলারকে কী করবে? ওকে—'

মাথা দোলাল কলিন। 'আমি যতটা ভেবেছিলাম তারচেয়ে অনেক গভীরভাবে জড়িত হেলার, এটাই আমার মাথায় ঢুকছে না, ওয়ারেনের সাথে ওর সম্পর্কটা কোথায়?'

'হেলার রবার্ট ওয়ারেনের অ্যাটর্নি।'

'বেসিনের প্রায় সবারই তো অ্যাটর্নি সে। নিশ্চয়ই ম্যাকমিলানেরও অ্যাটর্নি ছিল হেলার। ম্যাকমিলান র্যাপ্সটা বিক্রি করে দিল কেন?'

'বয়স হয়েছিল তো, মনে হয়, র্যাপ্সিংয়ের খাটুনি আর সহ্য হচ্ছিল না তার।'

'ওয়ারেন হঠাৎ হাজির হলো কীভাবে?'

'এই মানে—হাজির হলো আরকী—ম্যাকমিলান র্যাপ্স বিক্রি হবে—খবরটা কারও কাছে শুনছিল হয়তো।'

মাথা নাড়ল কলিন। এভাবে সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

ভিতরে ঢুকল ওরা। রান্নাঘরে চুলোর আগুন উষ্ণে দিল কলিন, আরও লাকড়ি

দিল। চুলোয় চাপানো পটে আবার কফি আর পানি দিল বেলিভা।

‘র‍্যাঞ্জে তোমার জন্যে ভাববে না তো ওরা?’ জিজ্ঞেস করল কলিন।

‘ভাবতে পারে অবশ্য প্রায়ই রাতের বেলা ওয়াগোনারে থাকি আমি, ওরা তা জানে।’

‘আচ্ছা, মেরি কেমন আছে?’

‘ভালই, সারাক্ষণ অস্থির। বুঝলে কলিন, ওকে আসলে আরও বেশি সময় দেয়া উচিত আমার, কিন্তু র‍্যাঞ্জের হাজারো কাজে এত ব্যস্ত থাকতে হয়—’

‘আবার বিয়ে করলেই পারো?’

‘পছন্দসই ছেলে কই?’

‘এদিকটা ভাল করে ভেবে দেখা উচিত তোমার। র‍্যাঞ্জের কাজ দেখাশোনার জন্যে একজন পুরুষ থাকলে মেরিকে অনেক বেশি সময় দিতে পারতে তুমি।’

মুদু হেসে মাথা নাড়ল বেলিভা। ‘আমার জন্যে তোমাকে অত ভাবতে হবে না। পছন্দসই ছেলে যদি পাই কখনও এবং সে রাজি হলে তখন দেখা যাবে।’

কথা বলে চলল ওরা। টগবগিয়ে ফুটছে পটের কফি। এই পরিবেশ বেশ ভাল লাগছে কলিনের। আস্তাবলে কিছুক্ষণ পরে কী ঘটতে যাচ্ছে ভুলে গেল ও, প্যাসি আসবার পর কী করবে সেই চিন্তাও মুছে গেল মন থেকে। রান্নাঘরে একটা চেয়ারে বসে ও, মাথার পেছনে হাত। একটা কাপে কফি ঢালল বেলিভা, চুমুক দিল, মাথা দোলল, সন্তুষ্ট, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল কলিন। আরেকটা কাপে কফি ঢালল বেলিভা, কলিনকে দিল।

‘আমি বাইরে গিয়ে দুজন দুজন করে কফি খেতে পাঠিয়ে দেব,’ বেলিভাকে বলল কলিন। ‘ইশ, রোজ এরকম তোমার বানানো কফি যদি খেতে পারতাম! তোমাকে আটকে রাখতে ইচ্ছে করছে!’

আরক্ত হলো বেলিভা। ‘বোকার মত কথা বোলো না, কলিন।’

বেরিয়ে গেল কলিন। আরও ফর্সা হয়ে এসেছে আকাশ, উত্তরে মেসকালেরো মাউন্টেনসের কালো কাঠামো দেখা যাচ্ছে, তবে আরও কাছের করাতের মত খাঁজ কাটা পাহাড়সারি অনেক বেশি স্পষ্ট। অনেক নীচ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে মেঘের দল, বৃষ্টি আসবে, কিন্তু কখন?

আস্তাবলের দিকে এগিয়ে গেল কলিন ফর্বস। কফি খাওয়ার জন্য হ্যারল্ড আর হন্ডোকে র‍্যাঞ্জে হাউসে পাঠাল। শেরিডানকে বলল পাহারায় থাকতে। তারপর টেরি জেলারম্যানকে নিয়ে হেলারের কাছে এল।

‘কিছু বের হলো?’ জিজ্ঞেস করল।

মাথা দোলল অ্যাটর্নি। ‘মনে হয় তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারব।’

‘কীভাবে?’

‘তুমি নিরেট প্রমাণ চাইছ, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবে না—প্রতিশ্রুতি দিলে আমি তা দেব।’

‘কী প্রমাণ?’

‘তোমাদের গুরু বিক্রির টাকা, রবার্ট ওয়ারেন আমার কাছেই জমা রেখেছে ওগুলো; উনত্রিশ হাজার দুশো একাশি ডলার, প্রত্যেকটা তোড়ায় ক্যাটল-বায়ার

অফিসের ছাপ মারা। টাকাটার উৎস বের করা কঠিন হবে না।’

‘টাকাটা তোমার সেফে গেল কীভাবে?’

‘ওয়ারেন ব্যাঙ্কে রাখতে চায়নি ওগুলো—নানা প্রশ্ন উঠত—র‍্যাঞ্জে ওর নিজস্ব একটা সেফ আছে অবশ্য, কিন্তু আমারটার তুলনায় ওটা টিনের বাক্স ছাড়া কিছু না।’

‘তা হলে তো দেখা যাচ্ছে খুব ঘনিষ্ঠ মানুষ তোমরা? তোমাকে বিশ্বাস করে এতগুলো টাকা জমা রেখেছে।’

‘আমি ওর অ্যাটর্নি, তাই রাখতে দিয়েছে—ঘনিষ্ঠতার প্রশ্ন আসছে কেন?’

বার্নের বাইরে ছুটন্ত পায়ের শব্দ পেল কলিন। দরজা খুলে মাথা গলিয়ে দিল শেরিডান।

‘ওরা আসছে!’ বলল সে।

‘প্যাসি?’

‘প্যাসি বললে প্যাসি।’

বাইরে এল কলিন ফর্বস। শহরমুখী রাস্তার দিকে তাকাল। একদল অশ্বারোহী আসছে, এদিকে। এগারজন, গুণল ও। অবশ্য সংখ্যাটা কোন ব্যাপার নয়, ওদের সঙ্গে লড়াইতে টিকতে পারবে না কলিনরা।

‘কী করব আমরা?’ জানতে চাইল শেরিডান।

‘হেলার আর বিলকে নিয়ে র‍্যাঞ্জে হাউসে চলে যাও তোমরা জলদি! একদম সময় নেই।’

দীর্ঘ এক মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কলিন, মনে মনে উপায় খুঁজছে। সটকে পড়বার মত সময় নেই, ওয়ারেনের নেতৃত্বাধীন প্যাসির কাছে আত্মসমর্পণের ঝুঁকিও নেয়া যাবে না; ব্যাপারটা লড়াইয়ের দিকে গড়ালে টিকে থাকবার আশা নেই বললেই চলে!

আর একটা ঘণ্টা সময় যদি পেত! হেলারের পেট থেকে সব কথা বের করে ফেলতে পারত ও। তারপর আবার শহরে যেত ওরা। কিন্তু এখন আর এসব ভেবে ফায়দা কী?

অ্যারন হেলার আর বিল ওয়ারেনকে নিয়ে র‍্যাঞ্জে হাউসের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে শেরিডান আর জেলারম্যান।

ওদের অনুসরণ করল কলিন।

সতের

শোবার ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কলিন, প্যাসির দিকে চোখ; রাইফেলের আওতায় এসে ঘোড়া থামিয়েছে ওরা। নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে এখন। প্যাসির সদস্যদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছে না কলিন, তবে পাশে

দাঁড়িয়ে আছে হ্যারল্ড লেভিট, সে নাকি রবার্ট ওয়ারেনকে চিনতে পেরেছে।

‘তুমি এখানে দাঁড়াও, হ্যারল্ড, ওদের দিকে নজর রাখো,’ বলল কলিন।
‘এদিকে আসতে দেখলেই জানাবে।’

‘ওদের কাছে আসার সুযোগ দিয়ে,’ বলল হ্যারল্ড, ‘তারপর আমরা যদি এক সঙ্গে আচমকা গুলি চালানো শুরু করি, ব্যাপার কী টের পাবার আগেই কিন্তু ওদের অর্ধেক স্যাডল খালি করে দেয়া যায়।’

‘এবং বাকি অর্ধেক শহর থেকে লোকজন আসা পর্যন্ত আমাদের ঘেরাও করে রাখুক।’

পাশের ঘরে চলে এল কলিন ফর্বস। হাত পা বাঁধা অবস্থায় মেঝেয় পড়ে আছে বিল ওয়ারেন, ডার্ক পিট আর হেলার। ছেড়ে দেবার জন্যে একঘেয়ে কণ্ঠে কাকুতি মিনতি করছে ডার্ক পিট, ইনিয়িং বিনিয়িং বলছে নিরপেক্ষ লোক সে, আদালতের নির্দেশেই এসেছে এখানে। এখনও মারের ধকল সামলে উঠতে পারেনি বিল ওয়ারেন, ঝিমোচ্ছে সে, কোথায় রয়েছে তা নিয়ে যেন তিলমাত্র মাথা ব্যথা নেই তার। হেলারের চোঁটে সূক্ষ্ম বিদ্রূপাত্মক হাসি।

‘এবার কী করবে, কলিন?’ জানতে চাইল সে।

‘জানি না,’ স্বীকার গেল কলিন।

‘প্যাসির সঙ্গে আমাকে আলাপ করতে দাও।’

‘কী নিয়ে আলাপ করবে?’

‘তোমাকে গ্রেপ্তার করে ওয়াগোনারে যাতে নেয়ার ব্যবস্থা করা যায়—’

মাথা নাড়ল কলিন, হেলারকে কথা বলবার সুযোগ দেওয়ার মানে খাল কেটে কুমীর আনা, ভাল করে জানে।

কফি হাতে রান্নাঘর থেকে এল বেলিভা। ‘তুমি,’ বলল সে, ‘যাই করবে আমার সমর্থন পাবে।’

‘সমাধানের একটা উপায় খুঁজছি আমি, বেলিভা,’ বলল কলিন, ‘কীভাবে যে কী করি!’

‘আমি অস্ত্র চালাতে পারি, কলিন।’

বেলিভাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করল কলিনের, তা না করে হাসল, বলল, ‘ধন্যবাদ, প্রার্থনা করো গোলাগুলি করতে না হয় যেন!’

কফি শেষ করে কাপ ফিরিয়ে দিল কলিন, কামরায় এসেছে হ্যারল্ড, তার দিকে তাকাল।

‘এগোচ্ছে ওরা,’ বলল হ্যারল্ড, ‘সব ওয়ারেনের পাণ্ডা। দুজন বাদে, শেরিফ, আরচার আর চার্লস রেডফিল্ড।’

‘ওয়ারেনের সঙ্গে রেডফিল্ডের সম্পর্ক কেমন?’

‘চার্লস তার চাকরি করে না যদিও, তবে সব সময় তার হয়ে ওকালতি করে।’

উঠানে ঢুকে পড়েছে প্যাসি। মাটিতে পা ঠুকছে ঘোড়াগুলো, অস্থির, শুনতে পেল কলিন। বেলিভার দিকে তাকাল ও। ‘মেঝেতে শুয়ে পড়ো তুমি,’ বলল, ‘হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হয়ে গেলে তোমাকে নিয়ে শঙ্কায় থাকতে চাই না আমি।’

সাথে সাথে বসে পড়ল বেলিন্ডা, তারপর চিত হয়ে শুয়ে কলিনের দিকে তাকিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে হাসল। ‘কেমন জানি বোকা বোকা লাগছে নিজেকে।’

‘সাবধান, উঠবে না!’

সামনে জানালার উদ্দেশে এগিয়ে গেল কলিন, হ্যারল্ড আর হন্ডো ওর পিছু নিল। এক পাশে সরে জায়গা করে দিল শেরিডান আর জেলারম্যান।

‘ওয়ারেনের প্যাসি,’ তিক্ত কণ্ঠে বলল জেলারম্যান। ‘চার্লস আর জেফরি আরচার ছাড়া সব ওয়ারেন রাইডার।’

বাইরে তাকাল কলিন। অশ্মরোহীরা ঘোড়া ঘুরিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের মুখোমুখি হয়েছে, এখন সবাইকে চেনা যাচ্ছে, অবশ্য সবার নাম জানে না ও। অর্ধেকের বেশি ঘোড়সওয়ার স্যাডলের উপর আড়াআড়িভাবে রাইফেল ফেলে রেখেছে, বাকিরা পিস্তল বের করে নিয়েছে হোলসটার থেকে।

ওয়ারেনের উদ্দেশে কিছু বলল জেফরি আরচার, তারপর গলা চড়াল।

‘ফর্বস! কলিন ফর্বস! বেরিয়ে এসো! আমার তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই!’

‘তোমাকে বেকুব মনে করেছে নাকি? বাইরে যেতে বলছে!’ গজগজ করে উঠল হ্যারল্ড।

‘কেন যাব না?’ বলল কলিন।

‘দরজা পেরোনোর আগেই ঝাঁঝরা হয়ে যাবে!’

‘উঁহু, ইচ্ছে থাকলেও ওয়ারেন পারবে না, ওর সঙ্গে আরচার রয়েছে...’

‘খামোকা ঝুঁকি নিতে যেয়ো না, কলিন। ভেতর থেকেই সেরে নাও আলাপ-সালাপ।’

‘কলিন!’ আবার ডাকল শেরিফ। ‘কলিন ফর্বস!’

‘আসছি!’ চোঁচিয়ে জবাব দিল কলিন।

পরমুহূর্তে দ্বিধায় পড়ে গেল ও, হ্যারল্ডের কাছে শোনা বাবা-ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডের সেই রাত্রির কথা মনে পড়ে গেছে। সেরাতে র‍্যাঞ্চ হাউস ঘেরাও করে ফেলেছিল প্যাসি, কাভার নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসেছে কাছে, তারপর আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়েছে জেফরি আরচার। আজও সেই একই ব্যক্তির নেতৃত্বে সদর্পে উঠানে পা রেখেছে আরেকটা প্যাসি। এবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? জেফরি আরচার হয়তো ভেবেছে র‍্যাঞ্চ হাউসে ও ছাড়া আর কেউ নেই।

আরচারের সঙ্গে তাল মেলাতে ঠিকই বের হবে ও, কিন্তু খালিহাতে, বিনা প্রস্তুতিতে নয়।

ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গীদের দিকে তাকাল কলিন। ‘ওদের একটা ধাপ্পা দিলে কেমন হয়?’

ভুরু নাচাল হ্যারল্ড। ‘যেমন?’

‘এতে অবশ্য কাজ নাও হতে পারে।’

‘কী করতে চাও?’

‘আমি বারান্দায় যাবার পর আমার প্রত্যেকটা কথার দিকে খেয়াল রাখবে

তোমরা, দুজন এই জানালায় থাকবে আর দুজন ওই জানালাটার কাছে। সময় বুঝে জানালার কাচ ভেঙে রাইফেল বের করবে, দেরি যেন না হয়, কিন্তু ওদের আগে গোলাগুলি শুরু করবে না। প্যাসির প্রত্যেককে কাভার করার চেষ্টা করব আমরা—সফল হওয়ার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে।

এছাড়া উপায় দেখছে না কলিন। এতক্ষণ বেলিভার মতই নিরাশায় ভুগছিল ও। প্যাসির সদস্যের মধ্যে নিরপেক্ষ লোক কেবল জেফরি আরচার আর রেডফিল্ড। হেলার ও বিলের কথায় ওই দুজন কান দিলেও বাকি সবাই ঠিকই বিরোধিতা করত, 'সামান্য ছুতোয় হত্যা করবার চেষ্টা করত ওকে। কিন্তু একটা ব্যাপারে কলিন স্থির নিশ্চিত, প্যাসির প্রত্যেকটা লোকের প্রাণের মায়্যা আছে, ওকে পাকড়াও করতে চায় ওরা, কিন্তু সেজন্য প্রাণ-হারাতে চাইবে না নিশ্চয়ই!

হোলস্টারের পিস্তল আলগা করে দরজার দিকে পা বাড়াল কলিন, কবাট খুলে পা রাখল বারান্দায়।

কলিনের ছায়া দেখামাত্র সবগুলো অস্ত্র ওর দিকে ফিরল। রবার্ট ওয়ারেনের হাতেও অস্ত্র দেখা যাচ্ছে, কুৎসিত বিকৃত চেহারা তার, বোঝা যায়, ট্রিগার টানবার জন্য উতলা হয়ে আছে সে।

কলিনের জীবনের সবচেয়ে সঙ্কটময় মুহূর্ত। শিউরে উঠল ও অজান্তে, নিঃশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে, মাথার উপর হাত তুলে রেখেছে, কাউকে গুলি ছোড়বার সুযোগ দিতে চায় না। চেহারা বহু কষ্টে স্বাভাবিক রেখেছে, কিন্তু এক বিন্দু স্বস্তি বোধ করতে পারছে না।

'ঠিক আছে, ওকে কাভার করে রাখো,' গম্ভীর কণ্ঠে নির্দেশ দিল আরচার, 'যেমন কথা ছিল বিচারের জন্যে শহরে নিয়ে যাব ওকে।'

'বিচার তো এখানেই করা যায়,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল রবার্ট ওয়ারেন।

'এই প্যাসির লীডার যখন আমি,' বলল আরচার, 'নির্দেশটা আমিই দেব।'

লম্বা করে দম নিল ওয়ারেন। 'ক্লাইভ,' ডাকল সে।

'বলো, রবার্ট।'

'কী করতে হবে জানো তুমি।'

শেরিফের একটু পেছনে ক্লাইভ কাসলার, ডান হাতে সিক্স-গান, কলিন দেখল শেরিফের দিকে পিস্তল ঘুরিয়েই ট্রিগার টেনে দিল সে।

আধ পাক ঘুরে কাসলারের দিকে ফিরেছিল শেরিফ, কাসলারের পয়লা গুলি ওর দেহ ভেদ করে আরেকটা ঘোড়ার গায়ে বিঁধল, তীব্র আত্ননাদ করে উঠল আরচার। রাইফেল ঘোরানোর চেষ্টা করল সে, কিন্তু তার আগেই ফের গুলি করল কাসলার এবং আবার।

লফিয়ে কয়েক পা সামনে এগিয়ে এল শেরিফের ঘোড়াটা, লাগামে টান পড়ল না দেখে লাফাতে শুরু করল। বাঁকা হয়ে গেল আরচার, পিছলে দড়াম করে পড়ল মাটিতে। গুলির শব্দে আরও কয়েকটা ঘোড়া ভীত হয়ে উঠল, ঈওয়ারীরা সামলে নিল ওদের।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে কলিন, রক্তশ্বাস মুহূর্ত, চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না ব্যাপারটা। অবশ্য ঠাণ্ডামাথার এই নশংস হত্যাকাণ্ড অপ্ৰত্যাশিত

নয়, এখুনি একই অবস্থা হতে পারে ওরও। ক্লাইভ কাসলার পিস্তলে গুলি ভরছে এখন, আর্নেস্ট হলদের হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়েছিল লোকটা, মানুষ হত্যা তার কাছে আর দশটা দৈনন্দিন কাজের মতই মামুলী।

কোনমতে চেহারা স্বাভাবিক রেখে কাসলারের দিকে তাকাল কলিন। ইস্পাত কঠিন চেহারা লোকটার, চোখে খুনের নেশা। রেডফিল্ডের দিকে চোখ ফেরাল এবার, সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে তাকে, চোখজোড়া যেন বেরিয়ে আসবে তার কোটর ছেড়ে, এই হিমেল সকালেও ঘামছে রীতিমত।

‘তোমার সাহস আছে, স্বীকার করছি, ফর্বস,’ বলল ওয়ারেন। ‘কিন্তু এখন যদি জলদি মুখ না খোলো তোমারও আরচারের দশা হবে। দুটো প্রশ্নের জবাব চাই আমি।’

জিভ দিয়ে ঠোট ভেজাল কলিন। ‘যথা?’

‘আমার স্ত্রী, কোথায় সে?’

‘সম্ভবত ক্যানসাস সিটিতে, স্প্রিংগারভিল রোডে ওকে স্টেজ কোচে তুলে দিয়ে এসেছি আমি।’

‘ঠিক?’

‘হ্যাঁ।’

ওর দিকে তাকিয়ে রইল ওয়ারেন, জবাবটা বিচার করছে যেন, অবশেষে মাথা দোলাল সে। ‘আমি অবশ্য আগেই আঁচ করেছিলাম,’ স্বীকার করল, ‘কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। এবার দু’নম্বর প্রশ্ন। বল ওয়ারেন কোথায়?’

মনে মনে কুঁকড়ে গেল কলিন, এই প্রশ্নটার জবাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হবে ওকে, ওয়ারেনের চেহারা দেখেই বোঝা যায় সেটা।

‘তার আগে একটা কথা বলি?’

‘না।’

‘কিন্তু আমাকে যে বলতেই হচ্ছে। খুব জরুরি।’

ধাপ্পা দেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়, হয়তো কাজ হবে না, তাতে কী, মরতে তো হবেই, চেষ্টা করেই দেখা যাক!

‘আমার ছেলে কোথায়?’ বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠল ওয়ারেন।

‘আমি যে কথাটা বলতে চাই,’ কায়দা করে বলল কলিন, ‘সেটা হলো, ঠিক এই মুহূর্তে একটা রাইফেল তোমার মাথার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, রাইফেলধারী এমন জায়গায় রয়েছে গুলি ফস্কানোর কোন সম্ভাবনাই নেই।’

র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনের দিকটা চষে ফেলল ওয়ারেনের দু’চোখ। ‘কোথায়? দেখছি না তো?’

‘ভুল হচ্ছে আরকী,’ বলল কলিন, ‘আসলে ঠিক কোন্ রাইফেলটা যে তোমাকে নিশানা করেছে আমি নিজেও জানি না, চারটে রাইফেল কি না!’

প্রথমে ডানে তারপর বামদিকের জানালার কাচ ভাঙবার মৃদু শব্দ পেল কলিন। আবার র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনের অংশে নজর বোলাল ওয়ারেন, হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। এতক্ষণ পর্দা টানানো ছিল জানালায়, কিন্তু কাচ ভাঙবার পর পর্দা সরিয়ে ফেলা হয়েছে, চারটে রাইফেলের নল বেরিয়ে আছে জানালার

আত্মসমর্পণের পর্বটি ভেসে গেছে। ঘোড়া ঘুরিয়ে উল্টোদিকে ছুট লাগাল তিনজন। এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে শুরু করল অন্যরা। ঘরে ঢুকে পড়বার ফুরসত পেল না কলিন, হঠাৎ একটা গুলি এসে লাগল কাঁধে, তীব্র ধাক্কায় এক পাশে কাত হয়ে গেল ও, আছড়ে পড়ল দেয়ালের উপর, চেয়ে রয়েছে উঠানের দিকে, চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা। তিনজন অশ্বারোহী পালাচ্ছে, স্যাডলের সঙ্গে মিশে গেছে ওরা। একেবেঁকে আস্তাবলের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে একজন। ফেলে দেওয়া পিস্তল তুলে নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওয়ারেন আর কাসলার। পিস্তলটা খপ করে ধরেই হাটুতে ভর দিয়ে বসল ওয়ারেন, কলিনের দিকে তাক করল ওটা, খিস্তি করছে অবিরাম। নিজেকে আর সামলাতে পারল না কলিন, মেঝেতে লুটিয়ে পড়তে পড়তে ওয়ারেনের উদ্দেশ্যে গুলি ছুঁড়ল ও, পরপর দুবার, তারপর গুলি করল কাসলারকে, চোখ থেকে খুনের নেশা আবার উধাও হলো তার।

দোলনার মত দুলছে ওয়ারেন, বাতাসে আঁকিঝুঁকি কাটছে যেন তার পিস্তল, অপর হাত দিয়ে ধরে ওটাকে স্থির করতে চাইল সে। আবার গুলি করল কলিন, তারপর পিস্তল ঘোরাল ক্লাইভ কাসলারের দিকে। ট্রিগার টানল, 'ক্লিক' শব্দ হলো শুধু, গুলি বের হলো না!

গুলি করবার আর প্রয়োজন ছিল না অবশ্য। র‍্যাক্স হাউসের ভিতর থেকে কাসলারের উদ্দেশ্যে ছুটে গেল একটা বুলেট, পাই করে আধপাক ঘুরল কাসলার। আবার র‍্যাক্সের জানালায় রাইফেলের বজ্রনিাদ। ভাঁজ হয়ে গেল ক্লাইভ, মুখ খুবড়ে পড়ে গেল ঘোড়া থেকে বেশ তফাতে।

যেমন হঠাৎ শুরু, তেমনি শেষ হলো সংঘর্ষ।

কলিন অস্পষ্টভাবে অনুভব করল হ্যারল্ড, হন্ডো আর অন্য কে একজন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাটু গেড়ে বসেছে ওর পাশে। হ্যারল্ডের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে সে, বলছে, 'ভেতরে নিয়ে চলো ওকে, তারপর দেখো ক্ষতটা মারাত্মক কি না!' বেলিভা।

'তাড়াছড়োর কিছু নেই, বেলিভা,' দুর্বল কণ্ঠে বলল কলিন।

ক্লান্ত বোধ করছে ও, বড্ড ক্লান্ত। কাঁধের তীব্র যন্ত্রণা যেন মাথা খারাপ করে দেবে! ঝিমুনি আসছে, জোর করে ঝিমুনি ভাব দূর করে দিল ও, পিটপিট করে তাকাল আবার ওয়ারেনের দিকে। কাত হয়ে পড়ে আছে লোকটা, নড়ছে না একটুও। কঠিন পথে জীবন কাটিয়েছে, মৃত্যুটাও এসেছে তার কঠিন রূপেই।

'কেমন বোধ করছ, কলিন,' জানতে চাইল হন্ডো।

'খুব খারাপ না,' বলল কলিন, 'কাঁধে সামান্য লেগেছে মাত্র।'

'আমার কাছে মোটেও সামান্য মনে হচ্ছে না,' বলল হ্যারল্ড। 'অবশ্য আরও মারাত্মক হতে পারত।'

'ভেতরে নিয়ে যাও ওকে।' বলল বেলিভা, 'এখানে বসে বকবক কোরো না!'

'না,' বলল কলিন। 'একটু দাঁড়াও।'

উঠানের দিকে তাকাল ও। বার্নের দরজার কাছে পড়ে মোচড় খাচ্ছে একজন, ওয়ারেনের পাশে আরও তিনটে নিখর দেহ গুনল কলিন। এরিক মেইন,

রেডফিল্ড এবং অপরিচিত একজন।

‘চারজন চম্পট দিয়েছে,’ জানাল হ্যারল্ড।

‘চারজন?’ প্রশ্ন কলিনের, ‘আমি তো তিনজনকে দেখলাম।’

‘না, চারজন। পালানোর সময় বোধ হয় ওদের দুজন চোট পেয়েছে।’

‘চার্লস দেখছি নড়ছে,’ বলল কলিন, ‘পাশের ওই লোকটাও।’

‘কাসলার। তোমাকে আগে ভেতরে নিয়ে যাই, তারপর ওদের দেখব।
ডাক্তার আনতে শহরে পাঠাব কাউকে।’

এবার আর আপত্তি করল না কলিন। ওকে ঘরে নিয়ে আসা হলো।

ড্যানিয়েল ফর্বসের খাস কামরায় এনে বিছানায় শোয়ানো হলো, ওর কাঁধের ক্ষতে ব্যান্ডেজ করে দিল বেলিভা আর শেরিডান। একটু পরেই চেতনা হারাল ও।

হ্যারল্ডের উদ্ভিগ্ন কণ্ঠস্বরে ঘোর কাটল কলিনের।

‘কলিন,’ বলল হ্যারল্ড, ‘এই যে কলিন, ইচ্ছে ছিল না তবু জাগাতে হলো, আরেকদল ঘোড়সওয়ার আসছে এদিকে। চোদ্দ পনেরজনের কম না!’

আরেকটা প্যাসি? আবার লড়াই করা সম্ভব হবে না ওদের পক্ষে।

‘ধরে বসো আমাকে,’ জড়ানো গলায় বলল কলিন।

‘নাহ্,’ বলল হ্যারল্ড, ‘আমি দেখছি ব্যাপারটা। বেলিভা?’

‘কী?’ দরজায় দাঁড়িয়ে বলল বেলিভা।

‘এদিকে এসো। তোমার কাজ হলো একে পাহারা দেয়া, যেন বিছানা ছাড়তে না পারে।’

‘পারবে না,’ বলল বেলিভা।

বিছানার কিনারে বুকে হাত বেঁধে বসল বেলিভা, ভয়ঙ্কর চেহারা। দোরগোড়ায় পৌঁছে থামল হ্যারল্ড, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। ‘এরিক মেইন মরেনি,’ জানাল সে, ‘এখনও মুখ খোলেনি, তবে খুলবে।’

‘অন্যরা?’

‘চার্লসও বেঁচে আছে—আর যারা পালাতে পেরেছিল—বাকি সবাই তক্কা পেয়েছে।’

‘বিল আর অ্যারন হেলার?’

‘বেঁধে রাখা হয়েছে, পিটকেও।’

‘দেখো, কারা এল,’ বলল কলিন, ‘যেভাবেই হোক ওদের আগে আমাদের বক্তব্য শোনানোর চেষ্টা করো।’

বেরিয়ে গেল হ্যারল্ড।

‘ব্যাপারটা,’ বলল বেলিভা, ‘সহজভাবে নিতে চেষ্টা করো, কলিন। যথেষ্ট করেছ তুমি। যতক্ষণ বারান্দায় ছিলে, প্রতিটি মুহূর্ত কী যে আতঙ্কে কাটিয়েছি আমি। ইশ্, গোলাগুলি শুরু হলো যখন—’

থেমে গেল বেলিভা, ঘাড় ফিরিয়ে জানালার দিকে তাকাল।

‘একটুর জন্যে গড়বড় হয়ে গেল,’ ধীর গলায় বলল কলিন। ‘সবচেয়ে ভয়ঙ্কর লোকদুটো পরাস্ত হলো আর হঠাৎ ঝামেলা শুরু করল কি না নিরীহ রেডফিল্ড!

কেন তখন করল সে? মানুষকে বোঝা কঠিন অনেক সময় খুব সাহসী লোকও চাপের মুখে ভেঙে পড়ে আর মহাভীতি প্রচণ্ড সাহসের পরিচয় দিয়ে বসে।

‘কথ’ বোলো না তো,’ বলল বেলিন্ডা।

‘ডাক্তার আনতে গেছে কে?’

‘হুন্ডো। এবার চূপ। খামোকা হয়রান হচ্ছে। ডাক্তার এসে কাঁধের গুলি বের করার জন্যে খোঁচাখুঁচি শুরু করবে, তখন সহ্য করার জন্যে শক্তি লাগবে, জমিয়ে রাখো।’

উঠোনে ঘোড়ার খুরের শব্দ, সমবেত চাপা কণ্ঠস্বর। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল বেলিন্ডা, বাইরে তাকাল।

‘শহরের কিছু লোক,’ বলল ও, ‘মানে প্রায় সবাই। হ্যারল্ডের সঙ্গে কথা বলছে কে যেন, আগে কোনদিন দেখিনি তাকে, বিশালদেহী লোক, বছর চল্লিশেক হবে বয়স, ভেস্টে একটা ব্যাজ আঁটা দেখতে পাচ্ছি।’

বর্ণনার সাথে মেলে এমন কারও কথা মনে করতে পারল না কলিন। উঠে বসতে গেল ও, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল, দুলে উঠল পৃথিবী। ছুটে এসে ওকে ধরল বেলিন্ডা, আলগোছে শুইয়ে দিল আবার, আপত্তি করল না কলিন।

‘ভেতরে ঢুকছে ওরা,’ ওকে জানাল বেলিন্ডা, ‘ভদ্র আচরণ করো।’

সরাসরি এ-ঘরে এল না অতিথিরা। মিনিট দশেক পর সপ্রতিভ চেহারায দরজায় এসে দাঁড়াল হ্যারল্ড, বেলিন্ডার বর্ণিত সেই আগন্তুকও রয়েছে সঙ্গে।

‘কলিন, এর নাম আর্ল সিমুর,’ বলল হ্যারল্ড, ‘স্যানতা ফে’র ইউএস মার্শাল, বিশেষ কাজে স্প্রিংগারভিলে এসেছিল, ওখানে লিভা ওয়ারেনের সঙ্গে ওর আলাপ হয়।’

বিছানার কাছে এগিয়ে এল সিমুর। ‘হ্যালো, ফর্বস,’ বলল সে, ‘খুব ঝামেলায় গেল সকালটা, না?’

‘হ্যাঁ,’ বলল কলিন।

‘ভোরের স্টেজে ওয়োগোনারে পৌঁছেছি আমি,’ বলল সিমুর। ‘গতকাল শেষরাতে একটা প্যাসি এদিকে এসেছে শুনে লোকজন যোগাড় করে পিছু নিয়েছি, দেরি হয়ে যাবে আশঙ্কা ছিল, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আসলে আমার কোন প্রয়োজনই ছিল না।’

‘তা হলে-কি ঘটেছে বুঝতে পেরেছ?’

‘হ্যাঁ। কেন, তাও,’ বলল সিমুর। ‘এখানে আসার আগেই সব জানতে পারি আমি। লিভা-মিসেস ওয়ারেনের কাছে। চমৎকার মহিলা, তাই না?’

‘হ্যাঁ,’ বলল কলিন, ‘তাই।’

‘অবশ্য একটু একগুঁয়ে,’ বলে চলল সিমুর, ‘প্রথম যখন আমাকে স্প্রিংগারভিলের কাছের কবরগুলোর কথা বলল, বিশ্বাস করা দূরে থাক, আমলই দিইনি, কিন্তু মহিলা নাছোড়বান্দা। ওর চাপে শেষে বাধ্য হয়ে অকুস্থলে গেলাম, খুঁজে পেলাম কবরগুলো। খানিক আগে আরেকটা চমক খেয়েছি আমি, তোমরা যাকে রবার্ট ওয়ারেন বলছ, তার চেহারা দেখলাম, ওকলাহোমায় অন্য নামে

পরিচিত ছিল লোকটা, রাস ম্যাকডোনাল্ড, দুই আড়াই বছর আগে জেল ভেঙে পালায়, ব্যাঙ্ক ডাকাতির একটা চেষ্টা চালায় এরপর, ব্যর্থ হয়, তারপর আর তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

‘ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল?’ বলল কলিন, ‘তা হলে এখানে র‍্যাঞ্চ কেনার জন্যে টাকা পেল কোথায়?’

পরমুহূর্তে পেয়ে গেল ও জবাবটা।

হেলার।

সে-ই টাকার ব্যবস্থা করেছে। হেলারই নাটের গুরু। শেষের দিকে বোধ হয় ওয়ারেনকে বেশে রাখতে পারছিল না। ওকে ওয়ারেনের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলবার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল এবার। ওরা যে কেউ একজন মারা গেলে শেষ পর্যন্ত হেলারই লাভবান হত। ওয়ারেন র‍্যাঞ্চের মালিকানা দাবী করতে পারত একদিকে, কিনে নিতে পারত ফর্বস র‍্যাঞ্চটাও...দুটো র‍্যাঞ্চের মালিকানাই হেলারের লক্ষ্য ছিল?

‘হেলারের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি,’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল কলিন।

‘না, আমি,’ বলল হ্যারল্ড, ‘কী বলতে হবে আমি জানি।’

সেদিন বিকেলে আবার শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়াল সিমুর। ‘একটু পরেই আমরা চলে যাচ্ছি, ফর্বস,’ বলল সে। ‘হেলারকে শহরে নিয়ে গিয়ে হাজতে ঢোকাতে চাই। ম্যাকডোনাল্ডের ছেলে, মানে তোমরা যাকে বিল ওয়ারেন হিসেবে জানো, তাকেও নিয়ে যাচ্ছি। আগামী কয়েকটা দিন এই মামলার ছেঁড়া সুতোগুলো একত্র করার চেষ্টা করব আমরা, তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে ফয়সালার ব্যবস্থা নেব। ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা তোমার উদ্ভিগ্ন হবার কোন কারণ নেই। হেলারের স্বীকারোক্তিতেই স্পষ্ট বোঝা যায় এতসবের পেছনে সে-ই আসল লোক। আচ্ছা, ক্যানসাস সিটিতে যাবার সম্ভাবনা আছে নাকি তোমার কিছুদিনের মধ্যে?’

‘ক্যানসাস সিটি?’ বলল কলিন। এক মুহূর্ত ভাবল। লিভা অসাধারণ মেয়ে সন্দেহ নেই, যে কোন পুরুষের জীবন পূর্ণ করে তুলতে পারবে। কিন্তু ক্যানসাস সিটির মত একটা জায়গায় গিয়ে কী করবে কলিন? বিস্তর্ষণ খোলা প্রান্তরের মানুষ ও, যেখানে ইচ্ছে মত ঘুরে বেড়ানো যায়, ফুলবাবু সেজে থাকতে হয় না।

‘নাহ্,’ অবশেষে বলল ও, ‘নেই।’

‘কদিন পর আবার দেখা হবে তা হলে,’ বলল সিমুর, ‘আশা করি শিগ্গির সুস্থ হয়ে ওঠো। ডাক্তার বলেছে কাঁধের ক্ষতটা তেমন মারাত্মক নয়।’

‘সম্ভব হলে কালই উঠে বসার চেষ্টা করব আমি,’ বলল কলিন, ‘এমন একটা র‍্যাঞ্চের কাজকর্ম তো আর ফেলে রাখা যায় না!’

‘চমৎকার কিছু সঙ্গীও পেয়েছ তুমি!’

‘সেরা।’

‘শুধু একটা মেয়ের অভাব।’

‘সেটাও পূরণ করা হয়তো সম্ভব,’ বলল কলিন।

জানালাৰ দিকে তাকাল ও, বেলিভাৰ চেহাৰা রক্তিম হয়ে উঠেছে, লক্ষ্য করল।

হেসে ফেলল সিমুর, ওদের দুজনের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে বেরিয়ে গেল। ওকে বিদায় সম্ভাষণ জানানো আর হলো না কলিনের।

জানালাৰ কাছে একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল বেলিভা, এখন ওর চেহাৰা দেখতে পাচ্ছে না কলিন।

বেলিভাৰ দিকে 'চেয়ে রইল ও। ভবঘুরে মানুষের পক্ষে একাকী জীবন কাটোনো সম্ভব, কিন্তু জীবনে স্থির হওয়ার জন্য বিয়ে অপরিহার্য। নিজস্ব একটা র‍্যাঞ্চ আছে বেলিভাৰ, ঠিক; ওরও আছে; কিন্তু দুটো র‍্যাঞ্চ তো একসঙ্গে চালানো যায়।

'আমি এবার বাড়ি ফিরব,' বলল বেলিভা।

'তা হলে আমিও উঠে পড়ব,' বলল কলিন।

চট করে ঘুরল বেলিভা। 'না! কিছুতেই উঠবে না তুমি। ডাক্তার বলেছে—'

'—আমার এখন শুশ্রূষার দরকার।'

'কিন্তু আমাকে মেরির কথা ভাবতে হবে না?'

'র‍্যাঞ্চ ওর দেখাশোনার জন্যে এলেনা আছে।'

'কিন্তু আমি ওর মা।'

'তা হলে কাউকে পাঠিয়ে দাও, নিয়ে আসুক ওকে, এখানে ওর কোন কষ্ট হবে না।'

'কাজটা কী ভাল দেখাবে?'

'আমার কাছে তো চমৎকার মনে হচ্ছে,' বলল কলিন। 'আমার মনে হয় এটাই সবচেয়ে ভাল উপায়।'

আবার আরক্ত হলো বেলিভাৰ চেহাৰা। 'বুঝে বলছ তো?'

মাথা দোলাল কলিন। 'এবার এদিকে এসো।'

এক পা সামনে এসেও দাঁড়িয়ে পড়ল বেলিভা। 'ভেবে দেখার জন্যে একটু সময় দেবে না?'

'পাঁচ সেকেন্ড সময় দিলাম,' বলল কলিন। 'তারপর উঠে বসব।'

পাঁচ সেকেন্ড পর উঠে বসবার উপক্রম করল কলিন, কিন্তু তার, আর প্রয়োজন হলো না।
